# মাতৃপুস্তক

( উপদেশ উপন্যাস )

প্রথম খণ্ড

কানন দেবী

প্রকাশক :—
অশোকানন্দ প্রসাদ
৬২/৬১, উত্তর ইন্দা
পো: খড়্গপুর
জেলা : মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৮

মুদ্রাকর :—
বেণীমাধব পাল
দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৭, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

আমি এই উপন্যাস
আমার মানস সন্তানের
হাতে তুলে দিলাম।

"মা"

কানন দেবী

# উপক্রমণিকা

নাম আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। উপাধি সেই নামেরই অলঙ্কার। আর অলঙ্কারের সার্থকতা বোধ করি অহঙ্কারে। বাং বদি স্বাভাবিক পরিণতি, কিন্তু হায় নামী যে হয়ে যায় বিকৃত। স্বীকৃতি পেয়ে এই বিকৃতি বড়ই বেদনাদায়ক। যাক এ ত গেল আমাদের কথা। এবার প্রশ্ন হল মায়ের নামই বা কি এবং সেই নামের কি ব্যাখ্যা হবে? উপাধি ও অহঙ্কারের বিচার না হয় অনাদি অনন্ত কাল ধরে চলবে।

মা নামেই যার একমাত্র পরিচয় তাকে কে কি নামে অভিহিত করে শান্তি বা আনন্দ পেতে চায়, সে জমা খরচে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা মায়ের নাম মা-ই বলে জানি। বাস্তব পরিচিতির পরা ছোঁয়ার গণ্ডীর আড়ালে তাঁকে যে অবগুণ্ঠনবতী দেখতে চায় আমরা চাই না তার কোন সমালোচনা করতে। তবে হৃদয়ের সংকীর্ণ স্থানে মাকে কি মানায়! হয়ত মানায়, তবে স্থান অকুলান হয়। আমরা অবশ্য তেমনই মনে করি। কিন্তু মায়ের তাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট, দুঃখ বা আক্ষেপ নেই। এইখানেই এই বিস্ময়কর প্রতিভার বিশালত্ব। এবং একমাত্র নিগূঢ় সাধনার মূলে তাকে করা যায় সম্যক উপলব্ধি তাই পরম বিস্ময়ে গভীর ধ্যানে চিন্তা করতে হয় অতিন্দ্রীয় লোকে সর্বদা অবাধে বিচরণকারী কে এই সাধারণ প্রাণ? মা কি জ্ঞানী, না জ্ঞান? এই আবির্ভাব কি কেবলমাত্র অমরত্ব লাভ করেই ক্ষান্ত আছে, না তারও অধিক অন্য কোন আখ্যায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে? এই কি সেই আদি অনন্ত? যাক কতকগুলো জটিল প্রশ্নে আমরা সুধী পাঠক ও পণ্ডিত-মণ্ডলীকে বিশেষ বিব্রত করতে চাই না। এখানে ব্যক্তি ও বিষয় উভয়ই ব্যক্তিগত ভাবে বুঝবার। কাউকে বুঝাবার নয়। শুধু প্রসঙ্গক্রমে একটি কথাই বলে রাখি—মা এই নামের সঙ্গে এ বিশ্বে সকলেই বিশেষ পরিচিত। তফাৎ যা এই—সর্বত্র তা কেবল অনুভূতির বস্তু। এখানে ঐ. হল সম্পূর্ণ উপলব্ধির বিষয়।

সত্য-স্বরূপ মহাপর্বতের ঠিক ঠিকানা সকলেরই জানা। যে যার মতন

তার খবর নিয়ে থাকে। কথা হল, কজন তাকে দেখেছে, দেখলেও খুব কম জনই চেয়েছে সেই পাহাড়ের কোল বেয়ে উঠতে। এবার কে কার ধারায় পর্ব্বতারোহন করেছে এবং কার হয়েছে কতদূর অগ্রগতি সে সমালোচনার অবকাশ আমাদের নেই। তবে পর্বতের চূড়ায় উঠা কারও হয়ে উঠেছে কি না সে বিচার অতীত একভাবে করেছিল। বিজ্ঞানের যুগে বর্ত্তমান একরকম বিভ্রান্ত। কিন্তু অনাগত ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ করে যোগ্যকে যোগ্য আসন দেবে। আমরা শুধু কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। পাহাড়ের শীর্ষে শুধু উঠা নয়, উঠে স্থির হয়ে থাকা, কবে কার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল? যদি হয়েছিল তিনি কি সেখানে ছিলেন শান্ত ধীর স্থির? তা না হলে ত চতুর্দ্দিকের প্রকৃতির বর্ণনা সম্ভব নয়। আমাদের জানবার বিষয়—কে কবে ঐ অত উঁচুতে উঠে সদা ব্যস্ত থেকে দিয়ে গেছেন সর্ব দিকের নিখুঁত বর্ণনা—সর্বদিকের অসংখ্য ধাবার বাধা ও বিভ্রান্তির গোড়ার কথার ব্যাখ্যা? এবার সময় নেই অসময় নেই সংসার ও সাধনার সার্থক সমন্বয়ের খাতিরে যদি কেউ অনবরত উঠা নামা করতে পারেন তবে তিনি কি সর্বকালের পরম বিস্ময়ের বস্তু হবেন না?

এবার এই মায়ের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব। বাংলাদেশের সাধারণ এক গ্রামে আজ থেকে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে আমাদের মায়ের জন্ম। অভাব অনটনের মধ্যে তাঁর বাল্যজীবন কাটে। বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন বুঝলেও কষ্টের সংসারে স্ত্রী-শিক্ষার প্রশ্ন উঠে না। তাই কেবলমাত্র বর্ণবোধটুকু হল। তারপর কোন মতে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ হতে আর লেখা পড়ার সুযোগ হয়ে উঠে নি। তবে ঘরে কাজের কমতি ছিল না। আর কাজ কমলেও মায়ের কাজের কামাই ছিল না। অষ্টপ্রহর কাজ আর কাজ—এইত আমাদের মায়ের জীবন—তাঁর নিগূঢ় সাধনার গোড়ার কথা। তবে কাজের সঙ্গে সব সময়ই অন্তরের এমন একটা জিনিষ মিশে থাকত বা থাকে যার জন্য মা সকলের অত্যন্ত প্রিয়। যাই হোক শিশু সে কিশোরী হল ঘর আর পরকে এক করে। ঘরের কাজ সারা হলে পরের ঘরে ছুটে গেছে সে। ঘর আর পর একাকার হয়ে গেছে। সহ্য হয় নি সকলের, কিন্তু আড়ালে কেউ একজন থাকবার হলে নিশ্চয়ই তিনি সেদিন লুকিয়ে হেসেছিলেন। একি কোন স্বাভাবিক স্পৃহা জানি না কে হেসেছিল কার কোন প্রবণতাকে লক্ষ্য করে।

আমরা আজ কেবল এক পরমাশ্চর্য্য বস্তু প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করছি। যে সৃষ্টি রহস্য দুর্ভেদ্য—যে বিষয়ে জানতে গিয়ে যুগে যুগে সাধক বিভ্রান্ত এবং দিশে হারা হয়ে পড়েছে সেই অনির্বচনীয়কে মা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে হঠাৎ এক বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যাক সে সব অনেক কথা। নমনীয় আগ্রহী ও উৎসাহীর কাছে মায়ের হাতে গড়া এই মনমন্দিরের দুয়ার সর্ব্বদাই অবারিত।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মা সংসারে ঢুকে আজ প্রায় ত্রিশ বছর সমান সংসার জালে আবদ্ধ। যাকে বলে ঘোরতর সংসারী। শুধু এই যা, সবার যা পায়ের বেড়ী, মায়ের তা মাথার বোঝা। তবে অনায়াসে মা বয়ে চলেছেন। এ পক্ষ ও পক্ষ দু পক্ষ সমান মানিয়ে নিজেকে মা বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাউকে অবহেলা বা ফাঁকি দিয়ে নয়, সংসার ও সাধনায় এ এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। আমরা খুব সামান্যই বুঝি। তাই বিশেষ বলতে গেলে বিলক্ষণ গুলিয়ে ফেলার ভয় আছে। কারণ যিনি জ্ঞানের উপাসক তার ধারা ধারণায় আনা যায়, কিন্তু যিনি মূলতই জ্ঞান তাকে মেলে ধরতে গিয়ে নিজের সঙ্গে আর পাঁচজনকে ভ্রমান্বিত করতে চাই না।

এবার মায়ের গান সমাধি প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা জানাতে চাই। হেঁসেলের হাতা-খুন্তির শব্দ ছাপিয়ে মায়ের যে সুর সময় সময় বাতাসকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তা ভাষাকে আশ্রয় করে পেয়েছে প্রাণ এবং সেই সুর ও সূত্র ধরে মানুষের নব জন্ম লাভের সম্ভাবনা। আজ সেই গান ঘর-ঘর সকলের প্রার্থনা-সঙ্গীত। ভগবানকে পাওয়ার পথের সাধনায় তার সূচনা এবং জ্ঞানের উপাসনায় তার পথপরিক্রমা। প্রায় সবকটি গানের প্রতিটি ছন্দ ভাবে বলিষ্ঠ এবং দর্শন ও সাহিত্যে সুসমৃদ্ধ।

লোক শিক্ষায় মা বসেন বটে তবে জনে জনে শিক্ষা দান ত সারাদিনই চলে। যে যেমন চায়, সে তেমন পায়। সকলকে তৃপ্ত করাই মায়ের ধারা। সবার ধারায় গিয়ে মা দাঁড়ান বটে কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়, অল্প সময়ের মধ্যে মা তাকে সত্যের ধারায় স্থিত করতে চান। তবে যে না চায় সে কিন্তু পালাবার পথ পায়। কারণ জ্ঞান আকর্ষণ করে বটে কিন্তু তার ত কোন দাবী নেই।

তবে চরিত্র গঠন মায়ের সাধনার গোড়ার কথা। তাই প্রতি মুহূর্তের

বিচার বিশ্লেষণ ঘরে বাইরে সকলকে স্তম্ভিত করে। এরই ফাঁকে ফাঁকে পেয়ে থাকি মায়ের অমর বাণী ও দুর্লভ সমাধি কথা। সে সমাধি বাহ্যজ্ঞান শূণ্য নয়। শুধু কি অভূতপূর্ব্ব, বিচিত্রও বটে। এ যে সজ্ঞান সমাধি। সম্পূর্ণ বাস্তব জ্ঞানে দাঁড়িয়ে সর্ব্বাবস্থায় এভাবে আধ্যাত্মিক সকল জটিল তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করা জানি না কবেও কখনও কোথাও সম্ভব হয়েছে কি না। পাঠক, পণ্ডিত আপনারাই সব বিচার করে দেখবেন, আমরা মায়ের স্নেহধন্য সামান্য সন্তান। ভয় ভাবনায় তাই শুধুমাত্র কিছু কিছু করে সব ছুঁয়ে গেলাম।

শেষে কয়েকটি কথা এই দুর্লভ জ্ঞান প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন। তিল থেকে তাল এ সংসারে দেখা যায় এবং তা সহজেই ধারণায় আনা যায়। কারণ উভয়ই বস্তু বিশেষ। কিন্তু যখন তিল থেকে বিশাল কিছু আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই ব্যক্তি আত্মা ও বিশাল বস্তুকে নিয়ে বহু দ্বন্দ্ব, যুক্তি ও তর্কের সম্মুখীন হতে হয়, এ কথা কার না আর জানা।

গল্পচ্ছলে সাধারণ কয়েকটি উপদেশ কথা দিয়ে শুরু কিন্তু সুবৃহৎ উপন্যাসে—বরং বলি মহাকাব্যের গণ্ডী পেরিয়ে বহু দূর গিয়ে এর সমাপ্তি। ফুলস্কেপের হাজার দেড়েক পৃষ্ঠা হাতে লেখার পর টেপ্ রেকর্ডিং মেসিনের সাহায্য নিই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে ছুটে এসে মা ধরে ধরে বলে যেতেন। এক সময়ে মায়ের অনর্গল বলার ক্ষমতার পরিচয় পাই এবং যার পর নাই স্তম্ভিত হই। তাঁর বলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব হয়। মেসিনের প্রয়োজন পড়ে। তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য, এ তাল না এ বিশাল?

১৩৭৫ সাল। জ্যৈষ্ঠের শেষ। জনৈক সন্তান একদিন বলে, "মা সন্ধ্যা আরতির (১৩৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে বালক ভোজন মহোৎসবের সময় প্রকাশিত মায়ের সহজ ভাবে গাওয়া মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি গানের একটি চটি বই।) গান পড়ে ভাল বুঝি না। আমরা সাধারণ মানুষ কবিতা গানের অর্থ সব সময় ধরতে পারি না। তাই কথায় কিছু পেলে পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। তবে বর্ত্তমানে আপনার উপদেশ বাণী চাই। ওই কথাগুলোর জোরে পথ চলব।"

সকাল বেলা। ১লা আষাঢ়, ১৩৭৫। মা ওই বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন, "উপদেশ বলতে কি বাবা মাত্র কয়েকটা কথা! কর্ম,

কর্ত্তব্য, ন্যায, নীতি ইত্যাদির যেমন শেষ নেই সেই রকম জানবি নীতি পালন উপদেশও অল্প কথায় হয না। এর শুরু আছে শেষ নেই।"

"তবু মোটামুটি কিছু বল"—এই বলে মাকে পীড়াপীড়ি করি।

হাল্কা ভাবে মা উত্তর দেন, "বেশ তাহলে কাদের জন্য চাই ?"

—সকলের যাতে প্রয়োজন মিটবে এমন মা।

—সবার জন্য হলে সে ত অনেক কথা।

—তা না হলে, সকলেই ত খোরাক খুঁজবে।

—"তাহলে শিশু দিয়ে শুরু করি। তবে একটা কথা কি জানিস—উপদেশ সে না হয অল্প কথায় সারলাম, কিন্তু ব্যাখ্যা তার লোকমুখে ঠিকমত হলে হয। যার গভীরতা বুঝবি না তাকে গুরুত্ব দিবি কি করে। অবশ্য আমি চাই তোরা প্রতি পদে আমায় বিচার করে দেখবি। যাই হোক মোটামুটি এই আদর্শ উপদেশ কথা তোদের দিলাম।"

এর পর উপদেশ কথা কখন কোন সময উপন্যাসের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে অনবদ্য ধারা নিয়েছে আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তারপর ধীরে ধীরে তা হয়ত বা সর্ব্বকালের ধারণা ও শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ছাপিয়ে গেছে। যাক সে বিচার আর সকলের করবার, আমাদের মানায না, আমরা ত বলবই।

মাকে আমরা আমাদের চোখে দেখেছি এবং বিলক্ষণ আমাদের মতন করে বুঝেছি। কিন্তু মায়ের মতন না হলে ত মাকে বুঝা যায না। যাই হোক সে সব উচ্চ মার্গের ব্যাপার কে বা কজন সে স্তর লাভ করতে পারবে জানি না। তবে বর্ত্তমান আমাদের অনেক কথাই বলা রইল। সে সকলই ভক্তির আতিশয্য, না ভাবের উচ্ছ্বাস, না প্রকৃত মাতৃ সত্যের আলোয দাঁড়িয়ে জ্ঞান বিচারের বলে যাচাই করে বলা তার উত্তর মায়ের শিক্ষায শিক্ষিত ও মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত আমরা অগণিত ভাই বোন কালে কালে নিশ্চয দেব। তবে আপাততঃ আমাদের একমাত্র বাসনা—সর্ব্বসমক্ষে এ মহাজীবন তথা আদি সত্য প্রকাশিত হোক।

আদর্শ ও উপদেশ বলতে যা বুঝায় সবই এই সুবৃহৎ উপন্যাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছেন মা। সত্য আদর্শ ন্যায নীতি ইত্যাদি হল সবের মূল বক্তব্য। তবে মিথ্যা বা অনাদর্শও ঠাঁই পেয়েছে। সেখানে জ্ঞান

দিয়ে তাকে করেছে খানখান। আর সবের মাঝে অমরেশের মৃত্যু নেই। একা অমরেশই অক্ষয় অমর।

প্রসঙ্গ ক্রমে দুটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংসারে শতসহস্র বন্ধনে জড়িত মায়ের জীবন। তার উপর মন্দিরের চাপ। অবসর মেলা ভার। সর্বদিক বজায় রেখে—সকলকে তৃপ্ত এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিতৃপ্ত এবং পরম পরিতৃপ্ত করে মায়ের এই উপন্যাস লেখা। সারাদিনের মধ্যে সন্ধ্যায় মাত্র চার ঘণ্টার মন্দির। সব সেরে এসে সব সারতে হয় মাকে। ফুল স্নানজল দেওয়া, কেসের বিচার, সমস্যার সমাধান, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা, লোকশিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয়ের জন্য মাত্র এই সময়টকু। এরই এক ফাঁকে ব্যস্ত হয়ে সময় করে নিয়েছেন মা উপন্যাসের খাতিরে।

আর এই সুবিশাল উপন্যাস অনর্গল বলার শেষে কোনদিন ক্ষণকালের তরেও মা ঘুরে দেখেন নি। কি লেখা হল সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্রও দ্বন্দ্ব, দ্বিধা বা উৎসাহ, আমরা পদে পদে লক্ষ্য করেও বুঝতে পারিনি। বরং পড়তে চাইলে তিনি বিরক্ত হয়েছেন এবং পড়তে দেন নি। বলেছেন, "আমি যা বলে দিয়েছি একবারই। দ্বিতীয়বার বলার মত আর কিছু নেই।"

এই বুঝি কিছু ভুল হল বা পাছে কিছু ছেড়ে গিয়ে থাকে, এ ভেবে লেখকের ভাবনা হয়। অল্প কথা হলে সে ভয় ভাবনার প্রশ্ন নাও উঠতে পারে কিন্তু যে লেখার এক রকম সুরু আছে, শেষ নেই সে লেখা কি করে নিশ্চিত থাকে, জানি না। অবশ্য এমন না হলে, এমন রচনাও সম্ভব নয়।

উপন্যাস প্রসঙ্গে খুঁটিনাটি আরও অনেক কিছুই আমাদের বলবার রইল। কেবল প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারেই তা সম্ভব। এখনই একবাক্যে কাউকে কিছু মেনে নিতে বলি না। শুধু এইটুকু আশা রাখি—সুধী পাঠক ও পণ্ডিতমণ্ডলী এগিয়ে এসে বিচার করে বলবেন, এ সৃষ্টির সার্থকতা কতখানি? কোথায় কোথায় মায়ের বৈশিষ্ট্য এবং কতটুকু অলৌকিকত্ব, অবশ্য তেমন মর্যাদা পাবার যোগ্যতা যদি মায়ের থাকে।

সন্তানগণ।

# নামকরণ

(—মায়ের আপন মনের খেলা এই যাকে বলে সমাধি—)

জানিস? জানিস না। বুঝলি না, উঁ? বুঝতে পারিস না, তাই। বুঝিস্ না বলেই বলছিস, জানিস? শুধু উপন্যাস উপন্যাস করে। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। জানিস নাবে এ উপন্যাস—ঐ ত বললাম—বুঝিয়ে দিই। আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি—

নালীর পোকাকে তুলে এনে যদি উপরে রাখিস পরে সে মরে যাবে, নালী ছাড়া বাঁচতে পারে না। তেমনি এই উপন্যাস—মনে কর যে তৈরী হবার নয় সে পড়লে তার এত বিশ্রী খারাপ লাগবে, সে পারবে না। তার কাছে খুব খারাপ লাগবে। আর মনে কর ধাক্কায় যদি গিয়ে কেউ নালীতে পড়ে গেছে তখন সে পথের পানে চেয়ে বসে আছে—কে যেন তাকে তুলে দিবে। যখন সে দেখল রাস্তা দিয়ে কেউ আর চলছে না এঁ্যা, তখন বাধ্য হয়ে সে নালীতেই রয়েছে—থাকতে থাকতে সে অভ্যস্থ হয়ে পড়ল। আচ্ছা তখন জানবি এই উপন্যাস পড়লে সেই পথ পেয়ে গেল। তাইত, এ কি জিনিষ, এই পেয়েছি। এই বলে সে তখন নালী থেকে উঠে এল। এ বুঝলি?

অর্থাৎ যার সুকৃতি ভাল আছে—যে নিয়ে এসেছে তারই এ জিনিষ ভাল লাগবে। আর যে কিঞ্চিৎ এনেছে সে আর কি করবে—সে ত এর মধ্যে ঢুকতেই পারবে না, এঁ্যা? বুঝতেই পারবে না। এটা কি সেই উপন্যাস হেঁ হেঁ হেঁ। বুঝতে পারছিস তো?

উপদেশ উপন্যাস তোরা দিয়েছিস, না? উঁ? হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। আচ্ছা আর যদি বলা হয়; যে উপন্যাস কথাটা বাদ দিয়ে দে, এঁ্যা? উপন্যাস কেন বলছিস? যদি বলিস যে, প্রকৃত জ্ঞান আদর্শের ব্যাখ্যা। এঁ্যা, তাহলে? হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ। হ্যাঁরে। এটা—এটা বলবি কি জানিস, এটার নাম দিবি, তাহলে ভাল হবে, মাতৃপুস্তক বলবি। হাঁ হাঁ হাঁ। এটা হচ্ছে এই—জ্ঞান আদর্শের ব্যাখ্যা—মাতৃপুস্তক। হে হে হে হে, হা হা হা হা—মায়ের সংসার, এঁ্যা? তাই নয়?

# আহ্বান

( —ভূমিকার আবেদনের উত্তরে মা— )

কি দিয়ে ডাকব শুনি !
ভাবিনু মনে ক্ষণেক—
ক্ষণেক আমি।
আয় রে সবাই
আয় দেখিনি।

শুধাল আমায় এসে—
কেন গো মা ডাক তুমি
এমন করে ভালবেসে ?
জান না কি মোদেরে শুনি ?
ওগো মা, সত্য করে চাই মা
চাই বলিবারে—
মাগো, রসময় জীবন মোদের,
কেমনে দাঁড়াব 'ইধারে' শুনি ?

চাইনু ফিরে তাই
সত্য আমায় বলছে বুঝি
মিথ্যা এদের নাই।
ক্ষণেক তখন চুপটি করে
শুধানু আমি আমার
অন্তর দেবতারে।

• কি দিয়ে বোঝাই
বল গো আমায়—
রেখে যাব কি পরিচয়
পরিচয় কোথায়?

মনের দেবতা জেনে
শুধু ইঙ্গিতে ভাবিতে—
ভাবালেন আমায়—
"কেন, নাই কি মনে
জান না কি-
পাবে না তোমার
উপদেশ বাণী?"

আবার ফিরে দাড়ানু নাই
এ জীবনে আমার
লাগিবে সময়
বয়ে যাবে বেলা
সেই তৎক্ষণ—
তারই আগে কিছু চাই,
তারই আগে কিছু চাই।

গম্ভীরের যিনি হলেন অবাক
শুনে এই বাণী, -
'কি দিবে ভার ভবে তাই।'

ভাবনু আমি আপন মাঝে
গল্প বলার সুযোগ যদি
দিয়ে ডাকি—ডাকি এদিকে।

মণ্ডা মিঠাই রাবড়ি চাই।
তারই মাঝে ভন্‌ভনাবে
জানি কত মাছি আসিবে
ঝাঁকে ঝাঁকে সেথায়।
যখন আসবে সবাই দলে দল
হায় রে হেথায় কি মধু!
ভাবিতে পারে না আগে যে তাই।
দেখে মনে হয় রাবড়ি বটে।
স্বাদে যে দেখি অন্য বটে!
এমনি করে ভাববে এরা
সবাই সবার ঘরে ঘরে

আমি গল্প বলার আসর খুলে
শুধু ডাক দিই
ওরে আয় সবে আয় চলে,
আমি তোদের গল্প শুনাতে চাই।
লাগবে ভাল কতই যেন।
অবশেষে শুধু—শুধু আপশোষ
শুধু হায় হায়

যদি আগে আসে হায়
তবে ভয় নাই
তবে ভয় নাই।
ওরে গল্প মধুর দেখবি যাদু

কাঁপিবে বুক
করিবে হিয়া—
হিয়া দুরু দুরু।
ওরে আয় ওরে আয়।
এবার বলি গল্প আমি
শোন রে শোন সবাই
তোমরা সবাই হয়ে এক মন।
হয়ে এক মন—
শোন আমার গল্পখানি—

অমরেশ অমরেশ।
জাগাও সাড়া সবার মনে,
সবার মনে দাঁড়াও এসে,
কর ধন্য জীবন এদের
তুমি যে তুমি যে বেশ।
অমরেশ অমরেশ।

মৃত্যু তোমার নেই
জীবন যুদ্ধ কেমন করে করিলে!
হয়েছিলে কি পরাজয়?
নাকি, করেছিলে তুমি জয়
জয় শেষ, অমরেশ?

দাঁড়াও এসে সবার মাঝে ;
শুধু বলে উঠ বারে বারে—
সত্য আমার চাই ·
আমি রব না ঘুমায়ে—
আমি ত ঘুমাই নাই।
আসিবে শত্রু জানি
অস্ত্র আমার ধারাল সেথায়
হই পরাজয় নাহি ভয় হয়
শানব আবার, অবশেষে জয়
করিব তা জানি।

বলবান বলিষ্ঠ শত্রু হেথায়
অস্ত্র তাই একের পরে
এক খোয়া যায়
টলে না এ মন
ভাঙ্গি না আমি।
ধরাশায় তবু ভয় নাই।
আমি অমরেশ, মরিব না
মরিব না।
ধরণীর ধুলা ঝাড়িব আপনি
করিব জয়, করাঘাতে তা
মানি যে আমি।

আমি অমরেশ।
করেছিনু কি যুদ্ধ হেথায়

অবশেষে তাই রেখে যেতে চাই
রণস্থলে গড়ায় সেজন
জয় মাল্য আজ তার গলায় যে।

পরাবে শেষে পরাবে শেষে
জানি সে এসে ;
লুকানো রয়েছে আমারই অন্তরে
বহিরজগতে দেখা যায় যাকে
দেখিবে সকলে তায়।
মৃত্যু আমার নাই।

আসিবে জানি হাতে করে
হাতে করে সেই—
ছিল যে প্রেমের মালা
আজ সত্য বলে
গলাবে তা মানি।
দূরেতে তারে যায় দেখা 'যায়।
মৃত্যু আমার নাই।

শিশু জন্মালে প্রথম বাবা মায়ের আদর্শ সন্তানকে ঘিরে ফুটে উঠল। ঐখানেই জানবে সন্তানের ভিত্তি তৈরীর প্রশ্ন। বাপ মায়ের কোলে যথানিয়মে বেড়ে উঠে শিশু। শৈশবে তার খেলাধুলা, খাওয়া দাওয়া, লেখাপড়া সব যথা-যথ চলতে থাকল। আর তার প্রতি তার বাপ মায়ের লক্ষ্য বা সজাগ দৃষ্টি চাই।

ছেলে পড়তে বসে অমনোযোগী, মা এসে বলল—ও কি রে, এ কি তোর অবহেলা! তুই সময় নষ্ট করছিস এর নাম যে ফাঁকি, তা বুঝিস? তুই ভাবছিস, আমরা দেখতে পেলাম না। আড়াল করে যাই কর না জানবি, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হল।

কিসের কি সৎ শিক্ষা, সুরু হল তার সুযোগ নেওয়া।

পুনরায় ফিরে এসে মা দেখে, ছেলে সেই আনমনা। তখন তাকে ধমক দিয়ে শাসন করল। এমন সময় দেখা গেল খোকার বাবা বাড়ীতে এসে গেছে। অমনি মায়ের গলার স্বর নরম হয়ে গেল। কারণ স্বামী গুরুজন। গুরুজন থাকতে লঘুজনকে শাসন সাজে না।

বাবা অমনি ঢুকেই বলল—'কি হয়েছে রে' অমন করছিস কেন? লেখা-পড়া না শিখলে কি করে মানুষ হবি! বড় হয়ে পাঁচ জনের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না!

এইভাবে প্রতিদিনের ঘটনায় মা বাপের নজর ছেলের উপর রইল। মা নিজের হাতে ছেলেকে খাওয়ানো, যত্ন করা, স্কুল পাঠানো ইত্যাদি সব করে। বাড়ীতে যে চাকর বাকর নেই তা নয়। তাদের দিয়ে অন্য কাজ করিয়ে মা ছেলের যাবতীয় কাজ—দায় দায়িত্ব নিজে বহন করে। তার একমাত্র কারণ, প্রকৃত আদর্শ দিয়ে ছেলেকে গড়ে তুলবে মা।

ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে মা তার সেই ঘরের কাজেই ব্যস্ত। নিপুণ হাতে চারদিক গুছিয়ে নিচ্ছে মা। ছেলে ঘর ঢুকতেই মা বলল—যাও বাবা, তোমার জায়গায় বই রেখে, বাইরের জামা কাপড় খুলে হাত পা ধুয়ে এস।

বলা বাহুল্য ছেলেদের স্কুলের জামা কাপড় আলাদা থাকাই ভাল।

ছেলেকে খেতে দিয়ে মা হাতের কাজ সারছে আর এই সুযোগে ছেলের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলছে—কি তোদের স্কুলে আজ কেমন পড়া শুনা হল?

সব পড়া পেরেছিস? আবার নূতন পড়া মাষ্টার মশায় দিয়েছেন তো? এই রকম কয়েকটা প্রশ্নের ফাঁকে হঠাৎ ছেলে বলে উঠল—ওমা জান আজকে না একটা ছেলের না একটা পেন পড়েছিল, তা আমি না নিয়ে এসেছি। মা জান কি সুন্দর লেখা যায় পেনটায়।

মা হাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—খোকা ক'রছিস কিরে। ছেলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল।

মা অমনি বলে উঠল—এক্ষুনি যাও পেন তাকে ফিরে দিয়ে এস। জান এর নাম চুরি।

ছেলে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—কেন মা, ফেলে গেছে কুড়িয়ে নিয়েছি—তাতে দোষ কি।

মা—খোকা তুই এই বুঝলি—এটা পকেট থেকে তোলা না হলেও সুযোগ নেওয়া ত বটে। জেনেছ যখন তার তখন তুমি ফিরে না দিয়ে নিজের কাছে কি করে রাখবে? যাও এখুনি ফিরে দিয়ে এস, তাছাড়া আমি শান্তি পাব না। ছিঃ বাবা, এরকম জিনিষ কোন দিন আমি যেন না আর শুনি।

ছেলের মতলব ফিরে দেবার নয়। তাদ্রামী সুরু করতে মা বুঝল ছেলে বেগ দেবে। তখন আদর্শময়ী জননী রূপ করে ছেলের সামনে ছেলের বাপের জীবনের একটা উদাহরণ তুলে ধরল। জানিস, তোর বাবারও একদিন না এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। অফিস ছুটির পর বাড়ী ফিরছে, তা বাসে উঠেছে। পাশের সীটে এক ভদ্রলোক তার হাত ব্যাগটি ফেলে যায়। ব্যাগ খুলে সে চমকে উঠল—সোনা দানা টাকা কড়ি যে কত ছিল সে আর বলব কি। তোর বাবা সঙ্গে তার ঠিকানা খুঁজে নিজের কাজের ক্ষতি করে সেই ব্যাগ তাকে বাড়ী বয়ে ফেরৎ দিয়ে আসে। ভদ্রলোক কোটি কোটি ধন্যবাদ জানায়। তোর বাবা বাড়ী এসে আমাকে এই গল্প করে।

ঠিক এই রকমই ঘটনা আমারও জীবনে একদিন ঘটেছিল। একটা কানের মাকড়ি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কার জিনিষ কি করে আর খোঁজ পাব। বহুদিন রেখে দিয়েছিলাম যদি কোন কালে হদিস পাই। শেষে এই সেদিন প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার বিনয় বাবুর মেয়ের বিয়েতে দিয়ে দিলাম। আদর্শ ঘর। অথচ মেয়ের বিয়েতে টাকা যোগাড় করতে পারছে না। সেই রকম ক্ষেত্র বুঝে জিনিষটি দিয়ে দিলাম। তাহলে এবার বুঝে দেখ—তোর

এই পেনটা নেওয়া তোর বাবা মাকে কতখানি ছোট করে দেওয়া হচ্ছে। তোর মধ্যে সত্য আদর্শ কৈ বল দেখিনি? এ তোর চুরি—মিথ্যার সুযোগ নেওয়া।

তারপর দেখ খোকা, তোর বাবা যখন কাজ থেকে ফিরে এই কথা শুনবে তখন ভীষণ ভেঙ্গে পড়বে। প্রথম তো এই কথাই বলবে—"বল কি গো, সে যে আমার ছেলে! তুমি তো আমাকে ভাল করেই জান, জীবনে কোন দিন অন্যায়ের ধার ধারিনি। শুধু কি তাই সামান্য ফাঁকির আশ্রয় কোন দিন নিই নি। যথা নিয়মে পরিশ্রম করে পয়সা উপায় করছি। তারপর আমার ছেলেবেলার জীবন মায়ের কাছে তো কত গল্প শুনেছ।"

একদিন অফিস থেকে তোর বাবা মাইনে নিয়ে বেড়িয়েছে। সামনে দুজন প্রার্থী এসে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়াল বলেই যে তোর বাবা ঝট করে পকেট থেকে টাকা বার করে দিয়ে দিল তা নয়। কোন কালেই তাঁর এ ধরনের উচ্ছ্বাস নেই! বিচক্ষণ লোক তিনি। মুখের দিকে তাকিয়ে বিচার করতে চাইলেন। একজনকে দেখে বুঝলেন তাকে দিলে নাম ছড়াবে। কিন্তু আর একজন তারই পাশে নিতান্তই অপরিচিত—তাকে কিছু দিলে নাম নেই বটে তবে সে বেচারী প্রাণে বাঁচবে। যার কাছে নাম আছে তার কাছেই তোর বাবা ভিখারী হয়ে দাঁড়াল—কোথায় পাব বলুন, এই তো মাইনা। এই দিয়ে কি যে কি করব তাই ঠিক করবার আগেই পুঁজি ফুরিয়ে যায়। কিসের থেকে নিয়ে কাকে দেব! আর যে প্রকৃত ভিখারী নয় অথচ ভিখারী সাজতে বাধ্য হয়েছে, বিচক্ষণ বাবা তোর, সেই জায়গা বুঝে নিজের সামর্থ মত কিছু দান দিল।

আমার চোখে দেখা, যে বছর দেশ জল প্লাবনে ভেসে যায়। তোর বাবা তখন সামান্য মাইনের চাকুরে। ঘরে অভাব থাকলেও তার হিসাব করে চলার জন্য কোনকালেই ভুগতে হয় নি। যখনই বলেছি—ধন্য তোমার বিচক্ষণতা, তখনই ফিরে বলেছেন—তোমারই বা কি কম। আমি এনে দিয়েছি তুমি সংসার করেছ, তবেই না সম্ভব হয়েছে। তোমার চাহিদা অস্বাভাবিক আর কবে!

যাই হোক সেদিনের কথা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। খেতে পায়নি বাস্তুহারার দল কাতারে কাতারে এসে ষ্টেশনে ভীড় করেছে।

একটুখানি ফেনের জন্য সে কি হাহাকার। তোর বাবার মনে নাড়া দিল। কিছুতেই ঘরে তিষ্ঠতে পারছেন না। একদিন পরিষ্কার বললেন—"প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি? আমার কি সাজে দেশের এ অবস্থায় ঘরে বসে থাকা। যাই দেখি ওদের কতটুকু কি করতে পারি।" কি বল—বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন। বললাম—কি, আমায় জিজ্ঞেস করছ।

—না তোমায় জিজ্ঞেস করা মানে—জানি তুমি এতে হাসি মুখে সায় দেবে। তবু বলা। তার কারণ কি বুঝতে পারছ না, তুমি যে আসন্ন প্রসবা। তখন তোর দাদা পেটে।

—তা আর ভাবছ কেন—তুমি কোথায় যাচ্ছ? ঈশ্বরের সৃষ্টি জীব, তাদের কাছে ছুটে চলেছ। নিশ্চয় তিনি সুব্যবস্থা করবেন।

এই কথা হচ্ছে এমন সময় তোর কাকা ও ঠাকুমা পৌঁছে গেলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝিয়ে উনি চলে গেলেন। সেখানে যেয়ে পাগলের মতো পরিশ্রম করেন। তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার প্রশংসা সকলে সে বার করেছিল। বাড়ী ফিরে এলেন। ঢুকতেই ঠাকুমা বললেন—ঈশ্বরের আশীর্বাদে কোন কষ্টই পেতে হয় নি বৌমাকে। ঐ দেখ, তোর ছেলে।

আর একবার বেশ মনে পড়ে তোর বাবার অফিসের এক চাপরাসীর বৌয়ের খুব অসুখ করে। অফিস কামাই করলে খাবে কি অথচ বাড়ীতে না থাকলেও রোগিণী ও ছেলেমেয়েদের দেখে কে। সামান্য কর্মচারীর দিকেও তোর বাবার লক্ষ্য ছিল। একদিন সকলের সামনে সে কেঁদে পড়ল। চাপরাসী লোকটা মন্দ নয়। তবে সকলেই দর্শকের মত দেখল, শ্রোতা হয়ে শুনল। কিন্তু তোর বাবার মনে চিন্তা এল—কি করা যায়। অনেকেই অনেক কথাই বলল। কিন্তু তোর বাবা নিজের চিন্তাতেই মগ্ন। বাড়ী ফেরার সময় তাকে আবার আলাদা ভাবে কাছে ডেকে সমস্ত জিজ্ঞেস্ করেন। তারপর বলেন—তুমি কালকে আমার সঙ্গে দেখা করো। বাড়ী এসে আমার সঙ্গে গোটা গল্পটি করেন। তোর বাবার মতের উপর কোনদিনই না দিই নি। আমার সায় পেল। পরদিন সকালে সেই লোকটি দেখা করার পর বাড়াবাড়ি বুঝে রোগিণীকে নিজে মাথা হয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। ছেলেগুলিকে দেখা শুনার জন্য ওর কে আত্মীয় স্বজন আছে, খোঁজখবর নিয়ে, তাদের আনবার যুক্তি দেন। সব সুব্যবস্থার পর যে টাকার দরকার হয়েছিল তার

খানিক ভার তোর বাবা নেন। তোর বাবার মুখ চেয়ে রোগিণীর সুচিকিৎসাই হয়। রোগিণী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে, সে যাত্রায় বেঁচে বাঁচিয়ে যায়।

চাপরাসী সেবার মাইনা পেল। সে তার কিছু টাকা নিয়ে ফল মিষ্টি কিনে তোর বাবার কাছে হাজির—'বাবু আপনি যে আমার উপকার করেছেন তা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। আমার স্ত্রীর জীবন নয় শুধু আমার সংসারেরও প্রাণদান করেছেন আপনি। সেইজন্য আমি গরীব মানুষ সামান্য কিছু খোকাবাবুর জন্য এনেছি।' উত্তরে তোর বাবা ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে বললেন—না না, খোকাবাবুকে দিতে হবে না। খোকাবাবু অনেক খায়। তোমারই ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে, তাদেরই বে দেয়। আর তুমি দিচ্ছ খোকাবাবুকে। তবুও সে কিছুতেই ফেরৎ নেবে না। তখন বাবু ফিরে বলে—আরে, তোমাদের খোকাবাবুর যে মাত্র দু'বছর বয়স। সে এসব খেতে পারবে কেন। তোর দাদার তখন বছর দুই বয়স।

তাহলে বুঝে দেখ্ খোকা। এই রকম ভাবেই তোর বাবার জীবন চলছে। কটি কথা বলব, বাবা। বড় হ' সব জানতে পারবি।

ছেলে এই সব কথা শুনল বটে কিন্তু তখনকারের মত সে সবই ভুলে গেল। কেন না তার তখন খেলার দিকে মন।

মা আবার কথা তুলল—যাক যা বললাম তোকে বললাম। এবার পেনটা নিয়ে কি করবি বল দেখিনি? ওটা তার বাড়ীতে দিয়ে আসবি তো এখন?' ছেলে মায়ের এই শেষ গল্পটি শুনে আর না বলতে পারল না। শুধু বলল—এখন পারব না। কাল স্কুলে ফেরৎ দিয়ে দেব। মাও বুঝল এখন ওর খেলার সময়। আর চাপ দিয়ে দরকার নেই। আগেও কটা গল্প বলেছি এখনও একটা বললাম। দেখাই যাক না কালকে স্কুলে যেয়ে কি করে। মা গৃহকর্মে মন দিল।

বড় ছেলে ফিরেছে স্কুল থেকে। উচু ক্লাসে পড়ে। তাকে ডেকে বলল—জানিস রে মানিক, খোকা আজকে কি কাণ্ড করেছে! বলেই তাকে গোটা ঘটনাটা জানাল। মানিক তখন মাকে ফিরে বলল—কেন মা, আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমাদের স্কুলে একটা ঘড়ি চুরি হয়। সেটা সেই যে আমাদের ক্লাসে ধরা পড়েছিল তাই নিয়ে বাড়ীতে বাবা কি হুলস্থুল কাণ্ড শুরু করেন। সেই ঘটনাটা বললে না কেন?

খোকা খেলাধুলা করে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরেছে। খোকার ভাইটি বোনটিকে নিয়ে একটু খেলা করে যথারীতি পড়তে বসেছে। পড়তে পড়তে হঠাৎ খোকার মনে প্রশ্ন উঠল—হ্যাঁ মা, বাবা ঐ যে ফলগুলো ফিরিয়ে দিল না, আচ্ছা তারপরে লোকটির ছেলেমেয়ে ওসব খেয়েছিল? মা—'তা কি আর তোর বাবা দেখতে গেছিল রে—ছেলেমেয়ে খেয়েছিল কি আরও দু'একজনকে দিয়েছিল!'

পর দিন স্কুলে গিয়ে খোকা যার পেন তাকে ফিরে দিল। মাকে এসে জানাল—'জান মা, ফেরৎ দিতে না, ছেলেটা কত কথা বলল—জানিস রে, আমি না পেনটা হারিয়ে না কি খুঁজাই না খুঁজছিলাম।

তাহলে খোকা দেখ—এই ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে তুই তার কাছে কতখানি বিশ্বাসী হলি। তাহলে বুঝছিস তো—সকলে ভালকেই ভাল বলে।

খোকা কিন্তু এর পর থেকে নিয়মিত পড়াশুনা খেলাধুলা করে যায়। মা-ও তাকে নিয়মিত ভাবে সত্য আদর্শের পথে গড়তে থাকে। মাঝে মাঝে সংসারের কাজকর্ম যে মা তাকে দিয়ে করায় নি তা নয়। সেও সব কাজ করে। আগের সব ছেলেমানুষী দুষ্টুমী তার ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, লেখাপড়ার দিকে মনটা এসেছে।

বাবা মা উভয়েই কর্মী। একটু ফুরসৎ পেলেই গৃহস্বামী ছেলেমেয়ে চারটিকে নিয়ে পড়াতে বসেন। শুধু পড়া বা পড়ানোই তার লক্ষ্য নয় সেই সঙ্গে গল্পচ্ছলে পাঁচটা উপদেশ কথাও বলে থাকে। এই সব কারণের জন্যই ভদ্রলোক গৃহশিক্ষক পছন্দ করে না। তার দৃষ্টিভঙ্গিই হল ঘরোয়া পরিবেশে পরিশ্রমী হয়ে সত্য আদর্শের মধ্যে ছেলেমেয়েকে গড়ে তোলা। তবে একেবারেই, যে গোঁড়ামী তার তা নয়। ক্ষেত্র বুঝে মাষ্টার দেবার কথাও ভেবেছেন।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে খোকা পড়াশুনায় উন্নতি করে। এই বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষায় মুরশুমে একদিন রাতে পাঠরত হঠাৎ পাড়ায় কোলাহল উঠেছে। বাইরে এসে দেখে খুব লোকজনের ভীড়। এমন সময় বাবারও ঘুম ভেঙ্গে যায়। জিজ্ঞেস করেন—'কি হয়েছে রে খোকা?' খোকা বাবাকে উত্তর দেয়—কি জানি বাবা, কিছু বুঝতে পারছি নি। শুধু লোকের ভীড় তাই একটু এগিয়ে যাচ্ছি দেখব। মায়ের কথা কানে গেল—শীগ্রি ফিরে আসবি।

খোকা যেযে ভীড়ের মাঝে ঝাঁপিযে পড়ল। ঘটনাটা সম্পূর্ণ জানল ও বুঝল। এখানে পাঁচজনে মেযেটিকে কি ভাবে রক্ষা করবে জেনে খোকা তাদের সঙ্গে সহযোগী হল। সেদিন গোটা রাত তাদের সঙ্গে কাজ করে সমস্যার সমাধান দেখে খোকা বাড়ী ফিরল। মা বাপও এখানে ভাবছিল। কিন্তু তাদের সরল মনের চিন্তা, দুর্বল ভাবনা নয়। খোকা বাড়ী আসতে বাপ মা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কি রে তোর এত দেরী হল—কি ব্যপার? খোকাও তাড়াতাড়িতে গোটা ঘটনাটা তাদের জানিযে মুখ হাত পা ধুযে নিজের পড়ার ঘরে গেল। কিন্তু মা তো যতই হোক মা। বলল—কি রে খোকা তোর যে সকালে পরীক্ষা, পারবি তো লিখতে? আশীর্বাদ কর মা যেন পারি—উত্তর করল খোকা।

পরীক্ষা বেরিয়েছে। খোকা পাস করেছে। এবার কি পড়বে, কোথায় পড়বে, সেই নিযে ঘরে বাইরে আলোচনা সুরু হল। বড় ভাই তখন ইনজিনিয়ারিং পড়ছে। খবর পেযে সে বাবা মাকে জানাল—"খোকা কি করতে চায়, কোথায পড়বে? আমার ইচ্ছা—ওকে মেডিক্যাল কলেজ গুলোয চেষ্টা করতে বল।" বাপ এই সময় একটু নিরপেক্ষ হযে গেল, মা প্রশ্ন করল—কি রে খোকা কি করবি—তোর দাদা তো এই কথা লিখেছে?

খোকার কিন্তু ইচ্ছা—সে দেশের কলেজে পড়ে। ঘরের খেযে মা-বাপের কাছে থেকে কলেজ করবে। যাই হোক খোকা নিজে স্থির করে স্থানীয কলেজে ভর্তি হযে গেল। কিন্তু বাবা তাকে হাজার প্রশ্ন করতে ছাড়ল না।—কি রে তুই যে এখানের কলেজে ভর্তি হলি তোর দাদা এলে কি বলবি?

'কি আর বলবে। কিছু বললে বলবে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিনি। তোমার সায ছিল।"

কদিন পরে গ্রীষ্মের বন্ধে মানিক বাড়ী এসেছে। প্রথম কথাটা শুনেই সে খাপ্পা হযে উঠেছিল। আজ সামনা সামনি হতে একেবারে ফেটে পড়ল—"কি রে তোকে যে আমি লিখেছিলাম তুই এই এই সব জাযগায ভর্তি হবার চেষ্টা কর, তা তুই সব বাদ দিযে এখানেই ব্যবস্থা করে নিলি—এর কারণ কি?"

আদর্শবাদী খোকা নম্র সুরে দাদাকে উত্তর দিল—কেন দাদা, ক্ষতি কি!

ক্ষতিটা যদি তুই বুঝতিস তাহলে আর এরকম কাজ করতিস নি। যা দিন কাল পড়েছে তাতে কোন লাইন ধরে লেখাপড়া না শিখলে ভবিষ্যতে কি

দিয়ে কি করে খাবি? বাস্তব যে কি কঠিন তা যদি বুঝতিস। সামান্য একটা ডিগ্রি পাস করে তোর কপালে কি জুটবে। ক্লার্কের চাকরী ছাড়া আর তো গতি নেই।

বড় ছেলের মধ্যে বিদেশী হাবভাব পোশাক সব এসেছে। বিলাসিতা ভাল করে ছুঁয়েছে। এ সবই সম্পূর্ণ বাপের মতের বিরুদ্ধে। যার ফলে বাপ উচ্চ শিক্ষায় যত লাভই থাক না কেন গুটিয়ে গেল। যেখানে লাভের প্রশ্ন সেখানে গুণীর ভাগ কম। বাবা আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিল। এবার ক্ষেত্র স্থলে এসে উপস্থিত হলো।—কি হল, তোমাদের কি হচ্ছে?

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলে লাফ দিয়ে উঠল—বাবা এটা কি খোকা ভাল কাজ করল?

প্রতি উত্তরে বাপ বলে—কেন ও কি বলতে চায়?

তখন খোকা শ্রদ্ধার স্বরে সুরু করল—বাবা, দাদা আমাকে যে কথা বলছে সে কথা আর অমান্য করছি না। তবে আমার বক্তব্য তুমি শুন। দাদার ইচ্ছা আমি ডাক্তার হই। আর আমার ইচ্ছা আমি সাধারণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে দেশের দশের কাজ করি।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরে বড় ভাই—কেন, ডাক্তার হয়ে কি দেশের দশের কাজ করা যায় না?

হ্যাঁ তা আবার যাবে না কেন? কিন্তু সে 'যায়'-এ আর এ 'যায়'-এ তফাৎ আছে। ডাক্তারের মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি সব স্বীকার করি। কিন্তু তার অন্ধকার দিকটাও লক্ষ্য করো, দাদা। আজকালকার দিনে বিদেশে ছেলেকে রেখে কোন মধ্যবিত্ত ঘরের বাপকে যদি পড়াতে হয় তাহলে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয় সে কি তুমি বোঝ না? এক্ষেত্রে যেমন বাবার অবস্থা সামান্য সচ্ছল, তেমনি তিনি তোমার ব্যবস্থা করেছেন। আমার ব্যয়ভার বহন করা এর উপর, বাবার উপর কি অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হবে না?

মানিক মেজাজ নরম করবে কি, পৃথিবীর বহু জিনিসের যথার্থ ধারণা তার হয়েছে। সে বলল—যেমন এখন খরচ করবেন তেমনি আমরা বেড়িয়ে বড় বড় চাকরী ধরে তাকে সাহায্য করতে পারব।

—"তা না হয় হল দাদা। কিন্তু দাদা, সব সময় টাকাটাই কি বড়? এখানে এত সুযোগের মূলেও কি তুমি অন্য কিছু চিন্তা করবে না? আমার

কথা কি জান, সব সময় অর্থ আর অট্টালিকা দেখলেই চলে না। তার সঙ্গে আরও কিছু দেখতে হয়। সবাই যদি তোমার এই ভাব নেয় তাহলে ভাব দেখিনি—ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে একঘেয়েমি চলে আসবে না? আমার কথা হচ্ছে —সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে যা হয় করব। সাধারণ লাইন ধরে এম. এ, পাস করে আমি জীবনে আদর্শ অধ্যাপক হতে চাই। বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ একদিক বড় করতে গেলে হয়ত তা গড়ে উঠবে কিন্তু তাতে আর পাঁচ দিক ভেঙে যাবে। বলবে—ফিরে এসে গুছাবে। কিন্তু একবার বাবার জীবন চিন্তা করে দেখ—যাতে আমাদের জীবনে গোড়ায় গলদ না থেকে যায় সেইজন্য আজীবন বাবা কি রকম পরিশ্রমী, আদর্শবাদী।

বাড়ী থেকে লেখাপড়া করলে বাপ মাকে দেখতে পারলাম, সংসারের পাঁচটা কাজ করতে পারব, দীপা মণ্টুকে লক্ষ্য করতে পারব। ওদের লেখা-পড়ার জন্য আজও কেন বাবাকে বসতে হবে। তারপর দাদা তুমি ভাবছ কেন—আমরা দুভা'য়ে মিলে রোজকার করে না হয় মণ্টুকেই ডাক্তারী পড়াব।

খোকা নিয়মিত কলেজ যাওয়া-আসা করছে। পড়া ও ভাইবোনকে পড়ানো তার রোজকার কাজ। নিজের খেলাধূলা, কলেজের ইউনিয়ন এবং তারই ফাঁকে মাঝে মধ্যে দুএকটা সিনেমা দেখা ইত্যাদি পাঁচ রকমের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটতে থাকে। একদিন কলেজ ছুটির পর দারুণ ঝড় জলে একটি মেয়ে আটকে যায়। সেখানে কলেজের আরও পাঁচটা ছেলেও দাঁড়িয়েছিল। বিকেল গড়িয়ে গেল বৃষ্টির থামার নাম নেই। এদিকে সময়ের একঘেয়েমি কাটাতে যৌবনচিত উচ্ছ্বাস পেয়ে বসে। কদর্য কথা সুরু হয়। খোকার মর্যাদায় লাগে। কি ভাবে কি করা যায়। সব ছেলেগুলি খোকার পরিচিত। কয়েকজন বন্ধুও বটে। এদেরই মধ্যে দাঁড়িয়ে খোকা। হঠাৎ কথা উঠল—কে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারে। এই কথা হতেই খোকা তার পূর্ণ সুযোগ নিল। দূর থেকে সকলে তার বাহাদুরী লক্ষ্য করছে। ঝপ্ করে খোকা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে বলল—'তোমার বাড়ী কোথায়? সকলে পুলকিত হয়ে ফিস ফিস কথা সুরু করেছে এমন সময় খাট গলায় খোকা বলল—বোন, তোমার কি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ? আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গে এগিয়ে এস তোমাকে বড় রাস্তায় পৌঁছে দেব।

মেয়েটি খোকাকে কলেজে পাঁচটা সংগঠনের কাজে লক্ষ্য করেছে। তাই কোনরকম কথা না তুলে পথে নেমে গেল। বন্ধুদের শেষ টিপ্পনী কানে না নিয়ে খোকা এগিয়ে চলল। পরদিন কলেজে আক্রমণ করল ছেলেরা।—'কি রে কেমন কাটল। কতটুকু জমল ?' খোকা নরম গলায় স্পষ্ট ভাষায় বলল—কি ব্যাপার বলত, তোরা দু'পা একসঙ্গে ফেলা দেখলেই যে বিরাট করে অর্থ খুঁজিস। আসা যাওয়ার পথে কারো সঙ্গে কোনদিন কটা কথা বললেই কি আর প্রেম জমে যায় রে ? জীবনটাকে সহজ করে নে ; অত জটিল চিন্তা করছিস কেন ? একটু 'সিরিয়াসলি' ভাবতে হবে না। শালা, পেটে নেই ভাত তো প্রেমের উৎপাত। যাই হোক সকলেই লক্ষ্য নিয়ে শুধু এইটুকু বুঝেছিল খোকা যেমন তেমনই আছে। সেই নিরপেক্ষ নিস্পৃহ ভাব, সব সময় হাসি হাসি মুখ। ঘরে বাইরে শুধু কাজ আর কাজ তার হাল্কা রসিকতাকেই সত্য বলে প্রমাণ করত—প্রেম করব তা সময় কোথায়।

খোকা শুধু নিজের পড়াই পড়ে না, বাড়ীতে ভাইবোনকে লক্ষ্য করে আর বাইরে জন চারেক ছেলে মেয়েকে পড়ায়। দুটি মধ্যবিত্ত ঘরের তারা টাকা দেয়। আর দুটি খোকাদের পাশেই থাকে। তাদের বাবা অল্প মাইনের চাকুরে। ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনে জুটাতেই হিমশিম খেয়ে যায়। তার উপর আবার গৃহ শিক্ষক। ছেলেটির মা একদিন এসে খোকার মাকে ধরল—দিদি, আপনার খোকা যদি আমার ছেলে মেয়ে দুটোকে একটু দেখিয়ে দিত তাহলে খুব ভাল হয়। জানেন তো, আপনার ঠাকুর পোদের এই মাইনা স্কুলের বেতনই কুলিয়ে উঠতে পারেন না, আপনি তো সবই জানেন। ওদের পরীক্ষাও সামনে এগিয়ে এল।

আচ্ছা খোকা এলে বলব। —উত্তর দিল খোকার মা।

খোকা বাড়ী এলে মা তার ছেলেকে খেতে দিয়ে কাছে বসে কথা পাড়ল—দেখরে, তোর পাশের বাড়ীর কাকীমা এসে ওর ছেলেমেয়ে দুটোর লেখাপড়ার কথা সব বলছিল, তা কি করা যায় বল দেখিনি ?

খোকা সব শুনে বলল—সত্যি কথাই মা, কিন্তু আমি কি করে সময় পাই বলত। আচ্ছা দেখি চিন্তা করে, তোমাকে কালকে বলব।

পরদিন যথাসময়ে খোকা ওর মাকে জানাল—আচ্ছা মা, ওদের তাহলে বলে দিও একঘন্টা মতন রোজ সময় করে আমি দেখিয়ে দেব। আসতে বলো।

খোকার মার মুখে সব জেনে, পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলা হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল। স্বামীকে গিয়ে গল্প করতে তিনি যে ছেলেটিকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাবেন ভেবে পেলেন না। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। আজকাল-কার দিনে কে এভাবে সাহায্য করে।

যাক ছেলেমেয়ে দুটি নিয়মিত পড়তে আসে। খোকাও দেখাতে কিন্তু করে না। এদের পড়াচ্ছে বলে অন্য কাজে যে ঢিলা পড়েছে তা নয়, সব দিক বজায় রেখেছে। এইভাবে তার দিন কাটছে।

শিবানীর বাবা একদিন একটা কাঁঠাল কিনে নিয়ে ওদের বাড়ী পোছে ডাকছে—'খোকা খোকা'।

খোকা ভিতর থেকে উত্তর করল, কে—কাকাবাবু? কি ব্যপার। না তোমার কাকীমা এই কাঁঠালটা তোমার খাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, তাই নিয়ে এলাম।

'কাকাবাবু! স্পষ্ট ভাষায় খোকা উত্তর দিল -এ তো আমি বরদাস্ত করতে পারব' নি। আপনি এ কি করেছেন। শিবানী সনৎকে, জানবেন আপনি, আমি আমার নিজের ভাই-বোনের মত চোখে দেখি। ঐ হলরে বাপু, নাও তোমার কাকীমাও তোমাকে ছেলের মতন দেখে এটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

কি বিচক্ষণ কাকীমা! আপনার আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে এ কাজ করেছেন কি। এই কাঁঠালটার দাম খুব কম করে হলে পাঁচ টাকা।

—নে বাপু অত আর সব সময় দেখলে চলে না।

যাক্ এবারের মত আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আমি গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনদিন যেন এরকম না হয়, তাহলে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হব। আমি কিন্তু যথা সত্য বলছি। আপনি কাকীমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন। আপনারা তো আমাকে ভাল করেই চেনেন। যে কারণে আমি এ কাজে ঝাঁপ দিয়েছি সে কারণ খেল হয়ে যায়। আজ আমটা কাল কাঁঠালটা, এসব আবার কি।

কাকাবাবুর তো হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল—উঃ খাঁটি বটে। এতদিন শুনতামই শুধু আজ হাতে হাতে প্রমাণ পেলাম।

এইসব কথা হওয়ার পর ঘুরে দেখে বাবা বাড়ীতে এসে গেছে—কি হল কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

বাবার এই প্রশ্নের উত্তরে খোকা বলে—এই দেখ না সনতের বাবার কি কাণ্ড। কাঁঠাল কিনে এনে পৌঁছে গেছেন—এটা কি ঠিক করেছেন?

'যাক তুমি কি বললে?'

শেষ কথা যা সে কাকাবাবুকে বলেছিল তা বাবাকে জানাল।

বাবা এবার বলল—যাক তুমি এবার এক কাজ কর না, তোমার মাকে বল—কাঁঠালটা ভাঙলে শিবানী সনতকেও যেন কিছু খাইয়ে দেয়। ওরা তো এখানেই পড়তে আসবে।

একদিন কলেজ ছুটির পর আসার পথে দেখে একটি ছেলে জাম গাছে উঠেছে, নেহাতই বাচ্চা। হায়রে ছেলেমানুষ। পাকা ফলের লোভে উঠেছে—কিন্তু আর নামতে পারছে না। প্রবীন, যুবক জল-সুরে কথা বলে পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ তাকে নামাতে চাইছে না। সমস্যা জেনে বা সৃষ্টি করে সরে যাওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্ব কোথায়। খোকা ফিরে এই অবস্থা দেখে সহানুভূতি মন নিয়ে এগিয়ে এল। ছেলেমানুষ লোভে না হয় উঠেই পড়েছে; কিন্তু তাই বলে তাকে কি গাছে রেখেই শাসন করতে হবে। নামিয়ে আনা কি উচিত নয়? এই বলে দু'পা এগিয়ে সে ছেলেটিকে নামাবার ব্যবস্থা করল। যাবার আগে সস্নেহে বলল—'দেখলি তো এভাবে উঠে কেমন বেকায়দায় পড়েছিলি। যাক এরকম আর কোনদিন করিস নি। যাঃ বোকা বাড়ী যা'—বলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য ছেলেরা সাময়িক চিন্তা করল হয়ত, কিন্তু যাকে উদ্ধার করল সে নিশ্চয় ভাবল—উঃ এ না হলে আজ আমায় কে রক্ষা করত। এরকম ছোটখাটো অনেক ঘটনা খোকার জীবনে প্রায় লেগে থাকে।

বাড়ীতে এসে হাত পা ধুয়ে জল খেয়ে শিবানীকে পড়াতে বসেছে। সনৎ আসেনি। পড়তে বসে বই টেনে নিয়ে হঠাৎ এই ঘটনাটি বলতে সুরু করল। শিবানী হাঁ করে খোকার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকার কাছে আজ খোকার গুরুত্ব অন্যরকম। শিবানী বাড়ীতে যাওয়ার পর ঘটনাটি তার মনে দোলা দিতে থাকে। রাতে শুয়ে সে একটু আনমনা হয়ে পড়ে। এইভাবে কদিন কাটে।

আর একদিন খোকা সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরেছে। রাত হতে বাপ একটু চিন্তায় পড়েছিল। কিন্তু মায়ের কাছে খবর পায় যে ছেলে সিনেমায় গেছে। যাইহোক বাড়ী ফিরে খাওয়া সেরে খোকা নিজের ঘরে গেল। আজ আর

বাপ মায়ের সঙ্গে বড একটা কথা বলার উৎসাহ নেই। খোকার ভাব মায়ের মনকে ছুঁল—'খোকা তো কোনদিন অত কম কথা বলে না। সমস্ত গল্পই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কাছে করা চাই।

যাইহোক এদিকে বিছানায় খোকার চোখে ঘুম নেই। সামান্য একটা সংসারিক বই আজ তার জীবনের সমতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত সংঘাত এসবকে কি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। আদর্শ-বাদী খোকা, আজ হঠাৎ একি হল। সিনেমা দেখার পর থেকেই তার মনটা কেন যেন তোলপাড করছে। যে খোকা আদর্শ ছাড়া জানত না সেই খোকা আজকে যেন সব সময় আনমনা। মাঝে মাঝে কোথা থেকে প্রেমের দোলা তাকে দুলিয়ে দিচ্ছে। তবে একথা কি ঠিক নয়—ন্যায়বাদী খোকা আদর্শকে হারায় না। এতদিন কত সিনেমা সে দেখেছে, কৈ কোনদিন তো তার এ-রকম হয়নি। তাহলে এখন নিতান্তই তার দেহের প্রয়োজন। কিন্তু এ কথাও ঠিক, বার বার তার মনে হচ্ছে—ছিঃ ছিঃ এসব কি মনে হচ্ছে। এ তো কখনও আমার মনে আসত না। কিন্তু তাই বললে চলে কি করে। 'ছিঃ ছিঃ' তার কোথায় স্থায়ী হবে। এ যে খোলের ধর্ম। খোকার ক্ষমতা কি একে অস্বীকার করে। এইভাবে কতটুকু খোকার যে ঘুম হয়েছিল সে কি আর কেউ জানবে।

যাক ভোর হয়ে গেল। সকালে উঠে নিত্যকর্ম যেভাবে যা করা দরকার করে চলেছে। কিন্তু মন কিসেও নেই। মায়ের কিন্তু পুরোপুরি সব জিনিষ-গুলো লক্ষ্য পড়ছে। তবে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

দীপা এসে মাকে বলছে—দেখ মা, মেজদা যেন কেমন হয়েছে আজ।

মা সম্পূর্ণ মেয়ের কাছে এড়িয়ে যায়—নিশ্চয় তোমরা ভালভাবে পড়াশুনা করনি তাই ওর মন খারাপ।

কলেজ থেকে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেছে। বাড়ীতে পা দিতেই মনে হল—একটু পরেই শিবানী পড়তে আসবে। নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার পর দেখে ও এসে গেছে। পড়াতে বসে শিবানীকে আর পড়াবে কি সেই গল্প শুরু হয়ে গেল। এমন সময় মায়ের চোখ পড়ল। সারাদিনই লক্ষ্য ছিল তার ছেলের দিকে। হঠাৎ পাশ থেকে দেখে খোকা শিবানীর সঙ্গে সেই সিনেমার গল্প করছে।

"কিরে খোকা, আজ সনৎ আসেনি? শিবানী কি একলাই এসেছে?" বলেই মা ঘরে ঢুকল।

খোকা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—"হ্যাঁ। সনতের আজকে শরীরটা নাকি খারাপ, তাই পড়তে আসে নি"।

যাক শিবানী পড়ে ঘরে চলে গেছে। খোকা ভিতরে এল। মা জিজ্ঞেস করল ছেলেকে—কি সনতের জ্বর টর কিছু হয়েছে? কি বলল শিবানী?

না জ্বর হয়নি, তবে একটু জ্বর জ্বর মত হয়েছে—খুব সহজ না হলেও সহজ ভাবে উত্তর দিল খোকা।

খোকা শুতে চলে গেছে। মা গৃহকর্ম সেরে বাপের কাছে গেছে—খোকার বিষযে কয়েকটা কথা তুলতে তিনি থামিয়ে দেন—হ্যাঁ আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি।

[এই অবৈধ প্রেমের অংশটুকু ব্যক্ত করতে মা দারুণ বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করেন। মাঝখানে ঝপ্ করে মা একবার রুখে উঠেন—কিরে, এ তোরা আমাকে দিযে কি করতে চাস? আমি কি এরকম ধরণের গল্প লিখে যাব। আজ কদিন ধরেই আমি চেষ্টা করছি ব্যক্ত না করে তোর আবদার রক্ষা করব। যাই হোক মোটামুটি তোকে একটা গল্প লিখে দিযে যাব। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলাম নি। যতবারই কৌটা খুলতে চাচ্ছি—মরচে ধরা কৌটা খুলতে গেলে যেমন হয সেইরকম আটকে যাচ্ছে। আর ভিতরেও কেমন যেন একটা অস্থিরতা এসেছে। না বলেও পাচ্ছি নি তাই বলে দিতে বাধ্য হলাম]

এই রকম ভাবেই খোকার দিনগুলি কাটতে থাকে। শিবানীর মাকে দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে প্রায় আজকাল বেড়াতে আসছে। দিদি ডাকটায যেন তার আন্তরিকতা বাড়িযে তুলেছে। তবে খোকার মায়ের মনকে এত আন্তরিকতা পুলকিত করতে পারছে না। যাই হোক মানিয়ে নিয়েছিল। মনে হয়েছিল—এমনও তো হতে পারে খোকা পড়ানোর জন্য কৃতজ্ঞতার মূলে এই রকম তার ভাব ফুটেছে। কিন্তু দিনের পর দিন খোকাকে দেখে সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আর বার বার মনে হচ্ছে—বিশ্বাসঘাতক মেয়ে। অভাবের জন্য সাহায্য চাইতে এসে এ কোথায় হাত বাড়াচ্ছে। আগে আগে শিবানীর মা এলে খোকার কাছে গল্প করত। ইদানীং সে সব কোন কথাই মা বলে না। খোকার চোখে অবশ্য এড়ায় না তা।

এই করে করে সামনে পরীক্ষা চলে এল। বর্ত্তমানে পড়ানোতেই তার সময় গেছে বেশী। নিজের পড়া তেমন করে তৈরী হয় নি। এই রকম মুরসুম হঠাৎ একদিন বাপ মায়ের কথা খোকার কানে পৌঁছল—"মানিক আজকাল টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে, দেখছ? আমি সেটা কয়েক খেপই লক্ষ্য করছি।"

বাপের কথা কেড়ে নিয়ে মা বলছে—তুমি তো কৈ তা আমাকে বলনি। তবে আমি এটা লক্ষ্য করছি—ওর চিঠির ভাব ভাষা পাল্টে গেছে।"

বাবা—না, আমি ভাবছি ওর প্রয়োজন মতই ও খরচ করছে। কিন্তু ইদানীং যেন একটা সন্দেহ ছুঁচ্ছে।

মা-ও সে কথায় সায় দিল—সন্দেহ কি সব সময় মিথ্যা হয়।

এই কথাগুলো খোকা সমস্তই শুনল। তারপর নিজের মত নিজের কাজ করে সে তার কলেজে বেরিয়ে গেল। আগামী কাল পরীক্ষা সুরু হবে। তাই কোন কথাই ভাববার অবকাশ নেই।

একের পর এক পরীক্ষা সে দিয়ে চলেছে। কিন্তু খোকার পরীক্ষা খোকা যে কি রকম দিচ্ছে তা তার চেয়ে আর ভাল কে বুঝবে। শেষের দিকে গিয়ে সে বুঝল যে তার কয়েকটি পরীক্ষা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। বি. এ ফাইনাল পরীক্ষা-এ খারাপ হলে যে তার জীবন অন্ধকার। কি করে এম. এ পড়ার সুযোগ পাবে। তাই গভীর দুঃখ বেদনায় তার মন আজ দারুণ ভেঙ্গে পড়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন মন নিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরল।

মা জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, কেমন পরীক্ষা হল? আজকেই তোর শেষ হয়ে গেল, না?

খোকাও সংক্ষেপে উত্তর দিল—দিলাম তো একরকম, তবে মনে হচ্ছে ভাল হয় নি। রাতে খোকা একরকম না খেয়ে উঠে গেল। মায়ের মুখে বাবা ছেলের মোটামুটি সব কথা শুনল এবং গম্ভীর হয়ে গেল।

দিন কয়েক পর যথারীতি সনৎ শিবানী পড়তে এসেছে। খোকার শুকনো মুখ দেখে শিবানী একটু ব্যথা অনুভব করল। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল—"খোকা দা, আপনি এত মুষড়ে পড়ছেন কেন?" খোকার গম্ভীর উত্তর এগিয়ে গেল—"না কোনকালে এত খারাপ পরীক্ষা তো দিই নি।"

সনৎ ছেলে মানুষ রোজ দিদির সঙ্গে এসে পড়ে চলে যায়। আজ সেও যেন

তার খোকাদাকে দেখে কোথায় একটা গভীর ব্যথা অনুভব করল। খোকা আজ পড়ানোর মধ্যে সনতকেই বিশেষ করে লক্ষ্য করল। রোজকার মত নিজের ভাইবোনকেও যত্ন নিয়ে পড়াল। শিবানীকেও বাদ দেয় নি। আজ নিজের পরীক্ষা খারাপ হয়েছে বলে সকলের লেখাপড়ার দিকে তার বিশেষ লক্ষ্য।

বাবা অফিস থেকে আজ খুব মনমরা হয়ে ফিরেছে লক্ষ্য করল খোকা।

মা কাছে আগিয়ে গেছে—কি গো, আজ তোমার মুখের ভাব এরকম কেন ?

—আর এরকম কেন ! দারুণ সর্বনাশ হয়ে গেছে।

বাবার মুখের এই কথা খোকার কানে যেতেই খোকা এগিয়ে গেল। মা জিজ্ঞেস করল—কি সর্বনাশ ?

—আমার নামে বোধহয় কয়েকদিনের মধ্যে চার্জসীট আসবে।

কেন ? চমকে উঠল মা। খোকা দু'পা এগিয়ে একেবারে সম্মুখে দাঁড়াল ? তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

বাবা বললেন—কয়েকটি দামী কাগজ ফাইল ঘেঁটে প্যাওয়া যাচ্ছে না। উপর মহল থেকে তাই কৈফিয়ৎ তলব করেছে। এ সবের দায়িত্ব আমার উপর।

খোকা থামিয়ে বলল—তা বাবা আপনি অত ভেঙ্গে পড়ছেন কেন ? নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আপনি যে বলেন সত্য সে ঠিকই ফলবে। তা আপনার যেখানে কোন অপরাধ নেই সেখানে অত চিন্তা করার কি কিছু আছে ?

বাবা ফিরে তাকালেন—সে কি খোকা, ও কি কথা বলছ ! আমার ভুলের মাশুল আমি ছাড়া কে বহন করবে।

চমকে উঠে খোকা বলে—ভুল !

হ্যাঁ ভুলই। আমার নীচে যারা কাজ করে তাদের কাজ ঠিক মত লক্ষ্য না করার জন্যই আজ আমাকে এভাবে বেকাদায় পড়তে হয়েছে। এখানে কি বলতে চাও আমার গাফলতি একেবারেই ছিল না ?

খোকা বাবার সমস্ত কথা স্তম্ভিত হয়ে শুনল। বাপ বেটার কথোপকথন এতক্ষণ মা দাঁড়িয়ে শুনছিল। শেষ একটা কথা ছোট করে বলল—একবারের ভুল তোমার। নিশ্চয় ভগবান তোমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন।

সে কথায় স্বামী তার কর্ণপাত করবে কি তখন তার মাথায় ঘুরছে—কি ভাবে কোথায় কি করা যায় ! যদি চুরি করার মতলবে কেউ জেনে শুনে এগুলো

হারিয়ে থাকে তাহলে এ থেকে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তা চিন্তা করে তার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। এ ত বেসরকারী সংস্থা, এত ক্ষতি স্বীকার করবে কেন? চাকুরী গেল এত বয়সে নতুন করে কোথায় কি করা সম্ভব। আজ দুর্ঘটনার মূলে নানারকম অনিষ্ট চিন্তা তার মনকে বেশ নাড়া দিয়ে করছে। বড় ছেলের মতিগতি তো এই রকম। খোকা এখনও পাস করে বেরয় নি। এই সবে পরীক্ষা দিয়েছে ছোট সে তো নেহাতই নাবালক। মেয়েও দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে চলেছে। বাড়ীতে একটা গভীর উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। গৃহস্বামীরই গৃহের ভাবনা। গৃহিণী তার দোসর। ছেলে-মেয়ে বাপ মায়ের পুণ্য বা পাপের অংশ বিশেষ তাদের ব্যক্তিগত কর্ম গুণ বা দোষে ভোগ করে থাকে। তাই দেখা যায় কোন ছেলে প্রচুর্যের মধ্যে জন্মলাভ করে কষ্ট পায় আবার কেউ হয়ত অভাবের সংসারে বাপ মায়ের কোলে এসে ভাগ্যলক্ষ্মী আখ্যা পায়। এই সুনাম বা বদনাম-পাওয়া সন্তানদের সঙ্গে বাপ-মায়ের ভাগ্য যে কতখানি জড়িয়ে তা আমরা একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বেশ বুঝতে পারি। যাক সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে শিবশঙ্কর। রোজই নূতন উদ্যমে লাগে। প্রতিটি ফাইল তন্ন তন্ন করে খোঁজে। আজ পেতেই হবে তাকে। এমনই মনভাব নিয়ে রোজ ব্যর্থ হয়। পরিচিত কারবারি সব সংস্থার সঙ্গে পত্রালাপ করছে। কাউকে ফোনে জানাচ্ছে। তারা যেন দয়া করে একবার খুঁজে দেখেন তাদের চিঠির সঙ্গে এ কাগজ চলে গেছে কি না। সারাদিন পর আপ্রাণ চেষ্টা করে শুধুমাত্র আগামীকাল চাকরীর আস্থাটুকু নিয়ে বাড়ী ফেরে।

খোকার চোখের উপর সব ঘটছে কিন্তু অফিসে না গিয়ে এর গভীরতা কত-টুকু কি বুঝবে। শুধু তার সংবেদনশীল মন বাপের শুকনো মুখ দেখে মোটামুটি সবটা অনুমান করে নেয়। আর এই সঙ্গে নিজের দুঃখ সে নিজে বহন করে চলেছে। দুঃখ নয় আক্ষেপ। সারা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের পরীক্ষা থেকে থেকে তার মনকে অবসাদে ভরিয়ে তুলছে। জীবনে সে মানুষ হবে বটে কিন্তু শিক্ষার আলোয় সত্য আদর্শ জীবন সবকে সে যাচাই করে নিতে চায়। সেই সঙ্গে বাস্তববাদী-মন অর্থের প্রয়োজনকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। তাই দুইয়ের সমন্বয় সাধন সম্ভব—যদি সে জীবনে একজন প্রতিষ্ঠিত প্রফেসর হতে পারে। তার স্বপ্ন তার সংগ্রাম চেষ্টা সব কিছুকে ব্যর্থ করে দেবে যদি এবার

পরীক্ষার ফল খারাপ হয়। অনার্স না পেলে সে এম. এ. পড়ার সুযোগ পাবে না। অনেক কষ্টের পয়সা বাপের। তার ব্যক্তিগত পরিশ্রম কি জানি আজ কিভাবে পুরস্কৃত হয়।

এইভাবে প্রায় মাস দুই কেটে গেছে। দু মাস নয় যেন দু বছর। একদিন বাপ বেটায় একসঙ্গে বিকেলেব পব ঘব ঢুকছে। খোকার পরীক্ষার ফল বেরনোর সময় হযে এল। বাপ ছেলেকে সামনে দেখে ডাকল—বুঝলি রে, আজ সেই হারানো কাগজগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। পাওয়া গেছে অনেক ফাইল ঘেঁটে একটা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় জায়গায়। খোকা তাকিয়ে দেখল চিন্তার ভারে হঠাৎ বেড়ে যাওয়া বাপের বয়স যেন মুহূর্তে কমে ঠিক আগের জায়গায় আসবার চেষ্টা করা সুরু করে দিয়েছে। অনিষ্ট আশঙ্কায় গোটা সংসারটা শুকিয়ে মরছিল। আজ বাপের সঙ্গে সকলে আনন্দের ভাগ পাবে।

খোকা বলল—দেখলে বাবা, তোমাকে আমি বরাবরই বলছি না—তুমি অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন, নিশ্চয় সুরাহা দেখা দিবে। যেখানে তোমার নিজের কোন দোষ নেই।

এ কথায় সর্বত্র বাস্তব প্রয়োজন মেটে না। বাবা সে কথা বিলক্ষণ জানেন। তবু সত্য আদর্শের কথা চিন্তা করে চুপ করে গেলেন। কিন্তু আর একদিন তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—তা বটে কিন্তু এই দুমাস কি হয়রানি হতে হল। তোমাদেরও কি কম ভাবিয়ে তুলেছিলাম। এমন কি মণ্টুকেও এর ভার ছুঁয়েছিল। খোকা, একেই বলে ভুলের মাশুল।

খোকা কথাগুলো সবই শুনল। আজ পড়ার ঘরে টেবিলে বসে পাঁচরকম পাঁচটা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার নিজের কথা মনে পড়ে গেল।—"আমি দাদাকে বড় গলায় বলেছিলাম। কিন্তু আজ যদি আমার একটা কিছু মন্দ হয়ে যায় তাহলে দাদার কাছে মুখ দেখানো দায় হবে। বাবার শেষ কথা তার মনকে তোলপাড় করছে—ভুলের মাশুল।

হায়, বিধি যে সত্যাই বাম হল। পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। খোকা অকৃতকার্য। মুহূর্তে তার কাছে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। বন্ধুরা কয়েকজন তাকে সহানুভূতির সুরে পাচটা সান্ত্বনার কথা বলে। কিন্তু আজ কোন কথাই তার কানকে যাবার নয়। এক বিশিষ্ট অধ্যাপক যেন খোকাকেই খুঁজছিলেন। অমরেশ তার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। এর দাদা মানিককে তিনি

ভাল করে চেনেন। পড়াশুনায় ভাল ছিল বলে সে প্রিয়পাত্র ছিল। কিন্তু খোকা কেন জানি না তার মনকে আরও বেশী আকর্ষণ ক'র। খোকাকে মনমরা দেখে কোথায় যেন একটা ব্যথা অনুভব করলেন। সস্নেহে পিঠে হাত রেখে বললেন—অমরেশ, তুমি পারলে না জেনে একটু বিস্মিত হলাম। কিন্তু অত ভেঙ্গে পড়ো না। পরীক্ষার কথা কে বলতে পারে। আবার উদ্যমী হও। তুমি না সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে চাও? তাহলে তোমাকে তো বাবা এ ভাব সাজে না। ঝপ করে খোকা চোখের জল সামলে নিল—ছিঃ ছিঃ আমি না ভুলের মাশুল দিতে বসেছি। হঠাৎ শিবানীর ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল। উঃ এইজন্য আজ আমার এই সর্ব্বনাশ! আর না দাঁড়িয়ে সে প্রফেসর সেনের কাছ থেকে বিদায় নিল।

ওদিকে বাপ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর উৎকণ্ঠায় সময় কাটছিল। রাস্তায় নেমে এসে কয়েকটি ছেলেকে খোকার কথা জিজ্ঞেস করল। তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব দুঃখের সঙ্গে উত্তর দিল—কি আশ্চর্য মেসমশাই, অমরেশ যে এইরকম করবে এ আমরা সপ্নেও ভাবতে পারি নি। কথাটা শুনেই ভিতরটা তার কেমন যেন মুচড়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে বাপের মনে অনেক কথাই খেলে গেল। কিন্তু নিজকে সামলে নিল। যা হবার তা হয়েছে। এবার ছেলেকে দেখি। যা হয়ে যায় তা নিয়ে চিন্তা করলে কি সমাধান মিলবে। ক্ষতি যখন হয়েছে ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি এগিয়ে আসছিলেন। দূরে খোকাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়ালেন। কাছে আসতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলেন। আমি আর কি বলব! খোকার মাথায় যেন পৃথিবী ভেঙ্গে পড়েছে। গোটা মুখ খানায় যেন কে কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

বাপ বাপের মত জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার খোকা?

বাপের কথা শেষ হবার আগে খোকা ভেঙ্গে পড়ল—বাবা এ আমি কি করলাম। কোথায় আমার ভুল হল।

না নরম না কঠিন এ রকম সুরে বাপ উত্তর দিল—নিশ্চয় কোথাও হয়েছে বৈ কি! যাক যা হবার হয়েছে নূতন উদ্যমে কাজ সুরু কর। দেখ সামনের বছর যেন খুব ভাল হয়।

ওদিকে স্বামী পুত্রের [illegible] খোকার মায়ের বুঝতে বাকী রইল না। পথের পানে চেয়ে [illegible] নানা কথা চিন্তা করছেন। মাঝে মাঝে

যে রাগ দুঃখ ছুঁচ্ছে না তা নয়। এইরকম সময় বাপবেটায় বাড়ী ঢুকল।—হু, আমি ওর আগে সবই বুঝেছিলাম। একটা বছর তো খোকা নষ্ট হয়ে গেল।—মা মনের কথা মনেই চেপে যায়।

শিবানীর বাবা এসেছে। গুটি গুটি পা ফেলে খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে বলল—ইস্ শিবদা, আজ আমার জন্য আপনাকে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হল। আমাব মনে হয় অমরেশ এদিকে না পড়ালেই ভাল হত। বেচারার পড়ানোর চাপেই এরকম অঘটন ঘটল।

শিবশঙ্কর বলল—আহা, ও তো ওর নিজের চাপ বুঝত, বুঝেই তো ওদেব পডাতে গেছিল।

সঙ্গে শিবানীর মাও এসেছিল। সে ভিতরে খোকার মাকে সমবেদনা জানাচ্ছে।—দিদি, আজকে খোকার এরকম হতে আমাদের বুকে সবচেয়ে বেশী বেজেছে। যে পরেব উপকার করতে যায় তার যে কেন এরকম হয়! আজকে খোকা না এদের পড়ালে কি যে অবস্থা এদের হত! ভগবান কি দয়ার দান এই রকমই দেন!

খোকার মা—নিজেদের ভুলকে না ভেবে ভগবানকে দোষ দেওয়াটা কি অন্যায় হচ্ছে না?

ভুল!—চমকে উঠল শিবানীর মা।

হুঁ নিশ্চয় কোথাও আছে বৈ কি।—চেপে গেল খোকার মা।

ওরা ওদের মত বাড়ী ফিরল। বেশ কয়েক দিন কাটে। সনৎ শিবানীও থমকে গেছে। পড়তে আসে না। প্রথম যা দিন কয়েক খোকা একটু মুসড়ে পড়েছিল। তারপরই সামলে নিয়ে আবাব উদ্যমী হয়ে উঠেছে। ভিতরে দমে গেলে কি হবে বাইরে সেই বাঘ বাচ্চা ভাবটা ঠিকই ছিল। তাব খাওয়া দাওয়া খেলা ধুলা সবই নিয়মিত চলছে। সংসারে আব পাঁচজনের মত সে নয়। সে সত্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত। ভুল হয়েছে, ভুলের মাসুল তাকে দিতে হবে—এই কথাটাই সে সহজ ভাবে বোঝে। ভুল ধরে যদি বসে থাকে তাহলে তো তাব জীবনটাই ভুলে ভরা হয়ে যায়। আব যাতে না ভুল হয সেইজন্যই চেষ্টা করতে হবে। ভুল ধরে বসে থেকেই তো সংসারের এই হাল! এক বছর যেমন ক্ষতি হল তেমন এবার ফার্ষ্ট ক্লাস নিয়ে বেরুতে হবে আমাকে। মন নিলে সংশোধন করতে কতক্ষণ যায়!

একদিন ভাই বোনকে পড়াতে বসেছে। সঙ্গে নিজের বই। সময়ের সদ্‌ব্যবহার করতে হবে প্রতি মুহূর্ত। হঠাৎ বাবা পড়ার ঘরে ঢুকলেন—কি রে তোরা বসেছিস, কৈ সনৎ শিবানী পড়তে আসে নি?

না - উত্তর দিল খোকা।

কেন?—জিজ্ঞাসা করে শিবশঙ্কর।

খোকা—না আমি ভাবছি আমার অসুবিধা হবে। সেইজন্য চাপ না নেওয়াই ভাল।

—বাবা সে কি বলছ? গরীবের ছেলে লেখাপড়া করে যদি জীবনে উন্নতি করে তবে তার সহায় হওয়া তো ভাল। বিদ্যা দান করা তো উত্তম। তা তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? এ তো আদর্শবাদীর বলিষ্ঠ ভাষা নয়।

—না ঠিক তা নয়, বলো তো পড়াব।

ছেলের কথা শেষ হতেই বাপ বলল—তা বলছ কেন? বল না—যা বললাম তা কি ঠিক নয়? সপ্তাহের সাত দিন না পার অন্তত দু, তিন দিন তোমার দেখিয়ে দেওয়া উচিত।

পরদিন সকালে বেরিয়ে যাচ্ছে খোকা বোনকে সামনে পেয়ে বলে যায়—ওরে দীপা, সনৎ শিবানী অনেক দিন পড়তে আসে নি, ওদের আসতে বলে দিস।

ওরা কিন্তু এখানের হাল একেবারেই ছেড়ে বসে ছিল। পুনরায় কোনদিন যে সুযোগ হবে সে আশা করা বৃথা। এই কথাই তারা ভেবে বসে আছে। হঠাৎ সেই ভাঙ্গা কপাল গোটা হবার সম্ভাবনায় তারা একসঙ্গে চমকে উঠল।

দীপা গিয়ে বলছে—কাকীমা, ওরা কেন পড়তে যায় না? মেজদা আজ তাই জিজ্ঞেস করছিল।

হঠাৎ শিবানীর কান খাড়া হয়ে উঠল—সে যেন প্রাণ পেল। ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

মা দীপাকে বলছে—জানত মা, খোকার এইরকম হয়ে যাওয়াতে তোমার কাকা ও আমি ভীষণ ভাবে ভেঙ্গে পড়েছি। না হলে ওরা বলছিল, মা আমরা আর খোকাদার কাছে পড়তে যাব না? আমিই বকে দিলাম ওদিকে।

—না কাল রাতে বাবা মেজদাকে বলছিল। মেজদা বলে দিয়েছে, আজকে পাঠিয়ে দিবেন।

পড়ার ঘরের পরিবেশটা খোকা এবার নতুন করে গড়তে চায়। কোথায় যেন কি এলোমেলো হয়ে গেছিল।

—কি ব্যাপার শিবানী তোমাদের তো হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা এগিয়ে এল?

হচ্‌কচিয়ে উঠল শিবানী—খোকাদা এরকম সুরে কথা বলছে! এত বলিষ্ঠ স্বর তো তার কোনদিন শুনি নি। শিবানী তার হরিণ চোখ দুইটি করুণ করে খোকার দিকে চাইল।

খোকা আজ তাব করুণ চাউনীর উপর কঠিন দৃষ্টি রেখে সস্নেহে বলে উঠল—শিবানী আমার মনে হচ্ছে তোমরা যেন পিছিয়ে যাচ্ছ।

শিবানীর ভিতর মোচড় দিয়ে কান্না উছলে উঠতে চাইল—এ কি তার সুর!

কিন্তু এখানেই কি খোকার বলার শেষ হয়ে গেল! সে আবারও বলল—দেখ এ পরীক্ষার ফল অনেক সময় বাৎসরিক পরীক্ষায় সাহায্য করে। হাফ ইয়ার্লি বলে গাফিলতি না করে উত্তমী হও। দেখলে তো আমাকে কি ভাবে ভুলের মাশুল দিতে হল।

আজকাল পড়ানো ও পড়া কাজ দুটো একসঙ্গেই চালায় খোকা, লক্ষ্য ঠিক রাখে দুদিকে। তবে সব সময় ওদের দেখে নিজেকে ছাখে। শিবানী কিন্তু ভাল করে যে পড়ায় মন বসাতে পারছে তা নয়। সনৎ পড়ে চলেছে। প্রশ্নোত্তর চলছে ওদের। শিবানী এক ধরেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। তার জানবার থাকলে কোথায় যেন বাধা পাচ্ছে; জানতে পারছে না। খোকা সেটা বুঝতে পারল। এটা তো ভাল জিনিষ হচ্ছে না। এর তো সমূলে বিনাশ দরকার। স্পষ্ট করে সোজা শিবানীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—কি শিবানী, তোমার কি কোন প্রশ্ন নেই, সনৎ কত কথা জানতে চাইছে?

কথার প্রথম অংশ শুনেই শিবানী দরদভরা দৃষ্টি নিয়ে মুখ তুলে চেয়েছিল কিন্তু পরের অংশ শুনেই আবার মাথা নামিয়ে নিল। তার চাউনী এই কথা নীরবে খোকাকে জানাল—নিশ্চয় প্রশ্ন আছে কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব তুমি দিচ্ছ কোথায়!

ভাবে ভাষা যেমন ধরা যায় তেমনি খোকাও বুঝল। কিন্তু খোকা কি আর ভুল করার ছেলে! আজ তার সে অবসর কোথায়। তাড়াতাড়ি জ্যামিতি বইটা টেনে নিয়ে বুঝাতে সুরু করল। বুঝালেই কি সব সময় সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়! যাক সেদিকে লক্ষ্য নেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ঝপ্ ঝপ্ কাজ বুঝিয়ে বলল—এই এইগুলো করে আনবে এর পর দিন।

সনৎ আগেই কাজ বুঝে নিয়েছিল। নিজের পড়ায় এবার লক্ষ্য করতে হবে। রাত বাড়ছে। ওরা উঠল। খোকা এগিয়ে দিতে উঠে দাঁড়ায়। দুজনের পিঠে হাত চাপড়ে বলল—যাক যে যার মনযোগী হয়ে পড়াগুলো করবে।

শিবানী গ্রহণ করতে পারল না। এটা কি সে ঠিক করল! হায় শিবানী আজ যদি খোকার মধ্যে আদর্শ দাদাকে খুঁজতে তাহলে হয়ত অনেক কিছুই পেতে। কার মধ্যে এ তুমি কাকে খুঁজতে চলেছ! এটা কি ঠিক করছ?

সেদিন কলেজ হোষ্টেলে গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অমরেশের বন্ধু শ্যামল। আবার এদের দুজনের দাদা একসঙ্গেই এই কলেজ থেকে বেরিয়েছে। পাঁচটা কথা আলোচনার মধ্যে এক সময় শ্যামল বলল—জানিস রে অমরেশ, দাদা কালকে বাড়ী এসেছে। বলছিল—মানিকদা নাকি এবার—কি শুনছিলাম—।

খোকা চেপে ধরল—কি ব্যাপার?

কেন তুই কিছু জানিস না? —একটু চমকে উঠল শ্যামল।—গতবারই দাদা এসে একটু আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে যায়। অবশ্য সেদিন মায়ের কাছে শুনছিলাম। তা তোরা একেবারেই কিছু জানতিস না?

যাই হোক গোটা ঘটনাটা, শ্যামলের মুখে শুনে অমরেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

একটু আগে পিছে করে দুজনের দাদা চাকরিতে ঢোকে। একই অফিস তবে দুজনের পদমর্যাদা ভিন্ন। মানিক ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে পরে চাকরি নিয়েছে। কিন্তু শ্যামলের দাদা বি কম পাস করে রোজকারের ধান্ধায় বেরিয়ে এখানে আটকে গেছে।

এই অফিসে স্টেনো না টাইপিষ্ট একটা মেয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করছিল। মানিকের সেদিকে লক্ষ্য পড়ে। ধীরে ধীরে ওদের ভাব জমতে জমতে খুব গভীরতা এসে যায়। তারপর এখন নাকি শোনা যাচ্ছে ওরা বিয়ে করবে।

গুম হয়ে সমস্ত কথা শোনে অমরেশ। শ্যামল থামতেই বলল—না না এ অবিশ্বাস্য। এ হতে পারে না।

ঠিক আছে একদিন তা হাল ফ্যাশানের সব গায়ে চড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে বৌদি ঘরে ঢুকবে।

শ্যামলের এই রসিকতায় সায় দেবে কি ওর মনের মধ্যে তখন তোলপাড করছে। আমাদের বাড়ীর ছেলে এ রকম কাজ করতে গেল! বাবার সত্যানুরাগ, আদর্শ জীবন সব কি দাদা ভুলে গেল! দাদা কি এই জন্যই আমাকে উচ্চ শিক্ষার কথায় জোর করেছিল। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এই রকম করেই কি বাঁধ ভাঙ্গতে হয়! আমার তো ধারণা ছিল অজ্ঞদেরই বাঁধ ভাঙ্গে। শিক্ষার আলোয় জীবনের সমস্যা বাড়ে না, সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে অমরেশ উঠে দাঁড়াল।

শ্যামল বলে উঠল—কিরে চলে যাচ্ছিস না কি?

হ্যাঁ এবার যাই।—ভাঙ্গা মনে উত্তর দিল অমরেশ।

শ্যামল বলল—অমরেশ, কথাটা শুনে খুব ভেঙ্গে পড়লি, নারে?

না, ভেঙ্গে পড়া পড়ির আর কি আছে! তবে কি জানিস—যারা যে ভাবে মানুষ হয় তাদের সেই ভাবে কাজ করাই উচিত নয় কি?

—যাক, তোর কি জাতটার জন্যই খুব মনে লাগছে?

শ্যামলের কথা টেনে নিয়ে, অমরেশ বলে উঠল—নারে না, জাতটাকে বড় করে ধরছিস কেন খৃষ্টান কি আর মানুষ নয়! এটা যদি ও বুঝা পড়া করে শৃঙ্খলায় ভিতর দিয়ে করত তাহলে আমার বলার কিছু ছিল না। হলই বা বাঙ্গালী খৃষ্টান, বাবা না হয় বহুদিন এদেশে বসবাস করছে, সবই আমি বুঝলাম রে। আদর্শ পিতার সন্তান হয়ে আদর্শচ্যুত হলত। একে কি তুই আদর্শ বলবি।

—কেন? আদর্শ বলব না কেন? তোর কাছে যা সেরা শ্রেষ্ঠ তা যদি তার কাছে না হয়। তুই যাকে গুরুত্ব দিবি সবাইকে কি তাকেই গুরুত্ব দিতে হবে?

—আমার কাছে যা আদর্শ হোল না তোদের কাছে তা আদর্শ—আদর্শ জিনিষটা কি এবার আমাকে, শ্যামল, তা একবার বুঝিয়ে বল দেখিনি?

—না জানিস কি—ও কি আর জেনে শুনে এটা করেছে ! ঘর্ষণে যে এভাবে আগুন ধরবে তা ও কি করে বুঝবে !

এই না বোঝাটাই তো হচ্ছে অবিবেক অনাদর্শ।—অমরেশ থামিয়ে দিল বন্ধুকে।

শ্যা—একটা তো সময় আছে, নিশ্চয় স্বীকার করবি, যে সময়ে কোন বাঁধ থাকে না।

অম—নিশ্চয় ; সেখানে শৃঙ্খলা নেই। জ্ঞান তার অতি অল্প।

শ্যা—আচ্ছা ভাব দেখিনি অমরেশ, এটা যদি তোর জীবনে হত তাহলে তুই কি করতিস ? তুই তো খুব আদর্শের কথা বলছিস।

অম—আমার জীবনে হলে আমি কি করতাম ? তবে শোন। প্রথম তো আমার যখনই ভাবে জমাট ভাব আসত তখনই সাবধান হতাম। তারই নাম জানবি ধরতি জ্ঞান। তারপরই ধীরে ধীরে ব্যক্ত করতে চাইতাম নিজেকে। যাকে খুব নিকট-জন মনে করি তার কাছে মন খুলে সব বলে চাইতাম তার জ্ঞান অভিজ্ঞতা। সে কি বলতে চায় জানতে হয়। হঠাৎ শঠতা করে টাকা কমিয়ে দিতাম না। শ্যামল, তুই তো আমার বাবা মাকে জানিস। যে বাবা মা সব কিছু আমাদের কাছে তিলে তিলে ব্যক্ত করে আমাদের গড়ে তুলেছেন তাদের সঙ্গে একি কপটতা ! যদি তার ভালই লেগেছিল তবে পরিষ্কার বললেই হত। কেন চোরের মত গোপন করতে গেল।

শ্যা—না এমনও তো হতে পারে এতদূর এগোবে বলে প্রথমে হয়ত ও নিজেও বুঝতে পারেনি।

অম—আঃ কেন জোর করে টানতে যাচ্ছিস ? জানবি আদর্শের পরি-প্রেক্ষিতে দুইই বজায় রাখা চলে। সবচেয়ে কি বড় জিনিস জানিস—যদি আদর্শকেই সে বড় করে দেখত তাহলে তার এ জিনিস আসতে পারে না।

শ্যা—এ তুই কি বলছিস রে ! এ কি কথা।

অম—হ্যাঁ ঠিকই বলছি।

শ্যা—ক্ষুধা আবেগ এগিয়ে এলে সামলানো কি চারটি খানি কথা নাকি।

অম—হ্যাঁ শ্যামল, এবার ভেবে দেখ দেখি আদর্শ বড় না, আবেগ বড় ? আদর্শকে রক্ষা করতে গেলে ,অনেক উচ্ছ্বাস আবেগ জলাঞ্জলি দিতে হয়। কারণ তারা স্থায়ী নয় আদর্শই স্থায়ী। অমর আদর্শকে জীবনে পালন করতে

হলে সাময়িক জ্বলুনি সহ্য হবে বৈ কি। কিন্তু আদর্শ যদি হারিয়ে যায় তাহলে? এরা তো ক্ষণস্থায়ী।

শ্যা—ক্ষণস্থায়ী যদি তা হলে কি আর ক্ষতি।

অম—না, ক্ষতি আর কিছু নয়, তবে নিজ হাতে নিজের কবর খোঁড়া হয়।

শ্যা—কি জানি।

অম—তার মানে স্থায়ী শান্তি চাস, না, সাময়িকের পিছনে ছুটবি? একটা কথা কি ঠিক নয়, শ্যামল, আপাত দৃষ্টিতে অনেক কিছুকেই মধুর বলে মনে হয়। কিন্তু চিরকাল সে কি মিষ্টতা দান করতে পাবে?

শ্যা—তা সে কোন্‌টাই বা পারে। সংসারে মানুষ নিজেই আর কদিন! সে জায়গায় ওসব চিন্তা ভাই, নিতান্তই অর্থহীন নয় কি?

অম—কি বলতে চাস? তাহলে কি যেমন তেমন ভাবে জীবন কাটালেই হল? পাপ পূণ্য, ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই।

শ্যা—অন্যায়টাকে তুই ধরছিস কেন? এখানে ন্যায় নয় কেন? বয়স হয়েছে, উপায় করে, ভাল লেগেছে, প্রেম করছে এবার বিয়ে করবে—এর মধ্যে অপরাধটা কোথায়। প্রেম অজেয় অমর। যা কিছু সার্থক সৃষ্টির মূলে জানবি অমরেশ, সেই প্রেম।

অম—কোন্ প্রেম? প্রেম জিনিষটা বুঝিস? প্রেম বলতে তার মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এ সব প্রেম মানে দুদিনের ক্ষুধা মিটানো। খেলি, বদহজম হল, ফেলে পালিয়ে এলি।

শ্যা—কি বলতে চাস তুই? মানিকদাকে নিয়ে এ তুই কি নিকৃষ্ট চিন্তা করছিস?

অম—আমি কাউকে কটাক্ষ করছি না। ধীরে ধৈর্য্যে যে জিনিষ আসে তাই জানবি স্থায়ী হয়। যারা উচ্ছ্বাস আবেগের বাঁধ রাখতে পারে জানবি, তারাই সার্থক সৃষ্টির মূলে। পৃথিবীর যা কিছু অসামঞ্জস্য সবের গোড়ায় জানবি ঐ অসংযত মন। এটাই কামের খোরাক জোগায়। আর তোরা আহাম্মকের দল এটাকে অলঙ্কার দিয়ে বলিস কি না—প্রে-এ-ম।

শ্যা—তোর প্রেমকে লক্ষ্য করতে গেলে সৃষ্টিই লোপ পেয়ে যায়।

অম—এতদিনে তুই আমাকে এই বুঝলি! বন্ধু, আমি সেই প্রেমের পক্ষপাতি যা সামঞ্জস্য আনে। আমি তো কামকে অস্বীকার করছি না। ও তো

দেহের ধর্ম। আসার আসবে, তা নিয়ে অত মাতামাতি কিসের। শৃঙ্খলা নিয়ে আয়। বাড়াবাড়ি বন্ধ কর। পৃথিবীটা যে রসাতলে গেল। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উপার্জন করছিস। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোর দিন কাটে, কিন্তু তোরই পাশে একজন মুহূর্তে এতগুলো টাকার মালিক হল। তার মেহনৎ কি—না কয়েকটা চোখকে ফাঁকি দেওয়া। সোজা পথে পাঁচ টাকা আয় করতে তোকে কি নাই বেগ পেতে হয়। আর এ কত সহজে পাঁচ হাজারের মালিক হল। এবার ভেবে দেখত ভাই, কার কি রকম মনের অবস্থা। কি দরাজ বুক নিয়ে তুই জীবন কাটাচ্ছিস। আর তার সব সময়ই ভয়, ঐ বুঝি কে সন্দেহ করল। পুলিশ জানলেই হাতে হাতকড়া। যেদিকে যাই-ই করে শুধু আগে পিছে চায়। পাঁচজনের চোখকে সে না হয় ফাঁকি দিল কিন্তু নিজের মনকে সে ভুলিয়ে রাখবে কি করে রে। তার মনে না দেখা দিয়ে যাবে কোথায়—বাবা কাকাদের বিবাহ জীবন, আমার দাম্পত্য জীবন—কিসের পরে কি এসেছে, এ তার মনকে তোলপাড় না করে পারে কি? যাক এ সব অনেক কথা। চললাম এখন।—এই বলে অমরেশ সব ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে এল।

অন্ধকার নেমেছে। পথে সে নিঃসঙ্গ। সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা করে সে এই একলা চলাকে নিজের মনে আজ দারুণভাবে অনুভব করছে। এ পৃথিবীতে যা মেলে ওর বাবার সঙ্গে। দাদা এ কি করতে চলেছে। শ্রদ্ধার আসন থেকে সরে দাঁড়াবে। না না খোকা কোনদিন অশ্রদ্ধা করতে চায় না। সে তার অর্ঘ সাজাবে। আজীবন দাদাকে দাদা বলেই জানবে। বিয়ে করা স্ত্রী তার বৌদি বৈকি। কিন্তু এ শ্রদ্ধা এ সম্মান আমি তো ব্যক্ত করতে পারি না। তবে যে আদর্শ নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃত আদর্শ তাকে নিজের জীবনে ফুটাতেই হবে। বাবার চরিত্রের উদারতা তাকে আজীবন আকর্ষণ করে। মা-ই বা কি কমটা যায়, বরাবরই তো বাবার সঙ্গে সায় দিয়ে গেছেন। এই সঙ্গে সে কি নিজের কথা ভাবতেও ছেড়ে দিল। কদিন আগে আমিই বা কি ভুল করতে চলেছিলাম। কিন্তু কেউ যদি প্রকৃত আদর্শকে লক্ষ্য করে, কোথায় দিয়ে কি ভাবে তার ভুল যেন তার কাছে ধরা পড়ে। খপ্ করে সে নিজকে সামলে নেয়।

এই সব নানা রকম ভাবতে ভাবতে অমরেশ ঘরে এসে পৌঁছল। থম থমে

মুখ। মা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পিছিয়ে গেল। বাপের চোখও এড়াল না। হাত পা ধুয়ে একেবারেই রাতের খাওয়ায় বসেছে, মা জিজ্ঞেস করল—কিরে খোকা তোর আজকে মনের অবস্থা যেন কেমন। কলেজে কিছু হয়েছে? ফিরতেও রাত করলি।

পাশে বাপ খাচ্ছে। খোকা ভারি গলায় উত্তর দিল—না কলেজে কিছু নয়, তবে হয়েছে একটা কিছু।

বাবা সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। খোকা বাবার দিকে সহজ ভাবে তাকিয়ে বলল—আমি বলব। থাক না দিন কতক বাদে খবরই পাবে।

মা বলল উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে—নারে, ব্যাপারটা কি বলই না।

তখন খোকা তার বাবা মায়ের কাছে নিঃসংকোচে শ্যামলের কাছে যা যা শুনেছিল সব ব্যক্ত করল। সব শুনে বাবা শুধু একটা কথাই বলল—শ্যামল কে?

খোকা উত্তর দিল—ঐ যে বাবা বিমলদার ভাই।

মা আকাশ থেকে পড়ল। কিন্তু বাবা নির্ব্বাক।

মা—সে কি রে। কি বলছিস? এ কি সব কথা। না আমি তোর কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কখনই হতে পারে না।

বাবা বলল—আঃ থাম না।

খোকা বলল—সত্যিই মা, বিশ্বাস করবার মতন নয়। আমারও ঠিক প্রথমটা এই রকমই লেগেছিল।

বাপের সেদিনের মত সেইখানেই রাতের খাওয়া সাঙ্গ হল। খোকার যেন কোথায় আবার লাগল—ছিঃ ছিঃ, দাদা কি করল!

যে যার মত খেয়ে উঠে গেল। আজ আর প্রতিদিনের মত কোন প্রসঙ্গই উঠল না। এদের ঘরের বরাবরের নীতি হল—ছেলে মেয়ে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসে শিবশঙ্কর পাঁচটা আলোচনা করত। খেলাধুলা, রাজনীতি ইত্যাদি সব কথাই উঠত। কিন্তু সবের মূল সুর ছিল, ধর্ম সত্য আদর্শ ন্যায় নীতি। তাই অস্থি মজ্জায় মিশে গেছে সত্যনিষ্ঠা, সহজ ও সরল ভাব। এ হেন পরিবেশের একজন মানিক সে আজ এ কি করল! খোকা শোয়ার ঘরে এই সব নানা কথা তোলপাড় করছে। তারপরে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মায়ের ত বাবার কাছকে আজকে ভিড়বার সাহস নেই। যেমন শুক

গম্ভীর ভাব নিয়ে আধ খাওয়া করে উনি উঠে গেছেন! কিন্তু মা তো এগুলোকে চেপে রাখতে পারছে না। ভিতর কাঁদছে, হাজার হলেও বড ছেলে।—মানিকরে বাবা, তোর বাবার কত আশাই না তোর উপর ছিল। আজ একে একে আমাদের সব কিছুই ভাঙতে বসেছিস। গভীর নিঃশ্বাস চাপতে গিয়ে দারুণ কান্না তার বুক ছাপিয়ে উঠল। দীপা মণ্টু ঝাঁপিয়ে পড়ল—কি হয়েছে মা, কাঁদছ কেন?

বিরক্তি ভরা গলায় বলল—কি আবার হবে? যা যা সব, বিরক্ত করিস নি। আমি যেন তোদের মানুষ করতেই এসেছিলাম নামের মা হয়ে।

মণ্টু কিন্তু বেশী তলাতে পারল না, একটু সরে দাঁড়াল। দীপা অল্প সল্প বোঝে, বলল—কি হয়েছে বলই না।

—কি আবার হবে! তিলে তিলে হাতে করে তাকে গড়েছি তোদেরও তৈরী করছি। তারই প্রতিদান। সে আমাদের কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই তোর দাদা একটা খৃষ্টান মেয়ে বিয়ে করেছে।

—মা, দাদা তোমাকে বাবাকে না বলে বিয়ে করবে? বাবা যে বকবে মা। না না এ হতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুর কথা নিয়ে দীপাও সায় দিল। সে পরক্ষণেই আবার বলল—হ্যাঁ মা, খৃষ্টান মেয়ে হলে তোমার লক্ষ্মীর হাঁড়ি ছুঁয়ে কি পুজো করবে, মা? ঠাকুমা এই সেদিনও তোমাকে কত নাই কথা শিখাতেন। আজ না হলে ঠাকুমা নেই।

মা আনমনা। এদের কথাগুলো কখনও কখনও কানে যাচ্ছে। ভাই বোন একটু দূরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বলছে—হ্যাঁ দিদি, বড়দা বৌদিকে নিয়ে বাড়ীতে আসবে? কি মজা আমাদের একটা বৌদি হবে।

দীপার ভিতরে আনন্দ হলেও বাইরে সে ছোট ভাইকে বকে দিয়ে বলল—কি বলছিস, দেখছিস না মা কি রকম রাগ করছে।

এদের কথাবার্তা চলছে এমন সময় খোকা এসে পৌঁছে গেল। —কিরে, তোরা এখানে কি করছিস?

মণ্টু কোন উত্তর করল না। দীপা ছোট করে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ মেজদা, দাদার নাকি বিয়ে হয়েছে?

তোকে কে বলল রে?—পাল্টা প্রশ্ন করল খোকা।

মা বলছিল—দীপা।

—হ্যাঁ ঠিক এখনও জানিনা, শুনছি তো সেই রকম। হাঁরে দীপা, মা খুব মন খারাপ করেছে, না?

দীপা উত্তর দেবার আগেই মণ্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—মা না কান্ছিল, আর কি সব না দুঃখের কথা বলছিল।

খোকা—মা-ও যেমন, দুঃখ করার কি আছে! কি বল মণ্টু? তুই আছিস আমি আছি, দাদা না হয় ঐ রকম একটা করেছে। তাতে ভেঙ্গে পড়ার কি আছে।

মণ্টুর উত্তরটা দীপাই দিল—ঠিক বটে মেজদা; তুমি একটু মাকে বুঝিয়ে বলত।

খোকা আর না কথা বাড়িয়ে মায়ের কাছে চলল।

মা তখন ভাঙ্গা মনে গৃহকর্মে রত। খোকা যে মায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা ওর মা বুঝতেই পারে নি। ছেলে ডেকে উঠতেই মা চমকে পিছনে ফিরে চাইল—কিরে কি বলছিস?

—না বলছি কি—তোমার বোধ হয় দাদার কথা শুনে খুব মনটা ভেঙ্গে গেছে, না মা?

—আর ভাঙ্গাভাঙ্গি কি বল! জীবনে যে এইভাবে কত আঘাত এগিয়ে আসবে সেই কথাই ভাবছি।

হঠাৎ কথাটা শুনে খোকা একটু চমকে উঠল। মা কি তাহলে সে সব কথাও মনে রেখেছে। তা আর মাকে দোষ দেব কি! ঘটনাটা তুচ্ছ হলেও তার পাশেই যে এই বড় ঘটনাটা ঘটে গেল। সেই তুচ্ছের মধ্যে মা বিরাট সম্ভাবনা চিন্তা করছে।

যাক গে, মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে খোকা বলল—ওকি মা, তা কেন ভাবছ তুমি। ছেলে তোমার তো একটাই নয়, আরও তো কটা রয়েছে মণ্টু, আমি এদের তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন!

মা—খোকা তুই!

পরিষ্কার সহজ গলায় উত্তর দিল খোকা—হাঁ মা আমি।

—তুই বাবা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবি!

—আশীর্বাদ কর মা তোমাদের আশা শুধু আমি কেন মণ্টুও যেন পূরণ করতে পারে।

মা যেন একটু আশ্বস্ত হল। ভাই বোন তখন কাছে ছিল, সব শুনল। তারপর যে যার কাজে রত হল।

পরদিন ওদিকে শ্যামল তার মায়ের কাছে খোকার কথা সব বলছিল—জান মা, অমরেশ একটা ছেলে বটে। মাণিকদার সঙ্গে ওর মিল পাওয়া ভার। যেন একটা আগুনের ফুল্কি। দাদার সব কথা শুনে তো একেবারে থ। প্রথমটা তো কোনমতেই বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর যাই হোক সব শুনে না মেনে আর উপায় থাকে। কিন্তু মা, আমি যখন এ বিয়েতে সায় দিয়ে মানিকদার পক্ষ নিলাম তখন তার সে কি সব অকাট্য যুক্তি। আমিও বাধ্য হলাম ওর সমস্ত কথা মেনে নিতে।

শ্যামলের মা অমরেশকে ভাল করে চেনে। বাড়ীতে বড় ছেলের বন্ধু মানিকও এসেছে আর ছোট ছেলের খোঁজে মাঝে মধ্যে অমরেশও আসে। মায়ের চোখে বহুদিন অনেক কিছুই বাধ বাধ ঠেকেছে। তবু মমতা তখন সেই সবে শাড়ী পড়তে সুরু করেছে। মানিক কি ঘন ঘনই না আসত। আর কাঁচা বয়সের ছেলেমেয়ের মধ্যে হাল্কা মেলামেশা কি সাজে। মমতা শ্যামল পিঠাপিঠি। অমরেশ কচিৎ কখন আসে বটে কিন্তু সে তার কি গুরু গম্ভীর ভাব। সব শুনে বলে—অমরেশের চরিত্রে একটা দৃঢ়তা আছে।

সে এক বড় মর্মান্তিক দুঃখের দিন। দুঃখ জিনিষটা সকলের কাছে সমান নয়। যাই হোক সকালে সেদিন শিবশঙ্কর বাজারে গেছে। ছেলেরা তাদের নিজেদের পড়াশুনায় ব্যস্ত। মা তাদের গৃহকর্মে রত। গৃহস্বামী বাজার করতে যদিও ভালবাসত না তাহলেও ছেলেদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে নিজেই থলি হাতে রোজ বেরত। তবে মাঝে মধ্যে মন্টু বা খোকা যেতে চাইলে আপত্তি করত না। হিসাব করে চলা তার বরাবরের স্বভাব। ছেলেদেরও অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় হিসাব দেওয়া। মা এই যে হিসাব চাইত

এ তার ছেলেদের অবিশ্বাস করে নয়; যাতে তারা জীবনে হিসাবী হয়ে প্রতিটি পা ফেলতে পারে এই জন্যই ঐ চাপ। এ তার স্বামীর শিক্ষা।

বাজারের মুখে পিয়নের সঙ্গে দেখা। ডাক পিয়ন। এ অঞ্চলে সে অনেক দিন কাজ করছে। বলল—এই যে বাবুকে যখন এখানেই পেয়ে গেলাম তখন আর বাড়ী যাব কি? শিবশঙ্করের হাসি মুখের সায় পেয়ে চিঠিগুলো হাতে দিল।

মানিকের চিঠি না এটা! হ্যাঁ কিন্তু বেশ যেন একটু ভারি ভারি লাগছে। দোমনা হয়ে দু'পা এগিয়ে আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। খাম খুলে এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে যেতে থাকে।—

শ্রীচরণকমলেষু বাবা ও মা,

আজ কদিন ধরেই তোমাদের একখানা চিঠি দেব দেব ভাবছি। তাই আজকে লিখলাম। তোমরা হয়ত শুনে সুখী হবে যে আমি এমন কতকগুলি কারণ বশতঃ তোমাদের না জানিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। আমার অফিসে আমার সঙ্গে একটি মেয়ে কাজ করত। মেয়েটি স্কুল ফাইনাল পাস। ওরা অনেকগুলি ভাই বোন। বাবার জমি জায়গা অল্প সল্প রয়েছে। ছোট বাড়ী। পাড়ায় একটু আধটু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। সংসারে অভাব মেটে না। বাড়ীর বড় মেয়ে শ্বেতা, বাধ্য হয়ে তাকে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে। মেয়েটির নম্র ও ভদ্র ভাব প্রসংশনীয়। আমার সঙ্গে মেয়েটির ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। তারপর আমি তাদের বাড়ীতে যাতায়াত করি। ওদের অনেক কথাই জানতে পারি। দিনে দিনে আমাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং এমনই পরিস্থিতি এসে দাঁড়ায় যে ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হই। ওরা জাতে খৃষ্টান হলেও আমার কোন পথ ছিল না।

এই চিঠি পড়ে তোমরা হয়ত অনেক রকমই ভাববে। তারপর বিচার করে দেখলে নিশ্চয় একদিন বুঝবে আমি ঠিকই করেছি। যাক তোমাদের চিঠির আশায় রইলাম। যদি আমাদের যেতে বল তবে তোমাদের বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাব। না হলে মাস দুয়েকের মধ্যে আমি বাড়ী যাচ্ছি। তোমরা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবে। ছোট ছোট ভাইবোনদের আমার স্নেহাশীষ দিবে। ও ভাল কথা, থোকার পরীক্ষার ফল কি হল এখনও কিছু জানতে পারিনি। সেই জন্য বিশেষ উদ্‌বিগ্ন। ওকে চিঠি দিয়ে চিন্তামুক্ত

করতে বলবে। আর আমি এমাসে টাকা পাঠাতে পারি নি। আমার এখানে অনেক খরচ হয়ে গেছে। আগামী মাস থেকে পাঠাতে চেষ্টা করব। ইতি—

তোমাদের স্নেহের মানিক।

শিবশঙ্করের সেদিন আর বাজার করা হলো না। হলেও লাভ হত না। কারণ আজ আর হাঁড়ি চড়াব কথা নয়। সে কোনমতে নিজেকে সামলে বাড়ী পৌছল। স্ত্রী ডাল, ভাত একটা ভাজা করে স্বামীর প্রতীক্ষায় খিড়কী দুয়ারে দাঁড়িয়েছিল। এবার মাছ এলেই ঝোলটা করে স্বামীকে খাইয়ে অফিস পাঠাবে। কিন্তু একি! স্বামী এইটুকু মুখ করে ঘর ঢুকছে। বিমর্ষ ভাব দেখে একটু চমকে উঠল—তাহলে কি বাজারে কিছু হল। কাছে আসতেই দেখে বাজার ব্যাগ খালি। বুকটা ধড়াস করে উঠল। চৌকাটে পা দিয়ে স্ত্রীর হাতে থলে ধরে দিল শিবশঙ্কর।

—বাজার আনলে না যে।

শ্রীমতির প্রশ্নের উত্তরে শিবশঙ্কর ছোট করে একটা কথাই বলে সোজা ঘরে উঠে গেল—হ্যাঁ ওর মধ্যেই আছে।

স্বামীর শুষ্ক গম্ভীর ভাব দেখে আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্নের সাহস পেলনা। থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চিঠিখানা পেলো। দেখেই বুঝল। বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। সব কথাই এক রকম আগে শোনা হয়ে গেছে। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করে ছুটে গিয়ে স্বামীর ঘরে ঢুকল। শিবশঙ্কর তখন জামা প্যাণ্ট পরে ফেলেছে।

—একি কোথায় যাচ্ছ তুমি? তোমার নাওয়া খাওয়া কিছু হল না। তুমি চিঠিখানা পড়েছ?

—না পড়লে আর খামটা ছিঁড়ল কে।

—তারপর, কি ব্যাপার?

—ব্যাপার আর কি। যা পড়লে তাই সত্য, তাই ব্যাপার।

—তা তুমি চান্ খাওয়া না করে বেরিয়ে যাচ্ছ!

—হ্যাঁ যেতে ত হবেই। স্ত্রী ছেলেমেয়ে যারা আছে তাদের দেখতে হবে। রোজকার না করলে চলবে কি করে বল।

স্ত্রী ঝাঁকার দিয়ে উঠল—তা এই জানোয়ারের সম্বন্ধে কি বললে। চিঠিখানা পড়লে যে।

*শিব—কি আর বলব। এখন তো আর সময় নেই। চিঠি খুলে তো খাওয়ার সময় হারিয়ে ফেললাম। তা কি বলবে তুমিই একটা ঠিক করে রাখ।*

তা তুমি একেবারেই কিছু না খেয়ে যাবে—একরকম চিৎকার করে উঠতেই দেখে পিছনে খোকা দাঁড়িয়ে।

কি হল মা?—খোকা বলল।

মা—কি আবার হবে। তোমাদের গুণের শেষ নেই। এই যে তোমার দাদা গুণের থলি ঝেড়ে দিয়েছে! তোমার বাবা না খেয়েই অফিস বেরিয়ে যাচ্ছে।—বলেই খোকার সামনে চিঠিটা কাছাড়ে দিল।

খোকা মাকে উত্তর না দিয়ে চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বাপকে বলল—বাবা, কিছু না খেয়ে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ কেন? অল্প কিছু খেয়ে যাও।

—না আমার অফিসের সময় হয়ে গেছে। আর এখন কিছু খাওয়া চলবে না। ধীর গলায় উত্তর দিল বাপ।

—একদিন না হয় একটু দেরী হবে, তাতে ক্ষতি কি। কেন তোমার নীচে অনেক লোকই আছে। তুমি তো এখন অনেক উপরে।

শিবশঙ্কর ছেলের মুখের দিকে সোজা চোখ তুলে চেয়ে বলল, "অমরেশ কি বলতে চাও? জান, আজ পর্যন্ত আমার চাকরিতে কোনদিনই এদিক ওদিক হয় নি। সত্য আদর্শ পালন করতে গেলে ঠিক ভাবে পালন করাই কি উচিত নয়? আজকে আমি বড় অফিসার হয়েছি বলে আমাকে কিছু বলবে না। তাতে কি, শিবশঙ্কর বাবুর একদিন না হয় দেরী হয়েছে—এই কথা কি ভাববে না কেউ? এবার অমরেশ ভেবে দেখ দেখিনি—আদর্শের অপলাপ হল কি না? কি করব বাধ্য হয়ে করেছি, উপায় ছিল না—এ কথার উপরে কি কোন কথা আছে? উপায় থাকলে সে উপায় আমারই হাতে আছে, কাজেই সমাধান করতে পারলে একমাত্র আমিই করতে পারি। রাস্তা দেখালে অনেক রাস্তা দেখানো যায়। কিন্তু দেখ, সোজা পথে যে চলে তাকে কখনও পালাবার পথ খুঁজতে হয় না। আর নিজের ইচ্ছায় পথ তৈরী করলে পালাবার পথ তৈরী করার খেয়াল সে রাখবে কি করে?"

এই কটি কথা অতি ব্যস্ততার মধ্যে বলতে বলতে শিবশঙ্করের জুতা পড়া সারা হয়ে গেল। খোকা কথাগুলো থ হয়ে শুনল এবং অনেক কিছুই ওর মধ্যে চিন্তা করতে রইল। অবশেষে এই কথাই বাবাকে বলল—"বাবা, এটা সত্যি

আমারই অন্যায় হয়েছে তোমাকে এ ভাবে বলায়। আমি দুপুরে তোমার অফিসে যাব। তুমি কিছু জলযোগ করবে টিফিন টাইমে। আমি নিয়ে যাব।"

—থাক ওসব ঝামেলায় কাজ নেই, আমি বাড়ী এসে একেবারে যা হয় একটা কিছু খাব। বাজারও তো আজকে করলাম না। তোমরা যা হয় একরকম করে চালিয়ে নিও।

অমরেশ শোনার ছেলে নয়—না না, ও আমি যাবই।

সেই কথার উত্তর না দিয়ে বাপ বেরিয়ে গেল। আর চিঠিখানা হাতে নিয়ে খোকা সোজা ওর মায়ের কাছে গেল।

এবার সুরু হল মায়ে পোয়ে দুজন মিলে নানা রকম গবেষণা। মা রেগে খুন হলেও দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে। অমরেশ যতই হোক দাদার ভাই হয়ে সামঞ্জস্য করতে চাইছে। যদিও আদর্শে ঘা লেগেছে তাহলে এখন আর উপায় কি। মা বাবা যে ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তাতে সান্ত্বনা না দিয়ে চলে না, যাই-হোক মাকে বলল—বাবার অল্প কিছু খাবার ব্যবস্থা করে দাও, বাবার অফিসে দিয়ে আসব।

খোকা সময় মত বাবার অফিসে গেছে। শিবশঙ্কর আজকে অফিসে এসে তার কাজ যথারীতি করছেন কিন্তু তার ভিতরে একটা চাপা কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ যে শিবশঙ্কর, মোটেই প্রকাশ করবার লোক নয়। পাছে প্রকাশ পেয়ে কাজের ক্ষতি হয়ে যায়। অমরেশ যেয়ে দাঁড়াতেই সহজ ভাবেই বলল -কি তুমি এলে? পাশে একটা ছোট ঘরে টিফিন বাক্স খুলে বাপ বেটাকে নিয়ে বসল। খেতে খেতে বলল—তোমাদের সব খাওয়া হয়েছে তো?

—হ্যাঁ বাবা আমাদের হয়েছে।

—যাক তোমার দাদার চিঠিখানা পড়লে নাকি?

অমরেশ সঙ্কোচ ও দুঃখের সঙ্গে বাবাকে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—কি বুঝলে? তুমি কি বলতে চাও এ বিষয়ে?—প্রশ্ন করল শিবশঙ্কর।

অম—আমি আর কি বলব। দাদার পক্ষে এ জিনিষটা করা কি ভাল হয়েছে। আমার কাছে এটা অন্যায় মনে হচ্ছে।

—কেন, অন্যায় আবার কি। সে তো লিখেইছে যে এমন পরিস্থিতি এসেছিল যে বাধ্য হয়েছি।

অম—হ্যাঁ তা না হয় হল কিন্তু পরিস্থিতির আগে দাদার কি চিন্তা করা উচিত ছিল না ? পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে দাদা কি আদর্শের অঙ্গহানি করল না। তারপর দাদার এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে একেবারে বিয়ে করে মা বাবাকে জানালে তাদের কি অবস্থাটা হবে। বিশেষ করে মা তার বড় ছেলের উপর দারুণ আশা নিয়ে কত স্বপ্নের জালই না বোনে।

শিবশঙ্কর খাওয়া সেরে হাত ধুতে ধুতে বলল—তবে কি জান, ছেলে যখন বড় হয় তখন তার নিজের মতামতটাকেই প্রধান বলেই জ্ঞান করে।

অম—হ্যাঁ তা করুক না কিন্তু সমালোচনার মধ্যে এলেই ভাল হয় না কি ?

যাই হোক আর কথা না বাড়িয়ে শিবশঙ্কর নিজের টেবিলে ফিরে গেল। অমরেশ বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। বাড়ীতে এসে মায়ের হাতে খাবার বাক্স দিয়ে বাবার কথা জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। মা জানলো খোকা কলেজ যাচ্ছে। মা আগেই জানত কলেজে একটা খেলায় অমরেশের আজ যোগদান করার কথা। আজকে ওদের কলেজের সঙ্গে কলকাতার কোন একটা কলেজের খেলা তাই দেখতে গোটা বাঁকুড়া নাকি ভেঙ্গে পড়বে।

সন্ধ্যার মুখে স্বামী বাড়ী ফিরেছে। শ্রীমতি ব্যস্ত হয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করল। খাবার ধরে দিয়ে সামনে বসেছে। শিবশঙ্কর আসনে বসে প্রথম প্রশ্ন করে—খোকার আজ ফিরতে দেরি হবে, না ? কলেজে কি একটা খেলা আছে বলেছিল যেন। খানিক পরে প্রসঙ্গ পাল্টে স্ত্রীকে প্রশ্ন করে—কি গো, মানিকের চিঠিটা পড়ে কি বুঝলে ? তাহলে তোমার বধূমাতাকে কবে আনছ বাড়ীতে ?

শ্রী—কি যে বাজে কথা বল।

শি—বাজে কথা কোথায় হল। তোমার ছেলে বিয়ে করেছে চিঠি এসেছে।

শ্রী—আমার ছেলে তোমার ছেলে নয় বুঝি। আমার এখানে আসতে হবে না। তুমিই বরং পূজোর ছুটিতে দিন কতক ঘুরে আসবে। বৌমায়ের সেবা যত্ন খেয়ে আসবে।

শি—না: আমি বুড়ো, বুড়োর সেবা কি আধুনিকা চাকুরে বৌমা ভাল করতে পারবে! ও বুড়ী শ্রীমতিই ভাল বোঝে, সেই পারবে।

শ্রী—নাও নাও খুব হয়েছে। এখন কি করবে সেইটাই চিন্তা কর।

ঝপ্ করে গম্ভীর হয়ে যায় শিবশঙ্কর—হুঁ, তাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি কি করবে?

শ্রী—আমি বাবা ও বৌকে ঘরে তুলছি না।

শি—কেন, ঘরে না তুলার কারণটা কি বল, তুলবে না বললেই হয়ে গেল।

শ্রী—যার কুল মান বংশ কিছুই জানলাম না, অফিসে চাকরি করতে গেছিল, তারপরে ধর্মও এক নয়—এই রকম পাঁচটা কারণে। আমি ওকে কি ক'রে কুলবধূ করে ঘরে ঢুকাই।

শি—আঃ ধর্ম জাত ও নিয়ে তোলপাড করছ কেন—মানুষ তো বটে।

শ্রী—হ্যাঁ তাই বললেই হল আর কি। তোমার মা যখন আমাকে আনেন তখন সাত পুরুষ লক্ষ্য করেছিলেন। বাবা যখন পাকা দেখতে এসেছিলেন তখন তোমার মা কি বলেছিলেন মনে আছে?—জানেন আমাদের কর্ত্তা বলতেন, বৌ করলে তার বংশ পরিচয় আগে ভাল করে জানবে। আর এখানে বংশ পরিচয় তো দূরের কথা জাতই নয় সে আমাদের। কাজেই ও বৌ বরণ করে ঘরে আমি নেব না। ও পারলে তুমিই নিও।

শি—তা তুমি না বরণ ডালা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলে আমি কি আর তসর কাপড় পরে তাকে বরণ করে ঘরে তুলব।

শ্রী—বেশত, আমি তো এত বললাম এবার তুমি কি বলছ বল না।

শি—হ্যাঁ কথাগুলো তো সবই সত্যি। এখানে ও তো ঠিক আদর্শ লক্ষ্য করতে পারল না। সেইজন্য দেখি ভেবে, কি করা যায়।

বাবা মায়ের কথার মধ্যে দীপা এসে পৌঁছে গেছে। মেয়ের বয়স এখন বছর ষোল হল। এ বছর স্কুল ফাইনাল দেবে। তারও নিজস্ব একটা মতামত আছে। বাপ বড বড় প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের অভিমতকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে।

দীপা—বাবা।

শি—কিরে?

দী—শুনছি নাকি বড়দা অসবর্ণ বিয়ে করেছে। এতদূর লেখাপড়া শিখে, তোমার শিক্ষা পেয়েও, সত্য আদর্শ ভুলে ঝপ্ করে এমন কাণ্ড করে বসল!

শি—না ও কথা বলছিস কেন, সে তো বিয়ে করেছে।

দী—হ্যাঁ বিয়ে করেছে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমাদের না জানিয়ে সে বিয়ে করল কেন ?

শি—তা এখন তো তোদের বৌদি।

দী—হ্যাঁ বৌদি না ছাই।

শিবশঙ্কর ছেলে মেয়ে স্ত্রী প্রত্যেকের মতামতটা জানতে পেরে মনে মনে স্থির করল—যাক কালকে অফিসের বিশ্রামের সময় একটা চিঠি লেখা যাবে। এই ভেবে উঠতে যাবে এমন সময় খোকা এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে মণ্টু ছিল। ও খেলা দেখতে গেছিল। দীপা আনন্দে লাফিয়ে উঠল—মেজদা, আজ তোমাদের খেলার কি হল ? মণ্টুই উত্তরটা দিল—জানিসরে দিদি, মেজদা না আজকে সুবিধা করতে পারে নি। খেলা খুব জমেছিল বটে তবে মেজদার খেলা খুব ভাল হয় নি।

বাবা মা পাশ থেকে কথাগুলো সব কান করল। আজ কয়েক বছর খোকা এই খেলার পুরস্কার পেয়ে আসছে। কিন্তু এ বছর কোথায় যেন কি একটা হয়ে যাওয়ার জন্য খোকা শুধু হাতেই ঘরে ফিরেছে।

সন্ধ্যার পর শিবশঙ্কর বাড়ী ফিরেছে। বেশ একটু ক্লান্ত। তবে মুখে একটা কঠিন ভাব। ঘরে ঢুকেই খোকাকে পড়ার ঘরে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অমরেশ, এটা পড়ে কাল পোষ্ট করে দিও।—গম্ভীর গলায় বলে সরে গেল।

অমরেশ গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিঠি পড়তে সুরু করল।

কল্যাণীয় মানিক,

তোমার পত্র পাইয়া আমি ও তোমার মা সমস্তই জানিলাম ও বুঝিলাম। যাক তুমি যে কথা লিখিয়াছ তাহার উত্তরে লিখি এখন এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমার মা-ও এই কথা বলিতেছে—যেদিন দরকার মনে করিব সেইদিন আমরা নিজেরাই যাইব। আর দুর্ভাগ্য সঙ্গেই যায়—অমরেশও এই বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। তবে নূতন উদ্যমে সে আগামী বৎসরের জন্য তৈরী হইতেছে। তুমি নূতন খরচের কথা ইঙ্গিত করিয়াছ। তাহাতে আমার মনে হয়, ইহার পর তোমার না টাকা পাঠানোটাই ভাল। আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

তোমার বাবা।

খোকা গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিঠিখানা পড়ে তার বাবাকে যতখানি চিনবার ভাল করে চিনে নিল। শুধু কি তাই সে ঐ সঙ্গে ভাবল—না এই বাপেরই ছেলে আমাকে হতে হবে।

দিন কয়েক কাটে। খোকাকে এখন খুব বেশী কলেজ ও বাড়ী করতে হয়। সে ইউনিয়নের একজন। সামনে কলেজ সোসাল। আজ যেতে দেরি দেখে শ্যামল, যতীন, বীরেন ইত্যাদি পাঁচ বন্ধু বাড়ী এসে হাজির। শ্যামলের ডাকে অমরেশ বেরিয়ে এল। দু'তিন জন একসঙ্গে বলে উঠল—কিরে তুই আজ এখনও যাস নি যে। আর মাত্র হাতে একদিন।

অ:—আরে ভাই ডাক্তারখানায় দেরি হয়ে গেল। মায়ের একটু জর জর চলছে আজ কদিন। তা চল চল বেরই। মণ্টু কপাটটা লাগিয়ে দে—বলে বেরিয়ে গেল অমরেশ।

বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল সে। বন্ধুরা দাঁড়াল একটু। দীপাকে ডেকে বার বার করে বলে গেল—এই দীপা মাকে এই ওষুধটা খাওয়াবি বিকালে। সন্ধ্যার পর আমি চলে এলে বাবার সঙ্গে সব কথা হবে এখন। আর মা নিশ্চিন্ত থেকো, তুমি ঘুমিও। আমার ফিরতে কি রকম কি দেরি হবে বলে যেতে পারছি না।

মা সুস্থ হয়ে উঠেছে প্রায়। বালিসে ঠেস দিয়ে বসেছিল। মৃদু হেসে বলল—হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

খোকা বেরিয়ে যেতে যেতে মণ্টুকে স্নেহের সুরে বলে গেল—ভাই দুষ্টুমী করো না। পড়তে বসবে। আর মায়ের কথা শুনবে।

বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে। সব কথাই কানে গেল। শ্যামল বলল—এ যে অমরেশ। এর কর্তব্য নিষ্ঠাই স্বতন্ত্র।

অমরেশ এসে যোগ দিল দলে—কিরে কালকের মধ্যে সব গুছিয়ে নিতে পারব ত?

সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি কাজ সেরে অমরেশ বাড়ী ফিরল। শিবশঙ্কর অফিস ফেরত জলখাবার খেয়ে অসুস্থ স্ত্রীর কাছে একখানা কেদারা নিয়ে বসেছিলেন। দীপা, মণ্টু অনেক আগেই পড়তে বসেছে। খোকা তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠতেই মা ডাকল—দীপা, মেজদাকে খেতে দাও।

দীপার সঙ্গে মণ্টুও উঠে এল। খোকা মায়ের কাছে গিয়ে বসল। মায়ের

কুশল জেনে, ওষুধের দিকে লক্ষ্য রেখে কথা সুরু করল বাবার সঙ্গে।—জান বাবা, ডাক্তারের ওখানে আজ খুব হয়রানি হতে হয়েছে।

শি—হয়রানি কি রকম?

খোকা—এই আজকালকারের ডাক্তাররা পাশই করেছে। কিন্তু জ্ঞানের যে কতটুকু গভীরতা তা কে জানে। শুধু নিত্য নূতন ওষুধ বেরচ্ছে—টাকার দিকেই লক্ষ্য—সেরকম মেহনৎ কোথায়! রোগী দেখে না ছাই। মায়ের কথা বলছি কথাগুলো যেন ভাল করে কানই করছে না।

শি—সেকি ডাঃ সেন যে বরাবরই আমাদের ঘরের চিকিৎসা করে থাকেন, এত পরিচিত হয়েও!

খো—শুধু কি তাই বাবা—নেতাঁরাই ঐরকম। অনেকের বাড়ীতে তিনি হয়ত চিকিৎসা করেন কিন্তু সব জায়গার বোধ হয় একই ভাব। তারই নজির আমার চোখের উপর একটা পড়ে গেল।

শি—কি রকম?

খো—ভদ্রলোকের স্ত্রীর পেটে কি হয়েছে ভাল হওয়ার দিকে ডাক্তার বাবুর লক্ষ্য যত না শুধু টাকার অঙ্কের দিকে উনি এগিয়ে চলেছেন।

শি—না এমনও তো হতে পারে যে টাকা প্রয়োজন।

খো—না বাবা তা নয় মানলাম কিন্তু এই জিনিসটাই কি হওয়া উচিত নয়—যে যে কাজে আসবে তার কাজের দিকেই লক্ষ্য রাখা দরকার। কাজ ঠিক হলে টাকা আপসে আসবে তা না করে এরা কাজের দিকে নজর কম রেখে টাকা টাকাই করে। তারপর আর একটা কি জান শুধু মুখ চাওয়া চাওয়ি কাজ। গরীবের চিকিৎসা যেমন তেমন, বড়লোকদের দিকেই শুধু লক্ষ্য। ডাক্তার মানেই তো প্রাণদাতা। ডাক্তারবাবু এসেছে—এই ভেবে কি বলই না পায়। আর ডাক্তার সেখানে কিভাবে কি করে।

শি—ঐ হয়, ন্যায্য খরচের দিকে কারও লক্ষ্য নেই, বেশী উপায় করে আর ইচ্ছামত খরচ করতে চায়। আর এর ফলে কতকগুলো গরীব মরে যায়।

প্রসঙ্গ বড় গুরুগম্ভীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কার আর সহ্য হয়। শ্রোতা তিন জনই এক পদের। মা চাপা দিল এদের কথায়—তারপর খোকা তোদের ফাংসন কতদূর কি হল?

খো—হ্যাঁ সবই ঠিক। বাবা তাহলে কালকে দীপা মন্টুকে নিয়ে যাচ্ছি আর তুমিও যাবে তো আমাদের জলসায়।

শি—আমি? আমি আর কেন?

খো—কেন অভিভাবকরাও তো যাবেন, কার্ড পেয়েছেন। তুমি বরং দেখিতে দীপাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

শি—না না বাবা, আমার উপর ও দায়িত্ব কেন। ও তুমিই ঠিক গুছিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমি কখন কাজ থেকে ফিরব, কি না-ফিরব তার উপর আমার যাওয়া নির্ভর করছে। তা এরা যাবে সনৎ শিবানীকেও বললে না কেন? সকলকে বলবে তারপর এরা এদের গুছিয়ে যাবে। তুমি শুধু ওখানে ওদের লক্ষ্য রাখবে।

শ্রী—হ্যাঁ হ্যাঁ সুচরিতাও বলছিল বটে—হ্যাঁ দিদি খোকাদের কলেজে নাকি জলসা হবে সনৎ বলছিল।

আজ কিন্তু এসব কথার মধ্যে অমরেশের মনে কোথাও কিছু ছুঁল না। ভগ্নী স্নেহে মনটা নেচে উঠল।

অমরেশ আজ দুপুরেই খাওয়া সেরে বেরিয়ে গেছে। তদারক করতে হবে। সন্ধ্যার মুখে গিয়ে পৌঁছল এরা ভাইবোন সকলে। মন্টু ও সনৎ অমরেশকে খুঁজে বার করল। অমরেশ ওদের কাছে এগিয়ে এসে বসার জায়গা করে দিল। তোরা বোস। আমার এখন দাঁড়াবার উপায় নেই। আর্টিষ্টরা এখনও সকলে এসে পৌঁছায় নি।

দীপা প্রশ্ন করল—মেজদা, তাহলে কে কে আসছে?

শিবানীর আড়ষ্ট ভাব কাটে নি। অমরেশ উত্তর দিল নতুন আর কি বলব ঐ যাদের নাম করেছি তারা এক রকম সকলেই। শিবানী আধা লজ্জা ভাবে চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। অমরেশ পরিষ্কার গলায় বলল—শিবানী, বোধ হয় সকলের নাম শুনিস নি। শিবানীর বুকের ভিতর চলছে ভাঙা কাঁসার বাদ্য। খুব কষ্ট করে উত্তর দিল—না—হু'।

শিবশঙ্কর বাবু ওদের দেখতে পেয়ে কাছে এসে নীরবে একটু দাঁড়িয়েছিল, প্রত্যক্ষদর্শী হল। সকলে দেখতে পেতে সহজ গলায় বলল—কি তোমাদের আর দেরি কত?

খোকা—এই যে বাবা, হয়ে এল বলে।

ওদিকে বহু মহলে অমরেশের ডাক পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাবাকে এদের মাঝে একটা বসার জায়গা করে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

রাত দশটা নাগাদ জলসা ভাঙল। এর মধ্যে এদের কাছে অমরেশ একবারও আসতে পারে নি। ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সব ফেলে একরকম ছুটে বাবার কাছে এল—বাবা, আপনি এদের নিয়ে এগিয়ে যান, আমি এদিকটা একটু গুছিয়ে তারপর বেরচ্ছি।

শিব—হ্যাঁ সেটাই বাঞ্ছনীয়। তবে তুমি কিন্তু দেরি করো না।

পথে শিবশঙ্কর এদের সঙ্গে হাল্কা কথায় সময় কাটিয়ে চলেছে। শিবানী কিন্তু খুব সহজ নয়—এটাও তার লক্ষ্যে পড়ল। কিন্তু স্বভাব চোখেই দেখল। এই বয়েসটাই এই রকম হয়। সামলানোটাই বাহাদুরী। এ সময় সহানুভূতি না দেখিয়ে যদি কটাক্ষ করা হয় তাহলে মনের উপর প্রতিক্রিয়া হয়—ছেলে মেয়ে বিগড়ে যায়। মনে মনে এক ফাঁকে এই চিন্তাও তাকে ছুঁয়ে গেল—আমি মানিক ও অমরেশ উভয়ের বাবা। মানিক কি করে বসল আর খোকা কি করে চলেছে। আজ কাল আদর্শ বাপ মাই চোখে পড়ে কৈ। আদর্শের গোড়াতেই যদি প্রেম ভালবাসা চলে আসে তাহলে আর আদর্শ দাঁড়াবে কি করে। এই রকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ী পৌঁছল। খানিক পরে খোকাও এসে ঘর ঢুকল।

খেতে বসেছে, মা জিজ্ঞেস করল—কিরে কেমন জলসা দেখলি তোরা?

দী—জান মা খুব ভাল হয়েছে।

মণ্টু—হ্যাঁ মেজদা, যে আর্টিষ্টটি তোমার সঙ্গে খুব কথা বলছিল তার গলা কিন্তু খুব সুন্দর। সে তোমাকে কি রকম করে চিনল?

খো—আগের বারই আলাপ হয়েছিল। এই রকম হাল্কা কথায় আনন্দে সেদিন সকলের কেটে যায়।

সুখে শান্তিতে এই ছোট সংসারের দিন কাটে। দুঃখ বেদনা বড় একটা আমল পায় না। কদর্য কাণ্ডের বালাই নেই এই পরিবারে। বাবা মা—বিশেষ করে গৃহকর্তা শক্ত সহজ হাতে হাল ধরে আছে। তবে মানিকের কোন খবর আর আসে নি। টাকাও পাঠায় না। শিবশঙ্করেরও কোন উচ্চবাচ্য নেই। অমরেশের লক্ষ্যে সবই পড়ে। তবে এখন সে টেষ্ট পরীক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এবারও আর পিছিয়ে পড়লে চলবে না। বরাবরই প্রায় ক্লাসের সঙ্গে লেখাপড়া করে চলে বলে ওকে পরীক্ষার সময় কোনদিনই রাত জাগতে হয় না। তবে এবার পরীক্ষায় সব মিলিয়ে চাপ বেশ একটু

বেশীই পড়েছে? ছুটির আগেই আবার ভাইবোনদের হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা। সনৎ শিবানীও পড়তে আসে যথারীতি।

দেখতে দেখতে টেষ্ট পরীক্ষা চলে এল। দারুণ পড়ার চাপ লক্ষ্য করে বাবা একদিন বলল—খোকা, এতদিন একভাবে পড়াচ্ছ। তোমার সামনে পরীক্ষা, কদিন না হয় নাই বা পড়ালে ওদের।

শিবশঙ্কর ছেলের সময় লক্ষ্য করে কথা কটি বলল। কিন্তু খোকার উত্তর তার মনে আদর্শের ঝিলিক দিল।

খোকা—তা কি কখনও হয়! লেগে না থাকলে! আমার পরেই তো ওদের পরীক্ষা। ছেড়ে দিলে তো একেবারেই ছাড়া হয়ে যাবে। রুটিন মত পড়া দিয়ে আমি আমার পড়ব। ওতে তেমন সময় লাগবে না।

দিন দুই পরীক্ষা ভাল হল। আজ তৃতীয় দিন প্রশ্নপত্র পেয়ে এক রকম সকলেই বেকায়দায় পড়ে। অনার্সের পড়া পড়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না কেউ। তার উপর সবই যদি বাইরে থেকে আসে। যাই হোক খোকা নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মোটামুটি লিখল। আশে পাশে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ফেল করছিল। খোকা খাতা খুলে ধরল। অল্প পরিচিত এক তরুণ অধ্যাপক সবে কলেজে এসেছে। অমরেশের কথা মাঝে মাঝে অধ্যাপক মহলে হয়, শুনেছে। এগিয়ে এসে মিষ্টি করে আক্রমণ করল—অমরেশ, এ তোমার কেমন বিবেক, নীতিজ্ঞান?

অমরেশ দাঁড়িয়ে উঠে সহজ গলায় উত্তর দিল—স্যার, না খেয়ে যে মরতে বসেছে তার দিকে লক্ষ্য নিন। যদি পরিশ্রম করে আয় করার উপায় সে না খুঁজে পায় তখন পেটের জ্বালায় যদি সে চুরি করে তবে কি তার অপরাধ ধরবেন?

অধ্যাপক মহাশয় ঠিক তৈরী ছিল না। তার অর্থনীতির ছাত্রের মুখে দর্শনের কথা শুনে একটু চমকে গুটিয়ে গেল। লক্ষ্য নিল সেদিন থেকে। আর অমরেশও কিন্তু একটু দমে গেল। এটা সত্য হলেও আইনে বাধে। এ আমি ভুল করলাম।

বাড়ী ফিরে সন্ধ্যায় বাবার কাছেও গল্পটি করে। বাবাও ঠিক ঐ কথাই বলল। ক্ষুধারও যে রকমফের আছে। সব ক্ষুধার্তকে কি একরকম খাদ্য দিতে হয়! যাক সবল মন আরও বাঁধ পেল।

সেদিন আর সেই অধ্যাপকের দেখা পায়নি। পরীক্ষা মোটামুটি ভালই করেছে। তবে পরের দিন আবারও সেই প্রঃ রায় গার্ড পড়েছে। মাথা না? করে অমরেশ পরীক্ষা দিচ্ছে। সে সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখেছে অমরেশের দিকে। ছেলেটি নম্র মেধাবী। ভাবভঙ্গীর মধ্যে কোন রূঢ়তা নেই।

পরীক্ষার সময় ফুরোতে সময় লাগে না। একে একে সকলের সঙ্গে খাতা জমা দিয়ে অমরেশ বেরিয়ে যাবে এমন সময় সে ডাকল—অমরেশ শোন।

হঠাৎ অমরেশের মাথায় বাজ পড়ল—এই রে, এ নিশ্চয় সেদিনের জের টেনে স্যার কথা বলবেন। সব জায়গায় সব কথা চলে না। সকলে চলে যেতে প্রঃ রায় সুরু করল—অমরেশ সেদিন যে কাজটা করলে সেটা কি যুক্তিসঙ্গত মনে কর?

অমরেশ উত্তর দিল—স্যার আমার ভুলই হয়েছিল।

প্রঃ রায়—ভুল কেন?

অ—না। হয়েছে কি জানেন, সর্বক্ষেত্রে সব জিনিস চলে না। আমি কথাটা যা বলেছি তা হয়ত সত্য কিন্তু ক্ষেত্রটা ঠিক ছিল না।

প্রঃ—হ্যা সকলে মিলে—'ছিঃ ছিঃ ও কিরকম!

অ—না স্যার ঐ যে ছেলেটি বড় গরীব পাছে পরীক্ষা খারাপ হলে অধ্যক্ষ মহাশয় আটকে দেন ফাইনালে বসতে না দেন তাই স্যার। ওর বাড়ীর অবস্থা এত খারাপ যে আটকালে পড়া তো দূরের কথা আর পেট চলবে না। তাই ওকে একটু দেখাতে চেয়েছিলাম আর পাঁচজন সুযোগ নিয়েছিল।

প্রঃ—তা না হয় হল, কিন্তু কথাটা কি বল দেখি। তুমি গরীব দেখে অভাবি বুঝে কাজটা করতে গেছ এক দিক থেকে ঠিকই। আর পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনটা কেন? যে যাতে যোগ্য তাকে সেই আসন দাও। পরীক্ষা শ্রেণীভাগ করে দেবে। এই নয় কি?

অ—আজ্ঞে, সে কথা তো ঠিকই।

অমরেশ বিদায় নিলে প্রঃ রায় কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল—ছেলেটি বেশ।

অনার্স পেপার সব হয়ে গেছে। এবার পাস পেপারগুলো বাকী। সেদিন প্রঃ রায়কে যা যা বলেছিল সব অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করলে জীবনটাই একরকম দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু শুধু হৃদয় নিয়ে চলে না, শুধু মস্তিষ্কের দাবী

মেটানোও ভাল নয়। উভয়ের সমন্বয় দরকার।' তাই মাঝে মাঝে একটু সাহায্য করা প্রয়োজন বৈকি। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় নিজে অমরেশ কোনদিনই এতটুকু সাহায্য নেওয়ার পক্ষপাতি ছিল না। ছিল না বলে তার মনে অহংকারও ছিল না। এই কথাই মনে হত—সকলেতো আর সমান নয়।' খেটেছে পড়েছে হঠাৎ হয়ত কোথাও একটু আটকে গেছে। তেমন বুঝলে অমরেশ জানলে তাকে ধরিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করে না। তবে আগের চেয়ে অমরেশ খুব সতর্ক; প্রঃ রায় মনে মনে ভাবছে—কৈ, অমরেশকে আর তো চোখে পড়ছে না। বোধ হয় আমার কথাতে ছেলেটি সাবধান হয়ে গেল। কারণ, আদর্শবাদী ছেলে তো। আর এদিকে হুরব আছে। সে খাতাখুলে দেখাবার ছেলে মোটেই নয়। আমারই সেদিন দেখার বা বোঝার ভুল ছিল তাই অমরেশ ওদিন সম্মুখীন হয়ে ওভাবে উত্তর দেবার সাহস রেখেছিল। কথাটা ঠিকইতো খেটে পড়েছে সামান্য একটু বাধটুর জন্য যদি দাঁড়িয়ে ফেল করে যায় কেউ, তাহলে অবশ্য মনে লাগবারই কথা। সে কি আর সবাই সহ্য করতে পারে!

পরীক্ষার ফল বেরল। অমরেশ মাথায় মাথায় হলেও ফার্ষ্টক্লাস নম্বর রেখেছে। শিবশঙ্কর অমরেশের ফল জেনে গভীর আনন্দ পেল। কিন্তু ব্যক্ত করল না।

মা বলল—হুঁ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই, আমার তো এই রকমই কপাল কি না।

দীপা চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—মা, তুমি কি বলছ, মেজদা ফার্ষ্টক্লাস-নম্বর রেখেছে তবু তুমি এইরকম বলবে!

মণ্টুও পিছিয়ে পড়ার ছেলে নয়। আনন্দে অংশ নেবে। সে বলল—জানিস দিদি, মা ঐ রকমই। আমার সেবার পরীক্ষায় কি সুন্দর সব নম্বর ছিল বাবা কত কথা বলল। কিন্তু মা না পাত্তাই দিল না।

খোকা সব কথা চেপে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল—আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আঁচিয়ে বিশ্বাস করো।

দীপা মণ্টু একটু অবাক হয়ে চাইল। মেজদা কি কড়া কিন্তু মায়ের কাছে মেজদা কত সহজ। রোজকার পড়া রোজের রোজ না পেলে কি আর ছুটে যায়। শিবানীরও রেহাই নেই। কয়েক কথা ভাইবোনের মধ্যে ফিস ফিস করে

হচ্ছে এমন সময় মন্টু বলেই ফেলল—মাও তো ভয় পায়। মা বলে না—তোর মেজদা বকবে।—কথাটা না শোনার ভান করেই অমরেশ সরে গেল।

অমরেশ বলল—আমার কিন্তু মা কালকে ফিস্ রাখিলের দিন। বাবাকে কিন্তু বলো।

মা—আমি ওসব বলতে টলতে পারব না।

অমরেশ—না না, আমি অনেক আগে বলে রেখেছি, বাবাও জানে তবু তুমি একবার মনে করিয়ে দিও।

শিবশঙ্কর বাবু ঘরে ঢুকছে কথাটা শুনতে পেল—মনে আর করিয়ে দিতে হবে না। আমার স্মরণ ঠিকই আছে। অনেক কষ্টে তোমার কি জমা দেওয়ার টাকা আগেই আমি গুছিয়ে রেখেছি। পাছে সুরসুমে আমি দিতে না পারি। ওসব জিনিস না হলেই নয়। এক বেলা বরং না খেলে চলবে।

কথাটা অমরেশের মনকে কাঁপিয়ে তুলল—উঃ এই রকম করে তো দাদাকেও পড়িয়েছিল।

শিঃ—টাকা আমি তোমার মায়ের কাছে রেখে দেব এখন। সময়ে নিয়ে নিবে।

আজকে অমরেশ কলেজে যাবে। কিন্তু এখনও রান্না হয়নি। বাবা কোন মতে নাকেমুখে দুটো গুঁজে চলে গেছে। তারপরও সময় পেলে রান্না হয়ে উঠল না। মা তার চিরকালই কর্মী। ইদানীং নানা রকম কারণে—রোগ থাকা বয়সের ভারে মা আর সব সময় সেই রকম লক্ষ্য নিতে পারে না। তাই মাঝে মধ্যে গলায় পায় লেগে যায়। রান্না ঘরে ঢুকে খোকা জিজ্ঞেস করল—মা রান্না হয়েছে?

মা—না এই সেদ্ধ দিয়ে তুই খেয়ে নে না।

অ—কেন বাবা তখন খেয়ে গেল তখনও যে সিদ্ধ এখনও সেই সিদ্ধ—কি ব্যাপার? মাছ দেখছি এখানে কাঁচাই পড়ে আছে।

মা—না, এতো হয়ে যাবে। তুই তো আজকে কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবি।

অ—হঃ ফিরি না ফিরি সে তো পরের কথা:—বলেই বাঁপার দিকে লক্ষ্য

করল। দালানের রকে দাঁড়িয়ে কি যেন বুনছে। ঝাঁকার দিয়ে উঠল—"কিরে কি ব্যাপার?

চমকে উঠল দীপা মেজদার মুখ চোখ রাগে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। দীপা একটু বেশ ভয় পেয়ে উত্তর দিল—মা তো কৈ আমায় ডাকেনি।

অ—মা তোকে ডাকবে! বুড়ো ধাড়ি মেয়ে লজ্জা করে নি। বাবা এক রকম না খেয়ে চলে গেল। আমিও এই রকম খেয়ে কলেজ যাব! যত সব বাজে কাজ নিয়ে দাড়িয়ে আছে।

দীপা—এতো আমার ইস্কুলের সেলাই।

—নে নে ওসব রাখ। অন্য সময় তো করতে পারতিস। আজকে তো তোর স্কুল নেই। মাকে একটু সাহায্য করার পর করতে পারতিস না।

মা অমনি বলে উঠল—না রে না ও আমি গুছিয়ে নেব। ওর পড়ার চাপে সেলাই করবার সময় হয় না। সেইজন্য ছুটিছাটা থাকলেই ও একটু সেলাই নিয়ে থাকে।

অ—থাক, তুমি কি খোট খোট মনবে নাকি। পড়ার চাপে সেলাই হয়নি, বলেই ছুটির দিন বাড়ি সেলাই নিয়ে বসে গেলেন। মেয়েছেলে হয়ে দুএকটা গৃহকর্মে মাকে সাহায্য করবে না সে কি রকম কথা।

শেষ ঝাল পড়ল গিয়ে মায়ের উপর "এ যত সব তোমারই আসকড়া।" বলে সবাকে ছিটিয়ে দিয়ে অমরেশ হুড়মুড় করে গর গর করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল। মা পিছন থেকে ডেকে উঠল ও খোকা খেয়ে গেলি নি যে, খেয়ে যা। মণ্টু বারান্দায় ছিল বলল, হ্যাঁ এই খেয়ে যাচ্ছে। দাদা এখন লম্বা পা ফেলে বহুদূর চলে গেল।

মা—টাকাটা কি নিয়ে গেল?

দীপা সঙ্গে সঙ্গে ভারি গলায় উত্তর দিল—হ্যাঁ। সকালবেলায় বাবার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে।

লম্বা লাইন পড়েছে। আজ কলেজে ফি জমা দেওয়ার দিন। এখনও নেওয়া সুরু হয় নি। দেখতে দেখতে অনেক সময় পার হল। কি ব্যাপার এখনও কেরাণী এসে পৌঁছয়নি। যাই হোক, রহিম শেখ এগিয়ে এল। অল্প অভিজ্ঞ হলেও কাজ সুরু করল। কাউন্টারের কাছে প্রায় এগিয়ে গেছে এমন সময় অমরেশের পিছনে একটা ছেলে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। অমরেশ

ঝুপ্ করে লাইন থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে কোল-পাঁজা করে একটা বেঞ্চের উপর শুয়াল। চারদিকে একটা চাপা হৈ চৈ উঠল বটে কিন্তু যে যার কাজে ব্যস্ত। বড়একটা কেউ তেমন ভাবে এগিয়ে গেল না। হঠাৎ এইদিকে প্রঃ স্যার আসছিল অমরেশকে দেখতে পেয়ে বলল—'কি ব্যাপার অমরেশ ?

—এই দেখুন না স্যার, পেট খেতে পায় না পড়ার চাপ। তার আবার ঘটি বাটি বেচে ঋণ করে ফিস্ দাখিল করতে এসেছে। এ আমাদের পাস কোর্সের একটি বন্ধু।

অমরেশের এ কথায় কি আর উত্তর দেবে। আরও কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক একটু ভীড় করল। জল পাথার ব্যবস্থা করেই সকলে খালাস। অমরেশ গোপনে একটু খাবার আনিয়ে খাইয়ে ওকে সুস্থ করে আবার এসে লাইনে দাঁড়াল। জন কয়েক বন্ধু হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠল—সামনে আয়। ছেলেরা সকলেই অমরেশকে চেনে। এখন কোথায় সে কি করছিল তাও সকলের বিলক্ষণ জানা। তবু কেউ কেউ ওকে আগে ছাড়তে নারাজ বা উদাসীন—সকলে একমত নয়। প্রঃ স্যার এবার চোখে পড়তে আর সহ্য করতে পারল না। অমরেশকে কাছে ডেকে গম্ভীর গলায় কাউন্টারে আদেশ করল—রহিম এর ফিস্ জমা নিয়ে নাও। ছেলেরা যে যার মুখ চাওয়া চায়ি করল। কি আর বলবে। এ কাজটা তাদেরই করা উচিত ছিল।

এদিকে মা বোন অপেক্ষা করে বসে আছে। বেলা গড়িয়ে গেল। অমরেশের পাত্তা নেই। দীপা সে যেন নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে রয়েছে। মেজদা তার অভুক্ত। খেয়ে গেলে হয়ত অপরাধ এতখানি ছুঁতো না। ওদিকে ফিস্ জমা দেওয়ার পর সে ইউনিয়নের কিছু কাজ সেরে নিতে চাইল। সামনে ফাইনাল – এগিয়ে এল বলে। তাই আবার কখন সময় হয় এই ভেবে সে কাজ গুছিয়ে বাড়ীর দিকে হন্ হন্ করে আসছে, সারা দিন পেটে দানাপানি পড়ে নি। সামনেই দেখে দীপা দাঁড়িয়ে। ওর মুখের দিকে চেয়ে খুব সহজ ভাবে বলল—কিরে তোর মুখ এত শুকনো কেন ?

দীপা কোন উত্তর দিল না। পাশ কাটিয়ে ঘর ঢুকতে যাচ্ছে বলল—যা যা মাকে বল ভাত দিতে। জানিস এখন পর্যন্ত কিছু খাই নি। তাড়াতাড়ি গামছা টেনে বাথরুমে গেল।

এদিকে ভাত বাড়া হয়েছে। খোকা মাথা মুছতে মুছতে দালানে উঠে

বলল জান মা—আজকে কলেজে একটা ছেলে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। গরীবের ঘর পেটে খেতে পায় না তা পড়ার চাপ কি করে সইবে। যা আমাদের দেশের অবস্থা হয়েছে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল অমরেশ। রান্না ঘরে তিন থালা ভাত বাড়া রয়েছে। "কি ব্যাপার মা, তোমরা কেউ খাও নি।" মরমে মরে গেল অমরেশ—ছিঃ ছিঃ এত বেলা হয়ে গেল। তোমার অসুস্থ শরীর, দীপাও এখনও খায় নি।"

মা—তা কি করে খায় বল। তুই রান্না ভাত ফেলে দিয়ে চলে গেলি।

—তা না হয় গেছি। আমার দুঃখ হল কেন জান—বাবা মাছটা আনল, খেয়ে যেতে পারল না। কেন দীপাই কি এ কথা বোঝে না। ওর তো বোঝা উচিত। নে-নে নে বোস। বলেই খেতে আরম্ভ করে দিল।

দেখতে দেখতে ভাই-বোনদের হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা এগিয়ে এল। প্রাকশ লক্ষ্য নেওয়ার জন্য এক রকম সকলেরই পরীক্ষা রোজ ভাল হচ্ছে। কিন্তু শিবানীর বিষয়ে অমরেশের একটু সন্দেহ আছে। প্রশ্ন করলেই বলে—মোটামুটি। কিন্তু কতদূর কি যে করছে সে একমাত্র ভগবানই জানে। মণ্টু খেলার ছেলে। অমরেশ সামলে চলে বলেই রক্ষে। নইলে নিশ্চয় সব খাতায় বল আঁকা হয়ে যেত। সনৎ মেধাবী তায় আবার ভাল কোচ পাচ্ছে। দীপা একরকম দিচ্ছে। ইদানীং সিনেমার ছবির দিকে লক্ষ্য পড়ায় দারুণ লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়। পাড়ার পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে রোজ বিকেলে গল্প করা একটা বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। খোকা এটা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। মেয়েদের বিকেল হলেই সেজে গুজে পাড়ায় বেরনো—এটার মধ্যে কোন বুনেদী ভাব নেই এ নেহাতই উটকো ভাবের পরিচয় দেয়। 'এরিস্টোক্রেট ফ্যামিলিতে চলে।

আর মাত্র কয়েকটা পরীক্ষা বাকী। এমন একদিন সন্ধ্যার মুখে মানিক হঠাৎ বাড়ী এসে হাজির। প্রথমেই মণ্টুই দেখতে পায়। মোড়ে খেলছিল। ঘরে ছুটে সে খবর দিল—ওমা, মা, বড়দা এসেছে, বড়দা।

মা দুঃখে আনন্দে চমকে উঠল—কি জানি কি দেখব। কিন্তু যা ভেবেছিল তা নয়। মানিক একাই। কথাটা কানে যেতেই দীপা খোকা দু'পাশ থেকে দুজনে বেরিয়ে এসেছে। সামনে এসে সুটকেশ নামিয়ে ছেলে মাকে প্রণাম করল—তারপর মা খবর সব ভাল?

মা মুখের দিকে না চেয়ে উত্তর দিল—হ্যাঁ আমাদের সব খবর তো একরকম। তোর খবর কি বল দেখিনি?

কথাটা শুনেই মানিক একটু থমকে দাঁড়াল। দীপা মণ্টু এসে প্রণাম করল বড়দাকে। অমরেশের মনে একটা ছোট ঝড় উঠেছে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এসে একটা প্রণাম সেও করল।

মানিক আবার সহজ হবার সুযোগ পেল—কিরে তোর টেষ্ট পরীক্ষা কেমন হল?

অম—হয়েছে, একরকম মন্দ নয়।

—না দাদা, মেজদা ফাষ্ট ক্লাস নম্বর রেখেছে। পাস থেকে মণ্টু বলে উঠল।

শুনামাত্রই স্বর টেনে মানিক সুরু করল—আচ্ছা তবে গত বছর ওরকম কেন হয়ে গেল বল দেখিনি?

অ—হয়ে গেল সেটা আমারই জন্য, আমারই দোষে।

কথাটার চড়া স্বর শুনে আবারও মানিক একট থমকে গেল। কিন্তু কি করবে—বুঝেও বুঝল না পুনরায় প্রশ্ন করল—খুব বেশী বোধহয় ইউনিয়ন নিয়ে মেতেছিলি—তাই?

অ—দাদা, যদি কেউ বিশেষ কাজে গুরুত্ব দেয়, বোঝে এবং যদি তাকে আয়ত্ব না করতে হয় তাহলে আশ পাশের সব কাজই হাল্কা হয়ে যায়। যা আয়ত্ব করা চলে না বা যায় না বা একরকম অসম্ভব, তাকে আয়ত্ব করতে চাইলে সময়ও যথেষ্ট দিতে হয়, পরিশ্রমও প্রচুর হয় এবং পাঁচটা কাজ তাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। তোমাদের খোকা মহারাজ তাই করতে গেছিলেন। সেই খোকা তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে বলেই আজকে ফার্ষ্ট ক্লাস নম্বর রাখিতে পেরেছে। সকলেরই ভুল একদিন ধরা পড়ে তবে যদি সে বুঝতে চায় ও চেষ্টা করে।

মানিক স্তম্ভিত হয়ে শুনছে, দীপা মণ্টু পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতদিন পর ছেলে ঘরে এসেছে বা দাদা এসেছে, কিন্তু সেরকম আহ্বান কারো নেই।

মাঝে মাঝে সেই ঝড় মানিকের বুকে বয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর মা শুধু বলে উঠল নে রে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাবি আয়।

—হ্যাঁ যাও দাদা, আগে জলযোগ করে এস তারপর অনেক কথা হবে এখন।

অমরেশ সরে গেল। দীপা অন্য জায়গায় ব্যস্ত হল। মা-ও হাতে এগিয়ে এল। দাদার পিছনে পিছনে মন্টু এগিয়ে গেল। দাদা তুমি না অনেক দিন আগে আমাকে একটা পেন দেবে—তা দেবে না?

ছেলে মানুষ ভাইটার মধ্যে আন্তরিকতা পেয়ে মানিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। কেউ গ্রহণ করতে পারছে না তাকে। বসতে বসতে বলল—দেব বৈকি, আমি তোর জন্য পেন কিনেই এনেছি। দাঁড়া, আচ্ছা না হলে তুই চাবিটা নে, সুটকেশ খুলে নিয়ে আয়।

দীপা কথাটা শুনে একটু কেমন করে সরে গেল।

মা বলে উঠল—না, ও আবার নিয়ে আনবে কেন? ও তুই নিজে উঠে দিবি এখন।

মানিকের বুক আবার নেমে গেল। তার মা তো এমন কথা কোনদিন বলে নি। এই কদিনে সবই যেন পাল্টে গেছে। ভাঙা মনে খাওয়া সুরু করল। এমন সময় বাবা এসে ঘরে ঢুকল। দীপা দেখতে পেয়ে বলে উঠল—বাবা, দাদা এসেছে।

শিবশঙ্কর বাবু বুঝেও না বোঝার ভান করল—কে দাদা?

বড়দা। —দীপা।

ও তাই নাকি। কখন এল? বলেই তিনি দালানে উঠে গেল। মানিক কথাগুলোয় কান রেখেছিল। কেন জানি চেষ্টা করেও মাথা তুলে চাইতে পারল না। এ তার বাবা। কত আঘাত সহ্য করে জীবনে আজ প্রতিষ্ঠিত। সংগ্রাম করেছে বটে কিন্তু কখনও নীতিভ্রষ্ট হয় নি।

সকলে চুপ চাপ। শিবশঙ্কর জামা কাপড় বদলাচ্ছে। এদিকে খাওয়া সেরে মানিক যেয়ে বাবাকে প্রণাম করল। বাবা ভাঙা গম্ভীর গলায় উত্তর দিল—থাক থাক।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কোন কথাই হল না। মানিক বলল—বাবা আপনার স্বাস্থ্যটা যেন খুব খারাপ হয়ে গেছে।

ছোট উত্তরে সংক্ষেপে সারল শিবশঙ্কর—কৈ ও কিছু নয়।

মানিক পা পা করে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল। নিজের সুটকেশ খুলে মন্টুকে ডেকে বলল—এই নে ভাই তোর পেন।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে মন্টু বলল—বড়দা, দিদির জন্য কিছু আন নি?

মানিক—কেন ও তো কিছু বলে নি। বলেই মণিব্যাগটা হাতে নিয়ে মায়ের কাছে গেল। বলল—মা এতে সাড়ে তিনশ টাকা আছে, বাবাকে দিয়ে দেবে।

মা—ও সব টাকা আমি জানি না বাবা, তুই তোর বাপকে দিবি যা।

মানিক—না তুমিই দিযে দিবে রাখ না।

মা টাকাটা হাতে নিযে রান্না ঘরের সেল্‌ফের উপর রেখে দিল। মানিক একটু যেন আশ্বস্ত হল। মা যখন টাকাটা নিয়েছে তখন বাবা নিশ্চয গ্রহণ করবে।

আজকে রবিবার। নানা কাজের ভেজাল সকাল থেকেই লেগে আছে। খেতে খেতেও যে কত বেলা হবে কে জানে। সকলের জল খাবার খাওয়া হল। শিবশঙ্কর বাজার থেকে ঘুরে এসে হাত পা ধুযে দালানে উঠল। শ্রীমতি জল খাবারের ডিসটা হাতে ডাকল।—ও দীপা তোর বাবাকে ডেকে দেয়ে।

উত্তরে শিবশঙ্কর বলল—হ্যাঁ যাই।

খেতে বসেছে, দু'একটা হাল্কা গল্প শুরু করতে যাচ্ছিল—জান, কি সব বাজার হয়েছে আজকাল। সব আগুন দাম।

এর উত্তরে শ্রীমতি আর কি বলবে। নীরবে চুপা এগিযে শুধু টাকাটা ধরে দিল।

শি—কি ব্যাপার? টাকা!

শ্রী—হ্যাঁ মানিক দিল, এতে সাড়ে তিনশ টাকা আছে।

শি—কেন কেন মানিকের আবার টাকা দেবার কি প্রয়োজন পড়ে গেল। টাকা কথাটা বিস্মর উত্তেজনায একটু চিৎকার করেই বলেছিল। মন্টু দীপা অমরেশ সব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িযেছে। শিবশঙ্কর নিজের গলায লজ্জিত হয়ে সামলে গেল। সংযম-সমতাই তার জীবনের একটা মস্ত বড় গুণ। মানিকও পা পা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দালানে দাঁড়িয়েছে।

এবার ধীর গলায় বলল—ও নতুন সংসার পেতেছে, খরচ খরচা করবে। আমাদের যাই হোক দুঃখ কষ্টে দিন চলে যাবে। টাকার প্রযোজন নেই।

মানিক ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে উত্তর দিল—না বাবা সেটা তিন চার মাস হয়ে গেছে। আর হবে না। এবার প্রতি মাসেই আমি পাঠাতে পারব।

শিবশঙ্কর খাবারের দিকে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় উত্তর করল মানিক তোমার টাকার আমি প্রয়োজন মনে করি না। এই এক কথাই তোমায় আমি

বললাম। তুমি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে আদর্শের এপিঠ ওপিঠ—অনেক কাটান শিখে রেখেছ। অনেক যুক্তিই তোমার মুখে শোনা যাবে।

মানিক প্রতি উত্তরে বলল—কেন আমি কি আদর্শের কাটান দিলাম ?

শি—বিলক্ষণ এড়িয়ে গেছ। কাটান বৈ কি। সর্ব্বদিক বিচার করে তুমি দেখেছিলে ?

মানিক—আমার তো মনে হয় আমি সব দিক বিচার করে বুঝে দেখেছি।

অমরেশ ঘরের মধ্যে খুট খাট এটা ওটা করছিল। হাতের কাজ যেমন তেমন, কান তার এই দিকেই ছিল। সোজা দাদার দিকে ঘুরে দাঁড়াল—দাদা এ তুমি কি বলছ ?

মানিক—কি খারাপটা করেছি ?

অ—হ্যাঁ খারাপ একে বলতেই হবে। এটা আদর্শ নয়। তুমি আদর্শের নামে কিছু একটাকে খাড়া করেছ। কিন্তু জানবে এ তোমাকে নিতান্তই প্রবঞ্চনা করেছে।

মানিক—না, কিটা হয়েছে ? কি ভুলটা করেছি, বল না। তোর জানে কি বলবি বল আমি শুনতে চাই—ধরে উঠল সে।

অ—ছিঃ দাদা, এ কি বলছ তুমি। তুমি না উচ্চ শিক্ষিত। তুমি বোঝ না, না ? কাকে বলে প্রকৃত আদর্শ আর কাকে বলে নামে আদর্শ—দাঁড় করানো। আমার কাছে তো খুব সহজেই সব ধরা পড়ে। আমি তবু তোমার চেয়ে বয়সে ছোট জ্ঞানে অল্প।

মা গৃহকর্মেই রত তবে দ্রুত নয় হাতের কাজ। কান মন এদিকে, শিবশঙ্করও নীরবে সব শুনছে। অনেক রকম দ্বন্দ্ব তার মনে আসছে। এই অবসরে দীপা তার মাকে সাহায্য করে চলেছে। তবে সেও সব কথায় কান রেখেছে। দীপা যদি হাঁ করে দাঁড়িয়ে শোনে তাহলে মা আজকে একেবারেই ডুবে যাবে। আর নতুন পেনের আনন্দে মাতোহারা হয়ে মন্টু একটা খাতা টেনে আঁকাচ্ছে। এবং থেকে থেকে দাদার দাদার জোর গলায় চমকে চমকে উঠছে। কখনও নিস্তব্ধ হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাল্কা মনে ওদের কথা বুঝবার চেষ্টা করছে।

এবার শিবশঙ্কর মুখ খুলল—কি বলতে চাও মানিক তুমি ? দেখ প্রকৃত আর কৃত্রিম কোনটা টিকে ? স্থায়ী কে ? খোকার কথায় আমার সায় আছে।

তোমার যুক্তি কি? খুলে বল না—কোন্ আদর্শের বলে বলিয়ান হয়ে তুমি এ কাজ করেছ।

মানিক ধীরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে শুরু করল—আমি তো বাবা আপনাকে আগেই লিখেছিলাম—এমন এক পরিস্থিতির চাপে পড়েছিলাম যে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি।

শিবশঙ্কর একটু যেন বিরক্ত হল—আহা পরিস্থিতিটা কি তাই বল না। পরিস্থিতি পরিস্থিতি কথাটাতো বার বারই শুনে আসছি!

মানিক—হ্যাঁ সেই বলছি।—দমে না গিয়ে উত্তর দিল সে।—প্রথম থেকে তোমাকে সব খুলে বলি। মেয়েটি যে অফিসে কাজ করত আমি সেখানেই এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাই। ওর পরিশ্রম অনুপাতে ও বেতন পায় না। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি কাজে কোন অবহেলা বা ফাঁকি নেই। ধীরে ধীরে আর পাঁচ জনের মত আমার সঙ্গে আলাপ হয়। প্রায় দিনই দেখতাম শুকনো ক্লান্ত মুখে কাজ করে চলেছে। একদিন সরল সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম—কি ব্যাপার মিস্ মুখার্জী আপনাকে এত কাহিল লাগছে কেন? মেয়েটি প্রথমে চুপ করে থাকল। লিফট্ থেকে সকলে এক এক করে যথাস্থানে নেমে গেল। আমরা নামব এমন সময় বলল মেয়েটি—মিঃ সাহা, আমরা গরীব মানুষ সামান্য মাইনের চাকুরে আমাদের ব্যাপারে দয়া করে কোন উৎসাহ প্রকাশ করবেন না। আমি একটু লজ্জিত দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললে—কিছু মনে করলেন নাকি? বললাম—না না, মনে করা করির কি আছে। মেয়েটি তারপর বলে চলল—না ব্যাপারটি কি জানেন তো, আমি বছর চারেক হল চাকরিতে ঢুকেছি। এই চার বছরেই আমার অনেক কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। সবচেয়ে একটি বড় কথা কি জানেন—আপনার কাছে আমরা চুনাপুঁটি। সেইজন্য আপনারা আমাদের যা খুশি করতে পারেন! সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করে বলে—আপনি বোধ হয় ভাল বুঝতে পারছেন না, তা যখন এখানে আছেন একটু লক্ষ্য রেখে চলবেন তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

এরপর সকলে যে যেমন কাজ করে চলেছি। আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বড় দুঁদে লোক। ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা দায়। অল্প বিস্তর সকলেই বকুনি খায়। তবে নিয়ম ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য ওতাকে কোনদিন বকুনি খেতে দেখিনি। ধীরে ধীরে অফিসের অনেক গল্পই কানে আসে। আমার কয়েকজন

বন্ধু এ অফিসেই বহাল হয়েছে। একটি ছেলের চরিত্র কলেজ জীবনেই একটু অন্য রকম ছিল। কাজে ঢুকে সে কাজের চেয়ে বেশী সময় আড্ডায় দিতে চাইত। মেয়েদের দিকে বরাবরই লক্ষ্য একটু বেশী, ধীরে ধীরে ঋতার দিকে এগিয়ে যায়। এমন কি ওদের অভাবের সুযোগ নিয়ে এটা ওটা সাহায্য করতে চায়। কিন্তু ঋতা কোনদিনই সেদিকে ওকে আমল দেয় নি। একদিন একটা ছোট্ট ঘটনা আমারই চোখের সামনে হয়ে যায়। ওর ভাইয়ের স্কুলে মাইনা দিতে হবে, দিদির কাছে ছুটে এসেছে। দিদি খুব চিন্তায় পড়ে গেল।—তাই তো রে, তোর তো মাইনা দেওয়ার দিন, কি করা যায় বল দেখিনি? আরে আজকে আমার একজনের কাছে কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল। তাই তোকে আশা দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে তো দিল না, এবার কি করি!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেবেন আর আমি কাজ করছিলাম। আমাদের কানে যায় কথাগুলো। হঠাৎ দেবেন এগিয়ে গিয়ে বলল—কি ব্যাপার খোকা, তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

ছেলেটি উত্তর দিল—ক্লাস টেন।

—ও তবে তো এবারই দেবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা দিদির অফিস চিনলে কি করে?

—আগে এসছি। আর আমাদের বাড়ী তো বেশী দূর নয়।

আর কঁহাতক কত কথা ছেলেটার সঙ্গে বলে। দেবেন এবার ঋতাকে প্রশ্ন করে—তা মিস মুখার্জী, ভাই এই অসময়ে অফিসে তলব করেছে?

ঋতা একটু সঙ্কুচিত হয়ে কাজ করতে করতে উত্তর দিল—না আজ ওর বেতন দেওয়ার দিন। তাই এসেছে।

দেবেন—তা কি হল, টাকা দেওয়া হয়ে গেছে?

ঋতা অল্প কথায় ওর পরিস্থিতি জানাতে দেবেন খপ্ করে পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিতে গেল। ঋতা হাত গুটিয়ে বলল—না প্রয়োজন হবে না। দেবেন একটু বিরক্ত হয়ে বলে—কি ব্যাপার বলুন তো আপনার? আপনাকে যা দিতে যাই আপনি প্রত্যাখ্যান করেন—কি ব্যাপার বলুন তো?

ঋতার সেদিনের উত্তরে বাবা, আমি একটু চমকে উঠেছিলাম। সোজা

উত্তর দেয়, কিছু মনে করবেন না মিঃ মুখার্জী, আমি ওরকম দানে কোন প্রয়োজন বোধ করি না। আমাদের অভাব আছে ঠিকই। কিন্তু আপনাদের শুভেচ্ছা থাকলে খেটে দু'পয়সা আয় করে নিশ্চয় অভাব মোচন করতে পারব।

দেবেন কিছুই বুঝতে চাইল না। শুধু বলল—ও তাই নাকি। বলে টাকাটা কুড়িয়ে নিল টেবিল থেকে।

আমি বাবা ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

মা বলল—নে নে রাখ, খুব হয়েছে। তুই তাই বলে একবারে বিয়ে করে বসলি কি করে ?

মানিক—ঐ তো বলছি মা, বাধ্য হয়েছি।

শিব—মানিক, তোমার মা যা বলছে কথাটা তলিয়ে চিন্তা কর। সে ঠিক বলছে।

মানিক—হ্যাঁ সব কথা আমার আগে শুনুন। আমি তো বলতেই এসেছি। বাধা না পেয়ে সে আবার বলে চলল—দেবেন বেপরোয়া লম্পট ছেলে। ঐ ঘটনার পর একটা প্রতিশোধের মন নিয়ে ও ঋতাকে অকারণে অপদস্থ করার চেষ্টা করে। সে অনেক কথা, কটা আর আপনাকে বলব। তবে একদিনকার একটা ছোট ঘটনা আপনাকে বলি শুনুন। সেদিন অফিস ছুটির পর যে যার বেরিয়েছি। হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করে দারুণ বৃষ্টি আরম্ভ হল। সেই সঙ্গে ঝড়। শিক্ষিত হলেও জানবেন সে মেয়ে মানুষ। দেবেন কোথায় ছিল সেই সেদিনের প্রতিশোধ ওর উপর নেবার সুযোগ পেয়ে গেল। বৃষ্টি থামার নাম নেই কিন্তু তবু ছুটির পর কে আর দাঁড়ায়। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। বেরিয়ে যাব হঠাৎ চোখে পড়ল ঋতা একলা যেখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে সেখানে দেবেন মহাশয় গিয়ে হাজির। কেন জানি না পা বাড়িয়েও গুটিয়ে গেলাম। একটু দাঁড়িয়ে যাই। এক এক করে অনেক লোকই চলে গেছে। দেবেন যেন কি বলছে বুঝতে পারছি। তবে শোনার কথা নয়। ঋতা অস্বস্তি বোধ করছে। এক সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে যাবে বোধ হয় এই স্থির করেই ঋতা পা বাড়াল। অমনি দেবেন ওর হাত চেপে ধরেছে। নির্লজ্জ দেবেন কাণ্ডজ্ঞানহীন। আশে পাশে যে দারোয়ানরা আছে সে খেয়াল তার নেই। ঋতার প্রকৃতি সেদিন আমাকে স্তম্ভিত করে। মুহূর্তে ঋতা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠে—কি

ভেবেছেন আপনি। আপনার বহু অত্যাচার আমি সহ্য করছি। শিক্ষিত বর্ব্বর কোথাকার! বলতে বলতে সে সজোরে হাত ঝিটকে নিজেকে মুক্ত করল। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আমি আর সমীচীন মনে করি নি। ধীরে ধীরে ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমার উপস্থিতিই ঋতার মনে বল সঞ্চার করে? দেবেন আমাকে দেখে দারুণ অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। কিন্তু ঋতা আস্ফালন করে উঠে—দেখেছেন তো, যত সব সুশিক্ষিত অসভ্যের দল। বলেই সে হন হন করে নেমে গেল। দেবেনকে বললাম—কি ব্যাপার রে—সুশিক্ষিত অসভ্য! দেবেন কোন পাত্তা দিতে চাইল না। চৌকস ছেলে। বলল—আরে রাখ রাখ বাদ দে ওদের সব কথা। ও মাগীরা মুখোস পরে ঘুরে বেড়ায়। আর ছুঁয়ে দিলেই গায়ে ফস্কা পড়ে যায়। হুঃ আদর্শ দেখাচ্ছে। তবু যদি না আমি কিছু জানতাম।

নীরবে নিরপেক্ষ হয়ে সব কথাগুলো শুনছিলাম। আর আগে ঋতার বলা কথাগুলো মনে করছিলাম।—নে নে চল চল। চল একটু চা খাওয়া যাক। খুব একচোট বৃষ্টি হল। সেদিন আর ওর সঙ্গে চা পানে প্রবৃত্তি হয় নি। সোজা নিজের কোয়াটারে ফিরে গিয়েছিলাম।

কাজের চাপে কদিন কেটে গেছে। একদিন দুপুরে নিজের টেবিলে চা পান করছি। এমন সময় ঋতা একটা কাজ নিয়ে আসে। কাজটার দিকে চোখ বুলিয়ে চলেছি হঠাৎ ও বলে উঠে—সে দিন দেখলেন তো। আপনি কি আগাগোড়া সব দেখেছিলেন?

বললাম—দূরে দাঁড়িয়ে সাক্ষী ছিলাম বটে তবে সবটা বুঝেও বুঝতে পারিনি।

ঋতা—দেখুন, বহুদিন ধরেই উনি আমার পিছনে লেগেছেন। শুধু দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে আমাকে নানা ভাবে ভোলাতে চান। যখন তখন শুধু টাকার গরম দেখান আমার কাছে। কিন্তু আমরা গরীব হলেও জানবেন ও রকম হীন দান ঘৃণা করি। ওদের মত ছেলেদের লক্ষ্য হল—টাকা দেখিয়ে একটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

বলেছিলাম—ও কথা কেন বলছ। ছিনিমিনি খেলার ইচ্ছা কি করে বুঝলে?

উত্তর দেয়—দেখুন বেশ কিছুদিন হল বাইরে পেটের দায়ে চাকরিতে বেরিয়েছি। কিন্তু তাই বলে চরিত্র নিয়ে যা খুশি তাই করতে রাজী নয়। শক্তি

দিয়েছেন ভগবান। তারই জোরে যাব। চরিত্র বিলিয়ে দুদিনের আনন্দ চাই না। এ সব মানুষ আমার এই জীবনে অনেক দেখা হয়ে গেছে। তা দেবেন মুখার্জীর নগ্ন চরিত্র, আমি কেন, যে কোন মেয়ে খুব সহজেই বুঝতে পারে।

এরপরও হয়ত অনেক কথাই হত কিন্তু অফিসে খোলা মেলায় ওভাবে মুখোমুখি নারী পুরুষের গল্প করা দৃষ্টিকটু বলে এড়িয়ে যাই। ঋতাও নিঃসংকোচে কাজ সেরে বেরিয়ে চলে যায়।

এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। দেবেনের উৎপাত বেড়েছিল। ওকে একা পেলে অনেক দিন বুঝিয়েছি—দেখ তুই ভুল করছিস। যদি ভালই লেগে থাকে তাহলে বিয়ে কর না কেন। সে কথায় ও কোন উত্তর দিত না। পরিষ্কার বুঝতাম—শুধু ফুলের মধু খেয়ে বেড়ানোই হল ওর নেশা। ও কোন দায়িত্বের মধ্যে যেতে চায় না। তারপর দিনে দিনে যেমন দেখেছি তেমন তেমন বলেছি। দেবেনও ছাড়নেওয়ালা নয়। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে উঠেছে। হয়ত ও আমার খুবই অনিষ্ট করত কিন্তু বিধি বাধ সাধল। দেবেন ভাল চাকরির সুযোগ পেয়ে চলে গেল।

যে যার কাজ করে চলেছি। একটি একটি করে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। মাঝে দেবেনকে নিয়ে ঘরে বাইরে চাপা আলোচনা সুরু হয়েছিল। দেবেন সরে যেতে এবার নতুন খোরাকের অপেক্ষায় অফিসের অনেকে বসে। কদিন দেখছি ঋতা কামাই করছে। আগেই বলেছি ঋতার চরিত্র ও গুণ আমাদের অনেকের স্নেহ শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। আমার কাছে ও বিশেষ সম্মান পায়। হঠাৎ একদিন অফিস ছুটির কিছু আগে ঋতা ছুটে আসে। আমার টেবিলের সামনে এসে নিজেকে আর সামলাতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার। আহা, অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন? চারদিকে লক্ষ্য করে খুব সামলে নিল। চা জল খাবার দিতে চাইলাম, তা শুধু এক কাপ চা গ্রহণ করল। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকল—আজ কদিন হল আমার পরের ভাইয়ের দারুণ অসুখ করেছে। ডাক্তার দেখছে কিন্তু কিছু ধরতে পারছেন না। তিনি বলছেন তার বাঁচাতে আর কিছু করা সম্ভব নয়। শহরের বড় ডাক্তার নিয়ে যেতে বলছেন। ভাইও দিন দিন ক্ষীণজীবি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন আমাদের এমন অবস্থা নয় যে শহরের বড় ডাক্তার নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করি। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করুন আমি

জেনেই এসেছি যে এ সমস্যার সমাধান আপনার কাছে এলেই হবে। আমি পরে খেটে আপনার এ ঋণ পরিশোধ করব। আপনি নিশ্চয় আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন।

ওদিকে অফিসের পাঁচজন একটু উৎসুক হয়ে পড়েছে। বললাম—মিস্ মুখার্জী আপনি অপেক্ষা করুন। ছুটির পর আপনার সঙ্গে কথা বলব। হাতে একটা কাজ দিয়েছেন ডি. ই। সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করলে আমারই ভাল।

ঋতা মেয়েদের কাছে উঠে গেল। এদের কারও কাছে তেমন প্রিয় নয় সে। বাইরে পা বাড়িয়ে সামলে চলা সকলের ধাতে পোষায় না। কেউই তেমন একটা আমল দিল না। আর ঋতাও গুরুত্ব বা আমল নেবার মেয়ে নয়। তার উপর যে অবস্থায় সে ছুটে এসেছে তাতে তার বসে থাকার জো নেই। সে পায়চারী করছে। আজই সকালে ডাক্তার এলে দিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে ও যেন প্রাণ পেল—আপনার হয়ে গেল। তাহলে বলুন কি করব। বেশী কথা আর বলব কি। বললাম—চল যাই তুমি এগোও, আমি পিছনে ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি। ঠিকানাটা দিয়ে যাও। তাড়াতাড়িতে সব বুঝিয়ে ও বিদায় নিল। আর আমি ডাক্তারকে নিয়ে ওদের বাড়ীর দিকে চললাম।

পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ঋতা অনবরত ভিতর বাহির করছিল। বাড়ী খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয়নি। মফঃস্বল হলেও বেহালা কলকাতার কাছেই। ডাক্তার সঙ্গে একেবারে রোগীর কাছে পৌঁছলাম। রুগীকে দেখে ডাক্তার বেশ ভয় পেয়ে গেল। তারপর ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপসন করে বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে আড়ালে ডেকে বলেন—এ রোগী ভাল করে তোলা দুষ্কর। বেশ টাকা পয়সা ও মেহনতের দরকার। রাতে রোগীর কাছে অবশ্যই একজন জাগবেন। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল, যে কোন মুহূর্ত্তে—বলতে গিয়ে থমকে গেলেন। বললাম রোগটা কি ডাক্তার বাবু। বললেন—এরা অবহেলায় রোগটা-কে বাড়িয়ে ফেলেছে। দেখছেন না ছাব্বিশ দিন হল জ্বর ছাড়েনি বলছে। এটা টাইফয়েড। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে হাতে ফিস গুঁজে দিতে বললেন—তাহলে আপনি আমার ডিস্‌পেন্‌সারীতে আসছেন। বললাম—হ্যাঁ আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ঋতা আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল বলল—ডাক্তারবাবু কি বললেন। বললাম—কি আর বলবে, তোমরা রোগীর চিকিৎসা এত গড়িমসি করে করেছ না

যাতে অম্বের হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা যাক আমি এখন ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে ওষুধ-গুলো নিয়ে আসি। ওর বাবা মা একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন। বেরিয়েই দেখলাম ডাক্তার আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এক সঙ্গে গিয়ে বাসে উঠলাম।

ফিরতে একটু রাত হল। ওষুধ পথ্য সব এক এক করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ওর বাবার সঙ্গে আলাপ হল। মা মমতাময়ী। এগিয়ে এসে উনিও কথা বললেন। ছেলেটিকে আগেই আমি অফিসে ঋতার কাছে যেতে দেখেছিলাম। আলাপ করতে চাইলাম। কিন্তু বড় দুর্বল। ওর বাবা বললেন—এবারই স্কুল ফাইনাল দিত, কিন্তু এই তো অবস্থা! আমাদের এই গরীবের সংসার। মেয়েটি বাইরে চাকরি করতে বেরিয়েছে। ছেলে বলতে এই বড়। আজ প্রনবেশ তাড়াতাড়ি পাস করে একটা কাজে না ঢুকলে ঋতা মায়ের বিশ্রাম নেই। এই ভাবেই গল্প চলছিল এমন সময় ওর মা এসে বললেন—বাবা, আজ অনেক রাত হল। এখানেই আমাদের সঙ্গে দুটো শাক ভাত খেয়ে কাল সকালে যদি কাজে গিয়ে যোগ দিতে, তাহলে কি ভাল হত না? ওদিকে রাতও হয়েছিল। তবে ইচ্ছা করলে যে বেরতে পারতাম না এমন নয়। কিন্তু মা বাপ ভাই বোন বাড়ীর সকলের আন্তরিকতায় সেদিন আর বেরিয়ে আসা হয়ে উঠে নি। তবে পরদিন চলে আসাই শেষ নয়। দু'একদিন অন্তর অন্তর আমাকে ডাক্তার সঙ্গে ওখানে যেতে হয়েছিল। এই আসা যাওয়ার ফলেই ওদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে রোগী আরোগ্যের মুখ নিল। ডাক্তারও চিকিৎসা করে চলেছে। বাড়ীর সকলের ভরসা হয়েছে।

সেদিন পথ্য করবে। ডাক্তারে জ্যান্ত মাছের ঝোল খেতে বলেছে। কিন্তু সে অবস্থা ওদের নেই এ কথা আমি খুব ভাল করেই জানতাম। তাই অগত্যা আমাকেই মাছ কিনে পৌঁছে দিতে হয়েছিল। সন্ধ্যার পর অফিস সেরে মাছ নিয়ে গিয়ে রান্না ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। সামনেই ঋতা এসে খুব ভাঙ্গা মনে মুখের দিকে চেয়ে বলল—এ ঋণ তোমার শোধ করব কি করে। দাবি সূচক ভাব তার। যাক তারপর বাবা আপনাকে আর বলতে পারব না। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ মুখের দিকে কড়া চোখে চাইল।—বাবা!

আঃ অমরেশ—থামিয়ে দিল শিবশঙ্কর।

কথাটাতে মানিকের হঠাৎ কোথায় যেন বেঁপে উঠল। কিন্তু বলা তো সে আর বন্ধ করতে পারে না। বলতে তাকে হবেই। এতক্ষণ বলার মধ্যে ক্রমেই উৎসাহ বেড়ে চলেছিল। এখন ভয়ে ভয়ে আবার সে সুরু করল।

সেদিন রাত্রে আমার ওখানে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে রাতের বাসে ফিরব এই স্থির করেছিলাম। কিন্তু ওর বাবা এমন গল্প আরম্ভ করল যে তা কোন রকম এড়িয়ে আসবার পথ ছিল না। এদিকে রাত বাড়তে মনটা খুব আনচান করছে। আর বোধ হয় বাস পাব না। ওর মাও এসে যোগ দিয়ে আরও দেরি করে দিল। ভদ্রলোক তার জীবনের কথা বলতে বলতে তার বাবার কথা তুললেন। তার খুব নাম ডাক প্রতিপত্তি ছিল। খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বেশ ধন সম্পদ করেন। কিন্তু করলে হবে কি নিজের অযোগ্যতাতেই অল্প দিনেই সব হারান।

'খৃষ্টান' শব্দটা শুনে সকলের একসঙ্গে বাঁধ ভাঙ্গল। শিবশঙ্কর—কি বললে, খৃষ্টান ?

মানিক বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। মুখের রেখাগুলো কুঁচকে গেছে। একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠেছে। মানিক বেশ কিছুটা দমে গেল। কিন্তু ঘা সারবে কি, খুঁচিয়ে রক্ত বার করে দেয় অমরেশ।

অমরেশ বলল—তাই বলে খৃষ্টান। এ তোমার যে কি জ্ঞান কি বিচার আমি তো কিছুই বুঝে পাচ্ছি না।

রান্না ঘরে মা একটু ব্যস্ত ছিল দীপা আস্তে করে কানে তুলে দেয়—শুনছ মা বাবা দাদাদের কি কথা হচ্ছে।

মা—হ্যাঁ শুনছি। বলেই ঘুরে দাঁড়াল—কিরে খৃষ্টান খৃষ্টান কি বলছিসরে ?

অমরেশ উত্তর দিল—হ্যাঁ তোমার পুত্রবধূ খৃষ্টান।

খৃষ্টান। লাফিয়ে উঠলো শ্রীমতি—বংশের নাম ডুবালি কুলাঙ্গার। শেষে বিধর্মী মেয়েকে বিয়ে করলি। বলেই মা চেঁচামেচি করতে করতে মানিকের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানিক তখন পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। ফ্যাকাসে মুখে মায়ের মুখের দিকে চাইল। অমরেশ তাড়াতাড়ি মাকে আটকাল—আঃ তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন দাঁড়াও না।

মানিকের ঐ রকম ভাব দেখে শিবশঙ্কর তখন বলে উঠল—কাজটা কিন্তু মানিক তুমি মোটেই ভাল করনি।

তার শান্ত স্বাভাবিক গলা পরিবেশে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল। অপরাধের মধ্যেও মানিক যেন একটা কথা বলার পয়েন্ট পেল। —অন্যায় অপরাধটা তুমি আমার কোথায় দেখছ—জাতি বিচার। এ তো তোমার কাছেই আমাদের শিক্ষা বাবা, যে জাত বলে কিছু নেই।

শি—হ্যাঁ তা না হয় হল। কিন্তু তাই বলে একেবারে আমাদের না জানিয়ে বিয়ে করলে কি করে। জাতই না হলে বিচার করি না আমি, কিন্তু মানুষ বিচার তো করব। তোমার কি জ্ঞানে কতটুকু তার বংশ পরিচয় পেলে যে একবারে তাকে তুমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করলে। এবং বুঝলে যে আমরাও তাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করব। জ্ঞান এর মধ্যে কত ভূত ভবিষ্যত লুকিয়ে আছে। কত অভিজ্ঞতা, জীবনের মধ্যে এই জ্ঞান আসে। বিশ্বাসী হও কিন্তু অন্ধ হয়ো না। তোমাকে দান করতে কে বারণ করেছিল। তাই বলে তুমি গ্রহণ করলে কেন? প্রথম কথা হচ্ছে—গ্রহণ করেছ বলে আমাদের কাছে অন্যায় করেছ। এবার চিন্তা কর তোমার দানের সার্থকতা কোথায়। ওখানে তো স্বার্থ। ওখানে যদি তাদের একজন হয়ে জড়িয়েছে এই কর্তব্য কর্ম সেরে আসতে তাহলে তোমার দানের শ্রেষ্ঠতা বা সার্থকতা ছিল।

মানিক—বাবা।

শি—হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম তোমার সব কথাই। তুমি বলতে চাইছ কি, তা আমি বলে দিচ্ছি। এই কথাই এখন বলবে তো—কিছু না মনে করেই তুমি তার দারিদ্রের দিকে লক্ষ্য করে এবং মেয়েটির গুণে মুগ্ধ হয়েছিলে। কিন্তু এ কথা কি মানিক ঠিক নয় যে তোমার আগের কথা কেউ জানবে না বা জানতে চাইবে না। তোমার শেষ নিয়ে বিচার হবে।

অম—দাদা, এই কথার সঙ্গে আমি একমত। সত্য বা আদর্শ তাতে জড়িত থাকলে সংঘর্ষ, সেখানেই তা খেল হয়ে যায়। গ্রহণ না থাকলে সেখানে জানবে যে তার চূড়ান্ত ফুটে উঠতে থাকল।

শি—ঐ ক্ষেত্রে তোমার রূপ কি হওয়া উচিত ছিল? আর মানিক মেয়েটিকে দীপার খাদে ফেলা ছেলেটিকে মণ্টু বলে জানা। ছেলেটিকে মানুষ করার পর তাদের সংসার তাদের বুঝিয়ে দিয়ে ওখান থেকে সরে আসা। তারা হয়ত তোমাকে জড়িয়ে রাখতে চাইবে। তখন তাদের বলা—আমি তোমাদের কেউ না, কিছু না। বলে তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসা।

দেখতে সে ঋণ কোনদিন তারা শোধ করতে পারত না। তোমায় সব সময় তারা দেবজ্ঞানে চিন্তা করত—ওঃ কে সে আমাদের এ রকম করে গেছিল! কিন্তু এ নিখিল বাবুর মনে দুরান্ত ভরসা—আমি মেয়ে দিয়ে ঋণ শোধ করে দিয়েছি—আমার জামাতা। ঐ সঙ্গে যে শ্রদ্ধনীয় তুমি ঋতার কাছে ছিলে সে শ্রদ্ধা তার ম্লান হয়ে দাবি এসেছে।

তারপর ভেবে দেখ মানিক, যে গর্ভধারিণী দীর্ঘ দিন আশা নিয়ে তার বুক বেঁধেছিল—তার পুত্রবধূকে তার মতন করে ঘরে আনবে, নিজে হাতে সঙ্গে সাথে থেকে গড়ে তুলবে, আজ তার বুকে তুমি কি রকম তুষের অনল জালিয়ে দিলে! জাতি ভেদ আমি করি না। তাই বলে তো মন ভেদ আছে। মন আমার তাকে চায় না। শুধু কি তাই—দীপার বিয়ের কোন প্রশ্ন উঠলেই তোমার ঐ আদর্শ কেউ দেখবে না। সবাই বলবে চাকরি স্থলে যেয়ে ছেলে একটা খৃষ্টান মেয়ে বিয়ে করেছে। কত লোককে তুমি আদি ঘটনা বুঝাতে যাবে। নজির যা তাই সকলে দেখতে পাবে। আর তোমার মা ও তাকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না। ভাবত দিনের পর দিন কি পরিশ্রম করেছিল জননী। এই ভাবেই কি তুমি তার ঋণ শুধলে। দুর্ব্বল প্রাণ মেয়েছেলে মা তোমার, তাকে তো তুমি বোঝাতে পারবে না।

মানিক দেখছে তার আর বলবার পথ নেই। বাবা যে যুক্তি দিয়ে যাচ্ছে তা তো কাটার মত নয়। অমরেশ বলল—দাদা আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি এ আদর্শের নামে কিছু একটা—খাড়া করা আদর্শ। প্রকৃত আদর্শ বলতে কি তা এবার বাবার কাছে বুঝছ তো?

শিব—আঃ শুধু কি তাই, মানিক বুঝে দেখুক না—যে দান করতে গেছিল তার মর্যাদা কোথায়। দক্ষিণা নিয়ে নিয়েছে। আর দেবেনই বা বলবে কি—ও ও আমার কবল থেকে ঐ জন্যই বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছিল। বলবে না—তাহলে বন্ধু, তোমার আগাগোড়াই একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর আশা ছিল।

মানিক—বাবা!

শি—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ হল নাও।

মানিক—আপনিও তাহলে তাই বলবেন।

শি—আমার বলা নিয়ে তুমি অত ধরছ কেন? বলার যে অনেক লোক আছে।

মানিক—এর মধ্যে কি, বলতে চান, আদর্শ নেই। আমি তো তার জীবনের দায়িত্ব নিয়েছি।

শিব—এ আদর্শটা কি রকম জান—খেল আদর্শ। এ যদি তোমাকে নিতান্তই বিবাহ করতে হত তাহলে তোমার দীর্ঘ সময় নেওয়া উচিত ছিল।—এখন আপনাদের যা করতে এসেছিলাম তা করে দিলাম। ও সব কথা থাক। ও এখন পরে হবে। —এই বললেই ওরা আশা পেত। এবার বুঝাপড়া চলত আমাদের সঙ্গে। তখন তোমার মাকেও বোঝানোর একটা পথ থাকত। কাজটা জেনে শুনেই হত। সেখানে কারো কিছু বলার ছিল না। গভীর করে চিন্তা করে দেখ'বে। মানিক ওখানে কি তোমার সেই ইচ্ছাই ছিল, না, অন্য কিছুর প্রকাশ পেয়েছিল? ঐ দেবেনের কথায় আসি। অল্প সময়ের ভোগও ভোগ আর দীর্ঘ সময় যুক্ত থাকলে তাকেও ভোগ আখ্যা দিতে হবে।

মানিক—সে কি কথা বলছেন বাবা! আপনার আদর্শও কি তাই বলে? সৃষ্টি তাহলে রক্ষা পাবে কি করে?

শি—আঃ আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কাউকে ত্যাগী হতে বলছি না। বিবাহ বন্ধন প্রয়োজনীয় এবং তা আনন্দের। তবে মোহগ্রস্থ না হয়ে নিখুঁৎ বিচার করে কাজ করাটাই শ্রেষ্ঠত্ব। তোমার দু' জায়গায় আমি ভুল পেলাম। প্রথম কথা আমি তো আগেই বলেছি—তুমি বাবা মায়ের বাধ্য ছেলে নও। এর মধ্যে আদর্শ কোথায়। মোহ তোমাকে গভীর করে ছুঁয়েছিল যার জন্য তোমার আর সময় নেওয়ার স্বর যায় নি। তুমি স্থির বিচার কখনই করতে পার নি। হতে পারে না।

মানিক—কেন তা হতে পারে না? আমার হল তো আমি বুঝতে পারছি না। বাবা আমি নিজেকে সাধারণ পাঁচটা ছেলের মত জ্ঞান করি না। রীতিমত আমার বিচার বিবেকের উপর আস্থা রাখি।

শি—তা যদি রাখ তাহলে সেইটিই আর একটু পাকা জ্ঞানে যাও, বুঝতে পারবে। মোহ জড়িত বিচার যে আদর্শ বিচার নয়—সর্ব্বদিক চিন্তা করে নিখুঁৎ বিচার তার মধ্যে যে মোহের বালাই চলে না, এ তুমিই কালে বুঝবে।

মা—এখনই বল না।

শি—আমার বলার চেয়ে তোমার নিজের জীবনে সেটা বলা কি ভাল হবে না। তোমার ব্যক্তিগত জীবনে তা প্রত্যক্ষ করবে।

তা তো যা হবার হবেই বাবা, তবুও শুনে রাখি। সরল ভাবেই বলল মানিক।

শি—না ব্যাপারটা কি জান, এই যে খতাকে বিয়ে করলে না তুমি জানবে এতে ধীরে ধীরে তোমাকে ওরা গ্রাসই করতে থাকবে। এটা যদি অন্য ক্ষেত্রে এইরূপ কাজ হত তাহলে সেখানে তারাই ধন্য হত। —আমরা গরীব কিছু দিতে পারি নি তবু কপাল গুণে শিক্ষিত ভাল জামাই করেছি। এই কৃতজ্ঞতায় তাদের মন কানায় কানায় ভরে থাকত এবং আজীবন তারা প্রকারান্তরে তোমার কাছে ঋণে বাঁধা হয়ে থাকত। আর এখানে সে দরিদ্রতাকে কেন্দ্র করে তোমার মহত্ত্বের প্রকাশ দেখবে কালে সেই দরিদ্রতাই প্রধান হয়ে দাঁড়াবে। তুমি তোমার বিবাহিত স্ত্রীকে তোমার মত করে রাখতে চাইবে। সেইখানে উঠবে অভাবের সাড়া। যেহেতু তাদের রোজগারী মেয়েকে তুমি বিয়ে করেছ এবার পূরণ কর ক্ষুধা। যদি বল না দিলে তারা কি ছাড়িয়ে নেবে! আমি যদি না দিই। তখনই বাধবে ঠাণ্ডা লড়াই। এই রকম কত কারণে দিনে দিনে অশান্তি বাড়তেই থাকবে। সাধারণ ভাবে দেখে শুনে বিয়ে দিলেও তো অশান্তির কম থাকে না। আর তার উপর যদি থাকে কোন খঁচ।

মানিক—তাহলে তোমরা আমাকে কি করতে বল?

শিব—তোমাকে? তোমাকে তো আর এখন বলার মত কিছু নেই। বিয়ে করেছ এবার যথা নিয়মে সংসার কর।

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে মানিক ডেকে উঠল—মা।

শ্রীমতি—তোমার বাবার মতেই আমার মত। আলাদা করে আমার আর বলার মত কিছুই নেই।

মানিক—তোমরা কি বলতে চাও আমি যে বিয়ে করলাম তোমরা তাহলে তোমাদের পুত্রবধুকে গ্রহণ করবে না?

শ্রী—কি করে করব বল। এই সেদিনও তো দেখেছিস তোর ঠাকুমার সঙ্গে আমার ব্যবহার। এক ভারে পড়ে উঠেছি বাবা, অন্য দিকে পা বাড়াতে সময় লাগবে। আমি যা আমার বৌকেও তো তাই খুঁজব তার বিপরীত হলে মেনে নিতে পারব কেন?

মানিক—বিধাব কর মা-জাবা নিছক বাঙ্গালী। হঠাৎ ঠাকুরদা ধর্মান্তরিত হওয়ায় এভাবে তাদের ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে। তাছাড়া তারা গরুও খায়

না বা শুধু বাইবেল আঁকড়ে পড়ে নেই। আর ওদের সঙ্গে মিশলে মা তুমি বুঝতে পারবে ও সাধারণ হিন্দুর মেয়ের মত। এক কথায় বলতে গেলে সুযোগ থাকলে বোধ হয় আজই ওরা হিন্দু হত। তুমি জাতটাকেই অত বড় করে দেখছ কেন মা মানুষটাকে বিচার করে দেখবে তো।

মা—সবই তো বুঝলাম আর আমার কথাও তো তোমাকে বললাম—এত শীঘ্র আমার ধাতে সহ্য হবে না মেনে নিতে পারব না। আর তার উপরে সামনে মেয়ের বিয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলে মেয়ের কারোরই বিয়ে হয় নি। সেইজন্ত আশীর্বাদ করি তোমরা সুখে সংসার কর। আমাকে আর জড়ানো কেন। আর তুমি আসা যাওয়া করো।

মানিক ধীরে ধীরে ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে এল। বাইরের ঘরে গিয়ে মাথা ধরে বসেছে। আজ তার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। নিজেকে আর ঠিক রাখা সম্ভব নয়। দীপা এসে বলল মা, কি বলত তোমরা। দেখেছ দাদার কি অবস্থা হয়েছে। কাঁদ কাঁদ মুখে টেবিলে মুখ গুঁজড়ে বসে আছে। আমি দাদাকে ডাকলাম দাদা, স্নান করবে না। দাদা আমার কথার উত্তরই দিল না।

অমরেশ পিছনে দাঁড়িয়ে দীপার কথা কান করে। "সত্যিই দাদার কথা চিন্তা করলে দুঃখ হয়। বেচারা, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়া হয়ে গেল।"

দীপা বলল—থাক না মা, যা ভুল করেছে এবারের মত ওকে ক্ষমা কর।

অমরেশ ক্ষমা! বাবা মা তো ওর প্রতি রুষ্ট নয়। কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। ক্ষমাই তো করেছে। বলতে পারিস গ্রহণ। বাবা যে যুক্তি দেখিয়ে গেছে দীপা, তাতে গ্রহণ করলে শুধু যে আদর্শই খেল হয় তা নয় সমাজ সংসারের কথা চিন্তা করলে গ্রহণ করা চলে না। সবই তো বাবা বুঝিয়ে বললো।

দীপা—হ্যাঁ মেজদা, ঠিক বাবার যুক্তির উপর কোন কথা বলা চলে না। অকাট্য যুক্তি। কিন্তু তাই বলে দাদার মনটা কি হচ্ছে ভাব দেখিনি।

দাদা বেচারী তো ভেঙ্গে পড়ছে। অন্তত দাদার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কিছু একটা করা উচিত। আচ্ছা মেজদা, এ সবের কি কোন মিমাংসা নেই।

অম—মিমাংসা আর কি বল? তুই এটাকে সমস্যা বলে ধরছিস কেন? তবে যে রকম ধরণের কথা বাবা বলে যাচ্ছে বা যে আদর্শ তুলে ধরছে তাতে

আপসেই একদিন সমাধান হয়ে যাবে। কতকগুলো কারণে আপাতত সব আটকে থাকবে। তবে দাদা যদি একটু লক্ষ্য নিয়ে চলে।

দী—সে আবার কি দাদা? একটু বল না।

অম—নে নে তোর এখন জানবার সময় লেগে গেল কি জানবি? মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক।

দী—ঐ তো তোমাদের রোগ—কিছু জানতে চাইলেই জানাতে চাও না। মেয়েছেলে বলে শুধু দূরে ঠেলে দাও।

অম—আরে, বাবা যে কথাগুলো বলল তুই বুঝতে পারলি না—তোমার আদর্শ খাড়া করা আদর্শ। দাদা যে কাজগুলো করে এল সেই মুবয়সে কি ঐ কাজটা করা উচিত ছিল। আর এখন যদি গ্রহণ করে তাহলেও বুঝতে পারছিস কি কি ক্ষতি। এবার বুঝ দাদা তো আদর্শচ্যুত নয়। যদি seriously দাদা বৌদিকে গড়ে তোলে তাহলে আশা করি একদিন হয়ত পথ তৈরী হয়ে যাবে।

দীপা হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকল। পরিষ্কার বুঝল মেজদা অনেক কথাই ভাঙ্গতে চায় না। আর অমরেশও শেষে শুধু এই কথাই বলল—বড় হ বড় হ একে একে সব বুঝবি।

শিবশঙ্কর এদিক ওদিক করে কিছু সময় কাটিয়ে দিল। খবরের কাগজের খাতায় চেষ্টা করেও মন রাখতে পারল না। উঠে এসে বলল—কৈ রে দীপা তোরা সব কোথায় গেলি? হাতের সেলাই নিয়ে মেয়ে এগিয়ে গেল—এই যে বাবা। স্নান করবে? তেল গামছা দেব?

শি—হ্যাঁ এবার করলেই হয়। বেলা তো হল। ওরা সব কোথায়।

দী—দাদা তো সেই বাইরের ঘরে মুখ নীচু করে বসে আছে এখনও উঠেনি।

শি—কেন, এত সব তো কথা হয়ে গেল! আর তোর দাদার ওরকম করে বসে থাকা কেন? যা দাদাকে ডাক।

দী—না বাবা আমি ডেকেছিলাম, কোন উত্তরই করেনি।

শি—যা আর একবার ডাক যা। দীপা বাবার কথামত আবারও গেল ডাকতে। আর শিবশঙ্কর পাশের ঘরে গিয়ে দেখে অমরেশ মণ্টুকে কি একটা ছবি বুঝাচ্ছে। দীপা মানিকের কাছে গিয়ে ডাকল দাদা, বেলা হল স্নান করতে যাবেনা?

মানিক স্থির বসে ছিল। ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—না বোন, আমার গাড়ীর সময় হয়ে গেছে। আমি এখনই চলে যাব।

কথাটা শুনে দীপার মাথায় হঠাৎ যেন বাজ পড়ল। হাঁ করে চেয়ে স্থির হয়ে গেল। এতদিন পর দাদা এসেছে এখনই চলে যাবে! খানিক বাদে বলল—কেন দাদা এখনই চলে যাবে তুমি?

মানিক—হ্যাঁ বোন, আমি তোমাদের কুলাঙ্গার দাদা, সেইজন্য এ ভিটায় আমার আর থাকা সাজে না। দীপা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দাদার দিকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলল। এমন কি দোষ করেছে দাদা! যাই করুক না, সব দোষ ম্লান হয়ে গিয়ে এখন দাদার যাওয়ার কথাই তাকে পাগল করে তুলল। ভিতরে কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

দীপা একটি মাত্র ছোট বোন বলে মানিকের কাছে সে কম আদরের পাত্র নয়। দাদা দীপাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল---ছিঃ বোন, কাঁদতে আছে। তোমরা বাবা মায়ের বুক জুড়িয়ে থাক। আমিও যদি তোমাদের মত হতে পারতাম তাহলে আমিও থাকতাম।

শিবশঙ্কর মেয়েকে পাঠিয়ে নিকটেই ছিল। কানে তার সব কথাই যায়। হঠাৎ গুরু গম্ভীর ভাব দেখে বলে উঠল—কিরে দীপা, তোর এত দেরি হচ্ছে কেন?

দীপা নীরব। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে পরদা তুলে দাঁড়াল। মানিকের কোলের কাছে দীপা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের বিষণ্ণ মুখ। শিবশঙ্করের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভাই বোনের কি মিল! আজ যেমন দুজনের আন্তরিক টান আর তেমন মুহূর্তের ভুলের জন্য বিরহ বেদনা। একসঙ্গে মানুষ হয়েছে।

দীপা পিছনে চেয়ে দেখল শিবশঙ্কর। চিৎকার করে উঠল—বাবা! দাদা আর এ বাড়ীতে জল পর্যন্ত খাবে না। এখুনি গাড়ী ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শিব—কেন কি হল মানিক। যাও যাও স্নানটান করে খাবে যাও।

মানিক—না বাবা, আমি যে শিবশঙ্করেরই ছেলে। আমার বাবার আদর্শ খেল হবে এ আমি চাই না।

শিব—আঃ ওসব আর ভাবছ কেন!

মানিক—নিশ্চয় ভাবব। আমার একটু ভুলের জন্যই তো আজ এই জিনিসটা হল।

শিব—তা যা হবার হয়ে গেছে। এখন তো আর কিছু করার নেই।

মানিক—হ্যাঁ সেইজন্য আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি—তোমাদের এই কুলাঙ্গার সন্তান যেন এ বাড়ী-মুখো আর না হয়।

শিব—কুলাঙ্গার! এ কি বলছ তুমি মানিক? পিছনে অমরেশ পৌঁছে গেছে। মণ্টুও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানিক—হ্যাঁ বাবা আমি যা বলছি, তুমি দেখ, আমি ঠিকই বলছি।

ও মণ্টু, কিরে তোর দিদি 'কোথায় তোর দাদাকে ডাকতে যেয়ে যে রয়ে গেল।—শ্রীমতী আজকে রান্না ঘরে বেশ ব্যস্ত। ছেলে অনেক দিন পর এসেছে। যতই হোক মা যে। দু'একটা ভাল মন্দ রান্না না করলে! মণ্টু মায়ের কথা শুনতে পেল না। সেই জন্য কোন উত্তরও পৌঁছল না মায়ের কাছে। বাধ্য হয়ে রান্না ঘরের কপাট টেনে দিয়ে বেরিয়ে এল। শ্রীমতী বলতে বলতে আসছে—"আর দীপাই বা কি! শিবানীদের বাড়ী থেকে নিমাই দিয়ে গেছিল। রেখে দিয়েছে। বলেছিল—মা, দাদা এলে পায়েস করে দেব। কৈ তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।"—বলতে বলতে সে ঘরে ঢুকে একটু থমকে গেল। ভিতরে কি যেন একটা হয়েছে। সকলে চুপ চাপ। স্বামী সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে তার ভিতরটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল। মারে দেখে মানিক স্যুটকেস গুছানোয় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কিরে তোরা স্নান করতে যাবি কখন।—সমস্ত দুঃখ চেপে শ্রীমতী বলে উঠল।

অমরেশ মায়ের কথা টেনে নিয়ে বলল—আর চান খাওয়া! দাদা বলে এক্ষুণি চলে যাচ্ছে।

শ্রীমতী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলল—কেন কি হয়েছে, চলে যাচ্ছে কেন, হ্যাঁগো?

শিব—তা কি করে বলব বল! ও যে এক কি পাগল ছেলে না। আর একেই বলে দৈবের ঘটনা। হয়ে গেছে। তাই বলে ভেঙ্গে পড়লে কি করে চলবে! রাগ দুঃখ না করে সুহৃৎ স্নেহি ভাব হোক এবার।

মানিক একটি কথার জবাব দিল না। মা দীপাকে বলল উঠ্‌—[illegible] যা রান্না ঘরটা দেখ যা তো।

শুকনো মুখ চোখ মুছে বীণা রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। শিবশঙ্করও স্নানে গেল।

ছেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—কিরে চান্ করবি নি, বা।

মানিক মুখের দিকে চোখ তুলে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলল—না মা, আর আমাকে ওভাবে বলো না। তোমাদের মানিক আর নেই।

মা কাছে আর এক পা এগিয়ে পিঠে সস্নেহে একটা চড় দিয়ে বলল—কি যে অকথা কুকথা বলিস।

মানিক—না তুমি চিন্তা করে দেখ আমি ঠিকই বলছি। আমার এ জিনিসটা তোমাদের কাছে যদি এত বড় অপরাধ অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে এ হতভাগ্য সন্তানের মুখ না দেখাই ভাল।

মা—তোর বাবা এতক্ষণ ধরে যা বুঝাল তা তুই এই বুঝলি। তুই ভেবে দেখবি যে, যা তুই করতে গেছিলি এবং পরে যা করে বসলি তা ঠিক হয় নি। ভুলটা স্বীকার না করলে চলবে কি করে বল!

মানিক—তাই তো বলছি মা আমি যে—আমি আমার ভুলের মাসুল দেব যাই। এ মুখ তোমাদের আর দেখাব না।

মা—এইখানেই তো বোঝা যাচ্ছে যে তোর রাগের স্বর।

মানিক—রাগ কেন বলছ মা তুমি? এইটিই কি মা আমার ঠিক হবে না।

মা—হ্যাঁ এই যা ঠিক তুই এতদিন করে এসেছিস। তোর মনের কি ধারণা যে, তোর ঠিক একরকম আর আমাদের কাছে ঠিক বেঠিকটা অন্য রকম।

মানিক—তা তুমিই বল না কি করতে হবে?

মা—আমার কথা কি জানিস, যা হবার হয়ে গেছে। তুই যেমন মাঝে মাঝে বাড়ী আসিস বাড়ী আসবি। তোর কর্তব্য—যেখানে যা করণীয় করে যা। যাকে বিয়ে করেছিস তাকে নিজের বিবাহিত স্ত্রী বলে গড়ে তোল। তার বংশ পরিচয় ভুলে যা। হঠাৎ রাস্তায় যেতে যেতে দেখলি পথের ধারে একটি অসহায় মেয়ে দাঁড়িয়ে। ছুটে এসে বলল—আমায় আপনি বাঁচান। কাতর আবেদন এড়াতে পারলি না। ঝুঁকি নিলি। রক্ষা পেল। এবার যে তোর জীবন সঙ্গিনী হতে চায়। তার সব দায় তার বইবি স্থির করে তাকে বিয়ে করলি। অবশ্য তার চরিত্র বিচার করে। এখন তোর কর্তব্য কি এই হবে না যে তাকে মানুষ করে যোটামুটি নিজের মত করে গড়ে তোলা?

মানিক—মা, তা কি করে সম্ভব। জলজিয়ন্ত তার যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

মা—এই দেখলি—তুই যে আদর্শ খাড়া করছিলি তারই প্রমাণ দিলি তুথ। তুই যদি নিতান্ত অবস্থার চাপে পড়ে সবই করে থাকিস তাহলে সব ভুলে যা। তাহলে 'অবস্থার চাপ' ওটা নেহাৎ তোর কথার কথা। এখানে যা বোঝা যাচ্ছে তাতে তুই মেয়েটির হাতে বাঁধা, মেয়েটি তোর হাতে নয়।

মানিক কিন্তু একটু বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। অমরেশ ঘরেই ছিল। বলল—দাদা, যুক্তি যে তুমি খাড়া করেছ তা চারদিক থেকে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা আদর্শ পিতার আদর্শবাদী সন্তান। আমাদের কাছে এসব জিনিস মোটেই শোভা পাবে না।

মানিক—আরে জিনিসটা কি সম্ভবপর নাকি।

অম—কিন্তু আমি মানতে পারলাম না।

মা—নে নে চল, তোর বাবার বোধ হয় এতক্ষণে খাওয়া হয়ে গেছে।

শিবশঙ্কর বাবু বাড়ী আছেন ?—কপাটে টোকা পড়ল।

কে ?—ছুটে গেল মণ্টু।—ও বাবা, পশুপতি জ্যাঠামশায় তোমাকে ডাকছেন।

শিব—কি ব্যাপার এমন সময় ?

পশু—না না ভয় পাবার কিছু নেই। আপনার বুঝি এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি। যান যান ধীরে সুস্থে সেরে আসুন।

শিব—না আমি এইমাত্র খেয়েই উঠলাম। কি ব্যাপারটা আপনি বলুন না।

পশু—আরে মশায় একটা শুভ সংবাদ। তাই আপনার কাছে এই ভর দুপুরেই ছুটে আসতে হল। দীপার জন্য একটি ভাল সম্বন্ধ এসেছে, তাই শোনা মাত্রই ছুটে এলাম। তারা আমার 'থ্রু' দিয়ে সব জানতে চেয়েছে। তবে সম্বন্ধটা খুব ভাল।

শিব—তা বেশ তো আপনি দেখুন না। তবে ও এই বছর স্কুল ফাইনাল দেবে।

পশু—হ্যাঁ সম্বন্ধ আসলেই যে বিয়ে হয়ে যাবে তার কি মানে আছে। কথাটা উঠল তাই আপনাকে বলতে এলাম।

পশুপতি শিবশঙ্করের সঙ্গে একই অফিসে কাজ করে।

মানিকের এদিকে আর যাওয়া হল না। মায়ের সঙ্গে সে ভিতর ঘরে গেল।

কথায় কথায় দেরি হয়ে গেছে। বিকেলের ট্রেনে যাবে। তা মা বাধা দিযে উঠল—না না আজ কোন মতেই যাওয়া চলবে না। অনেকদিন ঘরে সিমাইগুলো পড়ে আছে। দীপার ইচ্ছা পায়েস করে সবাই মিলে একসঙ্গে খাবে। তুই কাল 'ফাষ্ট' ট্রেনে যাবি।

মানিক যে কেন চলে যাচ্ছিল সেকথা মানিকই জানে। মায়ের মুখে এ কথা শুনে মানিকের বুকে কোথায যেন একটা আনন্দের ঢেউ বযে গেল। কিন্তু প্রতি উত্তরে চুপ করেই রইল। এরই মধ্যে পিতা শিবশঙ্কর এসে দাঁড়াল।

শিব—হ্যাঁ গো শুনছ, মণ্টু কিছু বলল কে এসছিল?

শ্রী—না ও কিছু বলেনি। শুধু বললজ্যাঠামশায় এসছেন।

শি—হ্যাঁ, পশুপতিবাবু এসে বলছিল। দীপার জন্য একটা সম্বন্ধ এসছে।

মানিক একটু যেন চমকে উঠল।

শ্রী—হ্যাঁ তা কি বলছিলেন উৎসুক হয়ে শ্রীমতী মুখের দিকে চাইল।

শি—না এমন কিছু নয

শ্রী—তবু শুনি না?

শি—শুনলে তো তুমি চমকে উঠবে।

শ্রী—কিরকম?

শি—একটি ছেলে আছে। ওর বাবার সঙ্গে পশুপতি বাবুর ভাব আলাপ অনেক দিনের। সেইজন্যই পশুপতি বাবুকে একটি ভাল পাত্রীর খোঁজ দিতে বলেছেন।

শ্রী—তা বেশত মন্দ কি। তুমি বললে না কেন?

শি—তা আবার বলব না কেন, শেষটা শোন ত। শিক্ষিতা সুন্দরী গৃহকর্মে নিপুণ, বুঝলে? দাবি দাওয়া—দশ থেকে পনের। সাধারণ গ্রাজুয়েট। কোন্ গ্রামে যেন সাব ইনস্পেক্টর।

মানিক আর না মুখ খুলে পারল না। বাবাকে প্রশ্ন করল—তা এরকম পাত্রের এত দাবী!

শি—তা আর বল কেন? আজকালের বাজার ত জান না। সেদিন আমি অফিসে শুনলাম—সামান্য স্কুল ফাইনাল পাস, তাতেই তার কি ডাট আর কি দাবি। কোথাও তার দাবি পোষায় তো মেয়ে ভাল নয়, আর কোথাও

মেয়ে পছন্দ হয় তো দাবি দেওয়া নিয়ে মন কষাকষি হয়। এই করে করে তার বয়সই বেড়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক আর যে কবে বিয়ে করবে। তা এই তো সব বাজার। মানিকের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

পরদিন সকালে মানিক বেরিয়ে যাচ্ছে। মা হাতে টাকা দিয়ে বলল—এই নে তোর টাকাটা।

মানিক ব্যথা ভরা মুখে মায়ের দিকে চেয়ে বলল—তাহলে এই খামি সন্তানের কিঞ্চিৎ তোমরা গ্রহণ করলে না!—মানিক টাকাটা হাত পেতে নিল। এবং সেও যে এই শিবশংকরেরই ছেলে। টাকা ফিরে নেওয়া সেইটিই প্রমাণ করে গেল।—ঠিক আছে খাড়া-করা-আদর্শ নয়, যেদিন প্রকৃত সত্য আদর্শের অধিকারী হব সেদিন দেব। এবার বাবা মাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। ছোট ছোট ভাইবোনগা একে একে প্রণাম করতে মণ্টুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল—ভাই, ভালকরে পড়াশুনা করবে।

মণ্টু—দাদা তুমি আবার কবে আসবে?

ভারিগলায় উত্তর দিল—আসব। দীপার মাথায় হাত রেখে বলল—দেখবি, এই বছরই তোর ফাইনাল পরীক্ষা। ভালকরে লেখাপড়া করবি। মায়ের প্রতি লক্ষ্য দিবি।

দীপা চোখের জল আটকাতে পারল না। ভ্রাতৃস্নেহে মন তার উচ্ছলে উঠল।

মানিক—কি যেন মণ্টু বলল—তোর যেন কি একটা চাই? তা কি নিবি বল?

দীপা কান্নাভরা গলায় উত্তর দিতে পারল না। উত্তরটা মণ্টুই জানিয়ে দিল—দাদা, দিদি না বলছিল—আমি পাস করলে দাদার কাছ থেকে একটা ঘড়ি নেব।

আচ্ছা ঠিক আছে—বলে মানিক।

মাও কিন্তু ক্ষেত্র স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে দারুণ চাপা ব্যথা নিয়ে। যতই হোক শিবশঙ্কর তো পুরুষ। তাই সে সব কিছুকে পাশে রেখে বলে উঠল—খুব সাবধানে থেকো।

অমরেশ এসে প্রণাম করতে মানিক পিঠে হাত দিয়ে বলল—থাক থাক ভাই, আর যাই কর আমার মত কুলাঙ্গার যেন হয়ো না।

[ বললাম – মা এ স্বাভাবিক উপলব্ধি যখন নয় তখন গতানুগতিক ধাঁচে কেন লিখে যাবে ; এই বিদায় ক্ষণকে গানের মধ্যে ফুটিয়ে তোল—শিবশঙ্করের সংসার, সত্য আদর্শ, তার মাঝে মানিকের ভুল—আর এই বিদায় ক্ষণ।

'দাঁড়া তাহলে একটু ভেবে আসি,' বলে মা কুয়োতলার দিকে গেলেন। ফিরে বললেন—বাবাঃ, যা বললি তা আমার সুরাতে কুলাবে না। আমায় ছেড়ে দে, আমি কেঁদে বাঁচি। বলে মা হাসতে হাসতে লেগেছে পরক্ষণেই শুরু করলেন ]

ভাই অমরেশ, আমি তোরে
বলেছিনু কত যে-রে ;
সে ভুল আজি আমার মাঝে
কেমন করে সইব আমি !
ভেবে দেখ।
ভেঙ্গে যায় বুক
দাঁড়াতে তোদের নিকট পরে।
জানি পিতা আদর্শ তিনি
জননীর কোলে পালিত আমি।
কত স্নেহ করে রেখেছিল তারা,
কত আশা বেঁধেছিল বক্ষ পরে।

ভাব অমরেশ—
যবে দিয়েছিনু শিক্ষা তোরে
ভেবেছিনু জ্যেষ্ঠ দাদা হব আমি—
টানব ওরে আমার করে।
হায় হায়
গিয়েছে মিলায়ে সবই আমার।
পেয়েছিল ঘৃণিত ক্ষুধা—
ওরে অমরেশ,
কেমন করে ব্যক্ত করি—
কে জানিবে আর সে জ্বালায় !
দিস না রে ভাই বুকে ব্যথা !'

হয়ে দাঁড়াবি আদর্শ পিতার কাছে
আদর্শ তুই হবি রে
তাদেব মাঝে আদর্শ ভ্রাতা।

ওরে অমরেশ,
কেমন করে বলব তোরে
পারব না রে বোঝাতে আমি।
আমাব বুকের মাঝে
তুষেব অনল
সদাই আমায দগ্ধ করে।
যে বাপের সন্তান আমি
সেই বাপেব তোবাও জানি।
তোদেব কাছে কেমন কবে
দাঁড়াব আব আমি বে শুনি!

ওগো দাদা—
বলো না গো অমন কবে।
জ্যেষ্ঠ হযে থেকো তুমি
তোমার কাছে জানব
আমি আমায কনিষ্ঠ বলে।
কব দাদা আশীর্ব্বাদ তুমি—

আর বলব? বলেই মা কিছুক্ষণ থেমে আবাব সুরু করলেন—

কর দাদা আশীর্ব্বাদ তুমি
যেন দাঁড়াতে পারি
সবার মাঝে ওগো আমি।
চাইবে পিতা মুখ পানে।
ভরে যাবে বুক।
অতদিনের দুঃখ তাহার
মেলাবে এসে কোন্ খানে।

বলে যাই আমি তোরে
উঠবি জেগে—দিবি সাড়া,
বাবা মায়ের অন্তরালে।
ভুলিয়ে দিবি মানিকেরে,
গিয়েছে মানিক হরিয়ে যে রে।

ওরে মানিক
কেমন করে এমন বাণী
শুনব স্থির হয়ে যে আমি।
ডেকেছিল কে মা মা বলে?
দিয়েছিল কে আমায় সাড়া—
জাগিয়েছিল জননী বলে!
ও মানিক আমার
কে বলে হারিয়ে গেছিস!
আমার মানিক আমার ঘরে
লেগেছে তারে ধোঁয়া ধূলা
মুছে যাবে মুছে নেবে মানি।
আবার মানিক-জ্যোতি
উঠবে ফুটে।
ও মানিক
হয়েছি আগে জননী,
তুই যে আমার শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ
ও মানিক
কেমন করে ভুলব আমি!

বলে যাই আমি তোদেরে
দীপা, মণ্টু, ওরে অমরেশ
থাকবি তোরা মানিক ধরে
যাবি না কভু ভুলে।

সে যে আমার বুক-জোড়া-ধন।
কোথায় ধোঁয়া দিয়েছিল কে
লেগেছে ধোঁয়া তারই অঙ্গ পরে।

ওগো মা
শুনেছিনু তোমার কাছে,
বলেছিলে তুমি যে মা—
মানিক দাদা এসেছিল রে
আমার কোলে আগে।
ওগো মা, শুনেছিনু তোমার কাছে
বলেছিলে মা বারে বারে—
"মায়ের পেটের বোন রে দীপা
আসবে মানিক, ডাকবি তারে—
ডাকবি যেযে আদর করে।
টেনে নিবি স্নেহ ভরে।"
ওগো মা মা
পেয়েছি দাদা, বলেছ
শিখিয়েছ তুমি বলে।

শিশু কালের গল্প শুনি
বল মাগো কত কথা
কত তুমি।
কত শুনি আশ্বাস বাণী।
ওমা বুক ভরে যায়
মন ভরে যায়
আমার মানিক-রত-নদাদা জানি।
আমি দীপা তাদের বোন।
এমনি করে গড়তে হবে।
অমরেশ! অমরেশ!
সে যে আমার দাদা।

মাগো ডাকি তারে সবাই মিলে
তারে খুঁজে খুন,
ওগো মা, আমি যে তাদের বোন।

ওগো মা, ভাবি মনে বারে বারে
আমি মায়ের কোলের ছেলে
দাদা দাদা বলব আমি
দাদারা দাঁড়াবে আমায়
আমারে ঘেরে।
চিনেছি মায়ের কাছে
মা বলেছে দাদা রে!
"ওরে মণ্টু, শোন
তোরই দাদা দেখলে পরে অপরাধ
তুখে হবে খুন।"

ওরে আমার মানিক।

ওগো মা,
যে বুক ভেঙ্গেছি তোমার
কেমন করে গড়ব আমি!
মাগো আমায় বল না।
দাও মা তোমার চরণ ধূলি
নিয়ে যাব পিতার সত্য বুলি।
চরণ ধূলির বাঁধ বাঁধিব।
মা, আমি কেমন করে
আমার ভাঙ্গা বুকে
জোড়া দেব
আমায় বল না।

মানিকের যাবার কালে সকলের মধ্যে একটা বিদায় বিরহ জেগে উঠল। সেই বিদায় বিরহ কি যে মর্মান্তিক তা আর কেমন করে বোঝানো যায়।

শিবশঙ্কর কিন্তু ঐখানেই দাঁড়িয়ে। এই সব দেখে শুনে সে ভাবছে—

—এদের মাঝে আমি আগে ছিলাম। পর পর আমা হতে এতগুলি। মুহূর্তে তাকে কত চিন্তা ছুঁয়ে গেল।

মানিক বিদায় নিয়ে চলে গেলে কিছুক্ষণ সকলে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভাঙ্গা মনে যে যার কাজে একে একে চলে গেল। কিন্তু শ্রীমতীর বুকে যেন পাথর চেপে বসেছে। সে আর নিজকে সামলাতে পারছে না। ছেলেরা মায়ের ভারি মন লক্ষ্য করে মাকে নানারকম দিক দিয়ে ভুলানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা আর কতটুকু কি করতে পারবে।

দুপুরে আজ আর শ্রীমতীর খাওয়াই হল না। বাড়ীতে কেউ নেই ছেলে-মেয়েরা সব স্কুলে। অমরেশকেও কোন কারণে বাইরে বেরতে হয়েছে।

একে একে বিকেলে দিকে স্বামী সন্তান বাড়ী ফিরেছে।—মা তোমার মুখটা শুকনো কেন? তুমি কি আজ দুপুরে খাও নি? ও বুঝেছি, বড়দা চলে গেছে বলে তোমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে।

দীপার কথার মাঝে হঠাৎ অমরেশ মণ্টু এসে পড়ল।

—জান মেজদা, মা আজ দুপুরে খায়ই নি। দেখেছ মায়ের মুখখানা কি রকম শুকিয়ে গেছে।—দাদাকে সামনে পেয়ে দাবির সুর ফুটিয়ে তুলেছে বোন।

অমরেশ বলল—হ্যাঁ তাই দেখছি। এবার অমরেশ মায়ের কাছে এগিয়ে গেল—ওমা, তুমি খাও নি কেন বল? দাদার জন্য তোমার বড্ড মনটা ভেঙ্গে গেছে, না মা?

দেখা গেল মায়ের চোখের গোড়ায় জলও এসে গেছে। অমরেশ যতই সবল স্বরে ডাকুক না কেন তবুও জল দেখে দুর্বল হয়ে পড়েছে। মায়ের সন্তান দূরে যাওয়ার বেদনা অমরেশ না বুঝলেও তাকে একটু ছুঁলো। মায়ের প্রাণ এই রকমই হয় বোধ হয়। সে বলল—মা আমি বলছি তুমি খাও। যে ব্যথা দাদার জন্য পেয়েছ তোমার আরও তো দুটো ছেলে আছে। দেখ তাদের দিয়ে কি হয়।

ভারি গলায় শ্রীমতী বলল—কি বললি খোকা। তোরা যতই পূরণ কর তবুও সে যে আমার প্রথম রে। তাকে দিয়ে যে আমার অনেক আশা ছিল।

ছোট ছোট দু একটি কথার মাঝখানে শিবশঙ্করও এসে পৌছে গেল।

গৃহস্বামী বাড়ীতে আগেই এসেছে। এরা কিন্তু কেউ দেখে নি। সে তার পোশাক পাল্টে জল খাবার খেতে এসেছে।—কি হল ?

মণ্টু বলল—জান বাবা, দাদা চলে যেতে মা মা আজকে খায়ই নি।

শিব—কেন না খাওয়ার কি আছে। তোর মায়ের ওটা বাড়াবাড়ি।

এবার শ্রীমতী মুখ খুলল—হ্যাঁ তা তো বলবেই, এরই জন্ত বলে বাপ আর মা—কত তফাৎ।

শিব—তা বটে তা বটে। হ্যাঁ তোমারই যত লেগেছে, আমার তো আর লাগে নি।

শ্রী—হ্যাঁ হ্যাঁ যা লেগেছে। সেইজন্ত নিষ্ঠুরের মত টাকাগুলো ফিরিয়ে দিলে, নিলে না।

শিব—আমি নিষ্ঠুর। শুন শুন দীপা তোর মা কি বলছে।

শ্রী—দীপা আবার শুনবে কি। দীপা আর তোমাকে কতটুকু দেখল যা চিনল। এই সংসারে আমি আজ পঁয়ত্রিশ বছর এসেছি আমি তো তোমাকে নিয়ে—এই রকমের জিনিস নিয়ে প্রায় জ্বলে থাকি। না-কে হ্যাঁ করবে না, হ্যাঁ-কে না করবে না—এমনি তোমার জেদ। তোমায় নিয়ে আমি জ্বলে মরছি। আজ না দীপা বড় হয়েছে, দীপাকে শ্রোতা করেছ।

—আঃ মা চুপ কর না।

কি রে চুপ করব, তুই আবার এক তিলা ঘুঘু।—ঝাঁকার দিয়ে উঠল শ্রীমতী।

শিব—চুপ কর মণ্টু, তোর মা এখন রেগে গেছে।

শ্রী—রাখ তো তোমার ঐরকম চিমটানো কথা।

শিব—আঃ ভাল কথা বললেও দেখছি তোমার রক্ত গরম। আমি যে মানিকের টাকা নিই নি তাতে কি তোমার সায় ছিল না যে তুমি শুধু আমাকেই দোষারোপ করছ।

শ্রী—আমার থাকলেও তোমার মত অত কঠিন নই আমি।

শিব—তা এভাবে দোষারোপ না করে তুমি মানিকের সঙ্গে গেলেই পারতে বা টাকা নিলেই পারতে।

শ্রী—কেন আমার টাকার কি দরকার। টাকায় তো কোন প্রয়োজন নেই।

শিব—তবে প্রয়োজন কোন্‌টা তোমার ?

শ্রী—জান, ছেলেটা কি ভাঙ্গা মনে ফিরে গেছে। যদি ওর ভাবনায় ভাবনায় কিছু একটা অসুখ করে যায় তখন কি হবে বলত।

শিব—হ্যাঁ হ্যাঁ ও একটা পাঁচ বছরের শিশু কি না!

অমরেশ বোনকে ধমক দিল—হ্যাঁ করে শুনছিস কি। বাবাকে জলখাবার খেতে দিবি ত। দেখছিস না কথায় কথায় কথা বেড়েই চলেছে। ঘুরে মাকে বলল—মা, তোমাকে আমি খেতে বলছি না, খাও।

শিব—দীপা, তুই তাহলে তোর দাদাকে একখানা চিঠি লিখে দে—তোর বৌদিকে নিয়ে চলে আসুক।

শ্রী—দেখছিস দীপা তোর বাবা কি রকম বাজে কথা বলছে। আমি কি তাই বলছি। তোর বাবা কি আমাকে তাই বুঝল। আমি যেন তাই দেখার জন্য ব্যস্ত।

অম—এখনও মা কথা বলছ। নাও, দুটো খেয়ে নাও দেখিনি। দে দীপা, মাকে দুটো ভাত দে।

শ্রী—না এখন আর ভাত খাব না। সন্ধ্যার মুখে নয়। আমার সন্ধ্যা দেওয়া আহ্নিক কিছু হয় নি।

অম—নাও তাহলে চা খেয়ে যাও।

শ্রীমতী কাজ কর্ম সেরে সন্ধ্যাপূজার দিকে এগিয়ে গেল। ছেলে মেয়েরাও সন্ধ্যায় যে যার হাত মুখ ধুয়ে পড়ার ঘরে গেছে। শিবশঙ্করও হাতে খবরের কাগজ নিয়ে পড়ার ঘরের টেবিলে গিয়ে বসল।

মানিক ওদিকে ঘরে পৌঁছে দেখে ঋতা তখনও অফিস থেকে ফেরে নি। ও বাইরের ঘরে চেয়ারে আপন মনে বসে ছিল। স্ত্রী ঘরে ঢুকেই বলল—কি তুমি চাবি পেয়েছিলে? আমি পাশের কোয়ার্টারে মাসীমায়ের কাছে রেখে গেছিলাম।

মানিক ছোট করে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

ঋতা ভাল করে বুঝতে পারল না। কি ব্যাপার! পথের ক্লান্তি, না অন্য কিছু? কারণ তারও তো মনে একটা দারুণ ভয় ছিল। মানিক মেনে নিলেও তার বংশে আমায় বধূ বলে গ্রহণ করবে কি? শুনেছি বাবা আদর্শবাদী কর্তব্য-পরায়ণ। মা নিষ্ঠাবতী।

ভাই বোনেরাও প্রায় সেই রকম। আর ওর মেজ ভাইয়ের ত কথাই নেই সে যেন সকলকে ছাড়িয়ে যেতে চায়।

যাক অল্প সময়ের মধ্যে ঋতা নানা রকম চিন্তা করে নিল। কিছুই সে ব্যক্ত না করে জিজ্ঞেস করল—কখন খেয়ে বেরিয়েছ? কি খেয়েছিলে? এস চা জল-খাবার খাই।

মানিক—হ্যাঁ যাচ্ছি। তুমি যাও।

মানিকের মনেও ঝড় উঠেছে তখন। এই ত কতক্ষণ আগে মা বোনকে দেখে এসেছি। তাদের পাশে ঋতাকে ত চিন্তা করতে পারছি না। তারা ঠিক আদর্শ গৃহলোক। তার কারণ কি এই না-তারা গৃহস্থ ধর্ম পালন করছে আর এ চাকুরে। দাদা—দীপাও কি লেখাপড়া কম জানে। দীপাও তো লেখাপড়া শিখছে। এই বুঝি হয়। মেয়েরা বাইরে বেরুলে তাদের নারী সুলভ কমনীয়তা কিছুটা কমে যায়। তবে আমার মনে হয় নারীর প্রকৃত নারীত্ব রাখতে হলে তাকে অফিসে পুরুষের মধ্যে সমতুল্য কর্ম করা চলে না। যেখানে তার নারীত্বের কোমলতা কমতেই হবে। কোন উপায় নেই এড়িয়ে থাকার।

এক পলকে ভেসে গেল দেবেনের ঋতার প্রতি ব্যবহার। এমন কত শত ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে।

কিন্তু তেমন কাজ চাইলেই কি পাওয়া যায়। এমনিতেই কি-নাই বেগ পেতে হয় চাকরি, চাকরি করে। তার যদি আবার বাছাই করা চাই তো গরীবের চলে কি করে। অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছিল যে ঋতাকে চাকরির সন্ধানে বাইরে বেরুতে হয়েছিল। উঃ এমনই দেশের অবস্থা। গুরুতর ভাবে দেশের কথা কি ভাববে মানিক, নিজের সমস্যাই আজ তার কাছে কঠিন।

পরক্ষণেই চিন্তা এল—সে একদিন ছিল। কিন্তু আজ আর তার কি প্রয়োজন। এখন ঋতা মানিক সাহার স্ত্রী। সে এঞ্জিনিয়ার। অভাব কোথায়। একথা না হয় আমি বলতে পারি। কিন্তু আমার মত এরকম আর কজন। সমগ্র নারী জাতিকে চিন্তা করে দেখলে তো আমার এ যুক্তি খাটে না। সেই জন্য খুবই উচিত নারী শিক্ষার। সমবায় ইত্যাদি নিছক মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সংস্থান করা। তাহলেই আমার মনে হব তাদের সবই বজায় থেকে সুষ্ঠু ভাবে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আজ যদি ঋতাকে আমি আমার অর্থের ও সম্মানের উপর লক্ষ্য রেখে ঘরে টেনে নিয়ে আসি তাহলে আর কতটুকু কি হবে! সমগ্র

নারী জাতির কিছু করতে পারব না তো। আমার গণ্ডীটুকুই শুধু বজায় থাকবে। কিন্তু ঋতাও যে এতদিন চাকরি করে এসেছে। তাকেও বাধ্য করা তো কম কথা নয়। চাকরির হাওয়া বেশ ভাল ভাবেই গায়ে লেগে গেছে। আবদ্ধ জীবন তার কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

চিন্তার মাঝখান ঋতা এসে দাঁড়াল—কি ব্যাপার তুমি এমন গুম্ হয়ে বসে আছ—বাড়ী থেকে এলে, মা বাবা কি বললেন। আমার যাওয়ার কি হল, তোমার ভাই বোনেদের আসার—উত্তর করছ না যে? ও ভাই বোনের বিরহ মনকে বুঝি খুব পাগল করে তুলেছে! অনেক দিন পরে বিদেশ থেকে দাদা গেল বোনের ঐ রকমই হয়। ছোট বোন দীপার কথাটাই বোধ হয় বার বার করে মনে পড়ছে? আঃ হোক না সামনেই পূজোর ছুটি। আবার না হয় বোনের কাছে যাবে। ভাই বোনদের নিয়ে আনন্দে ঠাকুর দেখে বেড়াবে। ভাই বোন—সত্যিই তারা কত স্নেহের ধন।

মানিক কোন কথাতেই সায় দিল না। সে তার গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার কিন্তু ঋতা একটুখানি গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবল ব্যাপার ভাল নয়। নিশ্চয় বাড়ীতে বেশ কিছু জলঘোলা হয়েছে। যাক আর কিছু না বলে সে তার নিজের কাজে রত হল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। মানিক স্ত্রীকে কাছে ডাকল—ঋতা এদিকে এস। গম্ভীর ভাবটা কেটে গেছে এখন গলা কিছুটা স্বাভাবিক। স্ত্রী কাছে এসে দাঁড়াতেই বলল—বস। তোমার সঙ্গে আমার আজকে অনেক কথাই আছে।

ঋতা—একটু দাঁড়াও উনানে তরকারি তুলে দিয়ে আসছি।

মানিক—কি তরকারি! কি রান্না করছ?

ঋতা—ঐ যে ও বেলার দিকে একটা মাছ কেনা হয়েছিল। মাসীমায়েদের সঙ্গে আধা-ভাগ করেছিলাম। তা সেবেলা ওটা রান্না করা হয় নি। আমার অফিসের সময় হয়ে গেছিল চলে গেছিলাম তাও বটে আর ভাবলাম তুমি আসলে সেবেলা টাটকা মাছই রান্না করব। ও ভাল কথা তোমায় একটা কথা বলি—কাল বিকেলে বাবা প্রনবেশকে আমার এখানে পাঠিয়েছিলে। দিন কয়েক আমাকে ওখানে যাওয়ার জন্য বলে পাঠিয়েছেন।

মা—তা তুমি কি বললে?

ঋ---আমি প্রথম তো বললাম আমি কি করে যাব---তোর জামাইবাবু তো বাড়ীতে নেই। তারপর আমার অফিসের কাজের চাপও অনেক বেড়েছে সময়ও হবে না আর ছুটিও পাব না।

কয়েক কথা সেরে হাতের কাজ গুছিয়ে এবার সে এসে স্বামীর কাছে বসল। কিন্তু বসার পূর্ব্বেই ঋতা বুঝতে পেরেছিল তাকে তার স্বামী কি বলতে ডাকছে।---কৈ, কি বলবে বল?

মা --ঐ তুমি আমায় তখন জিজ্ঞেস করছিলে না বাড়ী থেকে এলে কৈ কিছু তো বললে না! সেই সব কথাই বলব আর কি।

ঋ—কি বলবে! যা বলবে তা আমি আগেই বলে দিচ্ছি।

মা—কি বল ত?

ঋ—তোমার মা বাবা আমায় মেনে নেন নি—এই কথা তো?

মা—তা যদি বল তাহলে তাই। তবে বিস্তারিত ঘটনা শুনবে না কি?

ঋ—তবে শুনিই না তোমার বিস্তারিত ঘটনা।

মা—না, আগে তো আমার বাবার সম্বন্ধে তোমাকে বলেছিলাম। তুমি তো জানই বাবা কি রকম ধরণের আদর্শবাদী। মা-ও জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবতী। কারও চেয়ে কম যায় না। তাহলে এবার বুঝে দেখ—তারা তাদের ছেলে মেয়েকে কি রকম আশা করে। আমার এরূপ বিয়েতে তাদের সেই আশায় বাজ পড়েছে।

কেন?—চমকে উঠল ঋতা।

মা,—না তুমি যা মনে করছ তা নয়। বাবার বক্তব্য হচ্ছে উপকার করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়লে কেন? এই জড়িয়ে পড়ার জন্য এই কথা কি সকলে মনে করছে না বা করবে না যে উপকার করাটা তোমার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু তোমার দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল অন্য। তুমি হয়ত শত সহস্র বার বলবে না; তা হতে পারে না। কিন্তু তারই কি বাস্তব প্রমাণ তোমার পাশে দাঁড়িয়ে গেছে না? এ কথার জবাব তুমি কাকে কি দেবে! এবার তোমার ভিতরে যাই থাক না কেন।

ঋ—তাহলে তোমার কি করা উচিত ছিল—তিনি কি বলতে চান?

ঋতা কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারছে।

মা—তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যদি উপকারী মনই ছিল তোমার তাহলে কর্তব্য কর্ম করে চলে আসাই তোমার উচিত ছিল।

ঋ—কেন, সেই সঙ্গে আমাকে বিয়ে করে আরও কর্তব্য করলে। আমার বাবা মাকে কি কম নিশ্চিন্ত করেছ!

মা—এই 'নিশ্চিন্ত'টা আমি দাঁড়িয়ে অর্থ সামর্থ দিয়ে তোমাকে সৎপাত্রে দিলে—তাতে কি আরও মহত্ব উদারতা ফুটে উঠত না? সত্য আদর্শের খাতিরে সেইটিই হত প্রকৃত কর্তব্য কর্ম্ম। এখানে যেন হয়ে গেল কি—যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক। তার পরে একটা কথা কি—ধর্ম সে তোমাদের এক আমাদের এক। আমার মা যে নিষ্ঠা নিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করে তুমি কি তাই পারবে? হয়ত এর উত্তরে জোর করে বলবে—হ্যাঁ কেন পারব না! কিন্তু ভেবে দেখ দেখিনি সেটা রুচি বিরুদ্ধ কি না? কিন্তু যদি যে যার ঠিক ঠিক পথে চলে যাওয়া যেত তাহলে কারও কিছুই বলবার ছিল না বা চেষ্টা অভ্যাসের প্রয়োজন ছিল না। রক্তের পরিচয় বলে তো একটা কথা আছে! সেটা কি ঋতা তুমি অস্বীকার করতে পারবে? যা নিয়ে তোমার জন্ম—যা নিয়ে তুমি অভ্যস্থ সেটাকে পরিবর্ত্তন করতে হলে কি নাই পরিশ্রম করতে হবে চিন্তা করো তো। তাও হয়ত ঠিক ঠিক হবে কি না!

এই রকম নানা ধরণের যুক্তি যখন বাবা আমার সামনে তুলে ধরল তখন আমার সব কিছুই ম্লান হয়ে যেয়ে মনে হল—হ্যাঁ আমি অন্যায় করেছি। এরই নাম খাড়া করা আদর্শ।

ঋতা ফিরে প্রশ্ন করল—তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত?

সে কিন্তু কথাগুলা সবই হৃদয়ঙ্গম করল। যতই হোক, সে যে শুধু শিক্ষিত তা নয়, সেও সত্য আদর্শকে ভালবাসে।

মা—না আমার এখন কি মনে হয় জান—সত্যকারের যে যাই বলুক, তুমি আমি অন্তরে কি বুঝছি। আমাদের মধ্যে কতটুকু চাওয়া পাওয়া ছিল চিন্তা কর। তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল সমস্যার সমাধান করার তাগিদ। যাক সেই জন্য এই বিয়ে আর কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক আমাদের দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই এবং এ প্রকৃত বিবাহই। আমরা আমাদের পরস্পরকে জানি যে আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে সব সুসম্পন্ন হয়েছে। তাই নয় কি? তাহলে

যে ঝড় উঠেছে সে ঝড় স্তব্ধ করতে হলে কি করা উচিত আমাদের দুজনের। সেইটিই তোমার কাছে আমি উত্তর আশা করছি—বল?

ঋতা ধীরে ধীরে সুরু করল—এখানে একমাত্র করার পথ আমি কি দেখতে পাচ্ছি জান আমার পূর্ব পরিচয় সব কিছু ভুলে যাই। ভাবি, পথের ধারে সহায় সম্বলহীন একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি শিক্ষিত দয়ালু যুবক তাকে তার বুকে স্থান দিয়েছে। সেই মন নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়া চাই তার সংসারের প্রতি। সেই সংসার তো তাকে গ্রহণ করবে না। এবার সেই মেয়েটির উচিত ধীরে ধীরে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে তাদেব উপযোগী হওয়া। প্রত্যেকেই তো মানুষ আর প্রত্যেকেরই হৃদয় আছে। একটি কুকুরও যদি মনিব চেনে, পোষ মানে তাহলে মনিব তাকে নিজের শোয়ার ঘরে নিতে আপত্তি করে না। কিন্তু প্রথমে তাকে নিছক কুকুব বলেই দেখেছিল। আজ সে তার মনিবের পাশে শোয়ার অধিকাব পেয়েছে। কেন? না তার গুণে। এবার মেয়েটির যদি সত্যই কিছু আদর্শগত ব্যক্তিত্ব থাকে তাহলে সে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করবে। তখন তার সায়ে সায় দিতে বাধ্য হবে। আমার তো মনে হয় এ ছাড়া আব কোন পথ নেই। এবার তুমি বল। আমার জ্ঞানের দৌড় যা আমি সেই মত বললাম।

মা—না যুক্তিগুলো যা দিয়ে গেলে তা অমান্য করবার মত নয়। তবে আমি আর একটা পথেব চিন্তা কবছিলাম—সেই দিক দিয়ে তুমি প্রকৃত জীবন্ত হয়ে উঠলে ক্ষতি কি ছিল।

ঋ—তাহলে তোমাবটা এবার বল?

মা—না আজকে আর না—দশটা বেজে গেল। চল খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলি।

এটা কিন্তু মানিকের নিতান্তই এড়িয়ে যাওযা। তার কারণ কি এই নয় যে নিজে ভাববার সময় নিল। আর ঋতার সত্যিকারের অন্তরের কথা না, মুখেই সান্ত্বনামূলক কতকগুলো কথা বলল—সেদিকে লক্ষ্য নিতে হবে। যদি সান্ত্বনা হয় তাহলে নিশ্চয় বাঁক ধরবে। আর অন্তরের কথা হলে বলা, করা একই হবে।

মা—তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যদি উপকারী মনই ছিল তোমার তাহলে কর্তব্য কর্ম করে চলে আসাই তোমার উচিত ছিল।

ঋ—কেন, সেই সঙ্গে আমাকে বিয়ে করে আরও কর্তব্য করলে। আমার বাবা মাকে কি কম নিশ্চিন্ত করেছ!

মা—এই 'নিশ্চিন্ত'টা আমি দাঁড়িয়ে অর্থ সামর্থ দিয়ে তোমাকে সৎপাত্রে দিলে—তাতে কি আরও মহত্ব উদারতা ফুটে উঠত না? সত্য আদর্শের খাতিরে সেইটিই হত প্রকৃত কর্তব্য কর্ম। এখানে যেন হয়ে গেল কি—যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক। তার পরে একটা কথা কি—ধর্ম সে তোমাদের এক আমাদের এক। আমার মা যে নিষ্ঠা নিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করে তুমি কি তাই পারবে? হয়ত এর উত্তরে জোর করে বলবে—হ্যাঁ কেন পারব না! কিন্তু ভেবে দেখ দেখিনি সেটা রুচি বিরুদ্ধ কি না? কিন্তু যদি যে যার ঠিক ঠিক পথে চলে যাওয়া যেত তাহলে কারও কিছুই বলবার ছিল না বা চেষ্টা অভ্যাসের প্রয়োজন ছিল না। রক্তের পরিচয় বলে তো একটা কথা আছে! সেটা কি ঋতা তুমি অস্বীকার করতে পারবে? যা নিয়ে তোমার জন্ম—যা নিয়ে তুমি অভ্যস্থ সেটাকে পরিবর্ত্তন করতে হলে কি নাই পরিশ্রম করতে হবে চিন্তা করো তো। তাও হয়ত ঠিক ঠিক হবে কি না!

এই রকম নানা ধরণের যুক্তি যখন বাবা আমার সামনে তুলে ধরল তখন আমার সব কিছুই ম্লান হয়ে যেয়ে মনে হল—হ্যাঁ আমি অন্যায় করেছি। এরই নাম খাড়া করা আদর্শ।

ঋতা ফিরে প্রশ্ন করল—তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত?

সে কিন্তু কথাগুলা সবই হৃদয়ঙ্গম করল। যতই হোক, সে যে শুধু শিক্ষিত তা নয়, সেও সত্য আদর্শকে ভালবাসে।

মা—না আমার এখন কি মনে হয় জান—সত্যকারের যে যাই বলুক, তুমি আমি অন্তরে কি বুঝছি। আমাদের মধ্যে কতটুকু চাওয়া পাওয়া ছিল চিন্তা কর। তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল সমস্যার সমাধান করার তাগিদ। যাক সেই জন্য এই বিয়ে আর কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক আমাদের দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই এবং এ প্রকৃত বিবাহই। আমরা আমাদের পরস্পরকে জানি যে আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে সব সুসম্পন্ন হয়েছে! তাই নয় কি? তাহলে

যে ঝড় উঠেছে সে ঝড় স্তব্ধ করতে হলে কি করা উচিত আমাদের দুজনের। সেইটিই তোমার কাছে আমি উত্তর আশা করছি—বল ?

ঋতা ধীরে ধীরে সুরু করল—এখানে একমাত্র করার পথ আমি কি দেখতে পাচ্ছি জান আমার পূর্ব পরিচয় সব কিছু ভুলে যাই। ভাবি, পথের ধারে সহায় সম্বলহীন একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি শিক্ষিত দয়ালু যুবক তাকে তার বুকে স্থান দিয়েছে। সেই মন নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়া চাই তার সংসারের প্রতি। সেই সংসার তো তাকে গ্রহণ করবে না। এবার সেই মেয়েটির উচিত ধীরে ধীরে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে তাদের উপযোগী হওয়া। প্রত্যেকেই তো মানুষ আর প্রত্যেকেরই হৃদয় আছে। একটি কুকুরও যদি মনিব চেনে, পোষ মানে তাহলে মনিব তাকে নিজের শোয়ার ঘরে নিতে আপত্তি করে না। কিন্তু প্রথমে তাকে নিছক কুকুর বলেই দেখেছিল। আজ সে তার মনিবের পাশে শোয়ার অধিকাব পেয়েছে। কেন ? না তার গুণে। এবার মেয়েটির যদি সত্যই কিছু আদর্শগত ব্যক্তিত্ব থাকে তাহলে সে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করবে। তখন তার সায়ে সায় দিতে বাধ্য হবে। আমার তো মনে হয় এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এবার তুমি বল। আমার জ্ঞানের দৌড় যা আমি সেই মত বললাম।

মা- -না যুক্তিগুলো যা দিয়ে গেলে তা অমান্য করবার মত নয়। তবে আমি আর একটা পথের চিন্তা করছিলাম—সেই দিক দিয়ে তুমি প্রকৃত জীবন্ত হয়ে উঠলে ক্ষতি কি ছিল।

ঋ—তাহলে তোমারটা এবার বল ?

মা—না আজকে আর না—দশটা বেজে গেল। চল খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলি।

এটা কিন্তু মানিকের নিতান্তই এড়িয়ে যাওয়া। তার কারণ কি এই নয় যে নিজে ভাববার সময় নিল। আর ঋতার সত্যিকারের অন্তরের কথা না, মুখেই সান্ত্বনামূলক কতকগুলো কথা বলল---সেদিকে লক্ষ্য নিতে হবে। যদি সান্ত্বনা হয় তাহলে নিশ্চয় বাঁক ধরবে। আর অন্তরের কথা হলে বলা, করা একই হবে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা চলে আসছে। তাই সব দিক থেকে মনকে গুটিয়ে অমরেশ এবার লেখাপড়ায় খুব মন দিল। এখন তার কাজের মধ্যে দুই ভাই-বোন ও সনৎ শিবানীকে পড়ানো ও নিজেকে ফাইনালের জন্য তৈরী করা।

ওদিকে মানিক যাওয়ার পর থেকে কোন চিঠি দেয় না। সেইটা শ্রীমতী দীর্ঘদিন লক্ষ্য করে আজ শিবশঙ্করকে বলতে গিয়েছে। শিবশঙ্করও এই চিন্তাই করছিল কিন্তু সে ব্যক্ত করেনি শ্রীমতীরই ভয়ে। তাই বলে আজ শিবশঙ্কর লুকায় কোথায়। শ্রীমতীই যে বলতে এসছে।

শ্রীমতীর পায়ের শব্দেই শিবশঙ্কর পরিষ্কার বুঝতে পারল আজকে ডাক পিয়ন পেরিয়ে যাওয়ার পরই সে এ ঘরে কেন প্রবেশ করছে। শিবশঙ্কর একটু দমে গেল—এই তো রে এই বার একটু ঝামেলায় ফেলল। এরা বোঝালেও বুঝবে না, মাঝখান থেকে আমাকে দোষারোপ করবে। যাক শিবশঙ্করের ভাবা ভুল হল না।

শ্রী—কৈ দেখলে আজও মানিকের চিঠি এল না। ওর যেন এবারের যাওয়াটাই আমার ভাল লাগল না। আমাদের সঙ্গে যেন আর সম্পর্কই রাখবে না—এই রকমই ওর মনভাব।

শি—আঃ তা কেন বলছ। এ কি কথা তোমার। তাহলে তুমি কি বলতে চাও? তোমার বক্তব্য জানালেই পারতে আমাকে না ডেকে। ছেলেকে বড় করে মানুষ করে দিয়েছ। তোমার কর্তব্য তুমি করেছ। এবার তার জ্ঞান বিবেকে সে যাকে কর্তব্য বলে স্থির করবে তাই করবে। এ নিয়ে এত মাথা ঘামাঘামি কেন? আরও বাকী যে কর্তব্য কর্ম পড়ে আছে তার দিকে অগ্রসর হও।

শ্রী—হ্যাঁ তোমার মতন আর কজন! হও বললেই কি হওয়া যায়! ছেলেকে এত কষ্ট করে মানুষ করে সে যদি অকস্মাৎ কারও হয়ে যায় তাহলে মনের অবস্থাটা কি হয় বলত?

শি—আঃ এই তো তুমি পুরো স্বার্থ নিয়ে কথা বলছ। অন্যের কেন হবে, সে তার স্ত্রীর হয়েছে।

শ্রী—স্ত্রীর হয়েছে!

শি—তবে! আমি তোমার হইনি, কি বলছ তুমি?

শ্রী—আমি তো আর খৃষ্টান মেয়ে নই।

শি—এখানে জাতের কথা হচ্ছে কি? তোমার শুধু বলার কথা এই যে তুমি তাকে দেখে সম্বন্ধ করে বিয়ে দাও নি। সে তার নিজে দেখে বিয়ে করেছে। কিন্তু বিয়ে করেছে—স্ত্রী তার। আমার মা বাবা যেমন আমায় দেখে বিয়ে দিয়েছিল তেমন তোমায় নিয়ে ঘর করেছিল। আর আমিও যেখানে যা পাওয়ার ঠিকই পেয়েছিলাম। ভেবে দেখ—মানিক একটা যৌতুকের আংটি পর্যন্ত পায় নি। আর তুমিও ত র স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করছ না। কিন্তু এ-ও বিবাহ ও-ও তাই—একথা তো তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

শ্রী—তা কেন করব? আমাদেব সামাজিকতা ছিল—আনুষ্ঠানিক সেরে নিষ্ঠা নিয়ে বিয়ে হয়েছিল।

শি—আঃ কি মুশকিল! ওর না হয় সবগুলো হয নি, কিছু তো হয়েছে। এ সে আর ঠিক প্রেম করে বিয়ে করা নয়। জোর বলতে পাব মানিক যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং মেয়েটিও দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে ছিল।

শ্রী—তোমার কথা আমি শুনতে চাইনি—অমনি ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। হাতে হাত দিল না, গা ঘেঁসে দাঁড়াল না—কোথাও কিছু নেই অমনি হয়ে যায়!

শি—আঃ তা না হয় হয়েছিল। কিন্তু শেষ কথায় কি বলছে—মেয়ের বাপ এসে বিয়ের প্রস্তাব করে এবং সেই সঙ্গে মা, ও তারা আবেদন করে—আমাদের মত দীন দুঃখীকে উদ্ধার কর; তুমি বাবা ঋতাকে তোমার জীবন সঙ্গিনী কর। এই যে কতকগুলো পয়েণ্ট দেখিয়েছে এতে কি বলতে পার তুমি। এতে আমাদের বলার মত কিছু নেই। শুধু ভাবার মতই আছে। একটা কথা কি খুব ঠিক নয় শ্রীমতী, যে ছেলের পাতে তুমি মাছের মুড়ো দিয়েছ কিসের লোভে? না ছেলে তোমার ঘি খেয়ে শরীর পুষ্ট করবে। ছেলে কাঁটা শুদ্ধ খেয়ে ফেলল। এবার বুঝ সেই কাঁটা গলায় বিঁধে কষ্ট দিচ্ছে। যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে না হয় গলা বাঁচাল কিন্তু পেটকে বাঁচাবে কি করে! ঘি সহ্য করাই পেট তার। কাঁটা চিবিয়ে খাওয়া তার সহ্য হবে কি করে! তা সে যখন খেয়েছে তাকেই বদহজমটা বুঝতে দাওনা। এই নিয়ে মাতামাতি করে জিনিসটাকে হাল্কা করে দিচ্ছ কেন? তোমার অতিরিক্ত ব্যাকুলতা দেখলে মানিক যে অন্যায়টা করেছে তা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাবে না? তাকে তার অন্যায়টা বুঝতে দাও।

শ্রীমতী স্বামীর সব কথাগুলো শুনে যাই হোক মোটামুটি সব মেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আজ ঋতা অফিস থেকে ফিরেছে। মানিককে চা জলখাবার দিয়ে নিজেও নিয়েছে। ঝিকে বলল—ও গোবিন্দর মা, উনানে চারটি কয়লা দিয়ে দাও, আমি ততক্ষণ তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে আসি।

চায়ের টেবিলে এসে ঋতা বসেই প্রশ্ন করল—কি হল, আমি যা বললাম তা তুমি কি স্থির করলে?

মানিকও কিন্তু এরই অপেক্ষায় ছিল—ঋতা নিজে মুখে কিছু বলে কি না? বলল—হ্যাঁ, তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। তবে আমি একটা অন্য লাইনে যেতে চাইছিলাম।

ঋ—বল, তুমি কি ভেবেছ।

মা—আর কিছু নয়, ছোট খাট একটা আদর্শ স্কুল খুললে হয় না কি? ছোট ছোট কতকগুলো ছেলে মেয়েদের নিয়ে স্কুলটি হবে এবং তুমি হবে তার কর্ত্রী। একা যদি না পার তো সহকর্মী নিতে পার। শিশু দেশের ভবিষ্যৎ। ছোটদের গড়ে তুলবে নিজের হাতে। সত্য আদর্শই সব সংগঠনের মেরুদণ্ড। তাই নয় কি ঋতা?

ঋ—হ্যাঁ আমি রাজী। ভালত, ওটা নিজের স্বাধীন সংগঠন। তবে তার পিছনে তোমাকে হতে হবে 'লিডার'। টাকা পয়সা তো লাগবে এতে। তা কোন্খানে স্কুল হবে? জমি কেনা, বাড়ী তোলা এ সব অনেক কিছুই আছে যে।

মা—তোমার চাকরির টাকা তোমার কাছে কি আছে টাছে?

ঋ—আমার কাছে আর কোথায়। সেবার প্রণবেশ এল ওকে কিছু দিতে হল। তারপর এদিক ওদিক করে খরচ হল। হয়ত শ'ছয়েক টাকা বেরতে পারে।

মা—তা ভালই ত। আমি যে বাবাকে শ'তিনেক টাকা দিতে চেয়েছিলাম, সেটা বাবা নেন নি। তা আমার কাছে আছে।

ঋ—ও তাই নাকি। বাবা টাকা নেন নি? কেন, নেন নি কেন?

মা—থাক ওসব কথা এখন পরে হবে। স্কুলটা মায়ের নাম দিয়ে হবে আর প্রথম স্কুল উদ্বোধন করবে বাবা এসে। কেমন, এই ভাল হবে না কি?

প্রথম ঋতার মনে কোথায় যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। ঝপ করে সে নিজেকে সামলে নিয়ে সে যে সব কথা নিজে বলেছিল সেই খাদেই পড়ে গেল। —উনি তো খুব ভালই ভাবছেন। আমি এর চেয়ে কত তলার কথাই ভেবেছিলাম। নারীর প্রকৃত ধর্ম কি? তার বিবাহের পরে তার মান সম্মান প্রতিপত্তি যোগ্যতা বিচয় সবই তার শ্বশুর কুলের উপর নির্ভর করে। সেই রকম জিনিষই কি আজ আমার জীবনে এগিয়ে এসেছে না! মুহূর্তে চিন্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিল—খুব খুব ভাল কথা। এই তালে আমারও বাবাকে দেখা হয়ে যাবে। উনি আসবেন তো?

মা—তা না আসলে আমাকে হয়ত যে হোক করে যেয়ে আন্‌তে হবে এবং সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে।

দুজনে এক মত হয়ে এবার তারা কাজে অগ্রসর হল।

আজ অনেক দিন পর মানিক তার বাবাকে চিঠি লিখতে বসেছে। এতদিনে অমরেশের ফাইনাল পরীক্ষা নিশ্চয় হয়ে গেছে। ভাই বোনদের বাৎসরিক পরীক্ষা হল, কি না হল এবং হয়ে থাকলে কার যে কি হল সে সব কোন খবরই আসে নি। যাক গে, ওরা দেওয়ার আগে আমি ওদিকে লিখি—এই বলেই মানিক কলম ধরল—

পরম পূজনীয় বাবা—

আজ অনেক দিন হল আপনাদের ছেড়ে আমি এখানে এসেছি। আমার আগেই পৌছানো সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি যে কেন এতদিন চুপ করে আছি তা নিশ্চয় আপনাদের জানতে বাকী নেই। আজকে ভাই বোনদের কথা মনে করে চিঠি লিখতে বসলাম। ওদের প্রত্যেকের খবরাখবর আমাকে জানাবেন। আমি খুব উদ্‌বিগ্ন আছি। ভেবেছিলাম আমি আপনাদের অপদার্থ অযোগ্য ছেলে, আর কোন দিনই পরিচয় দেব না। কিন্তু ঐ কথা মনে করে আজকে হঠাৎ মনে হল আমি কি ভাই বোনদের কাছেও সেই অযোগ্য? বাবার কাছেই আমি না হয় আদর্শ সন্তান হতে পারলাম না। তাই বা মনে করি কি করে! ভাবতে গিয়ে কোথায় যেন ধাকা পেলাম। মানুষের জীবনে কি ভুল হয় না? আমার কাছে যেটা ঠিক সেটা বাবার কাছে ভুল বলে ধরা

পড়েছে। আমি যদি সেই ভুল ঠিক করবার চেষ্টা করি আর বাবাকে যদি সেই চেষ্টায় সাহায্যকারী হতে বলি, তবে কি বাবা আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন? না না, সে যে আমার বাবা। কখনই করতে পারেন না। যিনি সত্য আদর্শকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন, তিনি আমার বক্তব্য জানলে—উদ্দেশ্য বুঝলে নিশ্চয় সাহায্য করবেন।

যাই হোক, পরের চিঠিতে বিস্তারিত সব জানাব। সকলের খবর দিয়ে চিন্তামুক্ত করবেন। ও ভাল কথা, সেদিন যে পশুপতি জ্যাঠামশায় দীপার সম্বন্ধের কথা বলে গেলেন, তার কতদূর কি হল? আপনি ও মা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেন। ভাই বোনদের স্নেহাশীর্বাদ জানাই। ইতি—আপনার হতভাগ্য সন্তান—

মানিক

অফিস ফেরৎ মানিক সঙ্গে চিঠিটা এনেছে। বাবাকে এই চিঠিটা লিখলাম—বলে স্ত্রীকে চিঠি পড়ে শুনাল। কেমন হয়েছে বলত?

ঋ -মন্দ কি, ভালই ত হয়েছে।

মা—তাহলে এইটিই কালকের ডাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার এতে কিছু বলবার নেই?

ঋতা সম্মতি জানাল। তারপর সাধারণ পাঁচটা কথায় তাদের সময় কাটতে লাগল।

অকস্মাৎ এতদিন পর বড় ছেলের চিঠি পাওয়াতে শিবশঙ্কর একটু বিস্মিত হল। তবে বাইরে থেকে দেখে তার ভাব বোঝা দায়। উচ্ছ্বাস বলে কোন বালাই নেই তার জীবনে। স্ত্রী শ্রীমতী বেশী ছেলের চিঠি চিঠি করে পাগল হয়। তাই স্ত্রীর সামনেই চিঠিটা খুলে পড়তে সুরু করল। পড়া শেষ হলে স্ত্রীকে প্রশ্ন করে—কি বুঝলে গো?

শ্রী—কি আবার বুঝব। কি যে আদর্শ গড়ে তুলবে কে জানে। ও-ই জানে ওর আদর্শ।

শি—না তা আর বলছ কেন। নিশ্চয় সে একটা কিছু করবে নইলে এভাবে চিঠি লিখবে কেন।

এর মধ্যে অমরেশ এসে হাজির হল। শিবশঙ্কর সস্নেহে ডাকলেন—এই যে অমরেশ তুমি এসে গেছ।—বলেই মেজ ছেলের দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিল।

খোকা এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে বলল—বাঃ বেশত, দাদা ত ভালই লিখেছে।

শিবশঙ্কর এই নিয়ে একটু চিন্তায় পড়ল—একে কি উত্তর দেওয়া যায়। এই ভাবে দু' এক দিন কেটে গেল। শ্রীমতী মাঝে একবার জিজ্ঞেস করল—কি গো ছেলের চিঠির উত্তর দিলে?

শি—না লেখা হয় নি। কি যে উত্তর দেব তাই চিন্তা করছি। তুমিই বল না কি লিখব।

শ্রী—ও চিঠির উত্তর আমি কি বলব। তুমি কি বলবে দেখ।

শি—না তবু—একটা কিছু!

শ্রী—তবু আর কি—ওর কথায় সায় দিয়ে সান্ত্বনা-মূলক কিছু একটা লেখ।

শিবশঙ্কর আজ সময় করে ছেলেকে চিঠি লিখতে বসেছে—

কল্যাণীয় মানিক—

অনেকদিন পর তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি অমরেশের খবর জানিতে চাহিয়াছ। খোকা অল্পের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পায় নাই। ওর উপর কলেজের সকলেরই খুব আশা ছিল। তবে হ্যাঁ উহাকেও একটা খুব দোষ দেওয়া যায় না। খেলাধূলা, ইউনিয়ন, ভাই বোনকে পড়ানো সর্বদিক সামলাইতে হয় উহাকে' আর দীপা মণ্টু ওরাও বাৎসরিক পরীক্ষায় মোটামুটি ভাবে পাশ করিয়াছে। দীপা এবার স্কুল ফাইনাল দিবে। সেই জন্য ওর এই রকম করায় বেশী একটু চিন্তায় আছি। আর এই নিয়ে খোকাও একটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের এখানে সকলে কুশল। তোমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুণ। ইতি—

তোমার বাবা

আজ রবিবার মানিক বাড়ীতেই রয়েছে। সকালে প্রণবেশ এসে হাজির হল। এর আগেও তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সেদিন মানিক না থাকায়

কোন কথা হয় নি। আজ রবিবার দেখে সকালেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। ইচ্ছা দাদাবাবুর সঙ্গে কথা বলে দিদিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। বাবা এই রকমই বলে দিয়েছে।

—'কি সকালবেলায় প্রণবেশ যে কি খবর ?' মানিকের সম্মুখেই পড়ে গেল প্রণবেশ। প্রণবেশও সসম্মানে দাদাবাবুকে প্রণাম করে ফিক্ করে হেসে দিল—দিদিকে নিয়ে যাব। বাবা পাঠিয়ে দিল।

মানিক—দিদিকে নিয়ে যাবে। হঠাৎ, কি ব্যাপার ?

প্রণবেশ—ওদিন নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলাম, আপনি ছিলেন না। মা অনেকদিন দিদিকে দেখে নি বলে সেইজন্য দু'একদিনের জন্য নিয়ে যেতে চাইছে।

মা—তা তুমি আজই নিয়ে যাবে নাকি ?

প্র—না, বাবা আজকে আপনাকে বলার কথা বলে পাঠাল। আপনি সুবিধা সুযোগ বুঝে যবে বলবেন তবে নিয়ে যাব।

এদের শালা ভগ্নিপতে এতক্ষণ ধরে যে কথা চলছে ঋতা ভিতর থেকে সবই বুঝতে পারছে। কিন্তু আর আর ছুটে আসে নি। তার মনে এখন নানা রকমের ঝড় উঠেছে। তাই সে বেরিয়ে আসার অবসর পায় নি।

যাক এবার মানিকই ডাকল—এই যে শুনছ, প্রণবেশ এসেছে। তোমায় খুঁজছে। ও অনেকক্ষণই এসেছে।

ঋতার বুকটা আরও যেন মোচড় দিয়ে উঠল। কৈ আজকে তো তার ভাইকে আদর অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল না। না না না, একি আমি ভাবছি। এ তো আমার ভাবা অন্যায়। যে যেমন তার তেমন থাকাই ভাল নয় কি ? ভাইয়ের অসুখে ডাক্তার দেখাতে না পেরে টাকার সাহায্য নিতে এসেছিলাম। সেই জিনিসটা আজ এতদূর গড়িয়েছে। উদ্ধার ! আজ বামুন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ালে মানাবে কেন ? সেইজন্য যে যেমন তার তেমন থাকাই উচিৎ নয় কি ! এইরকম নানা রকম ভাঙ্গা গড়া ঋতা অল্প সময়ই করে বেরিয়ে এল।

ঋতা—কিরে প্রণবেশ, তুই এমন সময় ?

প্র—তোমাকে সেদিনকে নিতে এসেছিলাম না, তা জামাইবাবু না থাকার জন্য তো নিয়ে যেতে পারি নি, তাই আজ রবিবার দেখে বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে।

শ্ব—এখন কি করে যাব রে। এখন কি যাওয়া সম্ভব। তোর জামাইবাবু কি বলল?

হঠাৎ দরজায় ঘা পড়ল—বাবু বাড়ীতে আছেন?

হ্যাঁ, কি ব্যাপার, তুমি এমন সময় মহেন্দ্র?—বলে মানিক এগিয়ে গেল।

মহেন্দ্র মানিকের অফিসের একজন কর্মচারী। বহুদিনের পুরানো লোক।

মহেন্দ্র—না আপনি যে সেই একটা জমি দেখতে চেয়েছিলেন। তা আমি একটা ছকে খুব ভাল জমি পেয়ে গেছি।

মা—কোথায়?

ম—এই আমাদের যে অফিস আছে না; তার দক্ষিণ দিকে। জানেন বাবু, সেটা জমি নয়। এক ভদ্রলোকের বাড়ী ছিল—সে তার দেশের বাড়ীতে চলে যাচ্ছে। তা আমি খবর পেলাম তিনি ওটা বিক্রী করে দিচ্ছেন।

মা—তা বাড়ীটা কি রকম তুমি দেখেছ?

—হ্যাঁ দেখেছি।

—কেমন?

—সামনে একটা লম্বা বারান্দা। আর দু'খানা কামরা আছে।

—কি রকম—ছোট ছোট ঘর?

—না কামরা দুটো মোটামুটি মন্দ নয়। বড় হল ঘর না হলেও বড়। আর পাশে একটা রান্না ঘর আব ভাঁরার ঘর। আর সামনে কাঠা পাঁচেক জায়গা পড়ে আছে।

মানিক—জলের ব্যবস্থা আছে?

মহেন্দ্র—কিন্তু বাবু পাকা ছাদ নয়, টালির।

মা—আচ্ছা কি রকম কি দর দাম বলছে?

ম—আমার তো মনে হয় আপনি আগে দেখে আসবেন চলুন। আগে পছন্দ তার পরে দাম।

—আচ্ছা তুমি এখন এস। গেলে বিকেলের দিকে চারটের সময় যাব। তাহলে আসবে, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

ভিতরেএসে স্ত্রীকে ডাকল মানিক—শুনছ কোথায় গেলে?

—হ্যাঁ এই তো।—শ্বেতা এগিয়ে এল।

—প্রণবেশ কৈ, চলে গেল?

—হ্যাঁ চলে গেছে।

—কি বললে তাকে?

—বললাম আজকে তো যা, তোর জামাইবাবুর বাইরের লোক এসেছে, কথায় ব্যস্ত। দেরি হয়ে যাবে তোর, চলে যা।

মা—তা তাকে চা জল-খাবার দিলে, না এমনিই পাঠিয়ে দিলে?

খ—হ্যাঁ আমি তোমারই সামনে তখন তো চা বিস্কুট দিয়ে এলাম।

—তা আর কি বলল তোমাকে?

—বাবা ওর হাতে কটা টাকা চেয়েছে।

—তা দিলে?

—কেন দেব? আর তো পাওনা ওদের নেই আমার কাছে। মোটামুটি হিসাব করে নিয়েছি ওদের মাসে এই দেব, তার বেশী চাইলে পাবে কোথা থেকে।

—তা ওদিকে কত কি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছিলে যেন?

খ—কেন, ও তুমি ভুলে গেছ। পাই শ' আড়াই মতন। তা ওদের এক'শ করে দেব বলেই স্থির হল যে যতদিন না প্রণবেশের একটা সুব্যবস্থা হয়। হ্যাঁ প্রণবেশ কিন্তু এবার ওর চাকরির কথাও বলছিল। তা সবে তো স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। হাতের কাজও কিছু জানা নেই। এই বাজারে কোথায় কি পাবে!

মা—হ্যাঁ আমি ওর কথা ভাবছি। আমাদের কোম্পানী তো মাঝে মাঝে ক্লার্ক নেয়। তবে প্রণবেশ তো ক্লার্কের কাজ পেতে পারে।

খ—হ্যাঁ ওর বেশী এই বিদ্যায় আশা করা যায়।

মা—হ্যাঁ আমি চেষ্টায় আছি, খবরও রাখি, ডি. ই নিশ্চয় আমার কথা ফেলবেন না। দেখি কতদূর কি করা যায়। হ্যাঁ ভাল কথা, মহেন্দ্র এসে খবর দিয়ে গেল—একটা কাছেই জমির খোঁজ পাওয়া গেছে। বাড়ীও দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক দেশের বাড়ীতে চলে যাবেন সব শুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে। তা আজকে বিকেলে আমরা দেখতে যাব। তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

খ—হ্যাঁ কাছে হলে ত খুবই ভাল হয়। তবে জল আলো সব আছে তো?

মা—বলছে তো তাই, তবে ছাদ কিন্তু টালির।

খ—হ্যাঁ সব চইলে পাব কেন। অনেক কিছুই তো নিজেদের মত করে নিতে হবে।

মানিক একরকম তৈরী হয়েই ছিল। মহেন্দ্র আসতে একসঙ্গে সকলে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মানিক চাকরকে চাকর জ্ঞান করে না। এ হল প্রকৃত শিক্ষার গুণ। তবে বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এটা পাওয়া বটে।

যাক জায়গায় গিয়ে পাঁচটা আলোচনা, কথাবার্তা, পছন্দ অপছন্দ অনেক কিছুই হল। শেষে মানিক স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল—কি গো তা, তোমার পছন্দ ? তাহলে এটা ঠিক।

স্ত্রী—হ্যাঁ মন্দ কি। যে দুখানা ঘর আছে তার একটায় অফিস রুম করব! আর বাকী ঘর ও দালান নিয়ে ছেলে মেয়েদের বসার ঘর হবে। আর সমনে যে মাঠটা আছে ঐ মাঠে ওরা খেলাধুলা করবে। এক পাশে ছোট করে একটা ফুলের বাগানও করা যেতে পারে।

মা—তা ত না হয় হল, এবারে দর দাম শুন

স্ত্রী—কত ?

মা—না মহেন্দ্র আমাকে তেমন কিছু বলেনি এখনও।

স্ত্রী—তা-তা না শুনে তুমি এত হামলা হামলি করছ কেন ? কি মহেন্দ্র, তুমি কি কিছু শোন নি ?

মহেন্দ্র—না দিদিমণি, আমি তো সঠিক কিছু শুনি নি, তবে কি একটা হাজার বিশেক টাকার মতন শুনছিলাম বটে।

স্ত্রী—হুঁ ! তাহলেই তো হয়েছে। তোমার দাদাবাবু আর আমাকে বিক্রি করলেও তো অত হবে না।

মহে—মা দিদিমণি, ভাল জায়গাটা, নিয়ে নেন। স্কুল করবেন বলছেন, পাড়ার পাঁচটা ছেলে মেয়ে পড়াশুনা করবে।

স্ত্রী—কোথা থেকে নেব ! কোথায় অত টাকা পাব !

মা—না, তা তুমি ভাবছ কেন ? মহেন্দ্র যখন উৎসাহিত করছে তখন ও নিশ্চয় লোন টোন তুলে কিছু ব্যবস্থা করে দেবে।

কথাটা মানিক রহস্যচ্ছলে মহেন্দ্রকে বলল। কে জানত সে ঠাট্টা এত বড় সত্য হয়ে দাঁড়াবে ! এইখানেই কি বলা যেতে পারে না যে প্রকৃত সত্যের দিকে ঈশ্বরের সকরুণ দৃষ্টি থাকে। মহেন্দ্র কথাটাকে লুফে নিয়ে বলল- তা দেব এখন দিদি।

মা—সে কি মহেন্দ্র, তুমি টাকা কোথায় পাবে!

মহে—কেন দাদাবাবু, আমার ছেলে মানুষ হয়ে গেছে, মেয়ের বিয়ের চিন্তা অনেককাল আগেই চুকে গেছে দেশের জমি জমাও. জানেনা তো, কিছু আছে। আর চাকরি ত এ অফিসে দাদাবাবু অনেক দিনই হল। আমি নিশ্চয় কম্পানীর ঘরে কিছু লোন পাব? তা আপনি আমার লোনের একটা ব্যবস্থা করুন, আমি হাজার পাঁচেক টাকা দেব।

মা—সে কি মহেন্দ্র, তুমি অত ট্রাকা দেবে! তা কি করে হতে পারে! তোমার ত ঐ অবস্থা মাইনার চাকবি রিটাযার করলে তো টাকার প্রয়োজন আছে।

শ্ব—তা থাক না কেন, আমরা পরে শোধ করে .দব। কি বল মহেন্দ্র?

মহে—না দিদিমনি আমি তো আগেই বললাম—আমার কিছু জমি জায়গা আছে আমার কাজ কর্মও হয়ে এসেছে। আর—আর একটা কথা কি জানেন ত, ধর্ম কাজে মন দিতে পারে! এ তো আব কিছু নয় একটা লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এ রকম খরচের সুযোগ কে পায়।

মা—তা তোমার ছেলে বৌ আপত্তি তুল:ব না?

মহে—না না খগেন আমার সে ছেলেই নয়। সে শুধু আমায বলে—বাবা তুমি আমায আশীর্বাদ কর আমি যেন নিজে খেটে রোজকার করতে পারি। তোমার পয়সা আমাকে যেন না নিতে হয। বলেছিলাম—কেনরে, আমার রিটায়ারের টাকা? বলে কি জানেন দাদাবাবু—কেন তুমি মা—তোমাদের শেষ জীবনের যা ভাল লাগে তাই করবে। তা দিদিমণি এধরনের খরচের কথা খগেন শুনলে নিশ্চয আরও আনন্দ পাবে।

শ্ব—আচ্ছা মহেন্দ্র, তোমার ছেলে যেন কতদূর পড়েছে?

মা—কেন তুমি জান না—ওর ছেলে ম্যাট্রিক পাস করে হঠাৎ চাকরি পেয়ে চলে যায়। কি মহেন্দ্র, আমি ঠিক বলছি ত?

মহে—হ্যাঁ দাদাবাবু।

মা—তা বেতন কত পায়?

মহে—তা শ'দুয়েক টাকা মতন পায় বোধহয়, দাদাবাবু।

মা—দু'শো পায়! কি চাকরি?

ম—এমন তো দেখাব মত কিছু নয়, ঐ যে লাইনে আলো টালো হয়, তাতেই হাত পাকা ওর।

সেদিন আর বিশেষ কিছুই কথা হয় নি। যে যার মত বাড়ী ফিরল, মহেন্দ্রকে শুধু যাওয়ার সময় বলে দেওয়া হল—তাহলে মহেন্দ্র তুমি মানিকের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলো।

এবার মানিক মহেন্দ্রর উপর যেন একটু ভার দিয়েই কথা বলল। আর মহেন্দ্রর আন্তরিকতা আরও বেড়ে গেল।

অফিস ফেরৎ মানিক চিঠির বাক্সে বাবার চিঠি পেয়েছে। হঠাৎ মানিকের বুকটা ধস করে কোথায় যেন নেমে গেল---কি জানি বাবা কি লিখেছে! ঋতা সঙ্গেই ছিল। কাপড় পাল্টে চা নিয়ে এসে দেখে স্বামী তার সেই একই ভাবে চেয়ারে বসে আছে। নীরব নিশ্চল।

---কি হল অমন করে বসে আছ?

—হ্যাঁ এই মাত্র বাবার একখানা চিঠি পেলাম।

ঋতা উৎসাহিত হয়ে বলল—কি লিখেছেন বাবা?

—এই নাও, পড় না। পড়লেই বুঝতে পারবে।

আবেগ উচ্ছ্বাস বিহীন ছোট চিঠি খানায় কোথায় উৎসাহের লেশমাত্র নেই। ঋতা পড়ে একটু স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—কি রকম লাগল চিঠিখানা?

—না মন্দ কি, ভালই ত। হ্যাঁ, তোমার কেমন লাগল?

মা—না, লাগল মানে—আমি লম্বা চিঠি লিখেছিলাম তার উত্তরে উনি এইটুকু লিখেছেন। সবই ছুঁয়ে গেছেন কিন্তু অতি সংক্ষেপে। যাই হোক আমাদের কাজে আমাদের অগ্রসর হতেই হবে---না কি বল?

ঋ--হ্যাঁ তা তো বটেই। তবে আমার ইচ্ছা আমি একটা চিঠি নিজে হাতে বাবাকে লিখি—তা তুমি কি বল?

মা—হ্যাঁ আমার তাতে মোটেই আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা বলার আছে।

ঋ—কি সেটা---বল?

মা—তা হল—শ্রদ্ধাপূর্ণ সত্য আদর্শের ব্যাখ্যাই যেন তাতে থাকে। নির্জীব ভীরু কাপুরুষতা পূর্ণ চিঠি যেন না হয়।

ঋ—হ্যাঁ সে তো ঠিক কথা। আমি লিখে তোমায় পড়িয়ে নেব।

দিন কয়েক পরের ঘটনা। স্বাভাবিক জীবনে তেমন কিছু একটা না হলে সাড়া পড়ে না, এদের স্বামী স্ত্রী উভয়ের লক্ষ্য, মত, পথ, উদ্দেশ্য সবই এখন এক। স্থুল-স্থুল করে কত কথা কত আলোচনা দুজনের হয়। কিন্তু তারা সংযত; কোথাও উচ্ছ্বাস আটম্বরি নেই। দুজনের মুখ চোখে একটা দারুণ ছাপ পড়েছে।

সেদিন শনিবার বিকেলের দিকে প্রণবেশ এসে হাজির। কি বলবে ভাই সে তো দিদি জানে। মানিক আজ অফিস ফেরৎ স্কুলের কাজে হেথা হোথা গেছে। বিকেল গড়িয়ে যেতে চলেছে। হয়ত সন্ধ্যার পর ফিরবে, ভাইকে চা জলখাবার খাইয়ে পাঠিয়ে দিল ঋতা। ঠিক আছে তুই যা। আমি কাল যাব। সকালেই বেরতে চেষ্টা করব। তবে তোর দাদাবাবু আসুক—বলে দেখি।

রাতে মানিক অনেক কাজ সেরে ফিরল। স্বামী স্ত্রীতে সেই সব কথাই আলোচনা হচ্ছিল। খেতে বসে ঋতা জানাল প্রণবেশ বিকেলে এসেছিল।

মানিক—তা কি খবর ওখানের? সব ভাল ত?

ঋতা—হ্যাঁ মোটামুটি ভাল সবাই তবে—সেই সেদিনের জের টানল—কাল সকালে যাব বলে দিয়েছি। তবে তোমার মতের উপর নির্ভর করছি—সে কথাও জানিয়েছি। তা তোমার কোন আপত্তি আছে কি? আমার তো মনে হয় এ কাজটা সেরে আসাই ভাল। আমার সঙ্গে তুমিও চল না। বিকেলে দুজনেই ফিরে পড়ব।

মা—আবার আমাকে শুদ্ধ টানছ!

ঋতা উত্তরে বলল—তা তোমাকে দলে নেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে। সকালে চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যাব, দুপুরের রান্নাটা আর করতে হবে না। বিকেলের পর দুজনে বাড়ী ফিরব। এ যুক্তিটা মন্দ কি। তুমি রয়ে গেলেই তোমার খাওয়া নিয়ে একটা চিন্তা থাকবে, আর ছুটির দিনে একা একা বাড়ীতে থাকবে—সেটাই বা কি রকম কথা।

মা—না না, আমার অফিসের লেখা লেখির কাজ আছে। আমার যাওয়া সম্ভব নয়, তুমি সকালে চা করে ঐ ষ্টোভেই পারত দুটি ভাত চাপিয়ে দিয়ে যেও। দুটো আলু ছেড়ে দেবে আর একটা ডিম সিদ্ধ হলেই চলবে আমার। আর না হয় আমিই বারটার সময় স্নান করতে যাওয়ার আগে দুটো ফুটিয়ে নিতে পারি।

ঋতার আর বুঝতে বাকী রইল না। আজ সব কিছুই তার মনে আর একবার দোলা দিয়ে গেল। কিছু না ব্যক্ত করে সে চুপ করে গেল।

পুনরায় মানিক প্রশ্ন করল—কি এই যুক্তিটাই ভাল নয় কী?

ঋতা ছোট উত্তর দিল—ঠিক আছে তাই ভাল।—সে প্রতিবাদ করার মেয়ে মোটেই নয়। তার ভিতরের আগুন ভিতরেই জ্বলে উঠল। কিন্তু এতো নিভাতেই হবে, না হলে ত পুড়িয়ে মেরে দেবে। সেইজন্য ঋতা স্বাভাবিক নিয়মে আবার কথা বলা শুরু করল। তবে একটা কথাই ঋতার মনে বার বার করে জাগল—যাক ভাগ্যিস ভাইকে বলিনি তোর জামাইবাবুকে শুদ্ধ নিয়ে যাব। তাহলে ওরা দারুণ ব্যথা পেত। কিন্তু এ আমার বলার পথ রয়েছে। নিশ্চয় আমি গিয়ে পৌছলেই বাবা মা প্রশ্ন করবেন, কিরে জামাইকে সঙ্গে আনলি না? তখনই মুহূর্তে সবকে ঢেকে দিয়ে বলব—ওর অফিসে কাজ রয়েছে তাই এলো না। এই হলে ভাল হবে নাকি—সব দিককে ঠাণ্ডা করা। তার নিজের মনকে প্রশ্ন করল সে।

*[কি রকম কথাটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস - এক ধাপ নেমে গেলেই শেষ কথাটা শুনতে পাচ্ছি। যেন কত গর্ভের থেকে তোর কথা ভেসে আসছে। আর এক ধাপ উঠলেই মনে জাগছে—ও গল্পটা লিখতে হবে।*

*জবাবের হল।·মা এই বলেই বললেন—হঁ্যা লিখেছিস?]*

ঋতা সকাল সকাল উঠে সব কাজ সেরে, চারদিক মোটামুটি গুছিয়ে চা জল খাবারের পাট চুকিয়ে, সেই ষ্টোভেই স্বামীর জন্য ভাত চাপিয়ে দিল। আলু দুটো ছেড়ে দিল বটে কিন্তু সে ডিম সিদ্ধর বদলে ডিমের ঝোল করে দিল। সময় অল্প লাগবে বলে ভাতেই সে ডিম আলু সিদ্ধ করে নেয়, ঝোল চাপিয়ে এবার যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। হঠাৎ মানিক হেঁসেলে এসে বলল—একি, একি করছ তুমি! এ তোমার বাড়াবাড়ি।

ঋ—বাড়াবাড়ি আমি মোটেই করিনি। বাড়াবাড়ি করা আমার ধাতে কোনদিনই সয় না। এই সকাল আটটার ভাত বেলা বারটার সময় শুকনো খেতে তোমার কষ্ট হবে না কি? সেইজন্য একটু ঝোল করে রেখে গেলাম।

[—ঘরের চাবিটা দিয়ে দিই দাঁড়া।

বাস্তব—হ্যাঁ এখন না হয় থাক। সাড়ে এগারটা বেজে গেল।

—হ্যাঁ এ 'থাক' ও 'থাক' দুই থাক। ওখানে বাটি চচ্চড়ীর গন্ধ বেরুচ্ছে। বোধ হয় ধরিয়ে ফেলল।—অর্থাৎ ধোঁয়া সরিয়ে এখন মা হেঁসেলে ঢুকবেন।]

কথাটা শুনে মানিকের মনে হল—আচ্ছা এরই নাম কি মমতা নয়! এ বোধ হয় প্রত্যেক নারীর মধ্যেই থাকে। সে চায় স্বামী সন্তানকে সুখী করতে।

—তা তোমার চা জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে? সোয়া আটটা তো বাজতে গেল আর বেরবে কখন?

ঋতা বলল—হ্যাঁ ঐ তোমাকে যখন দিলাম তখনই এখানে আমি খেয়ে নিয়েছি।

—তা নাও তুমি এবার তাহলে বেরিয়ে পড়। তোমাকে আমি বাসে তুলে দিয়ে আসি চল।

—তুমি আবার বেরবে? কেন আমি তো একাই যেতে পারব।

—হ্যাঁ তা তুমি পারবে আমি জানি। তবুও একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে বাস ষ্টাণ্ড পর্যন্ত যেয়ে তোমাকে তুলে দিয়ে আসব, এখন তো গোটা দিনটা একলাই থাকতে হবে।

ঋতার মনে হল ঐ জন্যই তো বলেছিলাম সঙ্গে যেতে, তা তো আর গেলে না। যাই হোক মনের কথা মনেই চেপে সে বেরিয়ে পড়ল। দুজনে নানা ধরণের গল্প করতে করতে ষ্টাণ্ডে গিয়ে পৌছল।

বাস আসতে একটু দেরি দেখে ঋতা বলল—ইস্ তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, অফিসের কাজ আছে বললে যে।

মানিক উত্তরে বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ থাক না। গোটা দুপুরটা আমি কি করব।

হঠাৎ ঋতার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। ঋতার জীবন দেখে কোথায় যেন তার মোচড় দিয়ে উঠল। ওরা এক সঙ্গেই দুজনে পড়েছিল। ঋতার যে এইভাবে বিয়ে হয়েছে তা আলপনা আগেই শুনেছিল। কিন্তু দেখা হয়নি সামনা সামনি। বলল—কিরে ঋতা, তুই যে সব ভুলেই গেলি।

ঋতার মধ্যে খুবই আন্তরিকতা ছিল। দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলল—না ভাই, ভুলে যাইনি, নানা রকম ঝঞ্ঝাটে পড়েছি।

—তা তো হবেই তোর এখন নতুন বর নিয়ে নতুন নতুন ফরমাস করতেই সময় কেটে যাবে।

কথাগুলো মানিকের কানে অনায়াসেই পৌঁছল। সে যে নিকটেই দাঁড়িয়ে।

—যাক তোর বরের সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দে। মুখ দিয়ে তুই কিছুই বলছিস না যে। এরই মধ্যে তোর ভিতর এত ভারিক্তিক ভাব!

—কেন ও কথা বলছিস কেন? এর আগে আমাকে কি দেখেছিলি তুই?

—হুঁ তা অবশ্য বটে। চল চল তোর বরের সঙ্গে আলাপ করা যাক।

দু'জনে ঘুরে মানিকের দিকে এগিয়ে গিয়ে দু একটা কথা সুরু করেছে এমন সময় বাস এসে গেল।

আমি ভাই এবারে চলি আমার বাস এসে গেছে—ঋতা এগিয়ে গেল বাসের দিকে।

মানিক বলল—তাড়াতাড়ি ফিরবে।

ঋতা উত্তরে বলল—তুমিও কিন্তু স্নান খাওয়া শীগ্রি করে নিও।

আলপনা যাই বলুক পা টানতে গিয়েও যেন পারল না। দু একটা কথা বলতে চাইল মানিকের সঙ্গে। মানিক কি করে এর কাছ থেকে এড়িয়ে যাবে সেই চিন্তাই করছিল। সে কোনকালেই ছ্যাবলা মেয়ে পছন্দ করে না। ঋতাই কি কমটা; সেও তো চাকুরে মেয়ে। হোক না কেন চাকুরে, তার মধ্যে নম্রতা, আব্রু, সভ্যতা প্রচুর মানিক লক্ষ্য করেছিল। তাই সে তার গলায় মালা দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। শুধু এক দিনের দেখা নয় বহুদিন ধরে সে তাকে দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে। এত করেও এরকম ভাবে আগাগোড়া বুঝেও বাবা মায়ের কাছে তাকে কত না দোষী অপরাধী হতে হয়েছে। এই রকম ধরণের চিন্তা করে সে আলপনার কাছ থেকে বিদায় নিল।

আলপনা বিনা নিমন্ত্রনেই বলে বসল—আচ্ছা পারলে একদিন আপনার ওখানে বেড়াতে যাব।

কি আর বলে মানিক। বলল—আচ্ছা। কিন্তু এর এমনই চামড়া মোটা যে এই অন্তঃসার-শূন্য 'আচ্ছা'টা তার কানে ঢুকলই না।

ঋতা দশটার পর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। মা বাবা সকলে খুব আনন্দিত। —কিরে ঋতা, তুই যে আমাকে ভুলেই গেলি?—মা বলে উঠল।

মায়ের কথা টেনে নিয়ে বাবা উত্তর দিল—তা তুমি আর কত মনে রেখেছ তোমার বাপের বাড়ীকে। মেয়েদের তো এই রকমই হওয়া উচিত। যা যা মা, হাত পা ধুা। কি আছে ওকে খেতে দাও গো,—স্ত্রীকে বলেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করল—কিরে জামাই এল না? কি অফিসের কাজ আছে বুঝি?

ঋ—হ্যাঁ তা ঐ রকমই আছে।

তখনই মা কথা টেনে নিয়ে বলল—তা অনেক দিন তো আসেনি রে। তোর সঙ্গে তো আসতে পারত। আমাদেরও তো দেখতে ইচ্ছে করে, অনেক দিন দেখিনি।

ঋতা প্রশ্নের জবাবের দিকে খুব উৎসাহী নয়। বলল—ও আসবে, এখন চলত খেতে দেবে।

মা মেয়েকে জল খাবার খেতে দিয়ে কাছে বসে কয়েকটা প্রশ্ন করল।—তা যাই হোক, হ্যাঁ ঋতা, বিয়ের পর তোর কোন পরিবর্তন দেখছি না কেন? তোর না স্বাস্থ্যের পরিবর্তন না সাজ পোষাকের, কি ব্যাপার বলদেখিনি! বিয়ের আগেও যা ছিলি বিয়ের পরেও তাই। দু একখানা নতুন গয়নাও তো দেখছি না গায়।

এ সব কথার উত্তরে ঋতা প্রশ্ন করল—কৈ প্রণবেশ কোথায়?

মা উত্তর দিল—প্রণবেশ, ঐ তোরা আসবি বলেই তোর বাবা ওকে একটু বাজারে পাঠিয়েছে। তা কৈ জামাই তো আর এল না।

[কথার মধ্যে কথা। মায়ের কথার কি আর শেষ আছে! সবরই সুরু আছে। শেষ মা জোর করে করে বলেই শেষ। তাই বলে কি সমাপ্ত!

যাই হোক লিখতে লিখতে মা বললেন—আজ ঘোর মাথার মধ্যেই ঘুরছে। চোখে নেমে এসে দাঁড়াচ্ছে না।

এরকম একটা অবস্থায় এসে লেখা দাঁড়িয়েছে। তাই আচমকা আবদার করলাম—মা, ঋতার মনবেদনা গানের মধ্যে ফুটিয়ে তোল। ঠিক যে কি বলতে চাই তা বোঝাতে পারছি না। তুমি বুঝে নাও।

এ সব কথার উত্তরে আরো কয়েকটা সাধারণ কথা বলে মা গান ধরলেন।]

ঋতা নাম যাও মা ভুলে।
মাগো, এসেছি বলতে তোমায়
মুছে দাও তোমরা আমায়।
দেখতে আমায় আর পাবে না
দিয়েছ বিদায়—ওমা,
হয়েছিলে কাঙ্গাল বলে।

ঋতা নাম যাও মা ভুলে।
চেয়েছিনু সত্য আমি
জান নাকি—হে প্রভু, ঈশ্বর তুমি ?
করেছিলে কাঙ্গাল পিতায়
দিল বিকায়ে তাই আমারে।

ঋতা নাম যাও মা ভুলে।
মাগো হারায়ে গিয়েছে ঋতা
মা মা, কেমন করে বোঝাই তোমায়
ওগো বুঝে নাও তুমি
আপন করে।
ওগো মা, তব পরিচয়
কেমন করে বলব আমি
দাঁড়িয়েছিলাম আত্মবলে।

ঋতা নাম যাও মা ভুলে।
মা হয়ে পথের পথিক আমি
হয়ে দরিদ্র ভিখারিণী
কেউ ছিল না আমার বলে
খুঁজে নিয়েছি আশ্রয় আমার—
পতি রূপে করেছি বরণ ;
দিয়েছি বিকায়ে আমি আমারে।

ঋতা নাম যাও মা ভুলে।
ওগো মা, কেমন করে
বোঝাই তোমায়!
মা, মা—
শুধায়ো না আর আমারে।
করেছিলে কর্ম্ম তুমি
কেমন করে, জানব মাগো—
জানব বল আমি!
ফল দেখে মা ভাবছি এখন—
এ তো আর কিছু নয়,
কর্ম আমার পিতা মাতার
বাঁধা আমি তাদের সাথে।
কেমন করে করি খণ্ডন!

ওগো মা, আর ডেকো না
ঋতা বলে।
জ্বালায় আমার হৃদয় জ্বলে।
অধর ভরা হাসি মাগো
জানতে আমায় পারবে বলে।

ওগো মা, ঋতা নামে
কে ডাকে আমায় শুনি?
ওরে প্রণবেশ, যাই বলে যাই
ডাকবি না আর দিদি বলে।
ছিলাম নারে ও তোর
দিদি যে আমি!
ভুলে যা তোরা আমারে।
একই মায়ের সন্তান মোরা

কেমন করে দেব পরিচয়
আমি যে দিয়েছি—
দিয়েছি—ওরে,
ভেবে দেখ বিলাযে কারে।

দারিদ্রের তাড়না
বাঁধিতে হয়েছে মন
আমার উপায় ছিল না।
ভুলে যা ওরে প্রণবেশ
চেয়েছিনু আয়ু ভিক্ষা—
ঐ স্বর আমি ভাইয়ের।
কোথায় ছিলে, দানের সুযোগ
নিলে এসে, ধরলে চেপে।
শুধিতে হবে এ ঋণ তোমায়,
দাও; কর দান
তুমি তোমারে এসে।

হায় ঈশ্বর—
ধন্য তোমায় ধন্য তুমি
তব চরণে কোটি প্রণাম
জানাই তোমায় —
রেখো স্মরণে আমারে তুমি।
স্থান নিয়েছি যেথায় আমি
দেখেছি বিচার করে।
হে ঈশ্বর করুণাময়,
তোমার করুণার নাই তুলনা
যদি দান ঠিক করতে পারি
আমি আমারে।

ভুলে যাও ওমা আমায়
তোমার ঋতা নাই যে এখন
মাগো মা—মা—
ঋতা নামে ডাকলে পরে
অপমান হয় যে করা
গিয়েছে মরে তোমার ঋতা
সেই প্রণবেশের অসুখ কালে।
কোলে নিয়ে যাদুরে
ভুল শোক ঋতার মাগো, মা।
"পেয়েছি পুত্র হারায়ে কন্যা
দিয়েছি বিদায়ে তারে আমি।"
ওগো মা।

[ আজ ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৭৫। সকাল বেলা। খোকা উপন্যাস লিখতে বসেছেন মা। ঋতা তার মায়ের সঙ্গে বসেছে একান্তে। তার মনের মধ্যে কত তরঙ্গ উঠছে ভাঙ্গছে—তোলপাড় করছে। মায়ের মুখে কত কথা; মেয়ের মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা। কত শত ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রশ্ন ও উত্তর। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আক্ষেপ দুঃখের গান—"ঋতা নাম যাও মা ভুলে।........"

সন্ধ্যায় এই গানের জের টেনে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মা এক বিচিত্র কথাগানের মালা গেঁথে বসেন। নিতান্তই খেলার ছলে। তবে এ হল বাস্তব ও আধ্যাত্মিকের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। এখানে বিষয় ও বৈশিষ্ট্য যত বিস্ময়ের কারণ। অনবদ্য ও অনন্য সাধারণ এ সমাধি-কথা-গানের অংশ-বিশেষ এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। উপন্যাসের খাতিরে শুধুমাত্র উপন্যাসের অংশটুকুই এখানে তুলে দেওয়া হল। সকলের মুখের ভাষা এবং বিশেষ করে

মনের ভাব মা অনবদ্য সঙ্গীত কথায় পরিবেশন করেছেন। ফুলস্কেপের গোটা পঞ্চাশ পৃষ্ঠা মা একটানা কখনও কথায় বলে, কখনও অনর্গল গান গেয়ে গেছেন। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গেছেন বটে তবে উপন্যাস প্রসঙ্গে "প্রশ্ন-উত্তর" এক অনির্ব্বচনীয় অধ্যায়। বিষয় বলতে এক নয়, বহু। যাই হোক উপন্যাস বলা দিয়ে শুরু করে বিভিন্ন মোড় নিয়েছেন মা। তারপর পাঁচ সাত সুষ্ঠু ধারায় বয়ে গেছে মায়ের বিচার বক্তব্য। সর্ব্বরূপে রূপিণী, স্তবপাঠ, রাত পাহারার গান, জ্যোত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ প্রসঙ্গে মায়ের সত্য-প্রসঙ্গের সামান্য অংশ ইত্যাদি। উল্লিখিত এ সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলতে হয়। সে অবকাশ এখানে নেই। শুধুমাত্র উপন্যাসের জন্যই বিশাল ভূমিকার প্রয়োজন। এই অভূতপূর্ব্ব ও সর্বকালশ্রেষ্ঠের কল্পনাতীত সজ্ঞান সমাধির সম্পূর্ণ অংশ আমরা মন্দিরে টেপরেকর্ডিং মেশিনে ধরে রাখতে পেরেছি বলে নিজেদের ধন্য মনে করি এবং তা শত্বর পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার চেষ্টায় আছি। ]

—প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে এগোলে কেমন হয়?

বাস্তব জিজ্ঞাসা—প্রশ্ন উত্তর! হ্যাঁ তা মন্দ কি মা।

—আগে বলি, কেন এ গান গাইল সে। তার উত্তরে কি বলবি?

বা—ও বলবি টলবি না। যা বলবে তুমিই বলবে।

—জিনিসটা কি এইরকম হয় না—এই গান গেয়ে হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে।

বা—হাল্কা!

—একটা একটা করে গানেরই—যদি গান গেয়ে হাল্কা—পাঠক বোঝে যে গেয়ে এটা হাল্কা করা হয়েছে তাহলে তারই পাশে পঠককে প্রশ্ন করা হবে, যে প্রতিটি গানের অক্ষর অনুযায়ী উত্তর চাই। কি বলবে পাঠক?

বা—তাই ত। আর সত্যিকারের এ গানগুলি কি? এগুলি হচ্ছে অদ্বিতীয় প্রতিভার স্বাক্ষর। এ ত উপন্যাসের অংশ নয়, মা।

এ কথার উত্তরে না গিয়ে মা বলেন—বলবে নি কি—হুঁ, গানের উত্তরে তাই বলে! এ কথাই বলা হচ্ছে পাঠককে যে, যে গান গাওয়া হল সেই গান উত্তরের আশা করে। তাদের সঙ্গে সেই গান নিয়ে উত্তর চাই। কেন বলেছিল?

হুঁ, বলে যাও যে গানের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর রয়েছে, খুঁজে বের কর।

*[ বাস্তব জিজ্ঞাসার ফাঁকে ফাঁকে উত্তর জুগিয়ে মায়ে মেয়ের খেলা চলে। বাস্তব আধ্যাত্মিক সমন্বয় এখানে লক্ষ্য করবার। মায়েরই দুই রূপে মা এই কথাগুলি বলে চলেছেন। সাধারণের বুঝবার জন্য আরও ভেঙে বলি—এই যাকে বলে মা ও শ্মা। আর নাস্তিকের জন্য সহজ সরল যুক্তি পড়ে রইল—জ্ঞান ও মহাজ্ঞান। ]*

বলো না ঋতা অমন করে,
মা হয়ে কেমন করে দেব বিদায়
আমি তোরে!
ধরে জননী অঞ্চলখানি
মোছাল অশ্রু ঋতার চোখের।
ধরিল বাহুটি চেপে।

বলিল ঋতা—ওগো মা,
দিয়েছ হারায়ে তোমার ঋতায়
দান করেছ;
ভেব দেখ বারে বারে।
মা, দারিদ্র্যের তাড়না
বিধিবাম হয়েছিল কি?
ও বিধি, ছিল কি তোমার

এই ছলনা !
বারে বারে তাই তোমারে শুধাই—
চেয়েছিনু সত্য আমি
বিধি জান না কি
তুমি গো আমায় !

দারিদ্র্যের তাড়না
ভুলিয়ে দিলে সব কিছু যে
বিধি বিধি,
এ দুঃখ আমার জানাই কারে !
কে জানিবে আর
তুমি ছাড়া সবাই অজানা।
তুমি কি জান না মোরে ?
আদর্শের কাঙ্গাল ঋতা
করেছিনু দুঃখ আমি
ঘুচাব দুঃখ পিতা মাতার,
রাখিব সত্য,
করিব পালন ধীরে ধীরে।
ও বিধি তাই তো শুধাই
আমি তোমারে।

ধরিল ঋতা জননীরে চেপে।
ওগো জননী, যাও গো ভুলে,
কেঁদো না,—
ভেবো না আর ঋতার তরে।
জানবে তুমি জানবে মনে
দিয়েছ হারায়ে ঋতারে তোমার

"কোথায় খুঁজে পাব তারে !
মিথ্যা হবে রোদন আমার,
সার হবে ভাবা ক্ষণে ক্ষণে।"

হল ? এসেছি ? আবার খানিকটা যাব ? আবার কোন্ দিকে যাব—এবার বলে দে কোন্ দিকে যাব, বলে দে ?

বাস্তব জিজ্ঞাসা—এটা সম্পূর্ণ ?

—সম্পূর্ণ ! সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ নয় সম্পূর্ণ নয়।

বা—তাহলেও আক্ষেপ বেদনার তো একটা পরিমাপ আছে।

—না মাপ কিছুই নেই।

বা—গানটা না হয় সম্পূর্ণ হতে পাবে অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু আক্ষেপ বেদনা তার তো একটা—

—সে জনম দুঃখিনী বলছি নি ? প্রশ্ন উত্তর হোক।

আচ্ছা ঋতা কি সত্যই জনম দুঃখিনী ? ঋতার এই বক্তব্যের মানে কি ? এ আক্ষেপের গানের মানে কি ? তবে কি ঋতা সে মানিককে চায় না ?

—খুব চায়।

—তবে সে এ আক্ষেপ করছে কেন ? বলি।

আমি শুধাচ্ছি—ঋতা, তুমি কি তবে মানিককে চাও নি ? যেন কবলে কৌশলে আজ মানিককে পেয়েছ, এঁ্যা ? এ পাওয়াটা যেন তোমার বাঞ্ছনীয় নয়।

—তা কেন বলছ, মা ? তা কেন বলছ ?

—তা কেন বলব নি, মা ? তোমার যা গানের ভাষা যা সুর তাতে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে তোমার বাবা মাকে ছেড়ে তুমি অত্যধিক বেদনা বোধ করছ—তাই নয় কি ? এ গানে পাঠক কি বুঝবে ? তারা তো এই কথাই বুঝবে যে, ঋতাকে কবল কৌশল করা হয়েছিল। ঋতা যেন বাধ্য হয়ে এই রকম কাজ করেছিল। তাই নয় কি এটা ? এ ত বলবেই।

—এই কি বুঝলে ? এটাই কি ঠিক কথা ঋতার, এঁ্যা ?

—হু, এ কথাই ঠিক। এটা ভুল কেন বলছ ? এটা ঠিক কথা। কিন্তু তাই নয়।

—কিন্তু তাই নয়।

তাহলে সত্যিকারের সত্য বক্তব্য এবার ঋতা ব্যক্ত করছে। ঋতা বলতে চাচ্ছে বা ঋতা বলছে এই কথাই—কি বলছে? যে মানিককে পেয়ে সে সুখী, খুব সুখী। কেন? মানিকের চরিত্র, মানিকরে গুণ, মানিক দেখতে, মানিকের স্বভাব সবকিছু ঋতার কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঋতার দুঃখ বা আক্ষেপ ঐখানেই যে এ জিনিসটা কেন কৌশলে? আজকে আমাকে মানিকের কাছে কেন নত স্বীকার করে দাঁড়াতে হয়েছে। এর পিছনে এই কারণ নয় কি যে আজকে যদি আমি প্রণবেশের অসুখের জন্য না টাকা ধার করে আনতাম-না আমার বাবার এ দারিদ্র থাকত তাহলে আমাকে এ বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে হত নি। আমি—

ও, তাহলে তুমি বলতে চাও যে পতিগৃহে এসে পতি চরণে বশ্যতা স্বীকার করতে তুমি ইচ্ছুক নয়?

তা কেন মা, বশ্যতার রকমফের আছে। এ বশ্যতা হচ্ছে—যেন কোন কৌশলে মানিককে জালে ফেলা হয়েছিল, হয়ে মানিককে বাধ্য করানো হয়েছে। এইটি কি তাই নয়? শুধু কি তাই—আজকের মানিকের যা পথ মত, সেই পথ মত আমারও—একই। সত্য আদর্শ তার কোন জাতিভেদ নেই। ভিন্ন নেই; রকমফের নেই। কিন্তু সমাজ সামাজিকতা তার মধ্যে আছে ধর্ম। সেই বিভিন্ন ধর্মের উপরেই আজকে এই জিনিসটা হঠাৎ হয়ে যাওয়া কেন? আমিও তো সেই সত্য আদর্শ চাই। আজকে মানিকের যে বাবা মা, তারা আমারও বাবা মা। কিন্তু আজকে আমার বাবা মাকে অস্বীকার করতে হচ্ছে কেন? তার কারণ? সত্য তো একথা বলবে না। আদর্শের তো এ রূপ নয়। তা কেন বলব। তা কেন বলব? এটা যেন কৌশলের মধ্যে হয়ে গেছে। সেই কৌশলের মধ্যে করে যাওয়াতে আমি আমার বাবা মাকে এসে বুঝিয়ে যাচ্ছি। তাদিকে দুঃখে সুখে কথায় গানে সবদিক দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছি। এবং লক্ষ্য নিলাম সেই সত্য আদর্শের দিকে। মানিকের মত মানিকের পথ আমারও মত আমারও পথ। এবং প্রকৃতই যদি আদর্শ চায় মানিক তবে সেই আদর্শের কোথাও ভিন্ন ভেদ নেই। সত্যের ভিন্ন ভেদ নেই। কিন্তু যে সাময়িক ঘটনা দুর্ঘটনা বলে প্রমাণ হয়েছে, সেটা আজ কেন হল। এর জন্য আমি অপরাধী? আমি সেইটি জানতে চাই। কেন আজকে অপরাধী হলাম? না হলে জানবে

আমি মানিককে পাওয়ায় এতটুকুও দুঃখিত নয়। সবদিকেই আমি সুখী। কিন্তু আজ আমার বাবা-মা সুখী নয় কেন? কি কারণে? এবং তাদের সুখের পথ কোথায়? বর্তমান যা অবস্থা তাতে তারা পথ পাচ্ছে না কেন? তারা যেন অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ সত্যি, আমিও বলব অপরাধী তারা। কেন, না আজ হাত পাতার জন্যই তো। আজ ঐ দরিদ্রতার জন্যই তো। এই নয় কি?

কি বলবে প্রশ্ন উত্তর? এখানে কি মনে হয়—ঋতা দুখী?

ঋতা দুখী মোটেই নয়। ঋতা যা চাইত তাই পেয়েছে। কিন্তু সে চাওয়াটা হুড়মুড় করে চাইনি ঋতা। ধীরে ধীরে চেয়েছিল। এবং ঋতা ব্যক্তিত্ব নিয়ে চেয়েছিল। এখানে যেন ঋতা ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এখানে যেন ঋতা অপরাধী হয়ে পড়ছে।

কোন্ অভিমানে
কাঁদ মা ঋতা
এ পিতৃভবনে?
মাগো, জনক তোমার
শুধাই আমি
বল মা আমারে তুমি।

.... .... .... ....
.... .... .... ....

শুধাল পিতা ঋতারে তাই।
চাহিল ঋতা বদন পানে।
পিতা, কি দেব উত্তর তোমায়;
ওগো পিতা হয়েছ জনক জানি
জনম কালে কোথায় ছিলে
চিনি নাই তোমায় আমি।
যবে চিনিনু পিতা তোমারে,
স্নেহভরে নিলে আমায়
কোলে তুলে, ওগো পিতা।
এ মায়াভার,

কেমনে ত্যাগিব আমি।
চিন্তা বারে বার।

চাহিল চরণে ভাবিল মনে
দুবাহু ধরেছে পিতা তার।
পিতা, কর আশীর্ব্বাদ তুমি।
কি চাই আমি গো পিতা
বোঝ না কি, জান নাকি তুমি।
তাই এসেছি পিত্রালয়ে
ভুলে যাও আমায় পিতা।
খুঁজবে আমায়, খুঁজবে তুমি
খুঁজবে ঋতায়,
তোমার ঋতা নেই যে তোমার
বন্দী সেজন একের ঘরে।
পিতা, করিবে নির্জনে চিন্তা তুমি।

কে বলে বন্দিনী ঋতা!
সকলে করেছে বন্দি সে যে।
দেখবে ঋতায় সবার ঘরে
সবার মাঝে আমি।
ও পিতা, পিতা
চাহিতে এসেছি বিদায় জানি।
দাও—দাও গো আমায়
বিদায় তুমি।

এসেছি তব দ্বারে
দাঁড়ায়ে করজোড়ে;

পিতা মাতা উভয় মিলে
কর আশীর্বাদ—
দাও বিদায় স্নেহভরে।
যদি থাকে অন্তরে
গোপন বেদনা,
তবে পিতা, লয় হবে জানি
সুখী হতে আমি পারব না,
ওগো পিতা।

মা, হারিয়ে গেছে তোমার ঋতা
ওগো ঋতা বলে
আর ডেকোনা।
ওগো মা, ওগো মা
দিয়েছ হারাযে ঋতায়
কেন খোঁজ তুমি
তাই বল না।
দাঁড়ালো করজোড়ে
পিতা মাতা উভয় মিলে।

**ক্ষ্যান্ত হও ভক্ত নও**
**হয়েছ প্রভু ;**
**শোন শোন শুধাই এখন**
**কেন দূরেতে রও।**

[ শেষ চার ছত্রকে মা চাতাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। উপন্যাসই এ সজ্ঞান সমাধির প্রধান অঙ্গ। তবে সমন্বয়ই হল এর মূল সুর। এখানে ব্যাখ্যায় মা ছোট করে বলেছিলেন—ঋতার অজান্তে ঈশ্বর তার পিতামাতার প্রার্থনার উত্তরে ঋতাকে চরম গুরুত্ব দিল। না জানি এখানে কোন্ আদর্শ কুলবধূর রূপ মা চিন্তা করেছেন। তবে বিস্তারিত আখ্যায় না গিয়ে মা শুধু এইটুকু ছুঁয়ে দেন—চকে এসে পৌঁছল। এবার ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন। বুদ্ধিমান পাঠক বিচলিত হবেন না—চক্ ও চাতাল মূলত একই জিনিস। বাস্তব অভিজ্ঞতাই বলুন বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ—সবেরই মূলে সেই সাধারণ জ্ঞান। তবে সহজাত জ্ঞানকে কেউ যেন না সাধারণ জ্ঞান বলে গুলিয়ে ফেলেন।

"নইলে এ শুধু মায়ে মেয়ের খেলা বলা চলে।"—বলেই মা জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন—"একে জোতের অংশ জ্ঞান করা বাঞ্ছনীয় নয়। পাছে জোতের অংশ মনে কর তাই কতদূর টেনে নিয়ে তবে জোত শুরু করেছি।" জোতেরই রূপ নিয়ে আরও অন্য জিনিস বেরোয়। এইজন্যই একে জোত বলায় মায়ের একান্ত আপত্তি। জোত প্রসঙ্গে অল্প কথায় বলা সম্ভব নয়। বিস্তারিত বলে বোঝাবার অবকাশ এখানে নেই। চাতাল সমাধিকথায় এ সম্পর্কে কিছু আলোচিত হবে।

এই চাতালের সুর নিয়ে মা চকে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং অনবরত বাস্তব আধ্যাত্মিকের সমন্বয় করে চক আর চাতাল করেছেন। মায়ের এ এক পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি। সর্ব্বরূপে রূপিনী, উপন্যাস, জোত, মায়ে মেয়ে খেলা, বাস্তবোধ, রাতপাহারা প্রসঙ্গ এবং মায়ের সত্য প্রসঙ্গ, সবেরই জের মা এখান থেকে টেনে নিয়ে গেছেন।

তবে এ স্থলে মায়ের নিতান্তই আত্মগোপন। ঋতার পিতামাতা করজোড়ে দাঁড়ালে, মা যেন ঈশ্বরকে প্রশ্ন করছেন, এবার উপন্যাস কোন্ প্রসঙ্গে কার বক্তব্য নিয়ে বেরিয়ে যাবে। উত্তরে ঈশ্বরের উক্তি সর্ব্বকালের আধ্যাত্মিক চেতনার বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে---"ক্ষান্ত হও ভক্ত নও, হয়েছ প্রভু।" অর্থাৎ তাঁর বলবার কথা--"উপন্যাস এখানে এসে কোনদিকে মোড় নেবে সে বিষয়ে তুমি আমাকে কি প্রশ্ন করছ!" জ্ঞান ও মহাজ্ঞান মায়ের মাঝে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে তফাৎ করা একরকম অসম্ভব। যাই হোক পরক্ষণেই আমরা দেখতে পেয়েছি মা সর্ব্বরূপে রূপিণীর পথে আপন গতি নিয়ে এগিয়ে গেছেন। কিছুদূর গিয়ে ঘুরে এসে আবার ধরেছেন উপন্যাসের রাস্তা।]

ওগো মা মা—
যাও ভুলে যাও ঋতায় তোমার
মাগো, তোমার ঋতা
নয় যে তোমার;
দান করেছ কি কারণে,
কেন মা—ওগো মা?
আমি মা আমারে দান করেছি
জানি যাহারে
মা, তারই দান জানব মনে।
মাগো, কর আশীর্ব্বাদ জনে জনে।
খুঁজবে আমায় সর্ব্বদিকে
তোমরা মাগো, সর্ব্বক্ষণে।
তোমার ঋতা নাই,
কেন খুঁজ মা
তুমি গো ঋতায়!

যাদুরে নাও মা তুলে।
বারে বারে অধর চেপে
মুখ চুম্বন কর মা তাহার।
ভাই প্রণবেশ, বলি রে তোরে—
ভুলাবে মাকে আমার।
ছিল জননী জানি দুজনের,
হয়ে গেল ও তোর্ রে।
ওরে নাই জননী
আমার জানি,
আমি যে দিয়েছি তোরে রে।

ধরে ঋতা আঁচলখানি।
বাড়ায়ে বাহুখানি ধরিল
কচি ভাইয়ের চিবুক ঋতা
মুছে নিল জল সেই নয়নের।
বারে বারে অধর চেপে
বলিল ঋতা গভীর করে—
'রেখো প্রণবেশ মনে তুমি,
করিবে পালন জানি।
ও প্রণবেশ প্রণবেশ
ছিলাম দিদি তোমার আমি,
কেন প্রণবেশ অমন করে
পাও ব্যথা তাই শুনি।'

ছোট ছোট ভাই বোন
খুঁজিবে তাদের মাঝে
লুকায়ে রয়েছে দিদি।
"দিদি রে পাইব

যেথায় খুঁজে দেখা আমি
সেথায় দিদির বাসভবন।
ও প্রণবেশ ভুলে যাও
সবই তুমি,
ভুলাও তুমি মা বাবাকে।
প্রণবেশ করি আশীর্ব্বাদ
আমি তোমাকে।
সত্যের হয়ে দাঁড়াও
তুমি একজন।
দাও প্রণবেশ বিদায় তুমি
চলে যাই বিদায় নিয়ে
পতিগৃহে এখন আমি।

ও দিদি কেমন করে
বলছ শুনি !
এ মায়া ত্যাগ করা ভার।
বোঝাতে পারব না
আমি গো তোমায়।
ও দিদি, দিদি—
ঘেরেছিলে সবার মাঝে
এসেছিলে পিতামাতার কোলে
আগে তুমি।
পারব না পারব না !

ধরিল চরণ চেপে,
প্রণবেশ আগুলিল
পথ খতার।

কেমনে ছিটাবে সে
ভাবে ঋতা বারে বার।
কোথায় ছিল আদর্শ
পিতা তাহার
ধরিল পুত্রকে টানি—
দাও ছেড়ে দাও।

হুঁ। হুঁ। কেমন, বল দেখিনি ? কোন্ খাদে এনে ফেলে দিয়েছি ;

.... .... ....

.... •.... ....

পথ ছেড়ে দাও ঋতারে তুমি।
ফিরে এস ক্ষান্ত হও—ও প্রণবেশ,
তোমারে বলি শোন তুমি।
ফিরে এস ফিরে এস।
হয়েছে সময়, জানি যে তাহা
রবে না রবে না আর যে হেথায়।

কেমন করে ছাডব বল !
ওগো, ডেকেছিল মা মা বলে।
কেমন করে ভুলিব তারে !
ভুলিতে পারব না।

ওগো মা—
ভুলো না ঋতারে তোমার।
ছিল ঋতা তোমার কোলে
একই বলে জানতে তুমি।
বিলিয়ে দিলে জানবে কারে।
মা ছোট বড় খুঁজবে তুমি
তোমার ঋতায় সবার মাঝারে।

তারই আগে ভাববে তুমি—
"পতিগৃহে যাচ্ছ ঋতা।
ঘর করি কার।
আগে আমি আমায় শুধাই
তবে দেব বাধা ঋতারে জানি
ওগো মা মা—
বিদায় আমায় দাও না।

ওগো মা ওগো মা—
ফিরে চলে যাই
ডেকো না আমায়।
খুঁজিবে সবার মাঝে ;
শেষের কথা রাখিবে মনে
যেন কভু ভুলে যেও না।

মুহূর্তে ঋতা নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবল—ছিঃ ছিঃ আমি একি করছি! আমি এদের সান্ত্বনা দিতে এসেছি না, এদিকে শোকের বন্যায় ভাসাতে এসেছি?

—যাক, মা নাও নাও প্রণবেশ কখন আসবে বল দেখিনি? চল চল আমায় কি খেতে দেবে চল।

এই বলে পূর্ব্বের ন্যায় যেমন ভাবে মাকে নিয়ে যেত সেইভাবে চলল। মা খাবার এগিয়ে দিয়েছে। ভাই বোনেরা একে একে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কিরে তোরা সব খেয়েছিস? না হলে আয় আমার সঙ্গে খাবি আয়।

—না দিদি তুমি খাও আমরা খেয়েছি।—সকলে এক সঙ্গে বলে উঠল।

এ বাড়ীতে ঋতাকে প্রত্যেকেই ভালবাসে। শুধু কি তাই সকলের অন্তরে শ্রদ্ধা আছে। যাক ধীরে ধীরে বাবাও সে ঘরে এসে পৌঁছল মেয়ের সঙ্গে দুএকটা কথা বলবে এই ইচ্ছায়,—হ্যাঁরে ঋতা বলি তোর শ্বশুরবাড়ীর খবর কি?

—শ্বশুর বাড়ীর খবর ভাল। বাবা, তুমি এই একশ টাকা রাখত।

—হ্যাঁ তা না হয় রাখলাম, তোর কাছ থেকে যে আর কতদিন এভাবে নিতে হবে—সেইটিই আমাকে মহাচিন্তায় ফেলেছ। তোর ভাইটার একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত আমাকে তোর কাছে হাত পাততেই হবে। কেন জানিস তো, এতদিন তুই আমার ছিলি, এখন আমি তোকে দান করে দিয়েছি। ধীরে ধীরে তার সংসার গড়ে তোল এই আমার ইচ্ছা। ভাইকে আশীর্ব্বাদ কর, ও যেন সৎপথে থেকে কোনরকম দু'পয়সা রোজগার করে দিতে পারে। যাই হোক করে সুখে দুঃখে নুন ভাত আমরা খাব। এখন তোমার কাছে হাত পাতাটা যেমন আমি লজ্জাবোধ করি, তেমন অন্যায় মনে করি।

কথাগুলো ঋতার অন্তরে মোচড় দিয়ে উঠল, যদিও ঠিক কথা তবুও চাপা দিয়ে বলল—তা কেন বলছ বাবা—এ যে আমার কর্ত্তব্য।

সে জানত এ অন্যায় কথায় তার বাবা সায় দেবে না এইজন্যই সে ঐকথা বলেছিল।

—সে কি, কর্ত্তব্য! এতদিন তোমার কর্ত্তব্য ছিল। এখন পতিগৃহে গিয়েছ সেই গৃহই সুসজ্জিত করে তোল। সেই হল তোমার প্রধান কাজ।

—হ্যাঁ বাবা, সেই সব কথাই তোমাদের বলব আমি।—এই বলে এতদিনের চেষ্টা সংগ্রাম ও পাঁচজনের ঐকান্তিকতা, স্বামীর সহানুভূতি ইত্যাদি সব কথা সে ধীরে ধীরে বাবা মার কাছে ব্যক্ত করল। এই কথার মাঝে এক সময় প্রণবেশ এসে দাঁড়িয়েছে। সেও সব শুনল।

বাবা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে স্নেহভরা অন্তরে উত্তর দিল—আমরা আর কতটুকু আশীর্ব্বাদ করতে পারব মা, ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমার গুণ যেন দেশে দশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমার আশীষ কতটুকু মা।

—তা কি করে হতে পারে বাবা; তোমার স্নেহাশীসই তাঁর দুয়ারে আমাকে পৌছে দেবে। তবেই তো ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ নেমে আসবে।

মা সরল সাদামাটা মানুষ—হ্যাঁ মা আশীর্বাদ করি তোরা যেন বড় হোস। তবে আমাদের মনে রাখিস।

সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া সেরে নিল। ঋতা তৈরী হল এবার। বেলাবেলি না বেরুলে পৌছতে রাত হয়ে যাবে। প্রণবেশ দিদিকে রাস্তার এগিয়ে দিয়ে গেল। দিদি ভাইকে বিদায়কালে বলল—তুই মাঝে মধ্যে যাস

কিন্তু। আর ভাল করে পড়াশুনা করবি। কেন সবই তো বুঝতে পারছিস। তোর জীবনে একটি বছর নষ্ট হওয়া সে যে কি ক্ষতিকর তা ভাবা যায় না।

প্রণবেশের চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। দিদির কাছে বিদায় নিয়ে সে বাড়ী ফিরল।

ঋতা কোয়াটারে এসে দেখে মানিক বৈঠকখানায় কি যেন লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত। সে ঘরে ঢুকে বলল—কিগো, তুমি আজ বিকেলে কোথাও বেরোওনি ?

—না আজকে আর কোথাও না বেড়িয়ে অফিসের কাজগুলো সেরে ফেললাম। যাক্ ওখানের খবর সব ভাল ?

—হ্যাঁ সব ভাল।

—তা তুমি এসব কথা কিছু বললে নাকি—এই স্কুল তৈরীর কথা ? থাক্ পরে শুনব। এখন যাও হাত পা ধুয়ে নাও। আমার হাতে আর একটু বাকি আছে সেরে নি।

—তোমার চা জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে ?

—না আমি এখনও খাইনি। ভাবলাম তুমি এই তো এখনই এসে যাবে, একসঙ্গেই খাওয়া যাবে এখন।

ঋতা ভিতরে গিয়ে সব গুছিয়ে স্বামীর কাছে চা নিয়ে এল।

পতিগৃহে ফিরে ঋতা
শুধায় কুশল আগে তারে—
বল গো আমায় তুমি
আমা বিহনে এ দিন তোমার
কাটল কেমন করে।
হয়েছিল খুব কষ্ট জানি
ভাগ নিয়েছি তাহার আমি
আমার লাগি

কষ্ট তোমার সহেছ,
দয়া করে, দিয়েছিলে
আমায় ছুটি তুমি।

কি বল ওগো তুমি !
পতিগৃহে এসে ঋতা
কি বলিছ !
করে যাও অবাক আমায়—
বাঁধ আমায় কেমন করে
তাই গো বল শুনি ?

শুধাই আগে আমি তোমারে
বল ঋতা,
পিতাগৃহের সমাচার—
আছে কি কুশলে ?
পেয়ে আনন্দ হয়েছিল
সবার জানি ওগো তোমারে।
আসিবার কালে
করে এলে নিরানন্দ
বহালে অশ্রু পিতা মাতার
ভাই ভগ্নী কাঁদে
ধরে মায়ের অঞ্চলে।
দিল জননী বিদায় তোমায়
রহিল দাঁড়ায়ে পিতা তোমার
করিল আশীর্বাদ
অন্তর অন্তরে।

ও ঋতা, ছিনু আমি খুবই ভাল
কেন শুধাও কুশল !
জান না কি গিয়েছিলে—
গিয়েছিলে কেমন করে—
বলেছিলে, কি আমারে ?
ও ঋতা—
কেমন করে বলব তোমায়।
এবার কেমন করে আমার পিতায়
বোঝাই আমি !

হে ঈশ্বর—
যদি হও সত্য ওগো তুমি
দিও শক্তি
দিবে আমায়
ঠিকই জানি ;
বোঝাব পিতারে আমি।
দরদী মাতারে ডেকে
বলিব, মা মাগো শুন তুমি।
শুন মা আমার বাণী।
মা, কারে দিয়েছ
মানিকে তোমার—
কে নিয়েছে তাহার বলে।

যদি ঠিকই জান—ওগো জননী,
মা, পিতা মাতার ভাগ্য বলে,
আমার ভাগ্য আমি মানি।
পেয়েছি তাই তো ভার্যা
ওগো কেমন করে বোঝাই এক্ষুনি।
হে ঈশ্বর, সবার মাঝে
দাঁড়ায়ে তুমি
ঠিক উত্তর দাও আমায়
আমি চাই বোঝাতে
আদর্শবান পিতারে আমি।
ও পিতা—

শান্ত হও পতি তুমি
তব চরণে বাধা আমি
তব আশীর্ব্বাদের ভিক্ষা প্রার্থী
কর জোড়ে আঁচল পেতে
তব চরণে নত মস্তকে
রহেছি দাঁড়ায়ে আমি।
শান্ত হও শান্ত হও ওগো পতি
পতি তুমি।

মানিকের কাছে এক এক করে সারাদিনের সমস্ত কথাই বলল। এবং মানিকও ফাইল গুটিয়ে স্ত্রীর কথা মন দিয়ে সব শুনল। উত্তরে মানিক কোন জবাব না দিয়ে অন্য কথায় গেল।—আচ্ছা বাবাকে আজ অনেক দিন হল চিঠি দেওয়া হয়েছে; কই উত্তর এল না তো?

—নিশ্চয় আসবে। বাবা হয়ত ব্যস্ত আছেন। তবে আমার কি ইচ্ছা জান—দিন কতক অপেক্ষা করে আমিও বাবাকে একখানা লিখব।

—বেশ। আচ্ছা, মহেন্দ্র অনেকদিন হল দেখা করেনি। কি ব্যাপার বলত? ঐ জায়গাটার কতদূর কি ঠিক করল জানিয়ে যাবে তো। দেরি করলেই সব কাজ পিছিয়ে যাবে।

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন মহেন্দ্র সে রকম লোক নয়, সে যখন নিজে উপর দিয়ে এত কথা বলেছে তখন সময় হলে ঠিকই আসবে।

রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর ঋতার ইচ্ছা ছিল স্বামী শুয়ে পড়লেও কিছু সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসবে। দিনে অফিস রাতে অবসর করে সেইজন্য ঋতাকে এই কাজগুলো সেরে নিতে হয়। শুধু কি তাই রান্না বান্না, ঘর সংসারের কাজ সবই ঋতাকে নিজের হাতে করে নিতে হয়। ছোট সংসার হলেও কাজটা তো ঠিকই আছে, পরিমাণটা না হয় কম।

সায়া ব্লাউজ কাটা হয়ে পড়ে আছে। হাতের কাজ সে ফেলে রাখতে চায় না। যেদিনে বসেছে, মানিক শুতে যেয়েও উঠে এল।

—তুমি শোবে না?

অবশ্য এ কথা সে প্রায় প্রশ্ন করে থাকে। সেইজন্য স্বাভাবিক নিয়মে সে বলল—না তুমি শুয়ে পড়গে।

কি জানি কেন মানিক স্ত্রীর কাছে বসল। একটু চমকে উঠে বলল—কি ব্যাপার তুমি শুলে না?

—না, চল না, তুমি শোবে না?

ঋতার স্বামীর মনের কথা বুঝতে আর বাকী থাকল না, সে ধীরে ধীরে হাতের কাজ গুটিয়ে উঠে গেল।

সকালে উঠে ঋতা স্বামীকে চা জলখাবার দিয়েছে। বাইরে ডাক পড়ল—বাবু বাড়ী আছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, কে মহেন্দ্র ? কি ব্যাপার, কতদূর কি করতে পারলে ?—বলেই মানিক স্ত্রীকে ডাকল—শুনছ মহেন্দ্র এসেছে !

—"হ্যা যাই"—বলে ঋতা এসে দাঁড়াল।

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে সব কথা বলতে সুরু করল—অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমার সঙ্গে একজনের অনেক দিনের জানাশোনা ছিল বলে হাজার চারেকের মত কম হবে।

ঋ—যাক তবুও ভাল—

মানিক কথা টেনে নিয়ে বলল—ভাল আর কি দেখছ দাঁড়াও রেজিষ্ট্রি নিয়ে সবশুদ্ধ কত পড়ে দেখ। হ্যাঁ মহেন্দ্রকে চা দিলে না ?—মানিক চায়ের কাপ মুখ থেকে নামিয়ে বলল।

ঋ—হ্যাঁ এই দিই।

ঋতা বলতে মহেন্দ্র আপত্তি তুলল।—না দিদিমনি আমি চা খাব না। এই খেয়ে আসছি।

মা—অল্প একটু খাও।

ম—না একেবারেই খাব না। হ্যাঁ যে কথাটা বলছিলাম সেইটিই বলি। এবার তাহলে আপনি সরাসরি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মা—বেশ। কোথায় কখন দেখা করবেন তিনি ?

ম—বলেন তো আজই আপনার অফিসে নিয়ে যেতে পারি।

মা—না সন্ধ্যের পর বরং বাড়ীতেই নিয়ে এস।

মহেন্দ্র বিদায় নিল।

এর মধ্যে বারকয়েক অমরেশ কলকাতা ঘুরে গেছে। এবার সে এম. এ. পড়বে। ইচ্ছা করলেই দাদা বৌদির ওখানে যেতে পারত। কিন্তু সে দুর্বল ইচ্ছা অমরেশের পক্ষে একরকম অস্বাভাবিক। যাকে সে স্বীকার করে তাকে সে শক্ত হাতে ধরে। ছিটিয়ে দেওয়া জিনিসের দিকে তার একটা কৃপাদৃষ্টি থাকে কিন্তু মানিয়ে নিতে তার মন সায় দেয় না। এ স্বভাব শিবশঙ্করেরও। তাই কোনবার ওদিকের কোন প্রশ্নই তিনি খোকাকে করেন নি। তবে

মায়ের মন কোমল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে কলকাতা যাচ্ছিস তোর দাদার সঙ্গে দেখা করে আসবি নাকি? ছেলেও বেশী কথায় না যেয়ে মাকে মায়ের মত বুঝিয়ে দেয়—আমার সময় হবে না মা।

আজকে শ্রীমতী স্বামীকে বলছে—হ্যাঁ গো মানিকের চিঠিটার উত্তর দিলে নাকি?

—না দেওয়া হয় নি কি যে লিখব তাই চিন্তা করছি।

—হ্যাঁ তাড়াতাড়ি একটা কিছু উত্তর দাও চিন্তা আর কতদিন করবে!

—তোমার কাছে সেই নিয়ে তো আলোচনা করলাম। তুমি তো কিছু বললে না।

—আমি কি বলব! আমার কিছু বলার আছে! খালি এক কথা শিখে রেখেছে আমি বললাম না, আমি বললাম না। সব সমান তোমরা। খোকাকে বললাম তুই একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে আসবি। কতবার হারামজাদা ছেলে গেল—একবারও তার সময় হল না। বুঝতে একবার মা হলে। বুঝবে কি অফিসে চলে যাও। পাঁচজনের মুখ দেখলে পাঁচটা কথা বললেই তো তোমরা ভুলে যাও।

—আঃ! রাগছ কেন তুমি অত।

—ওমা, মাছ কাটা হয়ে গেছে; এস।

—হ্যাঁ দীপা তোর মাকে ডেকে নিয়ে যা তো। তোর দাদার জন্ত তোর মায়ের মনটা এখন খুব খারাপ হয়ে গেছে।

—আহা কি যে বল? দীপা ডাকলেই বুঝি আমি ভুলে যাব? যার জন্ত আগুন জলে সে আগুন সে ছাড়া কেউ নিভাতে পারে না। শুধু কাজের চাপে মনকে বেঁধে রাখা। তা ছাড়া আর কিছু না।

—বুঝি শ্রীমতী আমি সবই বুঝি।

—বুঝ যদি তাহলে এসব কথা বলছ কেন?

—কি করব এ ভাবে সান্ত্বনা না দিলে উপায় কি।

জননীর ব্যথায় পিতার হৃদয় যে মোচড় দিচ্ছিল সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু কি করবে, শিবশঙ্কর যে পুরুষ। তাকে সব কিছুই যে হাসিমুখে বহন করতে হবে। তাঁর উপর শিবশঙ্করের কাছে সত্য আদর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

শ্রীমতী রান্নাঘরে ঢুকেই বলে উঠল—নে বাবা, তোদের সব সময়ই তাকা। তুই আর এটা করতে পারছিলি না!

—তা কি দিয়ে কি করব তা তুমি না বলে দিলে! করে দিলেও তো ওদিকে বকবে। তোমার এখন এমন হয়েছে না সব সময়ই বকুনি দাও। যত না দাদাকে কাছে পাচ্ছ তত তুমি আমাদের উপর চাবল নিচ্ছ।

কোথা থেকে মণ্টু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল—হ্যাঁ দিদি, ঠিক বলেছিস। সেদিন না আমাদের ক্লাবে বল খেলা হবে, বাইরে থেকে দল এসেছে, মাকে একটা টাকা চাইতে মা যা বকে উঠল না। পরে অবশ্য দিয়েছিল।

শ্রীমতী এতক্ষণ চুপ করেছিল। এমন একটি কথা বলল সে এবার যা দীপা মণ্টু উভয়ের পক্ষে প্রযোজ্য।—যা যা বকিস নি তো, এখন লেখা পড়া শিখে বড় হ। বড় হলে বুঝবি।—একটু থেমে বেরিয়ে যাবার জোগাড় করে বলল—ঝাল চাপিয়ে দিলাম দেখে নামাবি। আমি একটু তোর বাবার কাছে যাই। একটা কথা মনে পড়ে গেল।

শিবশঙ্কর শ্রীমতীর পায়ের শব্দে একটু চমকে উঠল—কি জানি আবার কি মনে পড়ে গেল। আবার কতক্ষণের ধাকা! এদিকে যে অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। বেশী কথা ভাববে কি শ্রীমতী এসে হাজির।

—বলি হ্যাঁগা, পশুপতিবাবু যে খবরটা দিয়ে গেল সেটার জন্যই বা তুমি কি করছ? সব কাজেই যেন তোমার গাফিলতি। শুধু এক অফিস আর অফিস। মেয়ে কি তোমার বড় হয়নি—কি ভাবছ বলত?

—আঃ ও রকম কথা বলছ কেন? কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখি—লক্ষ্য আমার সবদিকেই রয়েছে। পড়াশুনার সময় যদি সব সময় বিয়ের চিন্তা করে তাহলে মনের উপর অল্প চাপ পড়ে না? সেই জন্য চিন্তা আমরা ঠিকই করি কিন্তু ব্যক্ত না করাই ভাল।

—কথা বলতে জান বুঝিয়ে বটে? চিন্তা যে করছ তার প্রমাণ কি?

—প্রমাণ দিতে গেলেই তো দীপাকে উত্তক্ত করে তোলা হয়।

—হ্যাঁ হচ্ছে উত্তক্ত!

—আঃ ভুল বুঝছ কেন, আমি ঠিকই খোঁজ খবর রেখেছি। পশুপতিকে তাদের চিঠি দেওয়ার কথা বলেছি সেইটিরই খোঁজ নেব। দেখে ছেলে মেয়ের কাছে বাপ মায়ের কর্তব্য চিন্তা করা যায় না।

—কি আর কর্তব্য তা হলে কি আর আমার পোড়া কপালে আগুন লাগত!

—তা কপাল যদি তোমার এত খাঁথের খোয়া যে—তাপেই আগুন ধরে যায় তবে আর কি করা যায় বল?

—ও মা, ঝোল হয়ে গেছে এখন কি চাপাব?

—ও দীপা বুঝি আজ রান্না ঘরে?

—হ্যাঁ মেয়ে তো বড় হল—শুধু পড়া আর পড়া কাজ শিখতে হবে না! সেই জন্য রান্নায় নিয়েছি।

—তা ভালই। মাই মেয়ের শিক্ষক ভাল হয় যদি মা হয় সুগৃহিণী।

শ্রীমতী আবার এদিকে দীপার কথায় চলে এল। আসতে যেয়েও মুখ ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে নিল—তোমার অফিসের সময় হয়ে গেছে নাকি?

—হ্যাঁ এবার স্নান করতে যেতে হবে।

মুখ ঘুরিয়ে দুপা না আগাতে সমুখে খোকা।—কিরে?—কি যেন সে মাকে বলতে এসছে।

—ওমা আজ আমায় একটু যেতে হবে।

—কোথায় আবার যেতে হবে? জানি নি বাপু, কি যে করছিস তোরা!

কিন্তু আর তখন শ্রীমতীর কথা বলার সময় ছিল না। মেয়ে হাঁ করে মায়ের আশায় বসে আছে উনান বইয়ে দিয়ে। যাক দীপাকে আর বেশীক্ষণ সামলাতে হল না। মা তার দায়িত্বভার নিল। খানিক বাদে শিবশঙ্কর স্নান খাওয়া সেরে অফিসে বেরিয়ে গেল।

খোকা খেতে বসল। ছেলেকে খেতে দিয়ে মা প্রশ্ন করল—কিরে তুই আজ কোথায় যাবি রে, কেন যাবি?

—ঐ তো তোমাকে বলছিলাম না একদিন, যে হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করব না, তা সেখানে গিয়ে দেখে শুনে সব ব্যবস্থা করে আসতে হবে।

—তা ওখান থেকে তোর দাদার অফিস কতদূর?

—বেশী দূর না হলেও দূর বটে।

—তা আসা যাওয়ার পথে একবার তো দেখা করে আসতে পারিস।

—যাব গো যাব, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আচ্ছা মা, বলত তুমি সবার চাইতে দাদাকে বেশী ভালবাস—না?

—তা তো বলবই। তোদিকে কি কমটা।

উত্তর কেড়ে নিয়ে দীপা ছুটে এল—আমরা আর কি বলব, তোমার ভাবই বলে দিচ্ছে, তাই বলছি।

—তোমরা যে সকল ভোগের মাঝে রাতদিন আদায় নিচ্ছ—তা তোমরা জান না ?, আর দাদার নাম করলেই দাদাকে ভালবেসে দিচ্ছি বেশী—না ?

—আঃ দীপা, ও তুই কি করছিস—বড় ছেলে তা একটু ভালবাসবে না !

—তুই থাম তো খোকা, তুইতো উসকাচ্ছিস।

এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মণ্টু—তোমরা কেউ জান না, মা সবচেয়ে বেশী আমাকে ভালবাসে, না কি গো মা ?

—চ' চ' বিরক্ত করিস নি তো। মা যে কাকে ভালবাসে আর কাকে ভালবাসে নি সেটা যদি বুঝতিস তাহলে তোদের দাম হত কত।

খো—আচ্ছা মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন জ্ঞানের সঙ্গে চিনতে ও বুঝতে পারি। শিশুকালের খোরাক হচ্ছে মায়ের স্নেহ মমতা আর জ্ঞানের খোরাক হচ্ছে জ্ঞান, বিবেক, আদর্শ। তাই নিয়েই করবে আমায় পাগল। নচেৎ ছোট বেলার স্নেহ ভালবাসা তাতে বড় হলে জন্মাবে—পিতা মাতা শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আসল খোরাক না খুঁজে পেলেই বাধ্য হয়ে বহুদূরে তাকে ছিটকে যেতে হবে কিন্তু শ্রদ্ধা ঠিকই বজায় থাকবে।

—খোকা ! একি কথা তোর মুখে শুনছি খোকা ? এ তুই কি বলছিস ? আমার মধ্যে তুই কিসের অভাব দেখলি, কি খুঁজছিস বল ?

—না মা তোমার মধ্যে আমি কিসসেরও অভাব দেখি নি। যার জন্য ছোট বেলার সেই স্নেহ মমতা আজ তোমার সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে এমন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে যা ক্রমেই আমাকে পাগল করে তুলছে। আজ আমি সত্য আদর্শ কোথা থেকে জানলাম বা জানতে পারলাম। সেই শিশুকালে একা কলম আমি ঘরে এনেছিলাম। মা কত স্নেহ মমতার সঙ্গে তার সত্য আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলে জানিয়েছিলে বাবার জীবনের কত কথা। সেই জন্যই পিতা মাতা আজকে আমার কাছে জীবন্ত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে ভেবে দেখ দেখি মা এর সঙ্গে স্নেহ মমতা মিশে এর কি রূপ হতে পারে ?

জননীর অশ্রু প্রবল বন্যার বেগে ঝরে বুক বেয়ে নামছে। খোকা বক্তব্য শেষ করেই মায়ের মুখের দিকে চাইল। দেখল জননীর সস্নেহ ভক্তি অশ্রু ঝরছে।

হে ঈশ্বর মালিক তুমি তোমার করণীয় কাজে যেন কোথাও আমার ভুল ত্রুটি না হয়। এই আশীর্ব্বাদ কর তুমি।

এই কথাই মা খোকাকে জানাল।—আমি কেউ না খোকা, সম্পূর্ণ মালিক তিনি। শুধু কিছুদিনের জন্য মালিকানি আমার উপর দিয়েছেন। তাই কোথাও ভুল চুক দেখলে শুধু মনে হয়—আমি কি তা হলে ঈশ্বরের কাছে অকর্মণ্য কর্মী আমার ভুলেই কি এই রকম হল! কোথায় আমার অযোগ্যতা এই বলেই মনের মধ্যে তোলপাড় আরম্ভ হয়।

মণ্টু দীপা কিন্তু দূরে সরে যায় নি। তারা কাছে থেকে মা দাদার বলা কওয়া অবাক হয়ে শুনছিল। যাক শ্রীমতী যথারীতি কর্মব্যস্ত হল। খোকা যথাসময়ে রান্নাঘরেই মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় স্বামী ফিরেছে যেমন রোজ ফেরেন। খোকা ফিরেছে রাতে। ছেলেকে দেখে মায়ের মনে খুবই আশা হল নিশ্চয় খোকা ওর দাদার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। খোকা এ কথা বুঝতে পেরেই বলল মা, আমি কিন্তু খুব আশা নিয়ে গেছিলাম দাদার সঙ্গে এবার দেখা করবই করব। কিন্তু আমার কাজের জায়গায় এমন ভাবে দেরি হয়ে গেল—

—যাক তোকে আর বলতে হবে না আমি কি আর জিজ্ঞেস করছি! তোদের কাজে কাজেই সময় কেটে যাবে সে কথা আমি আগেই জানতাম।

—তুমি বিশ্বাস কর মা, আমি আজকের রাত থেকেও দাদার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতাম কিন্তু দিন কয়েক পর আবার আমাকে যেতে হবে। সেইজন্যই আর জেদ করে রইলাম না।

—সে তোদের দয়ার উপর নির্ভর—যা ভাল বুঝিস করবি।

শিব—আঃ ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ও তো বলছে ওকে আবার যেতে হবে।

সকালে আজ শিবশঙ্করই বাজারে গেছে। এর মধ্যে পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল। খোকা একটা খাম দেখেই একটু চমকে উঠল—বাবার নামে খাম—এ যে মনে হয় মেয়েছেলের লেখা। আবার দাদার ঠিকানা থেকে এসেছে। ওর জানতে বুঝতে বাকী রইল না। বাবা বাড়ী আসতেই চিঠিগুলো হাতে দিল। শিবশঙ্করও ছেলের মত খামটা দেখে প্রথমটা একটু হচ্‌কচিয়ে গেল। খোকা কাছেই দাঁড়িয়ে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে চলেছে। খোকা বাবার মুখের দিকে চেয়ে একটু স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাবার মুখ যেন একটু চকচকিয়ে উঠল।

শিবশঙ্কর ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকাল—খোকা তোমার মাকে ডাক। মণ্টু দীপা কোথায়? সকলের শোনার মত। নাও তুমি এটা পড়ে সকলকে শোনাও।

পরম পূজনীয় বাবা ও মা

আমি আপনাদের অপরিচিতা। আপনাদের কাছে আমার পরিচয় দেওয়ার মত কিছুই নেই। তবে এইটুকুন ভরসায় আমি পরিচয় দিচ্ছি যে আপনাদের চরণে আমাকে স্থান দিতে হবে। আমি—আমার পরিচয় এই যে, আপনাদের পুত্রবধূ।

বহুদিন হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করার সুবিধা সুযোগ ঘটে নি। আমি জানি আপনারা আমাকে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে এইটুকু আমার মনে আশা বা ভরসা যে আপনি আদর্শ ও সত্যের পূজারী। সেই আশায় আজ আপনাকে আমি এই চিঠি ভরসা করে লিখছি। নিশ্চয় আপনি আমার জীবনের অনেক কিছু জানলে আপনি আমাকে গ্রহণ করবেন! আমি একটি অসহায় অভাগিণী এই মনে করেই আপনার ছেলে আমাকে বিয়ে করে তার কাছে স্থান দিয়েছে। তাই আপনাকে আজকে আমি লিখি—আপনি নিশ্চয় আমার এ চিঠির জবাব দেবেন। আমি আপনার ছেলের কাছে সব কিছু শুনেছি ও জেনেছি।

আমার মনের নূতন ইচ্ছা আপনি নিশ্চয় এতে আশীর্ব্বাদ করবেন এবং আসবেন। আমি একটি স্কুল খুলতে চাই। আগের জীবন আপনি নিশ্চই আপনার ছেলের কাছে শুনে থাকবেন। আমি একটি অফিসে চাকরি করতাম। বর্ত্তমান আপনার ছেলের মনের ইচ্ছানুযায়ী আমি সেই স্কুলের শিক্ষিকা হব—এই স্থির করেছি। আপনার মতামত কি আপনি জানাবেন। আপনার পত্রের আশায় রইলাম।

আরও কথা শুনেছি—নিশ্চয় এই চিঠি আপনি ঠাকুরপোকেও পড়াবেন—ঠাকুরপোও সত্য আদর্শের প্রতি অনুরক্ত—এ কথাও আপনার ছেলে আমায় বলেছে। মা হয়ত এই কথা প্রথমে শুনলেই চমকে যাবেন। কিন্তু পরে পশ্চাতে মাও জিনিসটি বুঝতে পারবেন। আপনারা সকলেই এ কাজে আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন ও উৎসাহিত হবেন বলেই আমি আশা রাখি।

আপনাকে আসা চাই-ই। আপনি জানবেন এ কাজে আমাকে মত না দিলে

আমি কিছুতেই অগ্রসর হতে পারব না। আপনি আসবেন এই আশা রেখে আমি আপনাকে চিঠি দিলাম। আমি পত্রপাঠ চিঠির আশা না করে আপনার আসার আশায় রইলাম। আপনারা—আপনি ও মা আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানবেন, ছোট ছোট ভাই বোনেদের আমার স্নেহ দিবেন, ইতি

আপনাদের হতভাগিনী বৌ।

এই চিঠি পাঠ শেষ হলে হঠাৎ দীপা বলে উঠল—ওমা, এ তো বেশ—মেয়েটার মধ্যে বেশ উচ্চ আশা আছে। সেই বল—এ যে আমাদের দাদা। আমরা যদি না বৌদি বলে কাছকে যেতে পারি তবে সেরকম জিনিস দাদা করবে কেন!

তুই থামত দীপা, সব বুঝলি। যার জন্য ঝপ্ ঝপ্ করে তোর মন্তব্য পাস করছিস।—ঝাঁকার দিয়ে উঠল মা।

শিব—আঃ ওরকম বলছ কেন? যতই বল ও তো একবারে মুখ্যু নয়। ওরও তো বোঝবার একটা শক্তি, শিক্ষা আছে।

শ্রী—তোমাদের ঘরে ত আমি বোঝার কাউকে কম দেখি না। তোমরাই যদি এত বোঝ ত আমাকে এনে সাক্ষী দাঁড় করাবার কি দরকার। আমি কি না শুনলেই নয়।

অমরেশ—মা, সবেতেই তুমি এত রেগে যাও কেন? চিন্তা করনা জিনিসট।

শ্রী—এই আর এক জ্ঞানদাতা দাঁড়াল।

শি—দেখ শ্রীমতী সত্য আদর্শ নিয়ে জ্ঞান বিচারে ছোট বড় ভেদাভেদ রাখা চলে না তাই নয় কি? খোকা যখন একদিন বালক ছিল তখন আমাদিকেই হয়ত কত সত্য আদর্শের রূপ দেখাতে হয়েছে বা জানাতে হয়েছে। আজকে হয়ত সেই খোকার কাছে যা আমরা দেখিয়েছিলাম বা বলেছিলাম তা নস্যিবৎ। তার ঢের বেশী সে শিখেছে। লক্ষ্য রাখবে সে অশ্রদ্ধা অপমান কোথাও করছে কি না! কিন্তু তাই বলে তার সত্য আদর্শকে ব্যক্ত করতে দেব না—এ যেননা হয়। সেইটিই কি গুরুজনদের উচিত নয়? আমার জ্ঞানে আমি এক চার আনা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ দেখছি সে চৌদ্দ আনার অধিকারী। এ আনন্দ বা গর্বের নয় কি? তবে হ্যাঁ একটা কথা সেও যেন স্বীকার করে যে প্রথম সূত্রপাত কোথা থেকে। তাহলেই আমার মনে হয় যা

বাবার শান্তিময় জীবনই হয়। এবং ছেলের কাছেও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকে। আমি যে প্রদীপের আলো দেখিয়েছিলাম তা থেকে এখন সে কত উচ্চস্তরে। পূর্বের আলোয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যদি বাবা মা সব ভুলে যায় তাহলে সন্তান সে তার আদিকে লক্ষ্য করেই পিতা মাতার প্রতি অটুট শ্রদ্ধা রাখে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে প্রদীপের আলোকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তাই না কি?

খোকা মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে আছে। আর একবার যেন তার কাছে তার পিতার চরিত্র নূতন আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। আগাগোড়াই জানে সে তার পিতাকে। আজ হল আরও গভীর করে জানা। তার পাশে ফেলে মাকে খোকা বিচার করতে পারবে। কিন্তু না না মাও যে আমার আদর্শময়ী। এটা নেহাৎই স্নেহের তাড়না। আমি তো আমার মাকে ভাল করেই চিনি। কেমন তার স্নেহ মমতা তেমনি তার সত্যনিষ্ঠা তাই ভেবে শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখজোড়া মেলে মায়ের দিকে একবার চাইল।

অম—তাহলে মা বুঝলে, পরশু আমি কলকাতা যাচ্ছি। এবার কিন্তু নিশ্চয় আমি দাদার সঙ্গে দেখা করে আসব।

জননী তার সম্পূর্ণ মুখখানি ফিরিয়ে নিয়ে—কিরে মনটা তোর আবার কি হল? স্কুল যাবিনি বলছিলি—আয় দেখি তোর গাটা।

মণ্টু মায়ের দিকে এগিয়ে গেল। মা ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বলল—হ্যাঁ একটু যেন মনে হচ্ছে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। তোর দিদিকে বলগে তুই যদি ভাত খাবিনি। অন্য তোর জন্য দুখানা করে দিক।

মণ্টু—দিদিকে আর বলতে পারব না। ওর স্কুলের সময় হয়ে গেছে।

শ্রী—তবে থাক আমিই যাচ্ছি।

শি—তাহলে চিঠিটা তুমি শুনলে।

শ্রী—হ্যাঁ শুনলাম তো—অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল।

শি—থাক, আফিস থেকে ফিরে আলোচনা করব। ঐ সময় খোকাও থাকবে।

শ্রী—আলোচনা আবার কি করব আলোচনা।

বলতে বলতে শ্রীমতী হেঁসেলের দিকে চলে গেল। কোন রকম শিবশঙ্করও প্রতিবাদ না করে আফিসে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় অফিস ফেরৎ ছেলে বৌ নিয়ে আলোচনায় বসেছে গৃহস্বামী।

সকলকেই কাছে ডাকল সে। খোকা তৎপর, কিন্তু তার মা যেন আসতে পারছে না যেন কাজের চাপে রান্না ঘরেই আটকে রয়েছে। এর মধ্যে বাপ বেটা কিছু কথায় এগিয়ে গেল।—তাহলে অমরেশ তুমি তো চিঠিখানা পড়লে, এতে কি উত্তর দেওয়া যায়?

—তুমি বল না বাবা, কি উত্তর দেবে।

—হুঁ সেই জন্যই তো তোমার সঙ্গে আলোচনায় এলাম কি উত্তর দেব।

আমার তো জ্ঞানে বলে—যে রকম ধরণের জিনিস আমরা জেনেছিলাম বা ভেবেছিলাম এ চিঠিতে তার বিপরীত দেখছি। তোমার কাছে জাত বড় কথা নয় সত্যই সব! তাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে আর একটিকে তো মেনে নিতেই হবে। সেই কারণ তুমি এবার ভেবে দেখ কি করবে।

—হ্যাঁ তোমার মতে আমারও মত। আর কিছু না তো, তোমার মাকে নিয়েই যত অসুবিধা সে যে নাম শুনতে পারছে না।

—ও আর কি কড় কথা! মায়ের মধ্যেও সত্য-আদর্শ আমি খুঁজে পেয়েছি। মায়ের হয়ত ইচ্ছা অন্যরকম ছিল, একটু গরমিল হয়ে যাওয়াতে মনটা একটু যেন কেমন হয়ে গেছে। ধীরে সুস্থে ঠিকই মানিয়ে নিতে পারবে।

বলতে বলতে মা এসে পৌছল। খোকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—এস মা বস, তোমার এত দেরি হল?

—হ্যাঁ হাতের কয়েকটা কাজ সেরে এলাম কিনা—

আর কিছু না হোক শ্রীমতীর গলায় নরম সুর শিবশঙ্করকে অনেকটা আশ্বস্ত করল। এই সময় মেজাজটা ঠাণ্ডা আছে। যাক কয়েকটা কথা হয়ত বলা যেতে পারবে।

শ্রী—নাও কি বলবে বল?

শি—হ্যাঁ বলব আর কি!—নাও না অমরেশ তুমিও তো চিঠিটা পড়েছ সেই চিঠির কথাই কয়েকটা আলোচনা করতে চাই।

খোকাও বাবার মুখের কথা পেয়ে আরম্ভ করল—ঐ যে সকাল বেলা বৌদির যে চিঠিটা এসেছে সেটা শুনলে তো, ওটা তোমার কাছে কি রকম লাগল বল?

শ্রী—বৌদি! বৌদি আবার কাকে বলছিস? আমরা তো তোর দাদার বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসি নি। তাহলে আবার বৌদি কে—কি করে হল?

অম—আঃ ওরকম কি কথা বলছ মা তুমি। তোমার কাছে এতো আমি তো আশা করি না। তুমি সত্য-আদর্শের মর্ম বোঝ। কেন এমন মিথ্যে রাগ করছ মা? তোমরা না বিয়ে দিয়ে আনলে কি বৌ বলে স্বীকার করবে না? এবার লক্ষ্য নিয়ে দেখ তোমার ছেলে উশৃঙ্খল জীবন যাপন করছে না প্রকৃত সংসারী হয়েছে। যদি ধর্মীয় মন নিয়ে সত্য আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে সে বিয়ে করে থাকে তাহলে তাকে মেনে না নেওয়ার কি কারণ আছে? সব বাপ মা-ই কি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে পারে? অনেক সময় ঘটনাচক্রে অনেক কিছুই হয়ে যায়। কিন্তু দেখতে হবে তার মূল কি। আর লক্ষ্যই বা কি?

এই যে এত কথা ছেলে বলে যাচ্ছে মা কিন্তু একটারও প্রতিবাদ করে নি। শিবশঙ্করও মনে মনে ভাবছে—হ্যাঁ খোকা যা যা বলে যাচ্ছে তাতে বলবার কিছু নেই। এরই নাম সত্যিই আদর্শ।

অনেকক্ষণ পরে মা-ই বলে উঠল—তাহলে আমাকে কি করতে বলিস তুই?

—না তোমাকে আমার বলার আর কিছু নেই। তবে সে অসহায় মনে করে যদি তোমার চরণে স্থান চায় তবে তাকে আশ্রয় দেওয়াটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? জাত তার ভুলে যেয়ে গুণ তার লক্ষ্য কর? কি বল বাবা—কথাগুলো আমার কি বলা ঠিক হচ্ছে? তুমি তো চুপ করেই রয়েছ।

শি—না আমার বলার কিছু নেই। তাহলে শেষ কি হল এর চিঠির উত্তর কি হবে?

খো—আমার তো মনে হয় আমি অনেক কিছুই বলে গেলাম—আর আমার জ্ঞানের দৌড়ই বা কতটা; বাকীটা তুমিই বল।

শিবশঙ্কর ধীরে ধীরে সুরু করল—আমার কি মনে হয় জান অমরেশ—যে মন নিয়ে যে আশা সে আমার কাছে করেছে সে আশায় তাকে বঞ্চিত করা মানে এক জাতের আমি সংস্কারাচ্ছন্ন। অতি সাধারণ একজনের পরিচয় দেব। তবে তুমি কি বল—সেইটা আগে জানি—স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল শিবশঙ্কর।

গভীরে শ্রীমতীর ইচ্ছা থাকলেও সে প্রকাশ করল—আমি জানি না বাবা তোমাদের যার যা খুশী করবে যাও।

শুনামাত্রই লাফ দিয়ে উঠল খোকা—ওমা ওকি কথা বলছ তুমি? তোমাকে সাধারণ মা ভাবিনি বলেই এই সব কথায় ডাকা বা বলা। আর

তাবপরে একথাও তুমি বোঝ বা জান যে বাবা তোমাকে ঘরে আনার পর থেকে ঠিক এই রকম জিনিসগুলোই বলেছে বা করেছে। তোমার জানার উপর যত না গুরুত্ব দিই তার বেশী হল—তুমি এতদিন ধরে বাবার কাছে কি শিখলে। সেটা তো আমরা ছেলে মেয়ে হয়ে তোমার কাছে আশা করব। কিন্তু তোমার কাছে যদি আমরা নানা রকম কথা শুনতে পাই তাহলে আমরা কোন্ পথে চলব—কোন্‌টা স্থির বলে জানব।

—দেখ খোকা এ সব আজে বাজে প্রশ্নের উত্তর আমি তোকে দিতে পারব না। সত্য আদর্শের আদর ঠিকই আছে। এটা তোর বাবার কথা মতই স্থির করে নে। আমিও যে এসব জিনিস ভালবাসিনি তা নয়। তবে জানবি—এমন কতকগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে আমিত্ব একেবারেই হারিয়ে আমাকে নির্ব্বাক নিরহঙ্কার হয়ে যেতে হয়। যেন আমিই কত অপরাধ করেছি। সব জায়গায় সত্য আদর্শকে ফুটান চলে না। যেখানে সত্য আদর্শের কদর বা আদর নেই সে জায়গায় কি করা উচিত বলদেখিনি ?

—মাঃ সে কথা কেন ভাবছ মা তুমি! সেরকম ক্ষেত্র বুঝতে না পারলে তোমায় সরে আসতে হবে।

—সেই ত হল—চোরের মতন ঘরে ঢুকে যেতে হল। সেইটিই তো আমার বেশী বাধেছ। বাড়ীতে কত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আসবে। তাদের একই প্রশ্ন—বৌমায়ের বংশ মর্যাদা—তার বাবা কি করে? ভাবত প্রতিজনকে কি বলা যায়! কি সত্য আদর্শের ছাপ নিয়ে ঘরে ঘরে পরিচয় দেব! তুই কি আমাকে বলবি—আমিও জানি রে জানি--যার নাম মহাদেব তার নামই গড তবে বেলপাতা তোলা, চন্দন ঘসার কি দরকার বা গীর্জায় যাবারই বা কি প্রয়োজন! আর একটা কথা জানবি -এই সবধরণের আলোচনা মেয়ে মহলেই বেশী হয়। খুঁজে বিচার খুব কম লোকেই করে। সে লোক দুর্লভ। তোর বোনের যখন বিয়ে হবে বা হতে যাচ্ছে, সব কথা বাদ দিয়ে আগে ঐ প্রশ্নেই উঠা পড়া হবে। সেই জন্য দেখ খোকা, তোর বাবার কাছ থেকে আমি শিখেছি আমারও মাথায় কিছু আছে—আমি নিজেই কিছু স্থির করতে পারি নি। এবং তারই ফলে নানা রকম দুঃখ বেদনায় মন ভরে উঠছে।

শিব—অমরেশ, এ পর্য্যন্ত তোমার মা বলে গেল আমি সবই শুনলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করা বা উত্তর দেওয়ার মত কিছুই নেই। যাক মন্টুর মা, এবার

আমি তোমায় বলি শোন—যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও তাহলে একটা কথা চিন্তা কর যতদিন ছেলে আমাদের কাছে লালিত পালিত হয়েছিল ততদিন সে আমাদের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ছিল। তাই নয় কি? ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তিনি ঘুরিয়ে ঠিকই করাবেন। শুধু মাঝখান থেকে আমাদের হায় হুতাশ মন খারাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই জন্য বলি ক্ষোভে সময় নষ্ট না করে শুধু করণীয় কাজে অগ্রসর হওয়া ভাল নয় কি? যদি দেখতাম এখানে করণীয় কিছু নেই তাহলে চুপ করে যেতাম। কিন্তু সামনে যখন করণীয় কর্ম এগিয়ে এসেছে তখন আমরা মাঝখান থেকে সত্য আদর্শকে ঠেলে দেব কেন? সে যা করতে চাচ্ছে; আমার ত মনে হয়, দেখে শুনে অম্লান বদনে তাকে হ্যাঁ দিয়ে সরে দাঁড়ান। তোমরা যা করতে যাচ্ছ তাতে আমাদের অন্তরের সায় আছে—এইটিই বুঝিয়ে বলা! তুমি সংসারে তাকে আটপৌড়ে ব্যবহার করবে কেন? সেখানে আশা ত্যাগ কর দেখবে জিনিসটা শান্তিময় হয়ে উঠবে। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে হবে—ছেলে বড় হয়েছিল সে তার বুঝে শুঝে ভাল মন্দ বিচার করে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। তবে বৌ আননি কেন ফির প্রশ্ন করলে বলবে আমাব সংসারের জন্য সে তো বিয়ে করে নি। সে নূতন সৃষ্টির মধ্যে অংশ গ্রহণ করবে বলে মনে করেছে। কথাটা শুনতে যদিও একটু অন্য রকম তাহলেও এই কথাই বলতে হবে। আরও চেপে ধরলে বলবে কি জানি আমার রুচিতে ঠেকে—কিন্তু এ কথাই তুমি জেনো শ্রীমতী আমার ছেলের ধর্মই তার ধর্ম।

তাহলে এই কথাই স্থির হল—তোমাদের একমত কিনা সায় দাও। গতকাল খোকা কলকাতা যাবে বলছে। তাহলে গিয়ে ব্যাপারটা কিছু জেনে আসবে। তাহলে?—

শ্রীমতী নীরবে সায় দিল। অমরেশ মন খোলা সায় দিল—এই যুক্তি বেশ—আমি তাহলে যেয়ে সব জেনে আসব।

এদিকে ঋতা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন, সকালেই স্বামীকে জিজ্ঞেস করছিল—হ্যাঁগো বাবার তো কোন চিঠি পত্তর এল না। আজ কদিন হয়ে গেল।

মানিক—তুমিও যেমন! আমার ত মনে হয় এর উত্তর বাবা দেবেন না।

—কেন?

—কেন আবার কি? যেকালে বাবা তোমাকেই স্বীকার করতে চান না সেকালে তোমার কোন কাজকেই তিনি মেনে নেবেন কেন?

—তাহলে আমি যে লিখেছি বাবা না এলে আমি এ কাজে অগ্রসর হতে পারব না।

—তুমি বলেছ·এবার তুমি বোঝ।

—কাজে যদি আমি অগ্রসর হই তাহলে বাবা নিশ্চয় একটি জানবেন। ভাবত তখন আমি কি রকম মিথ্যাবাদী হয়ে যাব। সেই কারণ আমার শেষ ইচ্ছা—যদি উনি না আসেন তাহলে আমি নিজে যেয়ে ওর পায়ে ধরে নিযে আসব।

—সে আবার কি কথা। তুমি কাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?·

—কেন তোমার সঙ্গেই যাব। তুমি সঙ্গে যাবে।

—আমি! আমি নিয়ে যেতে পারব না, বাবারে! আমারই ঢুকতে ভয় করছিল আর আমি যাব তোমাকে সঙ্গে নিয়ে।

—এ কি রকম ধরণের তোমার লজ্জা ভয়! তুমিও তাহলে কি আমাকে স্বীকার করনা, না কি?

—তা না করলে আর তোমাকে নিয়ে সংসার করছি কি করে।

—হুঁ, সংসার অনেকেই করে। যদি তাই হবে তাহলে সমাজে পাঁচ জনের কাছে বের করতে লজ্জা বোধ করছ কেন আর ভয়ই বা পাচ্ছ কি করতে? তুমি তো আমায় বিয়ে করেছ, না কি না?

—আঃ কি যে আজে বাজে কথা বক।

—কথা আমি আজে বাজে মোটেই বলিনি। কোথায় দশের সামনে বুক ফুলিয়ে বলবে—আমার বিয়ে করা বৌ। তা না করে যা তোমার অবস্থা সেটা কি ভয় নয়?

—সে রকম সমাজ তুমি কোথায় দেখলে যে আমি ভয় পাচ্ছি বলছ? যদি আজকে দেখে শুনে বাবা আমাকে বিয়ে দিত তাহলে বাবার সামনে তোমাকে নিয়ে দাঁড়াতে আমি লজ্জা পেতাম। এটাই জানবে বুনেদী আব্রু।

—যাক তাহলে এখন আমার কি করা উচিত সেইটা বল?

—উচিত? আমার ত মনে হয় এর পর তোমার ঠাকুরপোকে তোমার দুঃখ ভরা বোঝানো চিঠি লিখে তাকে ডাকা। এবং সে এলে, তাকে সঙ্গে

নিয়ে তোমার পথ কণা। গেলে একমাত্র তার সঙ্গেই যাওয়া চলে, যাক এখন অফিস যাওয়ার জন্য তৈরী হই। তা তোমার কত দেরী, তুমিও তো বেরবে।

—না আমি মনে করছি আজকে অফিস যাব না।

—কেন, কি হল আবার?

—না. শরীরটা আজ খারাপ।

—ও—কথা আর বাড়তে দেওয়া নিঃপ্রয়োজন মনে করল মানিক।

কাজের ব্যস্ততায় নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। ফাইলে মুখ গেদে সমান কাজ করে চলেছে। এক সময় বেয়ারা এক কাপ চা ধরে দিল। এ সময় চা খায় বলে না বলতেই এগিয়ে দিয়েছে। চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ তুলতেই সামনে দরজায় ভাইকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু হচকচিয়ে গেল—এতদিন পর এ সময় হঠাৎ অমরেশ—তাও আবার একেবারে অফিসে। কি সে জিজ্ঞেস করবে। প্রথমটায় কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। সামনে চেয়ার ছেড়ে বলতে বলতে এগিয়ে এল—কিরে খোকা, মা বাবা সব ভালত? বাড়ীর খবর?

অমরেশ উত্তর দিল—হ্যাঁ সব ভাল।

মানিক যেন এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হল। ধীরে ধীরে ভাইকে ভিতরে নিয়ে এসে বসিয়ে বেয়ারাকে আর এক কাপ চায়ের হুকুম করল। অমরেশ তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—না আমার এখন ট্রেনের সময় হবে যাবে।

—ট্রেনের সময় হয়ে যাবে। চল বাড়ীর দিকে চল—আজ-ই এখনই যাবি কেন?

—না দাদা আমাকে যেতেই হবে কারণ মা ভীষণ চিন্তা করবে।

হঠাৎ মানিকের বুকটা কেঁপে উঠে ডুকরে কান্না পেল—মা! আজ কি সে অমরেশেরই মা! মানিকের মা সে কি নেই। মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—নারে বাড়ীর দিকে না যেয়ে ফিরবি কি করে। চল তোর বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসবি।

না জেনে জোর করে দাবি নিয়ে বলে উঠল—মা নিশ্চয় জানে তো তুই আমার এখানে এসেছিস।

যাক দাবিটা তার মাঠে মারা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ উত্তর দিল—হ্যাঁ মাকে বলেই এসেছি। মা-ই কবার

ধরে ব্যস্ত হচ্ছে। আমারই সময় হয় না। সেইজন্ত এবার একরকম জোর করে সময় করেছি।

যাক মানিকের ভাঙ্গা বুকে কোথায় যেন একটু গোটা হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল।—তবে তো মা নিশ্চয় গাড়ীর বা বাসের সময় বুঝে স্থির করে নেবে—দাদা নিশ্চয় ভাইকে আটকে দিয়েছে।

অমরেশ চুপ করে আছে। তখন মানিক বলল—তা এক কাজ কর আমার ছুটি হতে আর বেশী দেরী নেই, তা আমি তোকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি তুই আগেই চলে যা। তোর বৌদিকে যেয়ে একটু চমকে দিবি। অবশ্য তোকে দেখে তার বুঝতে বাকী থাকবে না।

অমরেশের কিন্তু এতটা ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগল না। দাদার উপরোধে যদি যেতে হয় ত দাদার সঙ্গেই যাব। আগে এত আদর আপ্যায়নের কি প্রয়োজন! সে বলল—নাও না তোমার সঙ্গেই যাব। তবে তুমি আমাকে থাকতে বলছ দাদা, এটা কিন্তু আমি ঠিক মনে করছি না। কেন, এ এক ধরণের বাবা মায়ের অবাধ্য হওয়া।

মানিকের বুকে আবার ধাক্কা লাগল। সামান্ত রাত্রিবাসেই যদি অমরেশ এই কথা বলে—রীতিমত স্বাধীনতার বয়স এসেছে—সে তুলনায় দুর্ভাগা মানিক কি করেছে! বাবা মায়েরই বা কি করে দোষ দেব! সকলেই হীরা চায় রূপা আর কে আশা করে।

যাক দেখতে দেখতে অফিসের ছুটি হয়ে গেল। ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আফিস থেকে বেরিয়ে যাবে—চল, খোকা এবার আমরা ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে রওনা হই।

অমরেশ দাদার প্রতি অটুট শ্রদ্ধা রেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা বাড়াল। তা বুঝতে বাকী রইল না, অপরাধ করলে এই রকমই বোধহয় হয়। এদিকে আর দোষ দেব কি! এক কথায় আমি অবাধ্য তো বটে!

দুই ভাইয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। মানিক ডাকল—কপাট খোল। যেমন একধারে মানিকের আন্তরিকতা ও আনন্দ তেমন আর একদিক দিয়ে কোথায় যেন তার বাধা। যার ফলে সে আর কিছু বলতে পারল না। শ্বেতা এসে কপাট খুলে দাঁড়াল। পিছনের জনকে দেখে একটু হচকচিয়ে গেল। একই মুখ—মিল দেখে চিনতে আর তার বাকী রইল না। শ্বেতারও

হৃদকম্প আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু তার পাশ দিয়ে কোথায় যেন একটা আনন্দ থেকে থেকে ছুঁতে রইল। আজই সকালে কথা হচ্ছিল না—পথ হলে একমাত্র আমার দেওরকে নিয়ে হতে পারে। ঈশ্বরের কি আশীর্ব্বাদ—সেই দেওর আজ নিজেই আমার বাড়ীতে এসেছে। সত্য—সত্য পালন করতে পারলে নিশ্চয় ঈশ্বরেব আশীর্ব্বাদ আসে। আমি তো অন্যায় বা অপরাধ কোথাও করিনি। জাত ধর্ম সে তো ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। সে যে মানুষেরই মনগড়া। সত্য-আদর্শ সেই হল ঈশ্বরের সৃষ্টি।

কেমন করে সত্য পালন !
ব্যথায় ভরা হোক না জীবন।
নিশ্চয় পথ দেখাবেন
অন্তরীক্ষে আছে যেজন।

মুহূর্তে ঝবেব বেগে নানা রকমই তার ম'ন এল। সহজ গলায় বলে উঠল —ভদ্রলোককে চিনতে পাবলাম না তো ?

—চিনবে চিনবে। অতি পবিচিত।

অমবেশ এগিয়ে এসে দাদা ও বৌদিকে পাশাপাশি প্রণাম করল। যেই হোক না কেন দাদার বিয়ে কবা বৌ। মুহূর্তে ঋতা সব কিছু ভুলে যেযে তাব প্রণামের সুযোগ নিয়ে "থাক থাক" ভাই বলে চিবুক ধরে চুম্বন করল।

বয়সে এবা বেশী ছোট বড় নয় কিন্তু ব্যবহাবে অমরেশকে কাঁপিয়ে দিল।

মানিক বলে উঠল—একি ব্যাপার এখনও দেখছি, তোমার চারদিকে এলমেলো। তুমি বোধ হয় আজ খুব ব্যস্ত।

—হাঁ জানই তো। না কি বল ভাই ঠাকুরপো—ছেলেদের যেমন আফিস বন্ধ থাকলে তারা বন্ধু-বান্ধব ক্লাব সারে আমাব তো মনে হয় মেয়েরা বোধহয় বন্ধের লতা পেল তারা ঘরের ছোট ছোট কর্মে নিঁখুত কবে মন দেয়।

কথাটা তড়িৎ বেগে অমরেশের মনকে ছুঁয়ে গেল—চিঠির সঙ্গে লেখকের মিল আছে। প্রকৃতই পরিশ্রমী।

—যাক তোমরা দুভাযে এখন গল্প কর আমি তাড়াতাড়ি উনানটায আঁচ দিয়ে দিই—বলেই ঋতা রান্নাঘরে গেল। এই সুযোগ আঁচ দিতে দিতে ঠাকুরপোযের সঙ্গে গোটাকুযেক কথা বলা যাবে—ডাকি না কেন। 'ঠাকুরপো!' মিষ্টি গলায অন্তর ভরা ডাক শুনে অমরেশ আবারও একটু হচ্‌কচিয়ে গেল।

চেয়ে দেখল দালানে দাঁড়িয়ে বৌদি ডাকছে—শুন না ভাই এদিকে এস। চির পরিচিত দাদার কাছে বসে আর নতুন করে আলাপ করতে হবে না।

কথাটা মানিকেরও কানে লাগল। কোথায় যেন আনন্দ ছুঁয়ে গেল। অমরেশও লজ্জা সঙ্কোচের মধ্যে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে বৌদির কাছে উঠে গেল।

—ঠাকুরপো তোমার সম্বন্ধে না আমি তোমার দাদার কাছে অনেক কথা শুনেছি জান? আর যখন শুনি না তখন আনন্দে আমার বুক ভরে উঠে। সে •া আমারই দেওর! যে সত্য আদর্শ নিয়ে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই তা আর কতটুকু। তার চেয়ে বেশী যে আমাদের পরে আসছে।

যাক অমরেশের সামনে একথাগুলো কিন্তু অমরেশের খুব ভাল লাগছে না। কারণ সে এরকম জিনিষ মোটেই পছন্দ করে না। কে কার? যার করাবার দরকার তিনিই করিয়ে নেন। ও কি কারো ইচ্ছার উপরে;

—যাক আপনি ত নূতন বৌ সেইজন্য, বলার যা ছিল তা না বলে শুধু একটি কথাই বলব—সবেরই শেষ নিয়ে কথা। আজ যা দেখছেন কাল যে তা থাকবে, তার কি মানে আছে।

"এই আপনি" বলাতে ঋতার মনে দারুণ ঝড় ও দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে গেল। অমরেশ কিন্তু অত শত কিছু ভেবে বলেনি। থাক একথা এখন পরে তোলা যাবে—এই ভেবেই ঋতা অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করল।

—ঠাকুরপো তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি নিশ্চয় তুমি জেনে থাকবে। আমি যে কয়েকদিন আগে বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম সে চিঠির উত্তর পেলাম না। কি ব্যাপার বল দেখিনি?

অমরেশও কিন্তু এই কথাই ভাবছিল—এতক্ষণ এসেছি কৈ এরা তো চিঠির কথা একবারও তুলছে না! যাক এবার পথ পাওয়া গেল।

—হ্যাঁ বাবা চিঠিটা পেয়েছেন।

—তারপর বাবা কি বললেন—খুব উৎসাহিত হয়ে ঋতা জিজ্ঞাসা করল।

—না সে রকম এখনও কিছু বলেন নি।

—আর আমিও কি ভেবেছি জান—বেশী দেরি হলেই ঠিক তোমার সঙ্গে চলে যাব বাবার কাছে। যেয়ে বলব বাবা আপনার উত্তরের দেরি হচ্ছে বলে আমি সোজা চলে এলাম।

খোকা মনে মনে করল সে আবার কি রে বাবা—আমার সঙ্গে যাবে। আর মুখে সে বলল—আপনি আমাকে কোথায় পাবেন যে আমার সঙ্গে যাবেন ?

ঋতা কথার মোড় ঘুরিয়ে বলিষ্ঠ গলায় বলল—তুমি থাম ত'। কথা বলার ধরণ দেখ না—কথা বলছে যেন অপরিচিত কোন এক ভদ্র মহিলার সঙ্গে ; তাই বার বার 'আপনি আপনি'। তুমি আমার কে বল দেখিনি ? তুমি জান ? যদিও তোমায় আমায় বয়সে বেশী তফাৎ হব না তবু ভাই অমরেশ, জেনে রেখো, দীপা তোমার ছোট বোন ঋতা তোমার দিদি। আরে যখন তোমার দাদার কাছে দাঁড়াব তখন তোমার দাদার বৌ। তাছাড়া জানবে আমরা ভাই বোন। একত্র দাঁড়িয়ে আমরা কাজ করব। তোমার প্রতি কি আমার কম আশা, কম লোভ ছুঁয়েছে মনে করেছ। তুমি থাম না, সকলকে আমরা তাক খাইয়ে দেব না ভাই বোন একত্র হয়ে। শুধু দীপাকেই অন্যত্রে পাঠাতে হবে। তাও দেখে শুনে ব্যবস্থা করব। কেন মনের মতন ঠাকুর জামাই না হলে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে। আমাদের ঘরে একটি ছাড়া দুটি মেয়ে নেই।

সমস্ত কথা অমরেশ শুধু শুনেই চলেছে আর ভাবছে কখন কাউকে না দেখে বিচার করাটা কত ভুল। প্রকৃত আদর্শবাদী যদি শিবশঙ্কর হয় তাহলে তার ছেলে মানিক, অমরেশ সকলেই যে একই ছাঁচে গড়া। এক আধটু এদিক ওদিক হতে পারে। তাই বলে কি আমূল পরিবর্তন ! এই রকম নানা জিনিস দেখে ঘেটেছিল বলেই দাদা জাত বিচার না করে বিয়ে করেছিল। যাক এখনও অনেক কিছু জানবার আছে।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, বলত এই ত ডিমের ঝোল করলাম, কুমড়োর চাক ভাজা, আর কি করব বল ?

বৌদির আন্তরিকতা দেখে ঠাকুরপো আর ঠিক থাকতে পারছে না। বেচারা নিজেকে অনেকখানি সামলে রেখেছিল। এবার বলতে বাধ্য হল—ঝোলের সঙ্গে চাটনী না হলে কি আর চলে।

—ও সে তুমি নিশ্চিত থেকো—সে বেলা কুমড়ো দিয়ে তেঁতুলের টক করেছিলাম তারই খানিকটা আছে। সে তোমার চিন্তা নেই।

এদিকে সন্ধ্যা সাতটা আটটা বেজে গেল। দাদা অনেকক্ষণ বাইরের ঘরে কি সব কাজ করছিল। এবার ধীরে ধীরে ঠাকুরপো-বৌদির দিকে একটু

আগাল। আসতে আসতেই শুনতে পাচ্ছে ঋতা তার ঠাকুরপোকে বলছে—বাবু যখন ইউনিয়ন ফিউনিয়ন করেন তখন নিশ্চয় তিন চারবার চা চলে তখন আবার একটু চা চাপিয়ে দিই ?

—না না থাক। এই তো খাওয়ার সময় হয়ে গেল। একেবারেই ভাতে বসব।

—আরে রাখ লজ্জা করতে হবে না। শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে ঐ রকম শালীদের কাছে লজ্জা করো। একটু তোমার' দৌলতে ব্যবস্থা হলে আমি কি আর বাদ যাব ?

—তা আমাকেও কি বাদ দেওয়া চলে, যখন বাড়ীতে আছি—মানিক প্রবেশ করল।

—দেখেছ ঠাকুরপো, খদ্দেরের কম নেই। এটা কি জানত—অমরেশের লতায় দাদা বৌদি বর্তায়।

খোকা শুধু স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে, তার এই 'জলি' ভাব দেখে। এ যে হাল্কা মোটেই নয়। এর মধ্যে যে জ্ঞান আছে বা কর্ম ক্ষমতা বর্তমান তা সবদিক দিয়ে বোঝা যায়। যাক রান্না ঘরের দাওয়াতে বসেই খাওয়ার ব্যবস্থা হল। মানিক বলল—বিস্কুট, বিস্কুট নেই শুধু চা আনলে ?

—বিস্কুট ? বিস্কুট আবার কি হবে। আমরা সাহেব এ্যারিষ্টক্রেট মোটেই নয়। ভুটো চাল ভেজেছি, নিয়ে আসছি দাঁড়াও।

—ছিঃ, খোকা না এই প্রথম এসেছে। তুমি ওকে যা করছ নিন্দে করবে দেখবে।

—করুক করুক, খোকা যদি এ বিষয়ে আমার নিন্দে করে না, আমার খুব আনন্দ হবে। তাহলে বুঝব সত্য আদর্শ ভালবাসে বটে কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা মোটেই নেই। তা না হলে ঘরের নিন্দে বাইরে করবে! সে দেখল না বৌদির পরিশ্রম। কি ভাবে মিতব্যয়ী হয়ে সংসার করতে হয়, তাও চাইল না বুঝতে। তা না করে বিস্কুট পেল না বলে নিন্দে করতে গেল। আর এই নিন্দে আমার শোনা বা দেখা থাকল। ঠাকুরপো বিয়ে করে যখন বৌ আনবে না তখন কেক ছাড়া আমি চা-ই খাব না।

এতক্ষণে অমরেশ মুখ খুলল—তুমিই ভাঙ্গছ তুমিই গড়ছ।

—না তোমার দাদা বলছে বলে তাই বলছি।

যাক চায়ে সকলেই এক সঙ্গে মুখ দিল। মানিক বলে উঠে এবার—তোমার সেই চিঠিটার কথা অমরেশকে জিজ্ঞেস কর্‌ছিলে নাকি?—বলে নিজেই আরম্ভ করল—খোকা পেয়েছিস-তোর বৌদি একখানা চিঠি দিয়েছিল?

-হ্যাঁ পেয়েছি।

—তা বাবা তাতে কি বল্‌লেন—এটা কেমন হবে বলদেখিনি জিনিসটা? ও ভাল কথা আজকে মহেন্দ্র এসেছিল আফিসে।—ঋতার দিকে তাকিয়ে মানিক বললে।

ঋতা—হ্যাঁ কি বলল সে?

—বলল সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রেজিষ্ট্রি না করে নিলে তার অসুবিধা আছে জানাল।

—কেমন হবে বলদেখি খোকা, যা করতে চলেছি?

—না ভালই হবে, খারাপ কি।

ঋতা—ভালই হবে বললে ত চলবে না, এসে ঝাঁপ দাও সকলে।

ধীরে ধীরে আত্মপ্রান্ত সব গল্প মানিক করতে সুরু করে। ঋতা মাঝে মাঝে সায় দিয়ে সমস্ত রান্না সেরে নেয়। কোথায় দিয়ে সময় কেটে যায় কেউ টের পায় না।

রাত অনেক হল এবার ভাতে বসাই ভাল। ঋতা তাড়া দিল-নাও নাও বাকী কথা খেতে খেতে সারবে। খেয়ে উঠেও কিছু সময় পাবে। নাও নাও উঠ।

সব জোগাড় করে গুছিয়ে কি সুন্দর ব্যবস্থা করেছে ঋতা একা হাতে। ছিম ছাম দেখে খেতে রুচি হয় না কার! ঘরের চারদিকে একটা লক্ষ্মীশ্রী ভাব অমরেশকে মুগ্ধ করেছে। হাতের রান্নাও বৌদির মন্দ নয়। খাওয়ার পর শোয়ার ব্যবস্থা দেখে অমরেশ বেশ আনন্দ পেল। বৌদি বলল—তোমরা দুভাইয়ে ঘরে শোও।

অমরেশ—আর তুমি?

—না আমি ঐ ভাঁড়ার ঘরে একধারে একটু জায়গা করে নেব।

—না না বৌদি তুমি আমারই ওখানে ব্যবস্থা কর।

—হুঁ কি যে বল ঠাকুরপো! দু'ভাই এক ঠাই আনন্দের সীমা নাই। মাঝখানে পরের মেয়ে কেন আর গোলমাল করে।

অমরেশ ত উত্তর দিতে পারলই না, মানিকও একটু হকচকিয়ে গেল। বলা বাহুল্য এর পর ঋতার কথাই বহাল রইল।

খুব ভোরে অমরেশের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সকাল সকাল ট্রেন ধরবে। উঠার আগেই বৌদি তার উঠে গৃহকর্মে রত। বিছানায় শুয়ে শুয়েই ভাবছে—কৈ কে বলল—এর ত আমি যা দেখছি সত্যিকারের ধর্মিষ গৃহস্থ কর্মে নিপুণা মেয়ে। তার উপর দিয়ে গুণ—মেয়েটা রোজগারী। এই রকম ধরণের বৌ হলে ত মায়ের চিন্তা করবার কিছু নেই। জাত দিয়ে কি সব সময় ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে খেতে হয়।

একেই বলে সত্যের সাক্ষী, সত্যের সাহায্যকারী। কে জানত এভাবে অমরেশ এসে প্রত্যেকটি জিনিস এরকম করে উপলব্ধি করবে। দারুণভাবে মাকে বোঝাবার মন নিয়ে অমরেশ এবার বাড়ী যাবে। মানিক বললে না হয় অর্থ হবে—কি করবে বিয়ে করেছে তাই দোষ ঢেকে কথা বলছে। এ ত আর মানিক নয়।

একটু আলো দেখা দিতে বৌদি কাছে এসে ডাকল—ঠাকুরপো উঠে পড়।

অমরেশ যাই হোক না কেন এবার একটু মিষ্টি ঠাট্টা না করে পারল না,—কে কাকে যে ডাকে! এতক্ষণ যে আমিই তোমায় ডাকলাম। আবার আমাকে ডাকতে আসছে!

ঋতা আর হাসি চাপতে পারল না। যেই হেসে উঠেছে, ঠোঁটের উপর হাত রেখে অমরেশ ইঙ্গিত করল—চুপ চুপ, দাদা উঠে পড়বে।

এতদিন হল ঋতার বিয়ে হয়েছে। এতকাল পরে সে যেন একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেল। কাল থেকে শান্তি ও আনন্দ তাকে ছুঁয়ে সঞ্জীবিত করেছে। ধীরে ধীরে বিদায়ের আয়োজন হল। দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঋতা বলল—ঠাকুরপো তোমার দাদা আর আমি যা বললাম তা বাবাকে গিয়ে গুছিয়ে বলবে। সঙ্গে মানিকও সায় দিল—হ্যাঁরে, কি হয় শীঘ্রি জানাবি।

সন্ধ্যার পর অমরেশ বাড়ী পৌঁছেছে। বাবা বাড়ীতেই ছিল। ছেলে পৌঁছেই মাকে একটা আনন্দের খবর দিল। যা মা কোনদিনই আশা করেনি।—ওমা একটা সুখবর শুন, এবার না তোমার বড় ছেলের সঙ্গে আমি দেখা করে এসেছি—জান?

—ভাল আছে ত? কেমন দেখলি? শরীর স্বাস্থ্য সব ভাল?

—সে কথা কি বলতে! বৌদির হাতের ডিমের ঝোল আমার মুখে এখনও লেগে আছে।

—দেখ খোকা বক বক করবি নি ত? সব সময় যত সব আজে বাজে কথা।

—ঐ তো, আমি জানি—সত্যি কথা বললেই তোমার 'হট টেম্পার।'

এদিকে দীপা ছুটে এগিয়ে এসে বলল—হ্যাঁ, মেজদা সত্যি?

—হ্যাঁ! এ আবার আর একজন!

—আঃ, চটছ কেন? শুনই না জিনিসগুলো কি।

—ঐ তো মায়ের রোগ। না শুনে না জেনে বিচার করবে। না বাবা· মিশোন, কি তার অমায়িক ব্যবহার! আমি সেই কথাগুলোই তোমার কাছে বলছি।

মা কিন্তু সুরু শুনেই সেখান থেকে উঠে যাবার মতলব আটছে। খোকা বুঝতে পেরে বলল—ওমা, তুমি শুদ্ধা শুন। যা আমরা তার সম্বন্ধে ভেবে রেখেছি বা ভাবছি তা সে কিছুই না। ও রকম মেয়ে বৌ করা সৌভাগ্যের বটে। যেমন কর্মী তেমন বুদ্ধিমান। আর তেমনি তার অন্তর। সব দিক দিয়েই আমি তাকে ভাল ছাড়া খারাপ দেখলাম না। এত সুন্দর ব্যবহার বাবা, তা তোমাকে আর কি ভাবে বোঝাব।—বলে গতকালের সমস্ত ঘটনা, কথা, আলোচনা সব ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল অমরেশ।

দীপার এমনই আক-পাকানী সে পাখী হলে এখনই উড়ে গিয়ে বৌদির সঙ্গে আলাপ করে আসত। মা যতখানি তেতে উঠেছিল তত আর নেই। ধীরে ধীরে কোথায় যেন তার কোমল মনে নাড়া দিচ্ছে।

সুরু করল শিবশঙ্কর—তাহলে চিঠিটার এবার কি উত্তর দেওয়া যায়?

অমরেশ জামা জুতো খুলতে খুলতে ছোট করে উত্তর দিল—এবার তুমি বোঝ কি উত্তর দেবে, তবে তাদের নিরুৎসাহীত করো না।

হাত পা ধুয়ে দাওয়ায় উঠে খোকা হাঁকল—দাও মা খেতে দাও।

মা খাবার ধরে দিয়ে, বৌ বেটার সম্বন্ধে আরও পাঁচটা কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। খোকার কোন কথাই ফেলবার নয়। মা জানে ছেলে তার বিচক্ষণ। অমরেশের বিচার বুদ্ধি সকলের কাছেই যে সম্মান পেয়ে থাকে। খোকাও মায়ের মনের গতিক বুঝে অনেক গল্প করে চলে। দীপাও মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে

সব কথা গিলতে থাকে। সময়ে—রয়ে সয়ে খেলে চিবিয়ে খাওয়া চলে। অসময়ে গোগ্রাসেই গিলতে হয়।

এদিকে যখন ওদের কথা চলছে ওদিকে পিতা শিবশঙ্করের চিঠি লেখা সারা। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার মতন মানুষের বেশী সময় নেওয়ার কথা নয়। সংসারে সকলে ভাবতে বসেই যত গণ্ডগোল বাধায়। সকলেই জন্মায় সমস্যা সৃষ্টি করতে। সমাধান দেয় কজন।

সে এসে দাঁড়াল—খোকা, তাহলে এটা পড়ে কাল ফেলে দেবে।

মা পরিষ্কার গলায় বললো—পড়ত খোকা কি লিখেছে দেখি।

শিবশঙ্কর আর কোন কথায় কর্ণপাত না করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। খোকা পড়তে স্থরু করল—

কল্যাণীয়া ঋতা,

তোমার চিঠি পেয়ে সব কিছু জানলাম। তুমি যে কাজে অগ্রসর হতে যাচ্ছ সে কাজে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমরা শুভ কাজে শীঘ্রই অগ্রসর হতে পার। তবে আমার কথা যে লিখেছ আমার সময় খুব অল্প। সেইজন্য আমার পক্ষে যাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। খোকার মুখে আমি কিছু কিছু শুনলাম ওই মেয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

তোমরা সবদিক চিন্তা করে শুভ কাজ স্থরু কর। আমার পূর্ণ সমর্থন রইল। তুমি ও মানিক আমার আশীষ জেনো। এখানের সব একরকম। ইতি

শিবশঙ্কর সাহা।

ওদের স্বামী স্ত্রীর হাতে চিঠিটা পড়তেই মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু মানিক যে ঐ বাপেরই ছেলে। সেইজন্য শুধু চিঠির ভাষাই দেখল না। ভাষার মধ্যে যে ভাব অর্থাৎ অন্তর সেইটি সে বুঝতে পারল। তাই বুঝে ঋতাকে সে সান্ত্বনা দিল—আঃ অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন! এমনও তো হতে পারে—জ্ঞানী লোক অল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন। তোমাকে যে আদেশ দিয়েছেন এইটিই তো বড় কথা।

ঋ—এত অল্পেতে আমি সন্তুষ্ট হব কেন? যে বাবার আদেশ নিয়ে আজ

আমি সব করতে চলেছি তিনি কি আমায় উত্তর দিলেন—যেন বাইরের কোন জ্ঞানী মুরব্বী।—তা শুনব কেন!

—তাহলে কি করবে!

—কি করব দেখ না।—বলেই টেবিল থেকে চিঠির প্যাড টেনে বসল।

—যা ভাল বুঝ কর। আমি জানি না। তোমরা শ্বশুর বৌ—

—না তোমাকে আর জানতেও হবে না। তুমি নিরপেক্ষ দূরে থাকাই ভাল। যখন একটু আমি সুযোগ পেয়েছি তখন প্রকৃত সত্য-আদর্শের আদর আছে কি না আমি দেখব। বোঝাপড়া আমাদের বাপ বেটীতেই চলবে। আমার ত মনে হয় ঈশ্বরের এই ইচ্ছাই ছিল—এ বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমার মনের মিল হবে। আমরা একরকম হব। কিন্তু ভগবান এক জায়গায় গৃহস্বামীর মেরে রাখলেন—দেখি তুই সত্য আদর্শের ঠিক পূজারী না মৌখিক। যদি তোর মুখের কথা হয় তাহলে সামান্য মানুষের গড়া জাত বিচার নিয়ে তুই বানচাল হবি। তুমি জানবে প্রত্যেকেই সত্য আদর্শের বড়াই করে। কিন্তু যখনই তার সেই সময় এসে যায় তখনই সে সরে দাঁড়ায়। পালন আর কেউ করতে চায় না। এইখানেই হবে তার চরম পরীক্ষা।

—সে কথা বলছ কেন তুমি? এমন অবস্থায় যদি কেউ পড়ে যায় যে তার দ্বারাতে পালন অসম্ভব।

—অসম্ভব। অসম্ভব ত হবেই। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, সেই হবে সত্যের উত্তর। গায়ে না আঁচড় লেগে, হাঁটুতে না কাপড় তুলে সে পাঁকের মাগুর পেতে চায় কি করে? মাগুরের উপকারীতা লক্ষ্য করতে গেলে তাকে আঁচড় কাদা নিতে হবে। এবং সে জানবে নিতান্তই অস্থায়ী। কেন না, তার উপকারীতা এ সবকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাই নয় কি?

কথা শুনে মানিক স্তব্ধ। ঋতা কলম ধরল।

পরম পূজনীয় বাবা,

আজ আপনার একখানি চিঠি পাইয়া যেমন আনন্দ হইল তেমনি আর এক দিকে যার পর নাই আমি ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। আপনি যে চিঠি আমাকে লিখিয়াছেন তাহাতে আমি এতটুকুও সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমি আজ যে কাজে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি তাহাতে আপনার পূর্ণ সমর্থন দরকার। আপনি সম্মতি ঠিকই দিয়াছেন। কিন্তু আপনার উপস্থিতি কোথায়? আপনার

আসা চাই-ই। আপনি না আসিলে আমি এ কাজে অগ্রসর হইতে পারিব না। এ আমার একান্ত অনুরোধ।

যদি আপনি এ পত্রের উত্তরে নিজে না আসেন তবে জানিবেন আমি আপনার নিকট একাই পৌছাইব। দেখি আপনি প্রকৃত আমার পিতা না অন্য কেহ। আমি সেই সন্তানের দাবী লইয়া আপনার নিকট দাঁড়াইব। এই আশা করিয়াই যাইব যে, আমার বাবা সত্য আদর্শের ভিখারী পূজারী; তিনি নিশ্চয় আমাকে এ সত্য আদর্শের পথে অগ্রসর করাইবেন এবং নিজে হইবেন তার সাহায্যকারী।

আর কি লিখিব! ভাইবোনেদের আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা দেবেন। মা ও আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। এই চিঠির আশায় আর চিঠির আশা না করে আপনার আসার আশায় রহিলাম। ইতি—

আপনার পুত্রবধূ।

মানিক বাড়ীতেই ছিল। চিঠিটা খতা লেখার পর সে অনিচ্ছা সত্বেও বলল—কি হল আমি দেখতে পারব তো—না, না?

—তা আবার পারবে না কেন!

—না তোমার বাবাকে লেখা চিঠি কিনা! রীতিমত আমার ভয় করছে তোমার সাহস দেখে।

—যদি সত্যই চাও তবে আবার ভয় কেন! তবে হ্যাঁ এই কথা বলতে পার যে, লঘুজন গুরুজন, সেই ভেবে যেন ভাষা হয়।

যাক অল্প সময়ের মধ্যে চোখ বুলিয়ে চিঠিটা মানিক দেখে নিল।

—কি হল কি বুঝলে? কেমন হয়েছে?

—বাবা জানত বাবার একটিই মেয়ে। কিন্তু তুমি যা আরম্ভ করেছ তাতে—

—ঐ তো, যা তুমি ভাবতে পার না দেখ তাই হয়ত একদিন হয়ে যাবে।

বর্ত্তমান অমরেশ কলকাতাতেই থাকে। দু'একদিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। এসে হঠাৎ সে আটকে যায়। এবার তাদের পাড়ায় চারধারে খুব বসন্ত হচ্ছে। পাশের বাড়ীতে শিবানী সনৎ এরাও বাদ পড়েনি। কতক এর মধ্যে মারা যেতে সকলের মুখে চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ। অমরেশ এ অবস্থায় সকলকে ফেলে কি করে গিয়ে নিশ্চিন্ত পড়াশুনা করে! প্রতিবেশী

বয়োজ্যেষ্ঠরা শিবশ্রঙ্করের পরামর্শ মত এবং তার সহায়তায় সরকারী সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু এ সব রোগ হলে ছড়াতে আর কতক্ষণ!

শ্যামলের বাড়ীতে গিয়ে সেদিন খবর পেল অমরেশ, যে ওর বোন আক্রান্ত হয়েছে। সে যে ভীষণ অবস্থা তার! মেয়েটির প্রান পাওয়া ভার। তার জন্ত বাড়ীর সকলেই দারুণ উদ্বিগ্ন। ছুটাছুটি করছে। সকালে অমরেশ শ্যামলের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে পৌছেছে। ডাক্তারকে সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল—কি ডাক্তারবাবু, কেমন বুঝছেন বলুন ত?

ডা—গতকাল যখন পার হয়ে গেছে তখন মনে হয় এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যাবে। কেন না, গেল দিনই আমার খুবই ভয় ছিল। পালস্ খুবই খারাপ দেখেছিলাম। তবে ব্যাপারটা কি জানেন তো এতে দীর্ঘ সময় নেবে—গলার মধ্যে ঘা। মেয়েটির মুখে যদি এত না বেরত তাহলে হয়ত এত কাবু হত না।

যাক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে বেরিয়ে আসতে সে পথে বন্ধুকে বলছে—দেখ তুইও ওষুধ পথ্য দিয়ে বুঝিয়ে আয়; আর আমিও বাড়ী থেকে ফিরে আসি। তারপর দুজনে মিলে এক সঙ্গে ঐ টেলার পট্টিতে যাব। কালকে ওখানে জন চারেক মারা গেছে। আমার মনে হয় ওদের মূর্খামীর জন্ত ওরা বড্ড তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে রোগটাকে। আর আমাদের কলেজ থেকে যে কটাকে ভলেনটিয়ার করা হয়েছে তারা বোধহয় ঠিক মত কাজ করছে না। তাহলে আর সকলে অজ্ঞের মত ডোবার জল ব্যবহার করছে কেন?

মোড় ঘুরতেই পিয়নের সঙ্গে দেখা। কর্মব্যস্ত অমরেশ বাড়ীর চিঠি মাঝে মধ্যে পথে ঘাটেই পেয়ে থাকে। অমরেশের আজকে আর চিঠির পানে চাইবারও সময় নেই। পকেটেই সে রেখে দেয়। বাড়ীতে এসেই বলল—মা, কিছু খাবার আছে, দাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নি। চিঠির কথা তার একেবারেই মনে নেই।

—কেন রে খোকা, আজকে শ্যামলের বোন কেমন আছে?

—আছে ঐ একরকম। তবে ঐ টেলার পট্টিতে খুব বেশী যেন ছড়িয়ে গেছে। আমি মা, এখনই বেরব। কখন ফিরব কোন ঠিক নেই।

অমরেশ খেতে বসেছে। হঠাৎ মনে হল। বলল—ও মা তো দীপা আমার পকেটে একখানা চিঠি আছে নিয়ে আয় তো।

মা জিজ্ঞেস করল—কার রে?

—কে জানে তা আমি অত দেখিনি। পিয়ন দিতে পকেটে ভরে নিয়েছিলাম। তবে মনে হয় দাদার ওখান থেকে এসেছে।

দীপা চিঠি ছুটে নিয়ে এল। মা বলল—নে না, পড় না।

—ও তুমি বাবাকে দিও। আমার এখন পড়বার সময় নেই। আমাকে এখন তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

—মেজদা আমি খুলে পড়ব।

—না বাবার চিঠি কেন খুলে পড়বি। থাক বাবাই এসে দেখবে।—বলেই সে আর না অপেক্ষা করে হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

চকের মাথায় যেয়ে দেখছে—কৈ শ্যামল ত আসেনি। ওর ধারণায় ছিল—দুজনায় বেরিয়ে এসে এক সময় ঐ জায়গায় মিলবে। কিন্তু দেরি দেখে উত্তরাউত্তর চিন্তা বাড়তে লাগল—তবে কি ও এগিয়ে গেছে! তাই বা হয় কি করে! আমাকে না নিয়ে সে তো যাবার ছেলে নয়। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গিয়ে দেখে বন্ধুর বাড়ীর দিকে জন কয়েক লোক যেন যাচ্ছে আসছে। কি ব্যাপার! সন্দেহ যেন বেড়েই গেল। মনে খারাপ ডাকল। ঝপ্ করে মনকে সামলে নিয়ে বুঝাল—না না তা হতেই পারে না। আজই তো ডাক্তার বলেছে—কালের দিন যখন পেরিয়ে গেছে—তবে? প্রথমে মন যে তার কেঁদে উঠেছিল এবার সেই কান্নাই ব্যক্ত হল। হঠাৎ দেখতে পেল ডাক্তার ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে। আর কোন চিন্তা না করে ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করে ডাক্তারবাবু কি ব্যাপার, রোগী কেমন?

ডাক্তার ছোট করে একটি উত্তর দিল—অমরেশ বাবু আমার আর বলার কিছু নেই। আমি যুদ্ধে পরাজিত।

—এ্যাঁ,—চমকে উঠল অমরেশ। আর ডাক্তারের সঙ্গে দ্বিতীয় কোন কথা না বলে বন্ধুর বাড়ীর দিকে অমরেশ ছুটে গেল। বাড়ীতে গিয়ে নূতন করে কি আর শুনবে! মমতা? মমতা আর নেই। সে সকলকে ছেড়ে কোথায় কোন অজ্ঞান দেশে সরে গেছে। বাইরে ঘরে শ্যামল চেয়ারে বসে। মুখে নেই কোন [illegible] শুধু চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। শ্যামলের দু'তিনটি [illegible]ও এইটিই ছিল সকলের ছোট—বড আদরের। সকলকে এ মুগ্ধ করে [illegible] ছিল এর [illegible]। তার সমস্ত গুণ, হাসিখুশী ভাব আজ দাদার

মনকে বড় কাঁদিয়ে তুলেছে। এত করেও বোনটাকে বাঁচাতে পারলাম না! তবে কি আমাদের অজ্ঞতা! না কি আয়ুই ছিল না।

অমরেশ মিনিট দুয়েকের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে নিজের মনে দারুণ ভাবে বাঁধ বেঁধে ফেলল।—শ্যামল উঠ! ও কি করছিস! মমতা, মমতা আর নেই। এবার তার দেহের সৎকার করা কি প্রয়োজন নয়? তুই আমি যদি ভেঙ্গে পড়ি, তাহলে তার দুর্ব্বল মা বাবা কি করবে রে! নে, উঠে পড়। এই মমতা হারিয়ে জানবি অনেকের মধ্যে মমতা মিশিযে খুঁজতে হবে মমতাকে। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমাদের কাজ নয়। যা হবার তা হয়ে গেছে। মমতা কি এই কথাই আমাদের বলে গেল না—দাদা খুঁজে দেখ আমাকে অনেক জায়গায় তোমরা খুঁজে পাবে।

এবার ফেটে পড়ল শ্যামল।—অমরেশ, কি বলছিস তুই! যে প্রানপণ পরিশ্রম করেছিলি—রাতজাগা, দিনের নাওয়া-খাওয়া, বিশ্রামকে মাস মাটি করে এত যে করলি সব কি বিফল হয়ে গেল! আজ মমতা আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল; এ আমি কি করে সহ্য করি ভাই। সইতে পারছি না।

—শ্যামল, কি বলছিস? তোর কর্মে কোথাও কোন অবহেলা হয়েছিল কি না নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখ। এবার স্বার্থ নিয়ে সার্থকতার চিন্তা দূর কর। জীবনে আমাদের সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। এ ত শুধু নমুনা। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের রেহাই দিয়েছে। মনে কর দিনের পর দিন কেটে যাবে, অস্থি চর্ম সার হবে তখন আমাদের বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হবে। সেইদিন-গুলোর জন্য তৈরী হ। উঠে পড়, চলে আয়।

কে বলে আমার বন্ধু, গুরু, দেবতা, গুরু বললে হাল্কা হয়। কি বলে আখ্যা দেব, মুহূর্তে শ্যামলের মনে খেলে গেল। আপসেই চোখের জল শুকিয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল শ্যামল। ভিতরে ভীষণ কান্নার রোল উঠেছে। ছুটে যেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অমরেশ।—মাসীমা একি করছেন, আরো যারা আছে তাদের দেখবে কে! আপনি ভেঙ্গে পড়লে এরাও যে ভেঙ্গে পড়বে, উঠুন উঠুন।

শ্যা—বাবা, তাহলে কি করব এখন, কি করা উচিত। উঠ যুক্তি দাও—বল।

—শ্যামল, কি বলব! কিছু বলার নেই আমার। তোমার বোন মমতার জন্য তোমরা অনেক কিছুই করলে। শুধু কি তাই, অমরেশের ঋণও আমি শোধ

করতে পারব না। সে যেন তার বাবা দাদাকে ছাড়িয়েও মমতাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

এদিকে অমরেশ মাসীমাকে নিয়ে অনেক কথাই বোঝাচ্ছে। মাসীমা বলছে—বাবা অমরেশ, আমি কি করে ভুলব! ও যে আমার কোলের মেয়ে ছিল, কত আশাই ওর উপরে ছিল। ইদানাং কত কথাই সে বলত। আজ কেন সে আমাদের এভাবে ফাঁকি দিয়ে গেল।

—সে তো সবই বুঝতে পারছি মাসীমা, দীর্ঘ দিন ধরে আগুনের ব্যবস্থা করে গেল আজ মমতা। তিলে তিলে স্নেহ মমতা দিয়ে যে মমতাকে গড়া হয়েছিল তা কি আজ এক মুহূর্তে শুরু হয়। হয় না। কিন্তু এখন কারের মতন তো আমাদের কাজ করতে হবে। মৃত দেহ নিয়ে বসে কাঁদলে ফল ত হবেই না উপরন্তু ক্ষতি দেখা দেবে।—অনেক কথাই বুঝাল।

এদিকে শ্যামলকে ইঙ্গিত করে বাইরে ব্যবস্থা করে মৃতের সৎকারের কাজ শুরু করে দিল। কাঁধ দেবার লোক অনেকেই এসে পৌছল। অমরেশকে আর না কাঁধ দিলেও চলে। কিন্তু অমরেশ আপত্তি করে জানাল—না না, আমি যে ওর দাদা আমাকে কাঁধ দিতেই হবে।

যাক অল্প সময়ে ওখানের কাজ শেষ করে ফেলে সকলের সঙ্গে শ্যামলদের বাড়ীতেই অমরেশও গেল। আবারও শ্যামলের মা কেঁদে উঠল—বাবা অমরেশ রে, আজ কোথায় রেখে এলি তোর সেই মমতা বোনকে আমায় উত্তর দে।

অমরেশ নির্বাক আর উত্তর দিতে পারল না। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে তার জল বইতে রইল। ঝপ্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—মাসীমা কিছু খাইনি বড্ড খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরতে হবে আমাদের। কৈ উঠলে না যে। দাও। নে রে শ্যামল। আজকে গোটা দিন ও পট্টীতে যাওয়া হয়নি। দারুণ ভাবে মড়ক লেগেছে। চিন্তা করতে পারবি নি চারধারে কি অবস্থা।

শ্যামলের মা তখন এত সে নিজের শোকে কাতর যে ও কথা তার কানে ঢুকল না। খিদে পেয়েছে, খেতে দিতে হবে তাই কাঁদতে কাঁদতে সে ঘরে যা ছিল ওদের এগিয়ে দিল। ওদের যদিও খিদে পেয়েছে তাহলেও এ সময় কি ঠিক খাবে বলেই খেতে চেয়েছিল?

যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে একই অবস্থা—

কি করবে কতদূর সামলাবে। চারিদিকে শুধু কান্নার রোল। বস্তি পাড়া উজাড় হয়ে গেল, এদিক ওদিক করে বেশ কিছুক্ষণ কাজ করে এক ফাঁকে শ্যামলের ভাঙ্গা মনে কিছু আনন্দ দেওয়ার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করল—শ্যামল কি দেখছিস, কি করতে পারা যাবে বলদেখিনি? ভদ্রমহিলার এক মাত্র ছেলে বহু আশায় বুক বেঁধে ছেলেকে মানুষ করে। কিন্তু রোগের হাত থেকে রেহাই পেল না, মৃত্যু এল।

কথাটা শ্যামলের মনে ধরল—তাইত।

সন্ধ্যার বেশ কিছু পর যে যার ঘরে ফিরবে। ও শ্যামলকে বলল—দেখ বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু খুব বেশী ভেঙ্গে পড়বি নি। আমি এবার বাড়ী যাই? না, তোর সঙ্গেই ওখানে যাব?

—না! তুমি আর যাবে কেন?

আগের কথার জের টেনে অমরেশ বলল—কারণ তোর উপর ভাই অনেক কিছু নির্ভর করছে। তুই যদি বাড়ীতে যেয়ে ফের শোকাতুর হয়ে পড়িস তাহলে ওদের সামলাবে কে। ওরা কে কি খেয়েছে না খেয়েছে ওদিকটা একটু লক্ষ্য নিবি। তারপর আমি সককালেই যাচ্ছি।

শ্যামল মনে মনে ভাবছে উঃ হৃদয় বটে।

—কি তাহলে যাই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ,

—না চল বাড়ীতে তোকে এগিযে দিয়ে আসি। মাসীমা হয়ত তোকে একা দেখলে আবও কেঁদে উঠবে।

—অমরেশ আর কত ঋণী করবি বল। আজ তোর নাম বলে তুই বলতে কোথায যেন আমি বাধা পাচ্ছি।

—শ্যামল তুই তাই বলছিস্। এগুলো জানবি কিছুই নয। আমরা সকলেই সত্য আদর্শ হারিযেছি বলেই তাই তোর এত আশ্চর্য লাগছে। প্রত্যেকেই আমরা সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে যে যার গণ্ডী ছাড়া আর কিছু চিনি না। তাই নয় কি—চিন্তা করে দেখ।

এর পর দু'জন দু'মুখো হয়ে গেল।

বাড়ীতে আসার পর অমরেশের মন মেজাজ মোটেই ভাল থাকবে না এ কথা সকলেই বাড়ীতে জানত। তবু মায়ের মন চুপ করে থাকবার নয়।

বলল—কিসে বিধির বিড়ম্বনা কতদিনে শেষ হবে? কতদূর তোরা কি বুঝেছিস?

—আর বোঝা বুঝির কি আছে মা। চারদিকে শুধু হাহাকার উঠে পড়েছে।

—তাহলেও তোদের তো একটা অনুমান আছে। এই ভাবেই তো আর চলতে পারে না।

—না কিছু বুঝা যাচ্ছে না।

—খোকা, আমাদের বুঝবার জ্ঞান নেই বলেই তাই। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কখনই সমূলে লয় করে দিতে পারেন না। এই যেমন একটা কথা—মনে কর তুই কতকগুলো বীজ পুঁতেছিস, সেই বীজে চারা ফল ফলিয়ে উঠেছে। গাছ বড় হল। অনেক তার ডালপালা বেরিয়েছে। এবার সেই বীজের মালিক ত তুই। গাছের কাছে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলি—আগাছা। তা একেবারে নির্মূল করা উচিত। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু ডালপালাও নামিয়ে দেওয়াও দরকার। তবেই না গাছে ফল ভাল ধরবে। তুমি তোমার কাজে অগ্রসর হয়েছ এবার পাঁচজন দেখে বলছে—যাঃ সব গাছ কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই কি। তোমার পাগলের মত কাটার ভাব দেখে সকলে ভয়ে আঁতকে উঠছে। কিন্তু তুমি জান তোমাকে কতটা কাটতে হবে। তার পরেই তুমি থেমে যাবে। ঠিক ঈশ্বরও জানবে তাই করছেন। দেখবে কেউ থামাতে পারছে নি। কিন্তু থামলে সে আপনিই থেমে যাবে। তবে হ্যাঁ তোমাদের চেষ্টা চিন্তা পরিশ্রম সেগুলো কি গুরুত্বহীন। সব সাহায্য করবে বৈকি। আরও খুলে বলতে গেলে সেইটিই তো লক্ষ্য করবেন তিনি।—যে জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ। সে আমার সৃষ্ট প্রকৃতিকে কি ভাবে লক্ষ্য করছে। তাই নয় কি বাবা?

খোকা স্তব্ধ বসে। এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে গর্ব অনুভব করছিল—এবার সে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারল না, ছুটে এল। মায়ের হাত দুটো চেপে ধরে, মুখের কাছে মুখটি রেখে বলল—তবে মা? কে বলে অজ্ঞ অবুঝ তুমি! এবার তাহলে দাদা যাকে বিয়ে করেছে তাকে বৌ বলে স্বীকার কর। আমিও জানতাম—আমার মা জ্ঞানী তিনি আদর্শময়ী। তুমি তাকে এবার বিচার করে স্বীকৃতি দাও।

—একি বলছিস খোকা তুই। এক্ষেত্রে ওকথা চলে না। সত্য আদর্শ সে

ঠিকই। তবে স্থান কাল পাত্র বুঝে তার বিচার হয়। সবক্ষেত্রে একই হয় না।

—তা কেন বলছ মা, সত্য সে সত্যই, আদর্শ সে সর্ব্বত্রই আদর্শ বৈ অন্য কিছু নয়। তাদের আবার স্থান কাল পাত্র বুঝে চলতে হয়!

—হ্যাঁ রে খোকা হয়. ছেলেমানুষ বুঝবি নি। সমাজ সামাজিকতা মানতেই হবে। তা না হলে তোকে সমাজের বাইরে বনে যেয়ে দাঁড়াতে হবে। তোকে কেউ মেনে নেবে না। আর সেখানে জানবি তোর কাছে কারও কোন প্রশ্ন থাকবে না। কেউ উত্তর আশা করবে না।

—তাহলে কি বলতে চাও—সত্য আদর্শ চাপা পড়ে যাবে।

—তা কেন বলছিস সমাজের বাইরে মানেই বনে। তোর মতন তুই বলে চলবি এবার যার যা গ্রহনের—

*[ 'গ্রহনের?'—বলতেই মা বুঝিয়ে দিলেন। বিস্তারিত অনেক কথা বলেন মা। তবুও যখন বোকা অবুঝের মত বসে আছি এমন সময় ঝপ্ করে মা গান ধরেন—]*

ও খোকা গুণমণি
তোমার জননী আমি।
দেব উত্তর তোমায় জেনে
এনেছিনু ধরায় আমি।
শুন খোকা গুণমণি।
হয়ে আছি আমি
তোমার জননী।
দেব উত্তর তোমায় জেনে
এনেছি ধরায় আমি।
ভেবো না আমায় যেন
করেছিনু সৃষ্টি আমি।
হয়েছিনু ক্ষণেক মালিক
ধরেছিনু গর্ভে জানি।

শুন খোকা গুণমণি
হও তুমি বড়—খোকা।
চিনবে আমারে তবে

কে ছিল তোমার মাতা
হও তুমি বড়---খোকা।
যা বলিতে চাও রে যাদু
বুঝি তাই তোমার আগে।
হও তুমি সবার কাছে সাধু।

ও খোকা, রেখেছিনু
নাম যে আমি।
করেছিনু মুখ চুম্বন,
দিয়েছিনু সত্য স্তন
তোমারে আমি।
টে নছিলে দুগ্ধ যখন
ভাব নাই কিছুই তখন।
শুধু চেয়েছিলে বারে বারে---
স্নেহময়ী মা কি না আমি
তোমার বলে।

এবার ভেবে দেখ
ভেবে দেখ---ও খোকা,
আমায় তুমি।
তোমার মুখে স্তন্ত দিয়ে
কত চিন্তা, কত সাধনা
করেছিনু আমি।
"হে বিধি, বাঁধন তোমার,
বেঁধেছ আমায় জানি।
দিয়েছ গর্ভে আমার,
তোমারই দান সদাই মানি।
চাই বিধি ভিক্ষা এবার—
যেন গড়ে তুলি।

যে ধন দিয়েছ আমায়
ও বিধি—বিধি ;

ও পরমেশ্বর—
শুধাই তোমায়—জানাও কুশল
যেন গড়তে পারি আমি তারে।
বিধি, দিতে পারি পরিচয়—
করেছিল সৃষ্টি কে।
ধরেছিল গর্ভে যিনি
চেয়েছিল কি ঠিক আশীর্বাদ
ভিখারী হয়ে তোমার দ্বারে ?

ও বিধি, বিধি—
হয়ো না বিমুখ যেন।
গড়ে যেতে পারি তোমার—
তোমার গড়া আমার ধরা।
মনে রেখো সন্তানে যেন।
গড়ে উঠুক এমনি করে
দাঁড়াবে তোমার ভূবন মাঝে
আলো করে।

ও খোকা গুণমণি
আমি যে তোমার
মূর্খ-স্নেহময়ী মা
জানবে তুমি।
রইছে তোমার রক্ত শিরা
ভাবরি খোকা কারই সৃষ্টি
কারই হাতের পালন করা।

যাক মা ছেলের অনেক কথাই হল। শেষে মা বলল তোর কলেজে দু'তিনদিনের ছুটি নিয়ে এসে তো আটকে গেলি, সেদিকে দিয়ে অসুবিধা হবে না তোর ?

হ্যাঁ তা হবে বৈকি। হচ্ছে হবে। দু'একদিনের মধ্যে আমাকে চলে যেতে হবে।

এমন সময় বাপ এসে ঘরে ঢুকল। হ্যাঁ অমরেশ, খবর কি ? কি রকম কি বুঝছ বাইরে ?

মা বাবা, খবর মোটেই ভাল নয়। তারপরে শ্যামলের বোন তো আজকে মারাই গেছে।

হ্যাঁ আমি সেই শুনলাম। চারিদিকে হাহাকার দুঃশ্চিন্তায় সকলের মন ভার হয়ে আছে।

এভাবে কয়েকটি কথার পর বললেন---তুমি চিঠিটা শুনেছ তোমার মায়ের কাছ থেকে।

হ্যাঁ আমিই তো দিয়ে গেলাম, তবে চিঠির বিষয়ে কিছু জানি নি।

—বিষয়বস্তু আর কি। তোমার বৌদির একান্ত অনুরোধ আমাকে যেতেই হবে। এ যে কি ধরনের জেদ না, আমি তো বুঝেই পাচ্ছি না।

—কেন বাবা, তা বলছ কেন ? সত্যিই তোমার তো দাঁড়ানো দরকার। আমি বৌদির হয়েই বলব এ তো তোমার গৌরবের কথা—তুমি যে সত্য আদর্শের পূজারী—প্রিয় মনে কর। সেই সত্যাদর্শ নিয়ে বৌ ছেলে মেয়ে দিকে দিকে দাঁড়াতে চায়। তুমি সকলের সাক্ষী, কর্ণধার। একি কম আনন্দের কথা !

সে সব কথায় উত্তর না দিয়ে শিবশঙ্কর চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল—এই নাও এটা পড়ে দেখবে। দাও গো খেতে দাও, দশটা বেজে গেল।

মা খাবার দেওয়ার জন্য রান্নাঘরের দিকে এগালো। তার ফাঁকে অমরেশ চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে নিল।—হ্যাঁ বাবা আমি যা বললাম তাই। ও যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এমত অবস্থায় তুমি যদি না যাও তাহলে এই কথাই মনে করবে যে নেহাৎই সত্য আদর্শের বুলি। প্রকৃত কার্য্যকরী মন নয়।

তাহলে একটা দিন ঠিক করো যাওয়ার ব্যবস্থা কর। তুমিও যখন বলছ। ঠিক আছে তুমি কালকে আগে একটা চিঠি লিখে দাও যে আমরা সুবিধা সুযোগ বুঝে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। তোমরা তোমাদের কাছে অগ্রসর হও। এর মধ্যে আমি এদিকে একটু সুরাহা বুঝলেই যাত্রার আয়োজন করব।

সকালে উঠে শ্যামলের বাড়ীর দিকে রওনা হল। খানিকটা যাওয়ার পর দেখে সামনে শিবানী দাঁড়িয়ে। অমরেশকে দেখে শিবানী যেন একটু কেমন হয়ে গেল। তবে অমরেশের তো আর ঠুনকো মন নয়, সে তাই পরিষ্কার ব্যক্ত করল—কি রে এমন সময় এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

শিবানী সহজভাবে উত্তর দিতে চাইলেও পারল না। ওর বক্তব্য ও বলে চলল—তোর চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল না ?

ও তাতেও কিছু উত্তর দিল না। তবে স্বীকার করল—হ্যাঁ।

—যাক বোন, শরীর, স্বাস্থ্যের দিকে এবারে ভাল করে নজর দাও।..এর আগের বারে পরীক্ষায় ফল ভাল হয় নি। আর একটা কথা জানবি—মন আর শরীর ভাল না থাকলে লেখাপড়া ভাল হতে পারে না। আর সনতের চাইতে তোর উপরই রোগের আক্রমনটা বেশী হয়েছিল ত। যাক এখন তাহলে আসি।

শিবানী আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। পিছন থেকে ডেকে বসল।—যদিও দাদার দাবী তাহলেও কোথায় যেন একটা কিসের অভাব।

অমরেশ এতক্ষণ বেশ বীরের মত ছিল। কিন্তু আর সে পারল না। পা টানতে যেয়েও যেন টানা হল না।—কি বলছিস ?—ঘুরে দাঁড়াল সে।

—কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

ঝপ্ করে অমরেশের মনে হল—তবে কি আমার যাওয়ার অপেক্ষায় এখানে ও দাঁড়িয়ে ! সে যাক গে যাই হোক। ও সব জিনিস মনে করাটাও পাপ। শিবানী দীপা, দীপা শিবানী---এই কথাই কি আমার ভাবা উচিত নয় ! মিথ্যা আশা. নিরাশ তো তাহলে হতেই হবে। সে আশায়ই যাতে তা সৃষ্টি হয় সেই জন্য সুরুতেই সমূলে বিনাশ করাই কি উচিত নয়। মুহূর্তে এই সব চিন্তা করে সে জবর বাঁধ নিয়ে এগিয়ে এল শিবানীর কাছে।—কি বলছিস ?

আর কি বলবে ! তার বলার কিছু আছে না কি ! ভাষা সে হারিয়ে ফেলেছে তাই ভাবে সে বুঝাতে চায়। অমরেশ তাকে আবারও বলে উঠল—হ্যাঁরে অসুখ থেকে উঠে দুধ টুধ একটু খাচ্ছিস তো ?

এবার রীতিমত শিবানী অভিমান সরূপ রাগ ব্যক্ত করল—না।

—তাহলে মাকে বলব মা যেন এটার কিছু একটা ব্যবস্থা করে।

—যাক খুব হয়েছে, মা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। নামেও খোকা কাজেও খোকা।

—কি আর বুঝি নি বল? পরীক্ষার পাশ ফেল বুঝি, ইউনিয়ন, খেলা-ধুলা বুঝি, দেশের ভয়াবহ অবস্থা বুঝি, ও হো ভুলে যাব কেন—দীপা শিবানী বোনও বুঝি।

মুহূর্তে শিবানী জ্বলে উঠেছিল, দপ্ করে নিভে গেল।—খুব হয়েছে যেথায় যাচ্ছ যাও।

যাক অমরেশ এতক্ষণে কোথায় যেন সুরাহা দেখে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যে ভুল আমার জীবনে হতে চলেছিল তা যখন ঈশ্বর করুণা করে সামলে দিয়েছেন সে ভুল যেন আর না হয়। আমি এদিকে ভগ্নীরূপেই পেতে চাই।

তাহলে এখন আসি?—বলে যেমনই মুখ ফিরিয়েছে অমনি শিবানী বলে উঠেছে—এই মেজদা, শরীরের দিকে কিন্তু লক্ষ্য রেখে কাজ করবে। তোমার তো আবার নাওয়া খাওয়ার খেয়াল থাকে না।

—অতি বড় কর্মব্যস্ত হলে ঐরকমই হয় রে। ভাবদেখিনি এক একটা ঘরের মধ্যে লাইন ধরে বিছানা। ধারে মাঝের দুটো বিছানা গুটানো হয়ে গেল। সেই অবস্থা যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে মনের কি গতি চলে—চিন্তা করতে পারবি। তখন স্থূলকে তৃপ্ত করার কোন তাগিদ জাগতে পারে—কোন প্রশ্ন উঠতে পারে?

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তবুও তো তুমি নিজে না বাঁচলে বাঁচাবে কি করে! আজকে তোমরা যারা যারা ছুটে যাচ্ছ, ভাবত দেশের দশের কি কল্যাণ মন নিয়ে ছুটছ। সেইজন্যই আমার ভাবনা।

—ও হয়ে যাবে রে বোন, হয়ে যাবে। ও নিয়ে চিন্তা করিস না। তুই জানবি ভগবান এক শ্রেণীর মানুষ পাঠায় তাদের এই হল কাজ। আমি করছি বললে জিনিসটা অহংকার ছাড়া আর কিছু নয়। এবার বল যে আমার মাঝ থেকে এমন একজন কেউ অদৃশ্যমান আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন—তাই নয় কি? সত্যিকারের এ করায় আমি আনন্দ পাই। যদি না তোরা করতে দিস তাহলে জানবি আমি অস্থির হয়ে পড়ব। যাক অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার চলি বোন। গতকাল শ্যামলের বোন মারা গেছে—শুনেছিস তো?

—হ্যাঁ শুনেছি। মেয়েটা খুব ভাল ছিল, না দাদা?

—তা তো বটেই, তার উপর কি জানিস—চলে গেলে ভালটা আরও ভাল হয়।

—বলেই অমরেশ বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল। শিবানী তার চলার পথ লক্ষ্য করে হঠাৎ যেন লজ্জা ঘৃণায় মুচড়ে পড়ল। ছিঃ ছিঃ এমন দেব দুর্লভ দাদা, তাকে আমি কোথায় কোন খাদে নামাচ্ছিলাম। এইটি কি নারী জাতের ধর্ম নাকি? হঠাৎ কোথা থেকে কে যেন বলে উঠল—তা কেন! নারী পুরুষ উভয়েই দায়ী—এটা খেয়ালের ধর্ম। সাবধানেই সোনা। তা না হলে নিতান্তই আটপৌরে হয়ে যায়। যেখানে সেখানে চাওয়া পাওয়ার ক্ষুধা কি মিটালেই হল? সবুর ধীর ধৈর্যে একটা নির্দিষ্ট জনকে ঠিক করে নেওয়াই ভাল। কিন্তু এ আমি কি করতে চলেছিলাম! একজন শ্রেষ্ঠ মন নিয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মে দাঁড়িয়েছে। তাকে আমি মিছেই রূপ, যৌবন, প্রেমে বাঁধতে চাইছিলাম। সেইটি আমার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিত। আমি খানিক পেতে গিয়ে অনেক হারাতাম। অনেক অনেক সে ধন। কিন্তু আমার যখন খিদে পেয়েছে খিদা আছে নিশ্চয় সময় হলে পূরণ হবে। এবার আমার কি দ্বিগুণ পাওয়া হল না? এটা তো পেলামই। এখানে আমার চিরদিনের পাওয়া। কি প্রবল দাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আজ নিজের মনেই সে ঝড় তুলে সবকিছুকে চুরমার করে দিল। নূতন আলোয় জীবনের স্বাদ সে পেতে চায়! জীবনের স্থূল চাওয়া পাওয়া তার কাছে তুচ্ছ হয়ে দাঁড়াল। এই ভাবই সে রাখার চেষ্টা এবার থেকে করবে। এই মেজদা কারও একার নয়। সে বিশ্বের দাদা। তবে এইটুকুই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব—যেন আমি দীপা খুব বেশী দূরে না চলে যাই।

শ্যামলের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকিল—শ্যামল, ও শ্যামল?

—ভিতর থেকে মাসীমা বলে উঠল—কে?

—আমি মাসীমা।

ও অমরেশ—শোকাতুর স্বর।—এস ভিতর দিকে।

ধীর পদক্ষেপে অমরেশ ভিতরে প্রবেশ করল।—শ্যামল কোথায়?

—এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এইমাত্র সে বেরিয়ে গেল। বলল দেখিত গুটি গুটি পা ফেলে—ওর দেরি হচ্ছে কেন?

অমরেশের আর বুঝতে বাকী রইল না—ঐ যেটুকু সময় শিবানীর জন্য পথে

আটকে রয়েছিল সেইটুকুই তার বিলম্ব। যাক আমি তো আর বাজে কাজে ছিলাম না। তাহলে মাসীমা এখন আসি, দেখি শ্যামল কোনদিকে গেল।

অতি কষ্টের সঙ্গে মাসীমা সম্মতি জানাল।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল শ্যামল যেন আনমনা হয়ে ওকেই যেন খুঁজছে। যাক দেখা হয়ে গেল। শ্যামল বলল—কি রে তোর এত দেরি হল?

—হ্যাঁ, দেরি আর হয় নি। ঠিক সময়েই বেরিয়েছি। রাস্তায় একটা কাজ করতে যা দেরি হয়ে গেল। যাক এখন কোনদিকে আমাদের যাওয়া দরকার বলদেখিনি? আমরা ঐ কুমোর পাড়ায় আগে যাব। ঐ পাড়াটায় যেন কালকে বেশী মনে হয়েছিল।

দুজনে একমত হতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ শ্যামলের মনে প্রশ্ন জাগে। বর্তমান শ্যামল বন্ধুকে বন্ধু জ্ঞান না করে একটু জ্ঞানী জ্ঞান করে। ঐ সুযোগে পাঁচটা কথা জেনে নিতে দোষ কি!—রাস্তায় কোথায় দেরি হল, কিসের জন্য?

—সে অনেক কথা এক কথায় কথা নয়। ভগবান যদি বলবার দিন দেয় একদিন সবই বলব।

—সেদিন কি আর আমি-অভাগার সে সৌভাগ্য হবে যে শুনব!

—তা কেন বলছিস, এমন দিন কি আসবে যে দুর্জন সুজন হবে?

—ওঃ তুই আজ নিজে ভাল বলেই এই কথা বলছিস।

—ভাল হলে কি আর দুর্জন আখ্যা হয় আমার! আমি তো জানি আমি সুজন নই। যদি ঠিক সুজন হই তবে পাঁচজনকে সুজন করবার চেষ্টাও করব। নিজেই শিখলাম না, স্পর্দ্ধা রাখি কি করে!

এমন সময় কে যেন পিছন দিক থেকে ডাক দিল—অমরেশ দা ও অমরেশ দা

—কে?—ও সেই প্রমথ মাইতি। ছেলেটার গাঁয়ের দিকে বাড়ী, ওদের কলেজেই পড়ে। ইউনিয়ন করার সময় আলাপ হয়েছিল। খুব বড়লোকের ছেলে কিন্তু সরল সাধাসিধে। ভাবভঙ্গি সাধারণ হাল্কা। ওর জ্ঞানের অল্পতা হলে হবে কি সবেতে খুব ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শ্যামল খাট গলায় বলল—আচ্ছা, অমরেশ, এই তো তোমাকে গুরুদেব জ্ঞান করে, না?

—তা হয়ত, ওসব ফালতু আখ্যায় প্রয়োজন কি?

—এবার তাই শ্যামল বলেছিল। কিন্তু বিচক্ষণ জানত অমরেশ এসব কথা কান দেবার ছেলে নয়। ছেলেটি কাছে পৌছে গেছে। বলল—আজ একটা সুখবর দাদা। কামার পট্টিতে নতুন করে একটারও হয়নি। এবং যে যে গুলো আক্রান্ত হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই সুস্থ। রোগের কোনরকম উগ্রতা দেখতে পেলাম না। বরং মনে হল, শান্ত ভাব আসছে।

ঝপ্ করে অমরেশের মায়ের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। তাহলে বোধ হয় বিধি এবার আমাদের নিষ্কৃতি দিলেন। যাক মনে যেন কোথায় একটা আনন্দ ছুঁলো। এরাও দুজনে এগিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ঘারে দেখল। প্রমথর কথা গুলো ঠিক। অমরেশের মনে আশা হল তাহলে বোধ হয় দু'একদিনের মধ্যে সে বেরিয়ে যেতে পারবে।

আজ চারদিকে সুরাহা দেখে কাজ সেরে বাড়ীতে তাড়াতাড়ি ফিরেছে। মা জিজ্ঞেস করল—কি রে আজ এত শীঘ্রি?

হুঁ তোমার কথাই ঠিক। চারদিকের খবর ভাল। বলে জামা কাপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে উপরে উঠে আসতে আসতে মায়ের কাছে সারাদিনের সমস্ত গল্প বর

আজ বেশ কিছুদিন পর দুপুরে সে মায়ের সঙ্গে খেতে বসেছে। কি দিন গেছে! দেশের দুর্দিন এলে এইরকমই তোলপাড় করে দিয়ে যায়। মুখের হাসি, চোখের ঘুম সবই যেন মিলিয়ে যায়। তবে হ্যাঁ একটা কথা কি ঠিক নয় × যে অধ্যবসায়ী এবং সেবাবদ্ধ বা সহানুভূতিশীল যুবকের দল যেখানে দাঁড়ায় সেখানে যেন কোথায় ভয়ের মাঝেও নির্ভয় উঁকি দেয়। অবশ্য সবই ভগবানের হাত। তাই বলে তো আবার বসে থাকলে হয় না। সহকর্মীর দল এগিয়ে এলে আশা ভরসা হয়। তবে সবের উপরে একটা কথা সত্য—যে সংগঠনের কর্ণধার অমরেশের মত যুবক সে সংগঠন সহজে সংগবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে। নিজেরা উদযোগী হয়ে কাজ করেছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সব ভুলে গিয়ে মিশে গেছে তারা। সকলের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক। তাদের উদ্যম দেখে সরকারও সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে। তবে মাথার উপর শিবশঙ্কর নির্বিকার কর্ম করে গেছেন নিঃশব্দে। খোকা প্রতি দিনের অভিজ্ঞতা গিয়ে বাবাকে বলেছে। তাঁর পরামর্শ মত এখানে ওখানে গেছে। সকলেই সঙ্গেছিল কিন্তু শ্যামল কখনও তার সঙ্গ ছাড়ে নি।

বিকেলে আবার বেরতে হবে। দুপুরে ঘরে বসে চিঠিখানা শেষ করবে এই ইচ্ছাই তার মনে ছিল। যাই হোক যখন নূতন কোন বিপদের খবর নিয়ে বন্ধুরা এল না তখন সে তার কাজে বসল। তবে দিনের পর দিন এমনই গেছে—ঘরে কোন কাজে হাত দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। দলের সব এসে তলব করেছে।

ও বাবার নাম দিয়ে চিঠিখানা লিখতে হবে—এইকথা এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে সে কলম ধরল—

কল্যাণীয়া বৌমা;

তোমার চিঠি আমি আগে পেয়ে যা উত্তর দিয়েছিলাম তাতে দেখছি তুমি খুব ছেলেমানুষী করে অভিমান জানিয়েছ। তোমরা এই সত্য আদর্শকে ছুঁয়েছ। আর আমি ঈশ্বরের কৃপায় ও ধাপ থেকে বেশ কিছু এগিয়ে গেছি। সেইজন্য তোমাদের কাছে নূতন বলে অনেক কিছুই বাসা বাঁধতে পারছে। আমাদের তো আর সে সবের কিছু ভয় নেই। তাই বলি তোমার নূতন উদ্যমে আমি বাধাকারী হতে চাই না। আমার যাওয়াটাই যদি তোমার কাছে এত বড় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তুমি কাজে অগ্রসর হও, সময়কালে আমায় জানাবে কয়েক ঘণ্টার জন্য যেয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করব।

এই পর্য্যন্ত লিখে মায়ের হাতে চিঠিটা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। বলে গেল —মা, বাবাকে দেখিয়ে রাখবে এর বাইরে কিছু লিখতে হবে কি না বা লেখায় কোন ভুল আছে কি না। তা জানলে বাকীটা শেষ করে কালকে ফেলে দেব।

বলেই সে অমিত গুপ্তর বাড়ীর দিকে বেরিয়ে চলে গেল। সেখান থেকে শ্যামলকে নিয়ে দলবল সব বেরবে আজ। সমস্ত পট্টি পাড়া ঘুরে দেখতে হবে। এই রোগের উপশম সবে দেখা দিয়েছে। জনে জনে সকলকে সাবধান করা দরকার।

বিকেলের আগেই বেরিয়েছিল। প্রথম গিয়ে দাঁড়াল টেলার পট্টিতে। ভবেশ দর্জ্জির ঘর উজাড় হয়ে গেছে। পাঁচটি ছেলে গিয়ে এখন দুটিতে দাঁড়িয়েছে। বেচারা দিশাহারা হয়ে পড়েছে। দলের সব তার সঙ্গে কি ভাবে মিশে গেছিল সে দাঁড়িয়ে দেখবার বটে।

অমরেশ কাছে এগিয়ে যেয়ে বলল—ভবেশ দা, বৌদি কোথায় ?

বৌদি ভিতরে দাঁড়িয়ে তাদের আসা দেখে ব্যস্ত হয়ে একটু গুছিয়ে নিচ্ছিল। বাইরে আসে নি।

অমরেশই এগিয়ে যেয়ে বলল—হ্যাঁ বৌদি তোমাকেই বলি—যা হবার তা তো হয়েই গেছে, সে নিয়ে চিন্তা করে বাকী কাজে যেন না অবহেলা হয়। খুব সাবধান। এদের প্রতি লক্ষ্য যত্ন রেখো। তাই বলে তুমিও দাদা অসাবধান হয়ো না। জানই তো এ সব রোগ সেরে গেলেও মরে না। সতর্ক থাকবে। তোমাদের তো সবই বলা আছে। সরকারী ডাক্তার যেমন মাঝে মধ্যে আসেন তেমনই আসবেন। তাদের মতে চলবে।

ভবেশের ঘর থেকে বেরলে শ্যামল বলল—অমরেশ, সকলে মিলে ঘর ঘর ঘোরার কি প্রয়োজন। দুজন দুজন করে ভাগ হয়ে যাই। তুমি তো সঙ্গে সঙ্গেই আছ।

ছোট বড সকলেই শ্যামলের কথায় সায় দিল। স্থির হল ঝপ্ ঝপ্ কাজ সেরে তারা এক জায়গায় গিয়ে সকলে মিলবে। সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে কুমার আর কুমোর পাড়ায়। অমরেশ বলল—তাহলে কাজ সেরে বেরিয়ে এস। বটতলায় সকলে মিলব।

শ্যামল বলল—তবে ভাই, অমরেশ আর আমি এক সঙ্গে থাকব।

অমরেশ সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুলল—বা বা বা দুজনে আমরা একসঙ্গে থাকলে চলবে কি করে! ওরা কোথায় যাবে।

তখন সকলের মুখপাত্র হয়ে অমরেশ ভাগ করে দিল দল। রামশঙ্কর, ত্রিদিব, সুখলাল, দীপঙ্কর, অমিত গুপ্ত, দয়াল সিং, মমতাজ, প্রমথ মাইতি, আলী সকলেই মোটামুটি সব জানত; এখন দু'পাঁচটা কথা বলে ভাগ হয়ে গেল।

শ্যামল আর আলী একসঙ্গে গিয়ে ঢুকল রহিম শেখের ঘরে। কোলের ছেলে হারিয়ে বাপ মা দু'জনেই দারুণ ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের শোকে সান্ত্বনা দিয়ে মোটামুটি ওষুধ পথ্য চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞানের কথার নির্দেশ দিল। অমরেশের সঙ্গে থেকে থেকে বেশ রপ্ত হয়েছে সব। যাই হোক বেরবার সময় বলল—এ সবই বিধির মার। মানুষের কারও হাত নেই। তবে হ্যাঁ একটা কথা ঠিক ত—মানুষের চেষ্টা ও জ্ঞানের কাছে অনেক কিছু নির্ভর করে। সেইটির অভাব বা অবহেলা থাকলে বড় দুঃখের হয়। যাক আর নূতন কেস যখন আর একটাও দেখা যাচ্ছেনি তখন মনে হয় এ যাত্রায় সামলে গেল।

কথাগুলো যখন বলছিল তখন পরিষ্কার মমতার ছবি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। যে যে কথা সে বলল তাদের ঘরে তার একটিরও কি অভাব ছিল! তাই তার আজ ঈশ্বরের প্রতি অটুট বিশ্বাস। যে থাকার সে শত অভাব অস্বীকার করেও টিকে যায়, যে যাবার তাকে সহস্র বন্ধনেও বেঁধে রাখা দায়। তবে লক্ষ্য যত্ন মানুষের কর্তব্য।

কয়েক ঘর কাজ করে চলেছে। এদিক ওদিক দলের পাঁচজনকে চোখে পড়ল। সকলেই কর্মব্যস্ত! চোখে মুখে সকলেরই আন্তরিকতা। গোটা পাড়ায় সাড়া পড়ে যায় যখন এরা এসে ঢোকে। দু'পা এগোতে আলী বলল—আচ্ছা শ্যামলদা, একবার সেই মেয়েটাকে দেখে গেলে হয় না?

শ্যা—কে, সেই যার সেদিন বিয়ে হল?

—হ্যাঁ দাদা, খুব ভুগল বেচারী।

দুজনে গিয়ে আনন্দ বাবুর বাড়ীতে উঠল। মধ্যবিত্ত সংসার। কাজল বেরিয়ে এল। পরিষ্কার গলায় শ্যামল বলল—কি বোন, কেমন আছ?

কাজল ডাকল—এস না দাদা, তোমরা ভিতর দিকে এস।

শ্যা—না বোন, কাজে বেরিয়েছি, তাড়াতাড়ি পাঁচটা পাড়া ঘুরে ফিরতে হবে। ভিতর থেকে মাকে জিজ্ঞেস করে এস সকলে কে কেমন আছ।

কাজল ঘুরে এসে বলল—না দাদা তোমরা ভিতরেই এস মা ডাকছে।

বলতে বলতে মাও আগিয়ে এল।—এস বাবা আলী তোমরা ভিতরে এসে কথা বলবে। তোমাদের উপকার আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না। কি যে প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করেছ সে আর মুখে বলে বোঝাব কি করে!

শ্যামল—না মাসীমা, ওকথা আর ভাবছেন কেন! এ যে প্রকৃত কর্তব্য, এ করাই লাগে। যে করে সে জানবেন মানুষের চামড়া নিয়ে ঘুরছে, মানুষ নয়, তবে হ্যাঁ—

শ্যামলের মুখের কথা শেষ হবার আগে কাজলের মা বলে উঠল—হ্যাঁ বাবা, সেই ছেলেটি কোথায় যার নাম অমরেশ?

—হাঁ তারই তো কথা বলতে যাচ্ছি। সত্যি সমাজের কর্ণধার হবার যোগ্য বটে। সে আজ জেগেছে আর সেই সঙ্গে আমাদের পাঁচজনকেও জাগিয়েছে। আজ সে অন্য দিকে কাজ করছে মাসীমা, তবে এ পাড়াতেই আছে।

—ভগবান করুণ বাবা তোমাদেব কল্যাণ হোক। তোমাদের মতন ছেলে দীর্ঘায়ু হোক।

আলী—মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে যে ব্লিচিং পাউডার দেওয়াব কথা ছিল দিয়ে গেছে ?'

—না বাবা, তাদের শুনেছি আসার কথা ছিল, তাবা তো কৈ আসে না।

—দেখেছ শ্যামল দা শালাবা কেমন চোর, সামনে গেলেই জুজু মুচু।

—ও আর কি দেখছ ভাই, সেদিন আমবা যে দাসেদের পাড়াতে গেছিলাম না সেখানে একটা মজার ঘটনা শুনলাম। কি করেছ জান—সে ইঞ্জেকসন দেওয়ার কথা হয়েছিল না, তা বাইরে বিক্রি করে। করে বেটাবা সিরিঞ্জে জল পুরে কয়েকজনকে দিয়েছে। পড তো পড অমরেশের চোখেই ধরা পড়ে যায়। এই তো অবস্থা। আচ্ছা মাসীমা আমরা তাহলে এবাব উঠি।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আনন্দ বাবু স্বয়ং এসে হাজির—এই যে বাবাজীবনবা তোমরা সকলে এসে গেছ। বেশ বেশ। তা এখন বাবা সব দিকেই সুবাহা। কদিন তোমাদেব যা গেল।—একটু থেমে বললেন—তা মা কাজল দাদাদেব একটু চা খাওযাও না। তা বাবা আপত্তি আছে নাকি ? খোকা তো উঠে গেছে।

শ্যামল গা ঝাড়া দিযে উঠল—না আজকে আব না। আর একদিন হবে। এখন আমাদের দল কোন্ দিকে গেল দেখি।

আনন্দবাবু গদ গদ গলায বলল—"হ্যাঁ বাবা, তোমাদের মত মহাপ্রাণকে কি আর পাওয়া যাবে।

উভয়ে বেরিয়ে গেল।

বটতলায় একসঙ্গে মিলে দু পাঁচটা কথার আদান প্রদান করে বেরিয়ে গেছে তৎপর হয়ে তারা কামার পাড়ার দিকে। সেখান থেকে যাবে কুমোরদের বাড়ী। যে যার মত ভাগ হয়ে কাজ শুরু করল। ত্রিদিব এই কামারদেরই এক ছেলে। সবে কলেজে ঢুকেছে। খুব উদ্যমী। দীপঙ্কর ওরই সঙ্গে পড়ে।

ত্রিদিব বলল—অমরেশ দা এ তো আমারই পাড়া। মোটামুটি লক্ষ্যের মধ্যে প্রথম থেকেই আছে। তাই দাদা, আমার মনে হয় এখানে সকলে সময নষ্ট না করে অর্দ্ধেক রয়ে যাই। বাকী আটজনকে নিয়ে আপনি কুমোরদের বাড়ীর দিকে রওনা হন।

অমরেশ সকলের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করল তাই। ত্রিদিব কয়েকজনকে নিয়ে প্রথম গিয়ে নিজেদের বাড়ীতে উঠল। ওর বাবা এখনও সম্পূর্ণ সেরে উঠে নি। চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। দীপঙ্কর বলল—আপনি আবার উঠছেন কেন?

—না, এস বাবা তোমরা। তোমাদের কর্ম আজ আমার বৃদ্ধ জীবনে তাক খাইয়ে দিয়েছে। প্রকৃত মানুষ হলে এইরকম করাই দরকার। আমরা নামেই মানুষ হয়েছিলাম। নিজেদের গণ্ডী ছাড়া খুব বেশী একটা বুঝতাম না। আজ ত্রিদিব তোমাদের দলের সঙ্গে দেশের দশের জন্য ছুটেছে, ঈশ্বরই তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমাদের আশীর্ব্বাদ করার যোগ্যতা নেই। সবই যে খুয়ার করে ফেলেছি।

একসঙ্গে সবাই বলে উঠল—ও কি বলছেন, ও কি বলছেন!

—ঠিকই বলছি বাবা। মানুষ হতে গেলে সব সময় নিজের গণ্ডীর চিন্তা করাটাই কি বাঞ্ছনীয়! গণ্ডীর বাইরে আরও যে অনেক কিছু জানবার বা করবার থাকে!

এরই মধ্যে রামশঙ্কর বলে উঠল—আসলে কি হয়েছে জেঠু জানেন—অন্তর হয়ত অনেকেই নিয়ে আসে কিন্তু জাগিয়ে তোলাটাই অসম্ভব। যদি কেউ একজন তার মাঝে দাঁড়িয়ে জাগায়। সেইরকম ব্যক্তি দুর্লভ। তাই নয় কি জ্যাঠামশায়?

—হ্যাঁ তা তো বটেই বাবা। তবে অনেক সময় এ কথাটাও তো ঠিক যে, জাগালেও জাগতে চায় না। তোমরা আবার সেদিকটাও দেখ।

—যাক এখন উঠি তাহলে আপনি সাবধানে থাকবেন আপনার শরীর দুর্ব্বল।

দীপঙ্করের কথায় মৃদু হেসে ত্রিদিবের বাবা বলল—হ্যাঁরে ত্রিদিব আজকে না তোর মেসোমশায় তোকে খুঁজছিল। আমি তোর কথা সব বললাম। তোর মা অবশ্য বলল তাঁ সে রাতে এখানে থাকার কথা আছে।

ত্রিদিব—তবে তো ভালই হল, এসে মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে।

ত্রিদিবের মা এগিয়ে এল—তোর মেসোমশায় তোর বাবাকে দেখার জন্য তো এসেছিল। তার সঙ্গে কিছু ফল মিষ্টি এনেছে। আমি এনেছি। তোরা সব ভাগ যোগ করে খা।

যখন তিনি সকলের মাঝে এসে দাঁড়ালেন তখন তিনি যেন সকলেরই মা। তাই কেউ আর না করতে পারল না।

ওখান থেকে তৎপর হয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল কুমোরদের বাড়ীর দিকে। সামনের সড়কে দাঁড়ালে পরিষ্কার সব ঘর দেখতে পাওয়া যায়। সব অগোছালো বটে কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে সাজানো। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেখে দলপতি অমরেশ দা খাঁয়েদের ঘরে দাঁড়িয়ে গৃহস্বামীকে তিরস্কার করছেন।—কি ব্যাপার! চারদিকে অপরিস্কার। এত অগোছালো কেন্? আপনারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন তো আমরা কি করতে পারি!

খাঁ কিন্তু নীরবে দাঁড়িয়ে ওর কথাগুলো শুনছে। খাঁয়ের স্ত্রী ভিতর থেকে বলে উঠল—কখন করব সময় পাই না।

এ বিষয়ে অমরেশ পাকা—অভিজ্ঞ। সে তার মা বৌদিকে দেখেছে। তাই বলে উঠল—দেখুন, মানুষ কাটান দেওয়ার পথ অনেকই জানে। কিন্তু সৃষ্টি করা বা গোড়া গুছানোর পথ মানুষ একটাও যেন খুঁজে পায় না। আপনি বুদ্ধিমতী কর্মী সুগৃহিণী যদি হতেন তাহলে এ তো হতই, উপর দিয়ে আরও কিছু চিন্তা করতেন। আপনারা দুঃখ, হায়-হুতাশ করতেই এসেছেন। কিন্তু এমনই আপনাদের অজ্ঞতা যে দুঃখ দূর করবার কোন চেষ্টাই করতে নারাজ। যাক মোটামুটি একটা কথাই বলে যাই খাঁ সাহেব, লক্ষ্য রাখবেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তার মধ্যে এ রোগ বাড়তে পারে না। নইলে অর্থ যায় অথচ অনর্থই ঘটে।

খাঁ সঙ্গে সঙ্গে জানাল—আপনি তো ভালর জন্যই বলছেন সে কথা তো ঠিকই, তবে কি জানেন—কেন যেন ইচ্ছা থাকলেও হয়ে উঠে না।

পাশ থেকে শ্যামল বলে উঠল—ওটা তাহলে আপনাদের দুর্ব্বল ইচ্ছা। সবল বা প্রবল ইচ্ছা থাকলে তা পূর্ণ হয়। কি অমরেশ ঠিক না? অবশ্য তোমার কাছেই আমাদের এ সব শিক্ষা।

সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ চেপে দিয়ে বলল—শ্যামল মুখে বড় বড় কথা বলে এত তুলে কি না-ধরলেই নয়। কথা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা লেগে গেছে। আজ আর কাজ নেই। এর পর মাঝে মধ্যে কেউ কেউ এসে দেখে যাবে। না গেলেও যায় আসে না। সংগবদ্ধ হয়ে এরা নিজেরাও যেমন শিখেছে, পাড়ায় পাড়ায় অশিক্ষিত জনসাধারণ সেইরকম তৈরি

হয়ে উঠেছে। এখন এরা নিজেরাই নিজেদের এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। যাই হোক এবার অমরেশ জানাল—ভাই, তোমাদের ছেড়ে আমাকে কাল আবার কলকাতা যেতে হবে।

দীপঙ্কর, আলী ইত্যাদি কয়েকজন বয়োকানিষ্ঠরা বলে উঠল—কদিন অমরেশ দা ছিলেন বলে এত দুঃখ হাহাকারের মধ্যেও দিনগুলো আনন্দেই কাটত। সব সময় মনে একটা চিন্তা ছিল—নিঃস্বার্থ ভাবে কার কি করতে পারি। কি করে দারিদ্র, কষ্ট, অজ্ঞতা দূর করি। অবশ্য এর আগে আপনি যখন কলেজে পড়তেন তখনও পাঁচটা পাঁচ রকম দিয়ে দলবদ্ধ ছিলাম আমরা। কিন্তু দাদা আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের সেরকমটি আর হয় না। কি তাই না, শ্যামল দা ?

শ্যামলের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বলে উঠল—সে কথা কি বলতে ?

অমরেশ আপত্তি তুলল—তা কেন বলছিস শ্যামল ? রাজা বিনে যখন রাজ্য আটকায় না তখন তো সামান্য অমরেশ।

রামশঙ্কর বলল—ঐ তো অমরেশ দা, তুমি বুঝবে কি করে! তোমাকে আমরা বুঝি, তাই বলছি।

খোকা বাড়ী এসে হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেতে বসেছে। খুব পরিশ্রম হয়েছে না রে ?—বলে মা খোকার কাছে বসল।

খোকা—না মা, পরিশ্রম আর কি, কাজ তো সব গুছানোই হয়ে গেছে। তা তুমি বাবাকে চিঠিটা দেখিয়েছিলে ?

বলতে বলতে বাবা স্বয়ং এসে পৌছে গেল।

—হ্যাঁ তোমার মা আমার চিঠিটা দেখিয়েছিল। আমি পড়েছি।

—তা ঠিক আছে, বাবা ? না আরও কিছু তোমার বলার আছে ?

—না বলার আর কি আছে! বাকী যা দু'এক কলম মামুলী কথা তাই লিখে ফেলে দিও।

—কালকে তাহলে বাবা আমি কলকাতায় রওনা হচ্ছি। ক্লাস কামাই আর করব না।

—হঁ্যা তোমার এদিকে সব গুছানো হয়ে গেছে।

—হঁ্যা একরকম আয়ত্বে আনতে পেরেছি। নূতন কোন কেস নেই, আর সম্ভাবনা—সে ভবিতব্য। আমার ওদিকে বেশ কিছু ক্ষতি হয়ে গেল।

—ক্ষতিটা যদি রয়ে যায় তাহ'লে বুঝতে হবে—এক দিক গড়তে গেলে আর একদিক ভেঙ্গে যায়। বর্ত্তমান যে ক্ষতি সেটা যদি পরে সামলে যায় তাহলেই বুঝতে হবে তার মনের উপর দখল আছে। তবে কি জান অমরেশ, মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে—সে একদিককে লক্ষ্য করেই সামাল সামাল রব তোলে। অন্যদিক চিন্তা করা তো দূরের কথা। সর্ব্বদিকে লক্ষ্য করে সর্ব্ব সময় চিন্তা করে এরকম মানুষ কৈ! অথচ দেখ, জীবের শ্রেষ্ঠ মানব—ঈশ্বর এত বড় সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু সেই সম্মান নিয়েই গৌরব করে। কাজে কেউ নেই। তাই নয় কি?

—হাঁ বাবা, তোমার কথাগুলো আগে শুনতামই। এখন কাজে নেমে হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

মহেন্দ্র সকালে এসেছে—বাবু, তাহলে কবে আমাদের বাড়ীটা রেজিষ্ট্রি করা হবে?

মানিক—কথাটা ঠিকই বটে মহেন্দ্র, যখন দর দাম করা হয়ে গেছে—

মানিক বেশ চিন্তান্বিত—তবে একটা কথা কি জান—

ঋতা এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়াল—সকালেই মহেন্দ্র যে, খবর কি?

—খবর আর কিছু নয় দিদিমণি। আমাদের কাজটা আটকে আছে, তাই বাবুকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

মানিক যে 'তার' করে টান দিয়েছিল সেই টান ধরে ঋতা নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করল—আঃ চিন্তা করবার কিছু নেই মহেন্দ্র, আমি এবার যা শ্বশুর মশায়কে চিঠি লিখেছি না তাতে নিশ্চয় তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন।

এদিকে মানিক হায় নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল—যাক ঋতাই কথা বলতে সুরু করেছে।

আমি কি স্থির করেছি জান মহেন্দ্র—দু'একদিন স্থির থেকে আমি ছুটে যেয়ে বাবার কাছে মত নিয়ে আসব। তবে কি কাজ আটকে যাবে নাকি! তুমি যে তুমিও এত পরিশ্রমের পয়সা দিয়ে, অন্তর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছ। আর বাবা একজন আদর্শের খুঁটি হয়ে তিনি এ কাজে স্থির থাকবেন। আর এই সেদিনে ঠাকুরপো এসেছিল—দেওরটিও তো আমার ঐরকম ধরণেরই। তারপর

ওর মুখে যা শুনেছি আমি, তাতে ওদের বাড়ীতে সকলেই সত্য আদর্শকে ভালবাসে, তাহলে এ কাজে বাধা আসতে পারে না।

—তাই হোক দিদিমণি আপনার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়ে উঠে, এই প্রার্থনাই ঈশ্বরের কাছে করি।

ঋতার এত জোর-গলার কথা। মানিক যেন কোথায় একটু ভয় পাচ্ছিল। ও এত নিশ্চিন্ত কথা বলে যাচ্ছে, যদি না বাবা শেষ পর্যন্ত না মেনে নেয়! মাঝে মাঝে এই চিন্তাতে তার বুক কাঁপছিল। যাক মহেন্দ্র আশ্বস্ত মন নিয়ে উঠে গেল।

স্বামী স্ত্রী বিকেল গড়াতে কোথাটাবে একসঙ্গে ফিরেছে। মানিক চিঠির বাক্সে হাত দিয়ে ভাইয়ের লেখা চিনতে পেরে চমকে উঠল। ঋতা চা জলখাবারের জন্য ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানিক আগাগোড়া পড়ে স্তম্ভিত। বার বার শুধু যে চিঠিটাই পড়ল তাই নয়, এই সঙ্গে স্ত্রীকেও সে চিন্তা করছিল। ঋতা চা নিয়ে এসে দেখে স্বামী তার চেয়ারে বসে। তন্ময় হয়ে কি ভাবছে। স্ত্রীর উপস্থিতিতে মানিক একটু নড়ে বসল।

—কি ব্যাপার, অফিস থেকে এসেই চিন্তা করছ কি?

—না, এই চিন্তাই করছি যে এই সেদিন তুমি জোর-গলায় যে কথাগুলো বলছিলে তোমার মনের কথা ধরে বাবা কি করে উত্তর দিলেন!

—হুঁ হুঁ দেখেছ ত! দেখি দেখি চিঠিটা আমাকে দাও। চায়ের কাপটা তাড়াতাড়ি টেবিলে নামিয়ে দিয়ে চিঠিটা পড়তে সুরু করল।

মানিক বলে উঠল—আরে তুমি তো দেখছি আনন্দে আত্মহারা। ওপাশে যে রান্না ঘর খোলা আছে।

—হ্যাঁ এই যাচ্ছি।

বলেই চিঠিটা নিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। ফিরে বলল—দেখলে তো বাবার সায় আছে। এবার কাজে অগ্রসর হও।

—ঠিক বটে, তাহলে রেজিষ্ট্রি করে ফেলি, আর দেরি নয়।

পরদিন অফিসে মহেন্দ্রকে ডেকে বলল—তাহলে মহেন্দ্র কবে রেজিষ্ট্রি হবে?

—তা বাবু কালই বলেন কাল।

—না মহেন্দ্র কালকে মঙ্গলবার। কাল নয়। বুধবার দিনই ভাল।

মহেন্দ্রর হঠাৎ মনে হল কালকে মঙ্গলবার খর বার বলেই কি? তাই

জন্যই বোধ হয় বাবু আপত্তি করছে। কিন্তু সত্যিকারের তা নয়। কেন না, মানিক কোন সংস্কারের ধার দিয়েও যায় না। শুধু মহেন্দ্র বলাতেই কাজটা করায় কেমন যেন একটা হয় বলেই সেইজন্যই একদিন পিছিয়ে দিল।

যথাসময়ে কাজ গুছিয়ে নিল। মালিকের সঙ্গে মানিকের কোর্টে দাঁড়িয়েই দুএকটা আলাপ আলোচনা হল। মালিক বলল—আমার বড্ড টাকার প্রয়োজনের জন্য এটা আমাকে হাত ছাড়া করতে হল। নইলে এ আমার বড় হক সভার ছিল।

—হ্যাঁ, তাই তো আমার চিন্তা—এতে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে ত? আমার অবশ্য ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মানিক বাবু আমি এই বটতলায় দাঁড়িয়ে বলছি। আপনাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয় সফল হবে। আপনি যে কি জন্য কিনছেন আমি তো মহেন্দ্রর মুখে সব শুনেছি।

ঋতার মাথায় নূতন বোঝা চাপল। রেজিষ্ট্রি তার নামে হয়েছে। চাকরি এবার তাকে ছাড়তে হবে।

ফিরে আসার সময় মানিক মহেন্দ্রকে বলল—মহেন্দ্র, তুমি যখন একাজে এভাবে অগ্রসর হয়েছ তখন তুমি জেনো—এটিকে গড়ে তোলার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর। কারণ তুমি অভিজ্ঞ লোক, কোথায় কি রকম লোকজন পাওয়া যায় আমাদের চেয়ে ঢের বেশী তুমি বুঝবে।

—বাবু যে কি বলেন না—আপনাদের কাছে আমি!

ঋ—হ্যাঁ মহেন্দ্র তোমার বাবু একটুও বাড়িয়ে বলছে না। তুমি জানবে বুদ্ধি আমাদের মেহনৎ তোমার, তা না হলে দাঁড়াতে পারে না।

আর মনে মনে সে বলে উঠল—আমার নামে হলে হবে কি আমার বাবা হয়ে আবার মহেন্দ্র দাঁড়াক তো! যেমন লোকটির মনবল, তেমন কর্মী উদ্যমী, পয়সাও কিছু কম যায় না। অবশ্য ঠাণ্ডা ভাবের জন্যই আজ এর পয়সা হয়েছে। অফিসে প্রত্যেকের সঙ্গে যেভাবে কাজ করে চলে এমন কেউ নেই যে মহেন্দ্রর উপর অসন্তুষ্ট হয়। এটাও কি কম গুণ মহেন্দ্রর! সকলেই কাজে কথায় মহেন্দ্রকেই চায়। ওকে ঠিক বেয়ারার চোখে কেউই দেখে না। অফিসেই যেন একটা পাকা মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—মা, দিদির তো পরীক্ষা হয়ে গেল। বাবা যে সেদিন বলছিল আমাদের নিয়ে পুরী ভুবনেশ্বরের দিকে বেড়াতে যাবে, তা কি হল? তোমরা তো মুখে অনেক বারই বল। তা এবার ঠিক যাবে তো?

মণ্টুর কথার উত্তরে ওর মা বলল—হঁ্যা সেইরকম কথাই তো আছে রে। আমরা কালকে যাবই।

সঙ্গে সঙ্গে দীপা পৌঁছে গেল—সেই কবে রাঁচী বেড়াতে গেছিলাম তখন মণ্টুর বয়স কত বলত—চার পাঁচ বছর, না মা?

—তোমরা তো বেশ ঘুরে এসেছ আমার তখন একেবারেই জ্ঞান পড়ে নি।

—তুইও তো গেছলি বটে!

ভদ্রলোকের খুব একটা বাইরে যাওয়ার তাগিদ ছিল না। এ কথা কি ঠিক নয়—অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয় না। যে সংসার সত্য আদর্শ দিয়ে সব সময় গড়তে চায় সেই সংসারে গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী বেশী হৈ চৈ পছন্দ করে না। সময় নষ্ট, উচ্ছ্বাস, অর্থ ধ্বংস। তাই বলে একবারেই কোথাও কি না গেলে চলে! ঐ জন্য তাদের যাওয়া আসাটা দিন গুন্তির মধ্যেই পড়ে যায়।

আজকে ছেলে মেয়ে উভয়েই বাপকে ধরেছে—বাবা, এবার কিন্তু নিশ্চয় আমাদিগে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যাবই।

শিবশঙ্কর মনের কথাটা যেন ঠাট্টার ছলে ব্যক্ত করল—দাঁড়া না আর কদিন পরে এক জায়গায় যাওয়ার খবর আসছে।

শ্রীমতী—সে আবার কোথায়?

—কেন খোকা যে চিঠি লিখল—উদ্‌বোধন—সেখানে না হয় সকলে মিলেই যাওয়া যাবে। ক্ষতি কি!

—ও তুমি বুঝি ঐ মতলব ভেবে রেখেছ!

—না গো না, আমি ওদের ঠাট্টা করে বলছি আর কি।

—ওরকম ঠাট্টাই বা তুমি করবে কেন! তোমার মুখের ঠাট্টাও শুনলে ভয় হয়, যা মুখ দিয়ে বেরুবে তাই তো করে বসবে। এবার যখন ওরা জেদ নিয়েছে আমাদের যাওয়া উচিত। কারণ মেয়েটারও বিয়ে হয়ে যাবে, বড় হয়েছে।

—আচ্ছা ঠিক কর তাহলে, একটা দিন স্থির হোক। তোমরাই ব্যবস্থা কর মা ছেলে মিলে।

শ্রীমতী—খোকাকে জানাতে হবে তো ?

—তা জানাও।

পুরী ষ্টেশনে নামতে পাঁচটা পাণ্ডায় শিবশঙ্করকে ছেঁকে ধরল। শিবশঙ্কর একটু মানুষ-চেনা লোক, সেইজন্য একটিকে বেছে নিল। মোটামুটি একটা থাকার ব্যবস্থা হল। যেখানে ওরা ছিল সেখান থেকে মন্দির বেশী দূরে নয়। এপাশে এরা মা বেটীতে গুছাচ্ছে। ওদিকে বাপ বেটায় কথা বলছে। খোকা খবর পেয়ে খড়গ্‌পুরে এসে বাবা মার সঙ্গে দেখা করেছিল। শিবশঙ্কর বলল—অমরেশ, ভালই হল মন্দির কাছেই। তোমার মায়ের সুবিধা হবে।

অমরেশ মৃদু হেসে সায় দিল। তারপর কয়েক কথার পর সে বলল—বাবা, মা এদিকে গুছাগুছি করছে, তুমি একটু বস, আমি ততক্ষণ বাজারটা সেরে আসি।

পরদিন সকালে পাণ্ডা এসে ধরেছে—বাবু আপনাদের ভোগের ব্যবস্থা তাহলে ওখানেই করি ?

এইসব লোকগুলিকে, আগেই বলেছি, শিবশঙ্করের ভালভাবেই চেনা আছে। যাই হোক ওদের মধ্যে এ না হলে একটু ভাল, তাহলেও পাণ্ডা তো বটে। আর শিবশঙ্করের পূণ্য করার দৃষ্টিভঙ্গিটাই অন্যরকম। সে এখানে নেহাৎ বেড়াতেই এসেছে। যার জন্য বলে উঠল—না না না। ভোগের ব্যবস্থা আর কি, এখানেই আমাদের রান্না হবে।

—সে কি বাবু আজকে প্রথম দিন আপনারা প্রসাদ পাবেন না জগন্নাথ দেবের ?

শিবশঙ্কর মৃদু হেসে বলল—ও প্রসাদ ! তা বেলপাতাও প্রসাদ আর অন্ন ভোগও প্রসাদ—একটা খেলেই হচ্ছে।

পাণ্ডার কিন্তু সুরুতেই এমন কথা মোটেই ভাল লাগল না। ভাবল মেরেছিলাম এক দাঁও তা এ আবার কোন্ জাতের বাবুরে বাবা ! এদিকে কথার মধ্যে পৌছে গেল অমরেশ।. বাজারের থলি নামিয়ে বলে উঠল—কি ব্যাপার বাবা ঠাকুর আপনি যে এসময়ে !

—না এই এসেছিলাম আপনাদের ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা বাবুর কাছে জানতে।

—ভোগ! ভোগ তো আমার মা-ই রান্না করছে।

—খোকাবাবু বলেন কি! আপনি যে দেখছি একেবারেই নাস্তিক!

—হুঁ! নাস্তিক! কেন আমি কি ভুল বলেছি বল? তুমি ভোগের কথা বলেছ। আমি দেখছি আমার মা-ই রান্না করছে।

—তাই বলে কি আপনি ঠাকুরের সঙ্গে মানুষের তুলনা করবেন? ঠাকুরের ভোগ রান্না আর মানুষের ভাত রান্না—এক না কি?

—আমি তো দেখছি মানুষের ভোগ রান্না ঠাকুরের চেয়েও কাজের। একজন হাত পা নেড়ে কাজ করছে কথা বলছে—খাচ্ছে শক্তি পাচ্ছে আবার কাজ করছে। আর ওদিকে দেখ আমরাই তাকে হাতে করে গড়েছি, সে স্থবির দাঁড়িয়ে আছে। এবার বোঝ কার কতটুকু ক্ষমতা!

খোকাবাবু, এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না।—ধমকে উঠল পাণ্ডা মহাশয়—তাহলে এসেছেন কেন এখানে? আপনারা দেখছি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ভুলে গেছেন। আজকালকার ছেলেগুলোই দেখছি এরকম হয়েছে।

এদিকে শিবশঙ্কর হিসাব পত্তর দেখছে কিন্তু কান রয়েছে এদিকে।

আঃ পাণ্ডা ঠাকুর রাগছ কেন? এখানে আমরা কেন এসেছি জান না? এ নিরিক্ষণ করা—ঘুরে ঘুরে দেখব, জানব, বুঝব—কি করে মন্দির গড়েছে কার কত মেহনতের ফল। তারপর ধর্মের ভয় দেখিয়ে কি ভাবে তোমরা নিরীহ পাঁচজনের কাছ থেকে হাতাচ্ছ—সেই সবগুলোই দেখতে এসেছি।

পাণ্ডা ছেলেমানুষ নয়। সে বেশ প্রৌঢ় হয়েছে। লাল বর্ণ চোখ করে আগুন হয়ে তাকে অভিশাপ আরম্ভ করে দিল—এই সব ছেলের দ্বারা কোনদিন কিছু হবে! উচ্ছন্ন যাক এরা উচ্ছন্ন যাক। বিগ্রহ জগন্নাথ দেবের নামে কি সব বলছে!

খোকা সঙ্গে যোগ দিল—এই দেখ না কাকে তুমি বিগ্রহ বলছ পাণ্ডা ঠাকুর! যার হাত নেই সে হল বিগ্রহ—তাহলে আমাকে তুমি কি বলবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ থাক তোর মত ছেলে যে কতদূর আগাবি তা জানাই গেছে। —এবার সে রাগের জ্বালায় তুমি থেকে তুই-এ নেমে গেছে।

শিবশঙ্কর শুধু তাদের সীমা লক্ষ্য করছিল। সে তার ছেলেকে ভাল করেই

বোঝে। এদিকে দীপা মন্টু রীতিমত দর্শক হয়ে গেছে। শ্রীমতির কথাগুলো কানকে গেলেও বেরবার অবসর নেই এখন। কারণ সে তাড়াতাড়ি না গুছিয়ে নিলে। সন্ধ্যার দিকে মন্দির হয়ে এদিক ওদিকে একটু বেরবে।

খোকা দমবার ছেলে নয় সে, বলে চলে—শুন পাণ্ডা ঠাকুর তুমি রাগছ কেন তোমার জগন্নাথ দেব আমায় কালকে কি বলে গেছে জান?

চেপে দিল পাণ্ডা—আর জানতে চাই না; যাদের মধ্যে ধর্ম ভয় নেই ভক্তি নেই তাদের কথা আমি শুনতে চাই না। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি তোমার বাবার সঙ্গেই কথা বলব। তুমি আর কথা বলো না।

—বাবা ব্যস্ত বলেই তো আমাকে কথা বলতে আগিয়ে দিয়েছেন। তারপর কি জান—ছেলে বড় হলে অনেক সময় ছেলের উপর বাপ নির্ভর করে, তা বুঝি তুমি জান না?

আবার মোড় নিল খোকা—নূতন জায়গা নূতন পরিবেশ কাল এসে উঠেছি। বিছানায় শুয়েছি সেই সবে—হঠাৎ কে যেন এসে মাথার কাছে দাড়াল। বলল, তুই এসেছিস এখানে! তোদের মত কতগুলো জংলীকেই আমি খুঁজছিলাম। যদি আমাকে স্বয়ং ঈশ্বরই ভাবিস তাহলে এরকম করে আমার নামে ঠুঁটো মূর্ত্তি গড়ার কি দরকার! ঠুঁটোই বল গোটাই বল—মূর্ত্তি গড়ার কি প্রয়োজন! তবে যদি তোরা মন স্থির করতে না পারিস তাহলে হয়ত উদ্দেশ্যে মূর্ত্তি পট সামনে রাখলি। কিন্তু তাই বলে তাকে নিয়ে এত মাতামাতি করে আমার সৃষ্টির উপরে এত অনাচার এত অবিচারের কি প্রয়োজন! শুধু অন্যায় অনাচার দূর করবার ব্যবস্থা কর।

তারপর আমি জিজ্ঞেস করেছি—তুমি কে? কি আশ্চর্য, জান পাণ্ডা ঠাকুর—কি একটা জ্যোতি যেন মাথার দিকে সব আলোকিত করে সরে গেল।

তা খোকাবাবু তুমি তো তখন জিজ্ঞেস করলে না কেন—অন্যায়টা কোথায় কোথায় হচ্ছে, কে কে করছে?

—কে কে আবার করবে! এই তুমি আমি আমরা সবাই।

—আমি! আমি কি অন্যায় করেছি! আমি তো কিছু করি নি।

—তুমি কিছু করনি আর আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমাদের দলটাই বেশী করছে।

—ও তবে কি তুমি বলতে চাও—ধর্ম্ম ছেড়ে দেব?

—প্রকৃত ধর্ম বলতে কি বোঝ পাণ্ডা ঠাকুর ? আমাদের মত যাত্রীর কাছে তুমি যবার ছুটে এসেছ ঠিক তার পাস দিয়ে চিন্তা করদেখিনি কোন একটি অসহায় ক্ষুধার্ত্তি একটু ভোগ পাওয়ার জন্য মাথা কুড়ছে। কিন্তু তোমরা সেখানে কি করছ ? রীতিমত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বাবুদের ভোগ পৌঁছে দিচ্ছ। তোমাদের জগন্নাথ কি তোমাদের এইরকম ধরণের ধর্ম করতে বলেছে ?

—শুনতে চাইনি তোমার কথা। এ সব গুলো কেন যে জন্মায়! ঠাকুর যে কেন এগুলোকে রেখেছে এখনও!

শ্রীমতির কানে কথাটা পৌছল। সে হাতের কাজ ফেলে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়াল। শিবশঙ্কর যে কান রেখেছিল তার প্রমাণ সে এবার মুখ খুলল। মায়ের দাঁড়ানোর আগেই বাপের বক্তব্য স্বরু হয়ে গেছে।

—আঃ কি করছ খোকা! তুমি কি ভাবছ এত শীগ্রি এ তিমির অন্ধকার দূর করতে পারবে! কেন মিছে বকছ! আর এরা এসবের বুঝেই বা কতটুকু! এদের ভাঙ্গিয়ে খাওয়ার পথে দাঁড়ালে তো রেগে যাবেই।

—সে কি বলছ বাবা! এই ভাবে প্রতিবাদ করতে করতে একদিন বিরাট হয়ে উঠবে। তবেই না দূর হবে কুসংস্কার।

—হুঁ তা তো বুঝলাম। কিন্তু কথাটা কি জান—বড় সময় সাপেক্ষ জিনিস এসব।

—হোক না তাতে ক্ষতি কি! ঈশ্বর আমাদের যে জ্ঞান বিবেক দিয়েছে তা আমি কেন না বিতরণ করে চলে যাব! আমি আমার সাধ্য মত চেষ্টা করে চলে যাব।

শ্রীমতী—খোকা কি হচ্ছে বলদেখিনি ? এমনিই তো আমার পোড়া কপাল। পাণ্ডার কাছ থেকে কি শাপ শাপান্ত কুড়াচ্ছিস তুই। আমরা বেড়াতে এসেছি কি ধর্ম করতে এসেছি সে নিয়ে এত কথা বলার কি আছে রে!

শিবশঙ্কর—শাপ শাপান্ত! আবার কি কথা বলছ! মোটামুটি চলতি কথা বলে জান—গুরুজন বা ব্রাহ্মণ কারো মনে আঘাত করো না। তাদের অভিশাপ লাগবে। এ কথাটা কি প্রকৃত সত্য না ঠিক? একজন অন্যায় করছে সেখানে সত্য কথা বললে যেহেতু তার অন্যায় ধরা পড়ে যাচ্ছে সেইজন্য সে আগুন হয়ে অভিশাপ দিল বা মনে কষ্ট পেল। তাহলে তুমি কি বলতে চাও সেখানে শাপ লাগবে? তা যদি লাগে তাহলে বলতে হবে সত্য বলে কিছু নেই।

মানুষই ঈশ্বর। আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে আগুন তো জ্বলবেই। তার জন্য আর চিন্তার কি আছে! কি পাণ্ডা ঠাকুর আমি কথাগুলো কি ঠিক বলছি?

—হ্যাঁ, সবই তো বুঝতে পারছি সবাই তো ন্যায্য বলছেন। তা বলে খোকা বাবুর অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ভাল নয়।

তা ঠিক আছে মিষ্টি করেই এবার থেকে না হয় বলা যাবে, কোন চিন্তার নেই—অমরেশ এই বলতে বলতে ঘর ঢুকে গেল।

এরা নূতন জায়গায় এসেছে বাজার হাট ভাল পায় না। সেইজন্য মাকে বলল—মা তুমি এক কাজ কর—ভাজা আর খিঁচুড়ি করে ফেল। আর ও বেলার দিকে আমরা তো বেড়াতে বেরব এখানে দেখছি খাবার দাবার সুবিধাই —একটা দোকান থেকে কিছু পুরী কিনে পৌছে দেব। আর কালকে সকাল সকাল বেরিয়ে ভাল করে বাজার করা যাবে।

এদিকে পাণ্ডা কিন্তু ছেড়ে কথা বলে না। এদের গায়ের চামড়া মোটা। অনেক কুকথা সহ্য হয় তাদের। আর এরা তো রীতিমত ভদ্র।

—তা বাবু, তাহলে আপনারা কখন যাচ্ছেন, সে সময় এসে নিয়ে যাব।

শিবশঙ্কর—না না না, নিয়ে যেতে হবে কেন! আমাদের তো হাত পা সবই আছে। নিজেরাই পায়ে হেটে যেতে পারব।

অবশ্য শিবশঙ্কর এর মন বুঝেই এই উত্তর দিল। যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় মক্কেল, সেইজন্য সঙ্গ করে নিয়ে যেতে চাইছে। সংসারে সব আন্তরিকতার মূলে যে সেই এক স্বার্থ, সে আর কে না জানে!

—না ব্যাপারটা কি জানেন বাবু আপনি হয়ত ভুল করে অন্য কোথাও চলে যাবেন। আমাদের জগন্নাথদেবের আদেশ হচ্ছে—আপনি যে পুরী ধামে এসেছিলেন তা রাখার জন্য তো কিছু ভোগের ব্যবস্থা করে যাবেন। সেটাকে বলে 'আটকা বন্ধন'।

অমরেশ ঝপ্ করে ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে এল—সে আবার কি—আটকা বন্ধন!

শ্রীমতী—আঃ, খোকা আবার কথা বলছে! দীপা যা তো বক তো ওকে। বল যা মা বকছে। না হয় হারামজাদাকে এদিকে ডাক। ও যা ভাল হয় তোর বাবা করবে।

যতই হোক মায়ের প্রান তো। শ্রীমতী যে একেবারেই সত্য আদর্শ বোঝে

না তা নয়। বড় ছেলের এইরকম হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওর যেন মনে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকেছে। তাই বলে এ যেন কেউ না ভাবে যে সে স্বামীর কল্যাণ খোঁজে না। স্ত্রীলোক স্বামীর মঙ্গল আগেই চায়। ছেলে সে যে নিজের ভিতর থেকেই বেরয়। তাই সে যত বড়ই হোক মায়ের মনে হয় সে বড় নয়। ওটা আর কিছু নয় জননীর অন্ধ মমতা।

দীপা এসে কথার মাঝে দাঁড়াল—ও মেজদা, তোমায় মা ডাকছে।

—কেন রে?

—তা আমি জানি না।

—তুই না জানলেও দীপা, আমি জানি। মা কি ভাবছে জানিস—যদি পাণ্ডার শাপে আমি মরে যাই!

—আঃহাঃ কি যে বল যখন তখন। তোমার মুখে কিছু কথা আটকায় না বুঝি!

—তা কি করে আটকাবে! তুই-ও যে সেই স্ত্রীলোক—নারী, না দীপা? তা তোর এরকমটা সাজে না তুই লেখাপড়া শিখছিস সত্য আদর্শ তোর কাছে বড় হয়ে দাঁড়াবে না।

দীপা একটুখানি লজ্জা পেয়ে অন্তরের মমতা লুকিয়ে বলল—আমি কিছু বলছি না কি! ও মা বলছে তো।

—ঐ হল রে বোন হল। তোর যদি সে রকম জ্ঞান থাকত তাহলে মাকে বুঝাতিস।—বলে বোনের পিঠে দুটো হাত চাপড়িয়ে মায়ের দিকে আগিয়ে গেল।

তার আগেই ও দরজা দিয়ে দীপা পৌঁছে গেছে।—ঐ দেখ মা তুমি আমায় পাঠালে আর মেজদা কি সব বলছে।

—কি আর বলছি, তুই যে মাকে এসে নালিশ করছিস। এই দেখত মা, পাণ্ডার শাপে আমি মরিনি তো বটেই বরং আমার আয়ু বেড়ে গেছে।—বলেই মাকে যেয়ে জড়িয়ে ধরল।

—শ্রীমতী বাজে বকিস নি তো, তোরা সব সমান।

মণ্টু ঝাপিয়ে পড়ল—সমান আর কি, তুমি আর দিদি যা কর না! জান মেজদা, সেদিন আমাকেও ঐরকম করছিল। একটা ষণ্ডা মার্কা ভিখারী আমাদের [illegible] ভিক্ষা করতে এসেছে। আমি তাকে দুটো কথা জিজ্ঞেস

করছি সে আমার দিকে লাল চোখ করেছে। অমনি দিদি যেয়ে আমার ডানাটায় ধরে বলল—চলত তুই ঘরে।

ওদিকে শিবশঙ্কর পাঁচ কথার পর আবার ঘুরে ধরেছে— কি বললে পাণ্ডা ঠাকুর—আটকা ?

কথাটা লুফে নিয়ে পাণ্ডা উত্তর দিল—হ্যাঁ বাবু আপনার চোদ্দ পুরুষের নাম এখানে লেখা হবে। আপনি যে বংশের একটি ধর্মীয় সন্তান তারই নজিব সব আমার খাতাতেই লেখা থাকবে। আপনি অমুক সময়ে এসেছিলেন এবং সপরিবারে পুরী-ধাম দর্শন করে বাবার ভোগের জন্য এই পাঁচশ হাজার দিয়ে গেছিলেন।

এদিকে মা খোকার হাতে কি যেন একটা খাবার এগিয়ে দিচ্ছে, আব খোকা কথা শুনতে পেয়েছে। শুধু খোকা নয় সকলেরই কানে কথাটা গেছে। মাযের মন দুলে উঠল—এই বে খোকা বুঝি আবাব যাবে।

—ও মা, রাখ রাখ, শুনছি কি সব টাকার কথা হচ্ছে! থাম আমি আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে মা আটকালো—ও খোকা রক্ষা কর বাবা। বিদেশে বিভুঁইযে এসে একটা কলহ বাধাস নি। তোর চেয়েতে তোর বাপ অনেক বেশী জানে। সে যা বলার বলবে। তুই ঝাঁপ দিয়ে যাস নি তো।

খোকা—"ওগো মমতাময়ী মা জননী
কানে হাত চাপা দাও দেখিনি।
তোমার খোকা—
তোমারই থাকবে জানবে তুমি।
এসেছি করিতে কর্ম
দয়া করে বাধা দিও নি।
আশীর্ব্বাদ কর মা
তোমার খোকারে তুমি।"

নাচতে নাচতে খোকা বেরিয়ে চলে গেল। মা হাঁ করে চেয়ে রইল।

দীপা—দেখলে মা মেজদা কেমন কবিতা বলে তোমায় সব বুঝিয়ে দিল। ও ছেলেকে নিয়ে তুমি পারবে না।

মন্টু যোগ দিল—আর তোকে মাকে নিয়েও আমরা পারব না।

ঝাঁকার দিল মা— এই মণ্টু চুপ কর। ধানি লঙ্কার আবার ঝাঁঝ দেখ!

—হ্যাঁ আমি না হয় ছোট বলে আমায় চুপ করিয়ে ছাড়বে। মেজদাকে আর পারলে না তো।

মায়ের মনে আগুন ছিটিয়ে ছাড়ল মণ্টু।

খোকা গিয়ে নীরব দর্শক হল। পাণ্ডার ভয় ছুঁয়ে গেল—আবার সেই ছেলেটা এসেছে। শিবশঙ্কর কথার জের টেনে বলে এবার—কি যে বল পাণ্ডা ঠাকুর, পাঁচ পয়সা পকেটে আছে কি না সন্দেহ আবার পাঁচশ, হাজার।

—সে কি বাবু আপনাদের মত বড় বড় অফিসাররা যদি না দেবে ত দেবে কে!

—হুঁ, আমাদের মত অফিসার! তবে আমি এই কথা বলে আসতে পারি শ্রী জগন্নাথদেবের কাছে—'হে বাবা জগন্নাথ, তুমি অবশ্য সেই ঈশ্বর নয়, তবে ঈশ্বরের প্রতীক বলেই পরম শ্রদ্ধায় হাত জোড় করে জানাই—তোমারই হাতের পুতুল গড়া আমি শ্রেষ্ঠ মানব। যেন প্রকৃত পক্ষে সেই শ্রেষ্ঠ কাজ আমি করে যেতে পারি। কোথায় আছ দয়াময়—সেই আশীর্বাদ কর আমাকে। আমি তোমার প্রকৃত সৃষ্টিকে লক্ষ্য করব এবং দীন দরিদ্র অনাথকে লক্ষ্য করব। কেন তাদের আজ এই অবস্থা ভাবব সেই কথা। এবং সেই প্রশ্নই বার বার তোমাকে জানাতে ও তোমার কাছে জানতে চাইব তার উত্তর। আর আমাকে দিয়ে যেগুলি সৃষ্টি করিয়েছ তাদের প্রকৃত সর্ব্বদিক লক্ষ্য করে, চাওয়া পাওয়া মিটাব। আর বাকী যে অবসর সময়টুকু থাকবে তা দেশের ও দশের সেবায় ছুটে বেড়াব। হে করুণাময় দীনদয়াল তোমার কাছে দাঁড়িয়ে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে চাই।

খোকা মুগ্ধ বিস্ময়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। এর উপরে আর কি আছে বলার। আমি যা বলব তার চের বেশী বাবাই বলেছেন। পাশেই পাণ্ডা মুখের দিকে চেয়ে একেবারে হাঁ হয়ে গেছে—বাবাঃ এদের দেখছি কেউই কম নয়।

—যাক বাবু আপনাদের তো আর বলার কিছু নেই। যা ভাল বুঝেন করবেন।

পাণ্ডা হতাশ হয়ে ফিরে যাবে এমন সময় শিবশঙ্কর বলে উঠলেন—না না

ঠাকুর, উঠছেন কি! আপনাকেই এসে প্রথম চিনেছি, আপনার সঙ্গেই তো হেথা হোথা যাব।

ভাঙ্গা গলায ঠাকুর মশাই বলল—না বাবু, আপনারা দেখ্‌ছি সবই জানেন।—কিন্তু তবুও পাণ্ডা ভিতবের লোভ ত্যাগ করতে পারল না—দরকার হলে ডাকবেন আমি মন্দিরেই থাকব।

চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খোকার দিকে তাকিয়ে শিবশঙ্কর বলল—কি এই ভাল হল না, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ!

খোকা—ঝগড়াব চোদ্দগুণ হয়ে গেল। তুমি যা বললে তার উপর আর কিছু চলে না। তবে পাণ্ডা সব বুঝলে হয়!

এরা বিকেল গড়াবার আগেই বেরিয়েছে। মন্দিবের মুখেই পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শিবশঙ্কর কিন্তু এইটাই চেয়েছিল। পাণ্ডার কিন্তু সেই সে বেলার মিষ্টি মিষ্টি অপমানের আগুনের ছিটায় মনের ভিতরটা ধিকি ধিকি জ্বলছিল। তবুও এই যে—তাদের যে এই বৃত্তি! সেইজন্য বাধ্য হয়েই বলল—ওদিকে যাচ্ছেন কেন আপনাবা এইদিকে যান, এটা স্বর্গদ্বার; প্রথমে এই দিকেই ঢুকতে হয়।

খোকা—স্বর্গদ্বারে প্রথমেই না ঢুকে নরক দ্বার হয়ে স্বর্গে যাওয়াই ভাল!

—যাক গে বাবু, আপনার ছেলে যা বলে তাই করুন।

শিবশঙ্কর—আঃ সব সময় ওর কথা ধর কেন, পাণ্ডা ঠাকুর! ওরা ছেলে-ছোকরার দল, বলেই থাকে। চল চল তুমি যেদিকে বলছ সেদিকেই চল। তারপর একটা কথা কি ঠিক নয পাণ্ডা ঠাকুর, প্রথমেই আগুনটা যখন উনানে ধরে তখন তার তাপ খুব দাউ দাউ করে উঠতে থাকে। যে কোন জিনিসই পুড়ে যাবার সম্ভাবনা। রাঁধুনী ধীরে ধীরে সে আগুনের তাঁত বুঝে কাজ সুরু করে। সেই বুঝতে ওকে দাও এখন। ওকে আর কি বলব। আমাদেরও তো একদিন ওই রকমই দিনগুলো কেটেছে।

খোকা—বাবা, তুমি কথাটা ঠিকই বলছ বটে, তবে একটা কথা জানবে—গাছ যদি খুব তেজী হয় তবে তার ফল আরও তেজী হয়।

পাণ্ডা ওদের অত কথা বোঝে না। খানিকটা আগিয়ে গেছে। শুধু বাপ বেটায় দুজনে দুজনকে বুঝে নিল।

চারদিকে ঘুরে ঘুরে দর্শন করছে তাই, না বাপ ছেলের প্রত্যেকের কাজ

কর্ম নিরিক্ষণ করে চলেছে! দর্শনের লক্ষ্য যদি থাকে তা একটু ঐ মায়ের যা রয়েছে। পাণ্ডার মন উস্ পুস্ করছে কিন্তু কি বলা যায়! কিছু তো আর বলতে পারছে না। যাই হোক বেরিয়ে আসবার মুখে পাণ্ডা ঠাকুরের পারিশ্রমিক স্বরূপ নিখুঁৎ হিসাবী শিবশঙ্কর পাঁচটি টাকা তার হাতে দিল। পাণ্ডা তো হাতে করেই হাঁ। কি একটা বলবে, সে ভাব শিবশঙ্কর বুঝতে পারে বলে—কি পাণ্ডা ঠাকুর, ঐ নিয়েই সন্তুষ্ট হলে তো! আমরাও সব ছাপোষা মানুষ তো। আরও পাঁচটা খরচ খরচা আছে তো।

—যাক বাবু আপনাকে আর কি বলব আপনার ধর্মে যা হয় করেছেন।

পাণ্ডার কথা পাণ্ডাকেই ফিরিয়ে দিয়ে শিবশঙ্কর বলে উঠল—যাক এতক্ষণে যা বললে খাঁটি কথা।

এদিক দিয়ে ওরা বেরিয়ে আসছে। আসতে আসতে ভীড় তো আর কম নয়, মণ্টুর গায়ে লাগল ধাক্কা।

—কি হল!—আগেই মা চমকে উঠল।

একটি ভদ্রলোক তাকে হাতে করে তুলে দাঁড় করিয়ে বলে—না কিছু হয়নি। ছেলেটিকে একটু ধাক্কা লেগে গেছিল।

এদের কথা না শেষ হতে হতেই শিবশঙ্কর, খোকা যেয়ে পৌছল। কাছাকাছিই সকলে ছিল। ভদ্রলোক—ভদ্রলোককে দেখে এগিয়ে গেল—এ আপনারই বুঝি ছেলে?

—হ্যাঁ আমার ছোট ছেলে।

—তা বেশ বেশ।

শিবশঙ্কর—তা কোথ্ থাকতে আসছেন আপনারা?

—কোলকাতায় থাকি।

—কলকাতার কোথায়?

—যাদবপুরে। আর আপনার নিবাস?

—বাঁকুড়া থেকে আসছি। তা আপনার ছেলে মেয়ে কটি?

—ছেলে মেয়ে বলতে—আমার দুটি ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে। আপনার কি এই সব?

—বড় ছেলেটি কলকাতায় চাকরি করে।

—কি চাকরি করে?

—ইঞ্জিনিয়ার। এক বেসরকারী সংস্থায় কাজ করে। আপনার ছেলেরা ?

—বড়টি যাদবপুর কলেজে প্রফেসর।

—কি যাদবপুর—কোন্ কলেজে ?

—হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

—আর ছোটটি ?

—বি, এস, সি দেবে। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক নিজেই বলতে আরম্ভ করল—আর কেন বলেন—এই বছর দুই হল রিটায়ার করেছি। যে টাকাগুলি পেয়েছি—ইচ্ছা আছে ছেলেটিকে ডাক্তারী পড়াব। চাকরি থাকা কালীনই যাই হোক মাথা গুজবার একটি ঠাঁই করে নিয়েছি ঐ যাদবপুরেই। শুধু কি তাই মশায়, আর আমাদের জাতটাকে কেন বলেন! শুধু চেনে টাকা—টাকা আর টাকা! মেয়েটা বি, এ, পাস করল। দেখতেও আমার মেয়ে—আর কি বলব নিজের মেয়ের কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিয়াই মশাইটি এমনই হলেন—হেঁকে বসলেন বিশ হাজার।

—ও আপনার মেয়ের তাহলে বিয়েও হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ এই তো গেল বছরের আগের বছর বিয়ে দিয়েছি।

—তা জামাই আপনার কি করে ?

—জমিদার বংশের ছেলে। রাজনীতিই হল নেশা পেশা। বর্ত্তমান দিল্লীর পার্লামেন্টের মেম্বার। তবে কি জানেন আমাদের সাহা জাতটা এইরকমই। দিয়েও কি শান্তি আছে—শুধু দাও দাও। আজ এ দাও কাল ও দাও। বেয়াই মশায়—থাকেন নেপথ্যে। বেয়ানই বৌমাকে বলেন। বৌমা—তার এসে ফরমায়েস করে।

—বিলক্ষণ বিলক্ষণ আপনারও সাহা!—ভদ্রলোক একটু চমকে উঠেই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ান—তাহলে আপনারও—

শ্রীমতীর মন নেচে উঠল। শ্রীমতী তখন এক পা এক পা করে ভদ্রমহিলার দিকে আগাতে রইল। আর ভদ্রমহিলাও হাসিভরা মুখটি নিয়ে এগিয়ে আসছিল। প্রশ্ন করে—তা আপনারা কদিন হল এখানে এসেছেন ?

ভদ্রমহিলা—তা বেশ, কদিন হয়ে গেল। আমার শরীরটা খারাপের জন্যই বড় ছেলে মনরঞ্জন বলল—বাবা মাকে নিয়ে আপনি একটু পুরী ঘুরে আসুন।

তাই মাসখানেকের জন্য এখানে এসেছি।—ফি:র ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করল—তা আপনারা কদিন হল এসেছেন?

—সবে একরাত পার করেছি।

—তা থাকবেন ত কদিন?

—না থাকা বোধ হয় হবে না। ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কামাই হবে। এ নেহাতই মেয়ের জেদে হয়েছে। এবার স্কুল ফাইনাল দিল। বড় হল। কবে বলতে কবে বিয়ে হয়ে চ:ল যাবে তাই।

—ও এই মেয়েটি? তোমার নাম কি?

—দীপা।

—আর তুমি?

—আমি মন্টু।

—তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

—এবার নাইন হবে।

ইতিমধ্যে দুইভদ্রলোকে অনেক কথা হয়ে গেছে। এবার বিদায় নেবার পালা। বাইরে বেড়াতে এসে এভাবে আর কত সময় নষ্ট করা চলে। 'যাই'—উভয়ে উভয়ের নাম ঠিকানা জেনে নিল। শিবশঙ্কর বলল—একটা মনের মত মানুষ বিদেশ বিভুঁইয়ে পেলাম। আপনার সঙ্গে গল্প করে খুব আনন্দ হল। তাহলে একদিন আমার বাড়ীতে আসুন।

হৃদয় বাবু—তা বেশ বেশ ভাল। গেলেই হচ্ছে। একদিন গেলে মন্দ কি!

—না তাহলে কালকে আমার ছেলে আপনাদের আনতে যাবে। এর নাম অমরেশ।

এটা কিন্তু শিবশঙ্করের তোষামোদী মনবৃত্তি নয়। শিবশঙ্করের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ভদ্রলোক। দাদা জ্ঞান করেই তার এই আমন্ত্রণ জানানো।

আজ সকালে উঠেই শিবশঙ্কর খোকার মাকে বলল—কি গো, কালকে যে কথা মন্দিরের সামনে হয়েছিল সেই মত আজকে কাজ হবে ত?

—হ্যাঁ তা হবে বৈকি। কালকে মানুষকে কথা দিয়ে এলে আজকে আর ব্যবস্থা না করলে চলে!

লাফিয়ে খোকা দাঁড়িয়ে গেল—শুধু কি তাই বাবা, ভদ্রলোককে আহ্বান

করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এক ত মানুষ ভাল তার উপর ওর একটি বিবাহযোগ্য ছেলে আছে।

বাপ মায়ের মন একসঙ্গে নেচে উঠল—খোকারও তাহলে মনে ছুঁয়েছে ত কথাটা। কিন্তু সে কথা আর ছেলেকে কেউই জানতে দিল না।

'তাহলে কি করা উচিত খোকা'—শিবশঙ্কর বলল।—তাদের ডাকার আগে কি ভাবে তাদের অভ্যর্থনা করবে সেই ব্যবস্থা আগে কর।

—আচ্ছা। মা, তুমি আবার এখান থেকে কোথায় গেলে। এস্ বল তবে।

—কি বলব আমার চেয়ে তো ভাল তো তোর বাবা, তোরা বলতে পারবি।

—আচ্ছা মা, তুমি কি বলত, সব বিষয়েই বাবা আমি বলতে পারব? আর তুমি বুঝি কিছু বলতে পারবে না। কি যে তুমি বল না। স্বজাতি অতিথি তাকে কি ভাবে খাতির করতে হয় সেটা আমাদের চেয়ে তুমি বেশী বলতে পারব।

শিবশঙ্কর—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বুঝে দেখ। খোকা কিন্তু কথাটা ঠিকই বলছে। এসব দায়িত্ব মেয়েদেরই নেওয়া উচিত।

শ্রীমতী আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব টেনে নিয়ে বলল—নিশ্চয় ভাতের সময় তাদিকে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে না? আর তা করা উচিত নয়। বিকেলে জল খাবারের সময় চা জলখাবারের ব্যবস্থা করি।

বলেই খোকাকে কি কি প্রয়োজন হবে সমস্ত বলে আদেশ দিল আনতে।

এই ভদ্রলোক কিন্তু বাড়ী আসার পর কয়েকটি কথা স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছ।—মানুষগুলির সঙ্গে আলাপ করে কি বুঝলে?

—যা দেখলাম—মানুষ বলতে আমার কাছে ত ভালই লাগল।

হৃদয় বাবু—শুধু তাই নয় অন্তর ত আছেই, উপর দিয়ে যা মনে হল বড় সত্য আদর্শের পিয়াসী। প্রত্যেকটি কথা ভদ্রলোক যা বলে গেলেন তাতে আমার মনে হয় এরকম মানুষ দেখা যায় না। না আছে আড়ম্বর, না আছে উচ্ছ্বাস। আমিত্ব ত নাই বললেই চলে।

জয়াবতী উত্তর দিল—হ্যাঁ ভদ্রমহিলার সঙ্গেও আমি যা কথা বলে দেখলাম অতি অমায়িক।

হৃ—শুধু তাই নয় তুমি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলে—অনেকের

আমিত্ব থাকে কিন্তু সে এত সুন্দর আবরণ দিয়ে রাখে যাতে কেউ না প্রকাশ পায়। এই ভদ্রলোকের মধ্যে আমি সেই জিনিসটিও খুঁজে পেলাম না। তার মনের শুধু এই ভাব দেখলাম আমি—যা করেছি তা কিছু নয়, অনেক আমার সমুখে এখন পড়ে আছে। এসবের দিকে লক্ষ্য করলে আমি অতি ক্ষুদ্র, নিছক নগণ্য—এই তার ভাব।

জয়াবতী—আমার মনে হয় জান ছেলে মেয়েগুলোর মধ্যেও সেই ভাব

এদিকে শিবশঙ্কর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল—খোকা ও খোকা।

—যাই বাবা।

এদিকে খোকার পোষাক পরা সারা। বেরিয়ে আসতে বাবা বলল—ও তুমি তৈরি হয়ে গেছ। আমি তাই ডাকছিলাম। এবার বেরিয়ে যাও।

এদিকে খোকা বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিবশঙ্কর শ্রীমতীকে ডাকল—হ্যাঁ গো শুনছ, যদিও সাতদিনের ভাড়া করা ঘর, তবুও একটু গুছিয়ে টুছিয়ে নাও যাতে নেহাৎই ধর্মশালা মনে না করতে পারে। দীপা, ও দীপা—

—এই যে বাবা।

—যা তোর মা ওদিকে কি কাজে গেল একটু সাহায্য করছিস ত?

দীপার উত্তরের আগেই দীপার মা-ই উত্তর দিল—সে কথা আর তোমায় শিখাতে হবে না; এ যে তোমারই মেয়ে। আমি বললাম যে—বাইরে থেকে খাবার দাবার আনব। তা ও বলল কি জান—না মা, বাইরের খাবার ভাল হবে না, অথচ বেশী দাম নেবে, ঘরে করাই ভাল। সেই বেলা একটায় উনান শালে ঢুকেছে এখনও বেরবার নাম করে না।

ইতিমধ্যে মন্টু এসে মাকে তাড়া দিচ্ছে—ও মা, আজকে কোথায় যাবে বল না? আজ বেড়াতে বেরবে না?

—সর সর ত। তোর খালি ঐ হচ্ছে। দেখ না আজকে আমাদের বাড়াতে কে আসবে। আমরা আবার কোথায় বেড়াতে যাব!

—বা রে, তাই বলে ওদের আসার জন্য আমাদের যাওয়া হবে না।—মন্টু যেন একটু নাকে কাঁদা আরম্ভ করল।

—আঃ। ওকে বলই না—যাব যাব।—শিবশঙ্কর সহানুভূতি দেখালেন।

—না কেন বলব—ও বোঝে না! দেখ না দিদির সঙ্গে সেই অবধি পিছনে লেগেছে। ফক্কর ছেলে।

এধার থেকে দীপার ডাক পড়ল—ওমা মা, হয়ে গেছে আমার, এস।

—হ্যাঁ যাই। মা রান্না ঘরে গিয়ে দীপাকে হুকুম করল—তুই এবারে যা হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে গুছিয়ে নে যা।

এর মধ্যেও কিন্তু ছিল না শ্রীমতীর স্বার্থ। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রুচি বোধেরই প্রকাশ এ। মেয়ে গুছিয়ে নিয়ে এল। মা-ও তার খাবার দাবারগুলি স্বামীকে ডেকে দেখানো বা বলা সুরু করল। এদিকে মণ্টুকে ডেকে মা বলল—আমাদের বেডিংটা খুলে ভাল যে শতরঞ্চি আছে সেটা বের করে রাখ।

—হঁ্যা যাচ্ছি। তুমি কত আমার কথা শুনেছ। তুমি না আমায় বকেছ, আমি পারব নি।

শিবশঙ্কর—মণ্টু, ছিঃ গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। তোমার মা মা হয়। এই তুমি বুঝি লেখাপড়া শিখছ। তুমি একটা ক্লাশ নাইনের ছাত্র। তোমার মনে নেই যে—ছোটদের গল্পতে সেই যে গ্রামের ছেলে—। তাহলে তোমরা কি শিখছ। যাও এক্ষুনি।

—দেখ না বাবা, মা কোথ্থাও বেড়াতে যাবে না। তবে কি আমরা ঘরে বসে থাকবার জন্য এসেছি এখানে। এই তো দুদিন হয়ে গেল আর মাত্র হাতে পাঁচদিন। আর তাহলে আমরা কবে কোথায় যাব!

—সব হবে, সব হবে। মা এখন যা বলছে তা কর যাও।

দীপা—মা সুটকেস থেকে তাহলে ঐ কাপ প্লেটগুলো বার করে রাখি?

—হঁ্যা রাখ। অনেকক্ষণ তোর দাদা গেছে এবার চলে আসার সময় হয়ে গেল।

মায়ের মুখে কথা শেষ হবার আগেই সামনের দরজায় রিক্সার শব্দ। হাঁক দিল খোকা—মণ্টু, এই মণ্টু দরজা খোল।

মণ্টু তখনও বেডিং খোলার ব্যস্ত। সামনেই দীপা ছিল সেই দরজা খুলতে গেল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই জয়াবতীর চোখ পড়ল দীপার মুখের দিকে।—বাঃ মেয়েটি তো বেশ লক্ষ্মীশ্রী। যদিও সেদিন সে দেখেছিল তাহলেও এমনটি করে যেন চোখে পড়েনি। ভিতরে যেতে মা বাবার আহ্বান এগিয়ে গেল। ছোট দাওয়াটির উপর ইতিমধ্যে মণ্টু শতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়েছে।

বসুন বসুন—শিবশঙ্কর।

এদিক থেকে শ্রীমতী জয়াবতীকে বলে উঠল—ও দিদি আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যে বসুন।—জয়াবতী শ্রীমতীর চেয়ে বয়সে একটু বড়।

—হ্যাঁ এইতো বসছি।

উভয়ের ভাব দেখে মনে হল যেন কত পরিচিত এরা। শিবশঙ্কর বলে উঠল—কৈ চায়ের ব্যবস্থা করলে না।

—হ্যাঁ চা চাপাতে পাঠিয়েছি।

দীপার মা ও জয়াতে বেশ গল্প জমিয়েছে। এদিকে হৃদয় অমরেশের কাছ থেকে অনেক কথাই জানছে। মাঝে মাঝে দু একটির উত্তর শিবশঙ্করও দিচ্ছে, দীপা অল্প সময়ের মধ্যে চা জলখাবার গুছিয়ে নিয়ে পৌছে গেল। সুন্দর তার খেতে দেওয়ার ভাব ভঙ্গি। মেয়েটি যে প্রকৃত বুদ্ধিমতী কর্মী তা তার হাত পা চালাতেই বুঝা যাচ্ছে। হৃদয়ের সামনে প্লেটটি ধরে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে দেখল।—এ সব খাবার দাবারগুলি কে করল; মা লক্ষ্মী? তুমি বুঝি?

দীপা নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল—হ্যাঁ আমি, তবে মা সাহায্য করেছে।

কি যেন একটা দেওয়ার ভুল হয়ে গেছে মা ঝপ করে রান্না ঘরে উঠে চলে গেল।

এদিকে পাণ্ডার আবার প্রবেশ—কোথায় বাবু?

শিবশঙ্কর—এই যে কে? পাণ্ডা ঠাকুর নাকি?

অমরেশ ভাবল সর্ব্বনাশ এই সময় কথা পাতলে তো অন্য কথা হয় না। বাবাকে বলি ওকে বিদায় করতে। সে উঠে বাবাকে বলতে পাণ্ডা বিদায় নিল।

রীতিমত এ স্থান খালি এখন। এরা স্বামী স্ত্রীতে বসে। হৃদয় জয়ার মুখের দিকে চেয়ে শুধু একবার ইসারা করল—মেয়েটি কেমন, বৌ করলে হয় না?

জয়ার মুখখানা একবারে আনন্দে ভরে উঠল। মেয়েটিকে তার আগেই মনে ধরেছে।—ভালই ত কথা, পাত্ত না কেন।

শ্রীমতী—এই যে দিদি। কি বোকা মেয়ে এতক্ষণ দেরি করছে! এখন চায়ের কাপে মুখ দেবেন না এটা কিছু না খেয়ে।

আবার কি—স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে বলে উঠল—এইত এত খেলাম।

—না এটা মেয়ের নিজের বুদ্ধিতেই হয়েছে স্কুলে শিখিয়েছিল কি না সেইজন্য। ওর বড় সখ এটি করে আপনাদের খাওয়াবে।

হৃদয়বাবুর মনে ত আর কোন প্রশ্নই রইল না।—এখন কথা পাতব না বাড়ীতে গিয়ে কথা তুলব!

জয়া—বাঃ জিনিসটি ত বেশ চমৎকার হয়েছে। কৈ কি দিয়ে কি করেছ একবার বলত মা শুনি?

দীপা সরল ভাবে যে যে নিয়মে করেছিল হুড় হুড় করে বলে গেল। অতি কম খরচে জিনিসটি সুস্বাদু হয়েছে। যাক জলযোগ হয়ে গেল।

হৃদয়—কৈ শিবশঙ্করবাবু গেলেন কোথায়?

—হ্যাঁ এই যে আসছি।—শিবশঙ্কর এসে দাঁড়াল—বসুন বসুন।

হৃদয়—তা ভাল আমার তো আর ছেলে সঙ্গে আসে নি যে নিয়ে যাবে। তাই আমি নিজেই বলে যাচ্ছি কালকে সবকে নিয়ে বিকেলের দিকে যাচ্ছেন তাহলে?

—হৃদয়বাবু, কি যে বলেন। ছেলে কার! আপনার ছেলে আমার ছেলে, আমার ছেলে আপনার ছেলে।

কথাটি হৃদয়ের হৃদয় গলিয়ে দিল।

—তা বেশ বেশ। কথাটা তো ঠিকই, কিন্তু কজন সে কথা মনে করে!

—করাটাই বাঞ্ছনীয়, না করাটাই অস্বাভাবিক। কথাটা ভেবে দেখুন দেখিনি আমাদের সকলের পিতা এক কিনা? আমাদের মধ্যে শুধু কেবল কাজেরই ভাগাভাগি, তাছাড়া আর কিছু নয়।

এদিকে জয়াবতী খোকার মাকে জিজ্ঞেস করছে—তা মেয়েটির সম্বন্ধ হচ্ছে কোথায় দিদি?

—কোথায় আর হবে! দু'এক জায়গা থেকে একটু আধটু খবর এসেছে। তা এখনও বেশ জোরদার করে লাগা হয়নি।

শিবশঙ্কর ও হৃদয়বাবুতে বেশ জমে উঠেছে। শিবশঙ্কর বলে উঠল—ছেলের কোথায় বিয়ের সম্বন্ধ আসছে?

হৃদয় সরল মানুষ। অবশ্য তার আগেই একটুকু ইঙ্গিত ভঙ্গিত হয়ে গেছে স্ত্রীর সঙ্গে।—আসছে অনেক জায়গা থেকে তবে এখনও স্থির হয়নি। কেন জামাই করবেন নাকি?

—দাদা কি যেন বলেন আপনি! আমার মত অভাগা লোকের মেয়ে আপনার পায়ে স্থান পাবে—এ কিরকম কথা!

—ভগবান ভগবান। এমন কথা আবার বলে! আমি আবার এমন কি!

শি—না থাক, আর আত্মগোপন করবেন না। সব গল্পই তো আপনার শুনলাম।

—কেন আপনার দিক থেকেই ওজনটা কি কম! বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার।

শিবশঙ্কর চেপে দিল—থাক, আর বলবেন না। ঐ জায়গাটা আপনাকে ভাল করে খুলে জানানো হয়নি। তবে শুনুন।

হ—থাক আর শুনব কি! ছেলে ভাব ভালবাসা করে বোধহয় বিয়ে করেছে?

শিবশঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। অবশ্য আসে পাশে সবাই দাঁড়িয়েছিল।

—আরে থামুন মশায় ও সব আকচারই হচ্ছে, ও নিয়ে আর কি করবেন বলুন।

—দাঁড়ান দাঁড়ান দাদা, কথাটাকে অত হাল্কা করে দেবেন না। ব্যাপারটা একটু জটিল রহস্যময়ই।

হ—কি বাবা অমরেশ তাই না? তোমার বাবা এটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হচ্ছেন।

অমরেশের উত্তরের আগেই শিবশঙ্কর উত্তর দিয়ে বসল—ঘটনাটা শুনুন না, শুনলে বুঝবেন।

বলেই মানিকের আদ্যোপান্ত ঘটনা শিবশঙ্কর বলতে বসল। শোনার পরেও হৃদয় খুব একটা গুরুত্ব দিল না। বলল—ব্যাপার কি জানেন সত্যিকারের ভেবে দেখতে গেলে, অবশ্য আপনাকে আমি আর কি বলব। আপনি তো দেখছি সত্য আদর্শকে খুব গুরুত্ব দেন।

শি—আহা দাদা ও কথা বলছেন কেন আপনি। আমি না হয় দিলাম কিন্তু তাই বলে সবাই মেনে নেবে কেন। আমার এখন ছেলে মেয়ের বিয়ে থা সবই বাকী সেই সব ক্ষেত্রে আমার কি অসুবিধা হবে ভেবে দেখুন তো।

হ—অবশ্য যারা না বুঝবে তারা এটা নিয়ে নানা রকম চিন্তা করবে। কিন্তু বুঝলে চিন্তা করার কিছু নেই। জাত আমাদের হাতেই সৃষ্টি। সত্যিকারের বলতে গেলে কি জানেন, গুণ সে ঈশ্বরেরই দান। সেটা তাঁরই সৃষ্টি। প্রকৃত

যদি গুণবান হয় তবে জাত নিয়ে এমন কি যায় আসে। সেগুলো অবশ্য ক্ষেত্র হিসাবে বিচার করে দেখতে হবে, তাই নয় কি শিবশঙ্করবাবু ?

—দাদা আপনার মত মহৎ সমঝদার কজন আছে। এই তো আমার বিয়ের বয়সী মেয়ে হয়ে গেল সেই চিন্তায়ই ঘুম হয় না। তা না হলে ছেলে আমার এমন কিছু অন্যায় করেনি। তার উপর বৌমাটি যে, যদিও তাকে আমি আজও চোখে দেখিনি বা আচার ব্যবহারেও পাই নি, তাহলেও তার চিঠি পত্রে আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বলেই ঋতার স্কুলের খবর একটু আধটু ছুঁয়ে গেল।

হৃদয় শুনে বলল—ও তাই। বেশ বেশ ভাল। তাহলে আপনার এত চিন্তা ভাবনার কারণ কি।

—চিন্তা তো আমার ঐখানেই বিয়ে থার ব্যাপারে। সকলে তো আর বুঝবে না।

হৃ—আপনি আপনার চেষ্টা করবেন যে বুঝবার সেই বুঝে এগিয়ে যাবে।

শিবশঙ্কর কথাটা শুনে কিছু ব্যক্ত করতে না পারলেও যেন ভিতরে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হৃদয় বলল—তাহলে এবার উঠি।—স্ত্রীকে ডাকল —কৈ তাহলে এস।

জয়াবতী—চলি দিদি।

শ্রী—বিদেশে এসে আপনাদের মত একজনকে পেয়ে খুবই ধন্য হয়ে উঠলাম।

জয়া—ও আমরা বুঝি না।

শিবশঙ্কর অমরেশকে ডেকে বলল—খোকা তুমি তাহলে উনাদের একটু এগিয়ে দিয়ে এস।

কদিন খুব এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো হল। মণ্টুর আর আক্ষেপ করা চলে না। পিতা শিবশঙ্করের লক্ষ্য সবদিকেই। আগামীকাল তারা বাড়ী রওনা হবে। তাই স্ত্রীকে ডেকে বলল—কি গো কালই যদি বেরোতে হয় তাহলে একবার আজ বিকেলে হৃদয় বাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসা যায়।

শ্রীমতীর আপত্তি না থাকায় বলল—তাহলে খোকা, তুমি একবার খবর নিয়ে এস উনারা আজ বিকেলে বেরোবেন কি না।

হৃদয় সামনেই দাঁড়িয়েছিল। অমরেশের সঙ্গে দেখা—কি খবর অমরেশ?

—না, বাবা জানতে পাঠালেন আপনারা আজকে বাড়ীতে থাকবেন না কোথাও বেরোবেন?

—আচ্ছা, কেন তোমরা আসছ বুঝি? বেশ বেশ তাহলে আর কোথাও বেরোব না।

বিকেল গড়াতেই এরা সপরিবারে গিয়ে হাজির হল। হৃদয় এগিয়ে এসে বলল—'আসুন আসুন।' জয়াবতী পাশেই ছিল। শ্রীমতীকে মৃদু হেসে আহ্বান জানাল। ছোট একটা ঘর এরা স্বামী স্ত্রীতে ভাড়া নিয়ে আছে। খুব অগোছালো নয়। মোটামুটি সাজানো, তবে এদিকে ছড়ানো কয়েকটা দামী জিনিস চোখে পড়ল। সকলে মিলে এরা এক জায়গায় বসেছে। জয়াবতী রান্নাঘরে দিকে যেতে ব্যস্ত হল। শিবশঙ্কর বলে উঠল—দীপা তুমি বসে রইলে কেন। যাও একটু আগিয়ে সাহায্য কর।

বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী কথাটা লুফে নিয়ে বলল—ঠিক ঠিক মা, যাও, উঠে যাও। উনি আমাদের জন্ত নিশ্চয় খুব ব্যস্ত হচ্ছেন।

হৃদয় বাধা দিয়ে উঠল—না না ব্যস্ত হওয়ার আর কি আছে।—দীপার উঠা দেখে বলল—বস ত মা তুমি। তোমার আর যাওয়ার দরকার লাগবে না।

শি—না না যাক না।

এদিকে জয়াবতী একা পেরে উঠছিল না ঠিকই তবুও সৌজন্ত দেখিয়ে মুখে বলতে হয় তাই বলল—না না মা, তোমায় কিছু করতে হবে না।

—আপনি উঠুন ত দেখি মায়ের সঙ্গে কথা বলুন।

দীপা সম্পূর্ণ বুঝে নিয়ে তার হাতের কাজ ছাড়িয়ে নিল। সেও যেন আশ্বস্ত হল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দীপার কাজকর্ম লক্ষ্য করে মনে করলেন, বৌ করলে এই রকম বৌ করা উচিত।

ঐ সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে শ্রীমতীর দিকে এগিয়ে গেল—আমার হাত থেকে মেয়ে ত কাজ ছাড়িয়ে নিল।

শ্রী—তা নিক, আপনি বসুন আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলুন ত।

জয়াবতী কথাবার্তা বলছে বটে কিন্তু মন পড়ে রয়েছে রান্না ঘরের দিকে।

যতই বল মেয়েটা নূতন ত, তার উপরে নির্ভর করে পড়ে থাকাটা কি ঠিক হবে। এই ভেবে খানিক বাদে উঠে গিয়ে বলল—উঠ মা অনেক করেছ তুমি।

—কি আর করলাম। থাক আপনি দাঁড়ান না আমি করে নিচ্ছি। আপনি বরং এসেছেন যখন দাঁড়িয়ে দেখুন আমার কোথাও ভুলটুল হচ্ছে কিনা।

—ভুল আর হবে না।

জয়াবতী দীপার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে চা জলখাবার এগিয়ে দিল, এর পর আরও কত মামুলী কথা হল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। শিবশঙ্কর বলল—এবার তাহলে উঠি।

হৃ—তাহলে আপনারা কালকেই রওনা হচ্ছেন?

শি—হ্যাঁ সেইরকমই ঠিক আছে এখনও, আবার কি কোনদিন দেখা হবে।

হৃ—তা বিধির বন্ধন কোথায় কি কার দেখা হয়, না হয় সবই তাঁর উপর নির্ভর করে।

হৃদয়ের মুখ দিয়ে সবই যেন অজান্তে বিধি ব্যক্ত করে দিচ্ছেন। আর সেই শুনে বিচক্ষণ শিবশঙ্কর যেন কোথায় ভরসা পাচ্ছে। শিবশঙ্কর—হ্যাঁ তা তো বটেই।

কদিন খুব বেড়িয়ে হৈ হৈ করে সকলের আগে মণ্টু গিয়ে ঘর ঢুকল। দীপা ওর পিছনে সব সময় লেগেই আছে—কিরে তুই একেবারে পাড়াকে জানিয়ে ঘর ঢুকবি।

মণ্টু ফিরে একটা আস্ফালনেই দিদিকে স্তব্ধ করে দিল—দিদি ভাল হচ্ছে না কিন্তু।

দীপা—তোর ত ঐ কিছু বললে পরে তখনই তেড়ে আসিস।

মণ্টু—তুই ওরকম বলবি কেন?

শ্রীমতী—বলেছে তো হয়েছে কি। তোর গায়ে কি ফোসকা পড়ে যাচ্ছে না কি রে?

অম—এই মণ্টু এদিকে আয়, বেডিংগুলো গুছিয়ে খুলে টুলে নেব আয় ত।

মণ্টু—একক্ষুণি কেন, ওগুলো থাক না কেন কালকে হবে।

অম—নারে কালকে অসুবিধা আছে আমাকে বোধহয় ফার্ষ্ট ট্রেনে বেরিয়ে যেতে হবে।

মণ্টু অবশ্য মেজদাকে ভালই বাসত। মেজদার কথা মত আগিয়ে এসে

সে কাজে লেগে গেল। শিবশঙ্কর গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—কোথায় গেলে অমরেশ? এই রাখ চিঠিখানা পড়বে।

—কার চিঠি, দাদার?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে পড় না।

—লিখবে আর কি ওদের সেই উদ্‌বোধনের জন্য ডাক পড়েছে।

—তা ভালই ত, কবে যাওয়ার কথা বলছে সেইদিন যেয়ে না হয় তুমি উদ্‌বোধনের কাজটা শেষ করে দিয়ে এস।

—বাঃ তা কি করে হয়! মাঝখানে আর দুদিন মাত্র রয়েছে। তা তুমি না সঙ্গে থাকলে! তোমাকেও তো আমার সঙ্গে যেতে হবে।

অম—আমাকে আর কি প্রয়োজন।

—না তা হয় না।

—তাহলে আমি ভোরের গাড়ীতে বেরিয়ে যাচ্ছি, ঐ দিন ঠিক সময়ে তুমি যাবে। তুমি কোন গাড়ীতে যাবে আমি জেনে গেলে সেই গাড়ীর অপেক্ষায় ষ্টেশনে থাকব।

—ঐ তোমার মত ফাষ্ট ট্রেনেই যাব। তাহলে বৃহস্পতিবার ফাষ্ট ট্রেনেই আমি যাচ্ছি।

বেডিং খুলতে খুলতে কথাগুলো হয়ে গেল। অমরেশ মুখ ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়ল—কিরে দীপা তুই আর কখন চা দিবি?

কথাটা শেষ করার আগেই দেখে দীপা শিবানীর সঙ্গে খুব গল্প জমিয়ে দিয়েছে। জের টেনে বলে—ও তুইও দেখছি ঠিক সময়ে জুটে গেছিস। মেয়েগুলো সব একরকমের গল্পবাগীশ। তুইও ত একটু চা করে দিতে পারিস।

দীপা—আহা তুমি বুঝি একাই কাজ করছ। আমরা আর কিছু করছি না। কদিন ছিলাম না ঘর দোর সব কি রকম নোংরা হয়েছে জান।

মা খুবই ব্যস্ত। সাতদিন বাড়ী ছিল না। ছেলেমেয়েরা কি খাবে সেই চিন্তায় সে ব্যস্ত ছিল। শিবানী কিছু না বলেই চা করতে চলে গেল।

—মেজদা চা হয়ে গেছে এস—শিবানী ডাকল।

কিন্তু মেজদার আর পাত্তা নেই।

—দেখছিস দীপা চা তৈরী এখন আর মেজদার দেখা নেই।

দীপা বলল—তাহলে তুই দে আমি দিয়ে আসি, নাহলে তুই দিয়ে আয়।· নিশ্চয় মেজদার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে।

শিবানী দীপার দিকে চা-টা এগিয়ে দিয়ে বাকী কজনের চা ছাকতে গেল। দীপা বাইরের ঘরে ঢুকে বলল—ও শ্যামলদা এসেছেন বলেই মেজদা যায় নি।

অম—তা আমার চা নিয়ে এলি শ্যামলের চা কোথায় ?

—আমি কি জানি যে শ্যামলদা এসেছে।

শ্যা—বেশ, চা আনবি আন তা বলদেখিনি পুরীতে কেমন বেড়ালি টেরালি ? কেমন দিন কাটল ?

—আচ্ছা বলছি। শিবানীকে একবার হেঁকে বলে দিই। নইলে ও চায়ের পাঠ তুলে দেবে। শিবানী, এই শ্যামলদা এসেছে, আর এক কাপ চা দিবি।

শ্যামলের কয়েকটি কথার উত্তর দিয়ে দীপা বেরিয়ে গেল। শিবানী চা নিয়ে ঘরে ঢুকল ।

অমরেশ শিবানীকে জিজ্ঞেস করল—কি রে পড়াশুনা কেমন হচ্ছে ? না আমিও সরে গেছি আর তোরাও গোল্লায় যাচ্ছিস। এবার তোর ফাইনাল পরীক্ষা।

শিবানী—তা আর মোটেই নয়। তুমি যেমন যেমন দেখিয়ে দিয়ে যাও সেই রকম লক্ষ্য নিয়ে চলবার চেষ্টা করি।

অম—হুঁ। এই দুতিন ক্ষেপ আমারও এমন অবস্থা হয়েছে না এখানকে এলে তোদের মোটেই লক্ষ্য নিতে পারি না।

এতক্ষণ শ্যামল চুপ করে ছিল এবার বলে উঠল—চা-টা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। কে করেছে চা-টা ?

অম—নিশ্চয় এই আসামী, সামনেই রয়েছে।

শি—ভাল না ছাই।

অম—না রে ও খুব ভাল চা করতে পারে। শ্বশুর বাড়ী লোক না ওর চা খেয়ে চা করে রোজ খাওয়ানোর লোভে বৌকে আর এ মুখই হতে দেবে না।

শি—আচ্ছা থাক খুব হয়েছে। দাদারাই এই কাজটা করুক না। বোনকে আর ও মুখ হতে দিয়ে কাজ নেই।

শ্যা—ওরে বাপ। তাই আবার হয় না কি! মা-টার মুখে সব শুনেছি তো সমস্ত বোন মাসেই গলগ্রহ।

অম—যা বলেছিস ঠিক।

শি–আহা গলগ্রহ হবে কেন। ও ছাড়া আর কি পথ নেই।

অম–উঁ হু, কোন পথই নেই।

শি–এঁ্য নিজেরা বেটাছেলে হয়ে এসেছে বলেই একবারে মাথা কিনে বসেছে, বাবুদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। আর আমরাই যত আপদ।

শ্যা–তা বলছ কেন গৌন, গলগ্রহ না হলেও অন্তত দুর্ভাবনার তো বটেই।

শি–তোমরা বুঝি নয়।

অম–মোটেই না আমরা চিন্তা দূর করি, চিন্তার কারণ হইনা।

ওদিক থেকে দীপা ডেকে উঠল–ও শিবানীদি, শিবানীদি।

দীপা তার শিবানীদিকে মাঝে মধ্যে শিবানী নাম ধরেও ডাকত, এটা নিতান্তই তার আবদারের ছিল। শিবানী উত্তর দিল–হ্যাঁ যাই। মেজদা, শ্যামলদা আসি।

দীপা প্রশ্ন করে–কিরে মেজদা বুঝি পড়ার কথা জিজ্ঞেস করছিল?

আজ বৃহস্পতিবার। অমরেশ সকাল সকাল উঠে তৈরী হয়ে নেয়। একটু পরে বাবা এসে পৌছবেন। যথাসময়ে সে ষ্টেশনে গিয়ে বাবাকে দেখতে পেল। ট্রেনটা আজ একটু বিলম্বে পৌছানোয় অল্পবিস্তর হয়রানি সকলেই হয়েছে। যাই হোক সোজা তারা মানিকের ওখানে গিয়ে উঠল।

বাড়ীর দরজায় ধাক্কা পড়তে শ্বশুর আর বুঝতে বাকী রইল না। মানিক অস্থির ভাব নিয়ে খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিল। যেমন শ্বশুর মধ্যে আনন্দ ছুল, তেমনি বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল—কি জানি সামনে গিয়ে পৌছিলে কি করবেন। নিজের মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে তার উদ্দেশ্যে এই কথাই জানাল–

হে ঈশ্বর, তুমি সত্যের উত্তর দাও।
আশা করি দয়াময় ঈশ্বর তুমি।
সবার কাছে হই না অপমান
তোমার কাছে হয়ে থাকব
তোমার অন্তরের মনি।

হে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ কর তুমি
না করি যেন কর্মে অবহেলা
রাখিতে পারি স্মরণ যেন
তোমার আদর্শ বাণী।
তুমি করুণাময় আমি জানি।

কুলবধূর রূপ নিয়ে ঋতা ধীরে ধীরে শ্বশুরের সামনে আগিয়ে এল। তখনও শিবশঙ্কর বাইরে। তার আগেই অবশ্য অমরেশ শিবশঙ্কর বলে ভিতর থেকে জানতে পেরেছিল। ঝাপ দিয়ে বলে উঠল—যাই বাবা। প্রথম স্বরে শিবশঙ্কর যেন কেমন একটু হচকচিয়ে গেল। অমরেশ অবশ্য এ ধাপ আগেই পার হয়ে গেছে। সেইজন্য তার আর কিছু ভাবার ছিল না। মনে হয় শিবশঙ্কর এটা ভুলই করল। এরকম ধরনের আন্তরিকতা সে দেখেছে বলে মনে হয় না। তাই তার একথা ভাবা আশ্চর্য নয়। ভাবল তার জনক পিতা এসেছে বলে "যাই বাবা" বলে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু তা নয় ঋতা ঠিক শ্বশুরকেই 'বাবা' বলে ডেকেছে।

কপাট খোলর সঙ্গে সঙ্গেই—

*[ দারুণ ভাব ও ঘোর ঠেলে মাকে এগোতে হচ্ছে। দেখে বেশ বুঝা যায়। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মা আটকে দেন। গাড়ী অচল হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দারুণ সচল মায়ের ইঞ্জিন। তবে অবস্থার চাপে মাকে ব্রেক করে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। এ না হলে এমন বাস্তব ও আধ্যাত্মিকের —তথা সংসার ও সাধনার সমন্বয় হয় কি করে? ]*

শিবশঙ্কর উত্তর না দিয়েই শুধু চেয়ে দেখল। কি বলবে, তার যে মুখে ভাষা জোগাচ্ছে না। আর এ যে ঋতা, উত্তর অপেক্ষা না করেই বলল—ঠাকুরপো হাতে ওটা কি, নামাও। হাত পা ধুবে চল।

শ্রদ্ধাপূর্ণ মন নিয়ে ঋতা ভূমিষ্ট হয়ে তার শ্বশুর মশায়কে প্রণাম নিবেদন করল। ভদ্রলোক আরও যেন হচকচিয়ে গেল—কে বলে সে চাকুরে, শিক্ষিত মেয়ে! যার মধ্যে এত গূঢ় বধূ রূপ—সে কেমন করে অফিসে কাজ করে! যাক আমার যে ধারণা ছিল তা বুঝি পাল্টিয়ে গেল। এই বুঝি প্রকৃত আদর্শের রূপ।

এই কথাই মুহূর্তে চিন্তা করেই বলল—"থাক থাক মা।" কে যেন তাকে মা বলতে বাধা করাল। এই কি সত্য!

[ আর না বলব নি। অনেক বলে দিয়েছি। এই নাও তোমাদের গ্রাস—বলেই মা বাস্তব বোধে দাঁড়িয়ে গেলেন। ]

[ ১০ই আশ্বিন, ১৩৭৫। রাত প্রায় একটা। ভাইয়েরা মিলে রাতপাহাড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি মায়ের জানালায়। তিন রাজ্যের ব্যাখ্যায় মা বিচিত্র সমাধিতে অনেক কথা বলেন। পরে পরে বিস্তারিত আরও অনেক কিছু জানাতে পারি এ প্রসঙ্গে। এ সব তথ্য শুধুই তত্ত্বে ভরা। আমরা সদ্য তা প্রকাশের চেষ্টায় আছি। ]

ঋতা—বাবা, আজকে ট্রেন লেট ছিল? এত দেরি হল কেন?

হতভম্ব মানিক।

[ সব ব্যাপারটা কি রকম যেন বুঝে গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। সুবোধ ত আমাদের ঐ পর্যন্তই। অগত্যা মায়ের শরণাপন্ন হতে হল। মা বলেন, "শিবশঙ্কর যেয়ে দাঁড়াতেই ঋতা যে কথাগুলো বলল, সেই কথাগুলো কার, তোরা বুঝতে পারছিস নি?"

"আমি বাস্তব রাজ্য ছেড়ে বহুদিন হল আধ্যাত্মিক রাজ্যে চলে এসেছি। তাহলে এই সব উপন্যাস আমার কাছে অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। আমি নিজেই এই উপন্যাসের একজন ব্যক্তি ছিলাম, মনে কর না। তাহলে এবার সেই উপন্যাস তোদের সখে তোদিকে লিখে জানাচ্ছি। তাহলে দেখ, আধ্যাত্মিক রাজ্য থেকে ভাব রাজ্যে যাচ্ছিলাম। ভাব রাজ্যে আমাদিগে উপলব্ধি করতে হয়। হঠাৎ সেখানে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে একবার ঋতার জিভে ঠোঁটে প্রকাশ করলাম—'বাবা আজকে কি ট্রেন লেট ছিল?.......' এইটি বাস্তব। ]

মানিক তো দেখেশুনে হচকচিয়ে গেছে তার আর বলার মত কিছু ছিল না বলে সেও এইটুকুই শুধু বলল—আজকে ট্রেন লেট ছিল—না বাবা ?

—হ্যাঁ লেটই ছিল বটে।

এদিকে ঋতা যে মানিকের স্ত্রী সেকথা একেবারেই ভুলে গেছে। যেন মনে হয় শিবশঙ্করের একটি বিবাহিতা কন্যা। অথচ আচার ব্যবহার তার বধূরূপের অভাব কোথাও নেই। যাক শ্বশুর দেওরকে জলযোগ করিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরবার ব্যবস্থা করল।

—তাহলে ঠাকুরপো, তুমি একটা ট্যাক্সি ডাক।

মানিক—ট্যাক্সিতে আমাদের এতজনকে নেবে তো ?

ঋতা—হ্যাঁ বাবা আমাদের এই কজন ট্যাক্সিতে ধরবে না ?

শিবশঙ্কর—হ্যাঁ কজন দেখ না।

—আমরা চারজন, ড্রাইভার পাঁচজন আর মহেন্দ্র।

—মহেন্দ্র !

—ও সেই কথাটাতো আপনাকে বলাই হয়নি। মহেন্দ্র না আপনার ছেলে, আমার আফিসের পিয়ন। কি বলব বাবা আপনাকে, এরকম মানুষ দেখা যায় না। আপনি জানবেন আপনার ছেলে বৌয়ের সুরোদ না ঐ মহেন্দ্রের জন্যই।

শিব—কেন ?

—একটা কথা ঠিক নয় বাবা আদর্শের সঙ্গে অর্থ দরকার হয়। সেই অর্থই মহেন্দ্র দিতে এসেছে। সে অর্দ্ধেক অংশের অংশীদার কিন্তু ঠিক পুরানো ভৃত্যটির মত আমাদের কাছে থাকে, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।

মানিক তার আগেই বলে বসল—হ্যাঁ বাবা আপনার বৌমা যে কথা বলল সবই ঠিক। এমন লোক আর দেখা যায় না।

অম—হ্যাঁ দাদা, তা এর সর্ত্তটা কি ? এ যে এত করছে ?

মা—না অমরেশ, একথা শুনলে হযত হচকচিয়ে যাবে—শর্ত বলে এর একটা বিশেষ কিছু নেই। দেওয়াটাই এর আনন্দ।

শিবশঙ্কর বিশেষ কিছু না বলে শুধু বলল—দেখ ফলনেই পরিচয়। যে ব্যবহার দেওয়ার জন্য সে আগিয়ে এসেছে তোমরাও সেই ব্যবহার দেবার জন্য প্রস্তুত থেকো।

মহেন্দ্র এসে দরজায় দাঁড়াল—বাবু, বাবা এসেছেন? কেন, সময় ত আর বেশী নেই।

কথাটা শিবশঙ্করের কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন কেমন বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে পিছনে চেয়ে দেখল—তাহলে কি সেই এসেছে।

মানিক উঠে গিয়ে কপাট খুলে দিয়ে বলল—হুঁ। মহেন্দ্র বাবা অনেকক্ষণই এসে গেছেন। তোমার জন্তই আমরা অপেক্ষা করছি।

—তা কৈ বাবা? তার বুড়ো ছেলের সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে চলুন বাবু।

শিবশঙ্কর উঠে তখন দাঁড়িয়েছে। মহেন্দ্র দু পা এগিয়ে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিবশঙ্করকে প্রণাম করতে তিনি যেন স্নেহ গদগদ হয়ে—থাক থাক বাবা, আমায় আর প্রণাম করতে হবে না, বস।

এদিকে মানিক খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। খোকার ট্যাক্সি আসতে যেন দেরী হচ্ছে।

মহেন্দ্রর সঙ্গে শিবশঙ্কর দু'একটা হাল্কা কথা বলছে। মানিকের কথা কানে যেতেই বললেন—তাই তো ওর দেরী হচ্ছে খুব।—বলতে বলতেই ট্যাক্সির হর্ণ শোনা গেল।—যাক গাড়ী এসে গেছে।

মানিক—নাও তাড়াতাড়ি করে সব গুছিয়ে বেরিয়ে পড়। আমাদের ফিরতে কিন্তু দেরী হতে পারে; যার যা খাওয়া দাওয়া সব ঠিক ঠিক হয়ে গেছে ত? মহেন্দ্র নিশ্চয়ই মোটা জল খাবার খেয়ে বেরিয়েছ।

—আর আমাদের কথা বাদ দেন বাবু। আমাদের খাওয়া দাওয়া! যখন যা পাই তখন তাই খাই।

মানিক—খোকা, বাবার কিন্তু আজ সারা দিনে ভাত খাওয়া হল না।

ঋতা—চিন্তা করার কিছু নেই, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখে বেরোচ্ছি। এসে গরম মাছের ঝোল ভাত বাবাকে রান্না করে দেব।

মানিক মনে মনে ভাবল—ব্যাপার কি। স্পর্দ্ধা তো ঋতার ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। হলই বা কুলিন ব্রাহ্মণ, তাই বলে একেবারেই ভাত! জানি নি বাবা, সবটাই তো ওর স্পর্দ্ধার উচ্চ ধাপ দেখতে পাচ্ছি। যাক যা ভাল হয় করবে।

গাড়ীতে সকলে মিলে এক সঙ্গে যেয়ে চাপল। ঋতা লক্ষ্য নিয়ে ওর মধ্যে

এমন ভাবে জায়গা করল—মাঝে বাবা একদিকে অমরেশ একদিকে নিজে গুছিয়ে চেপে বসল। যাক নানারকমের গল্প সুরু হল। উত্তরা উত্তর সকলেই কিছু কিছু দিতে রইল। গল্পের সূচনা বা বলিষ্ঠ ভাব অমরেশ আর ঋতাতেই চলতে রইল। মাঝে মাঝে কোথাও ঋতা হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা বুঝলে আগে ভাগে সে বাবাকে স্বাক্ষী করে বসে—আচ্ছা বাবা আপনি বলুন ত ঠাকুরপোর এ তর্ক মেনে নেব কেন।

উত্তরে শিবশঙ্কর বলে—তা তো ঠিক কথাই, মেনে নেওয়ার না হলে মেনে নেবে কেন! তবে সেটা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।

যাক গাড়ী এসে যথা স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে সকলে নেমে এগিয়ে গিয়ে উঠল। যথারীতি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধনের কাজ সুরু হল। বামুন ঠাকুর আগেই পৌঁছে গেছেন। সমস্ত বুঝে নিল। ঋতা গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল। প্রতিটি কর্ম তার গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। বামুন জিজ্ঞেস করল—তাহলে সংকল্প হবে কার নামে? সকলে সমস্বরে বলে উঠল—বাবার নামে। শিবশঙ্কর আগাগোড়া দাঁড়িয়ে তার পুত্রবধুর প্রতিটি কর্ম লক্ষ্য করছিল। শুধু তাই নয় পুত্র মানিকেরও আব ভাব লক্ষ্য করে বিচক্ষণ সুদক্ষ শিবশঙ্কর যা বুঝল ছেলে তার কিছু অন্যায় করেছে বলে মনে হল না। অবশ্য আগাগোড়া শিবশঙ্কর এই কথাই চিন্তা করে এসেছে। সেটা চোখে দেখার পর সে আরও নির্ভুল বলে বুঝল। মহেন্দ্র দিনের পর দিন পরিশ্রম করে সমস্ত গুছিয়ে রেখেছে। যেখানে যে ঘরে যেমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার সেখানে সেই সেই মত সাজিয়েছে। তবে প্রত্যেকটি কাজের আগে এদের স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছে।

ওগো বধূরাণী তুমি গুণমণি
ধন্য হোক জীবন তোমার
পূর্ণ হবে কর্ম জানি।
দাঁড়াবে তোমার আসে পাশে
দাঁড়াব এসে জানি আমি।

সত্যের কাঙ্গাল বলে
কেঁদেছিনু গোপন করে;

শুনেছিলেন বিধাতা।
তাই গৃহলক্ষ্মী হয়ে তুমি
এলে আমার বধূমাতা।

গড়ে উঠুক চারিদিকে,
ভরে যাক'আদর্শেতে।
থাকবে না আর
কাঙ্গাল কেউ তাহলে।
চিনব মোরা সবাই তখন
ছোট বড় এক হয়ে—
গড়েছিল কে মোদেরে।

যাক শিবশঙ্কর বক্তব্য যখন লিখে চলেছে তখন সকলে সেইদিকে এক দৃষ্টি নিয়ে খুব স্থির মনে লক্ষ্য করছে। প্রণবেশ তার বাবাকে নিয়ে যথাসময়ে এসেছিল। তারাও এ সময়ে উপস্থিত। ঋতা কিন্তু'এইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে কবিতাটি মনে মনে পাড়ে চলেছিল। শুধু এই কথাই সে তখন ভাবছিল—'হে ঈশ্বর যে ঋতা ছিল সে ঋতা হারিয়ে যেয়ে নূতন ঋতার আবির্ভাব হয়। তোমার কাছে আমি এই প্রার্থনাই করি—তুমি যেন কাঙ্গালের এ দান কেড়ে নিও না।' তার চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে।

শিবশঙ্কর লেখা শেষ করে যখন নেমে দাঁড়াল—তাহলে এবার আমার কাজ হয়ে গেছে। তোমরা যথানিয়মে কাজ করে চল।

ঋতা তখনই পায়ের উপরে মাথাটি রাখে। অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুটি রীতিমত শিবশঙ্করের পা দুটি ভিজিয়ে দিল। কিন্তু সে মাথা আর তোলে না। শিবশঙ্কর বলে উঠল—আচ্ছা মা এবার উঠ, আমরা আসি।

ঋতা— ওগো পিতা বল তুমি
ছাড়িব না চরণ দুটি।
ক্ষমা কর দয়া কর
বধূরূপে কর গ্রহণ
আমারে তুমি।

জানি আমি কাঙ্গাল অভাগিনী।
চিনি না ঈশ্বর;
স্মরণে ডেকেছিনু সদাই আমি।
করেছিলেন দয়া বলে
বুঝি তাই বারে বারে।
পতিরূপে পেয়েছিলাম
তোমার সন্তানেরে আমি।
পিতা আমার তুমিই জানি।
আমার কাছে তুমি ঈশ্বর
মনে মনে সদাই ভাবি
তাই গো আমি।
নিয়ে চল সঙ্গে করে।
যেতে চাই শ্বশুরালয়ে,
পেতে চাই মাকে আমার।
বিফল জীবন করছি যাপন।
নারীর জীবন ধন্য তখন
যদি পারি করতে
আপন সবারে।

ঋতার এই প্রণাম আবেদন সকলেই স্তব্ধ হয়ে দেখছিল বা শুনছিল। এর মধ্যে কেউ কখনও তার বেদনা ভরা বাণীতে চোখের জল আটকে রাখতে পারে না। শিবশঙ্কর এই কথাই শুধু ভাবছিল তখন, আজকে যে মন নিয়ে যে ভাব নিয়ে আমার কাছে বধূরূপে এগিয়ে এসেছে এর কি প্রয়োজন ছিল। পেটে বিদ্যা শিক্ষিত রোজকাগী স্বামী, আমাদিকে নিযে না মেলামেশা করলেই কি নয়। ঠিক তার পরেই ভাবতে সুরু করল—এরই নাম আদর্শ। এরই নাম সত্য। সব থেকেও সবকে সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আজ তার এ মনবৃত্তি কেন? প্রকৃত সত্য আদর্শের রূপ ঠিক এই রকমটিই হয়। কিছু দূরে ঋতার বাবা দাঁড়িয়েছিল। শিবশঙ্কর তাকে দেখে বেশ বুঝতে পারল—বৌমায়ের বাবা। আহা বেচারা যেন কত অপরাধই করেছে। তাই সে অপরাধীর মত অত দূরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কৈ বিচার করে দেখলে তো মনে এই দাঁড়াচ্ছে—অপরাধ,

কেন সে অপরাধকরবে। মেয়ে বড় হয়েছে তার বিয়ে দিতে হবে। ছিল না তার অর্থ, কিন্তু অর্থ ছিল না বলে তার মেয়ের জন্য শিক্ষিত সুপাত্র চিন্তা করাটা কি অন্যায়। দিতে না পারুক চিন্তা করতে তার দোষ কি! নিশ্চয় তার চিন্তা গভীরে অর্থপূর্ণ ছিল। যার ফলে সার গাদাতে পদ্ম ফুটল। তাহলে মোটেই সে অপরাধী নয়। ,

এই পাঁচ কথা চিন্তা করতে করতে সামনে আগিয়ে যেয়ে বলল—'এখান থেকে আপনার বাড়ীটা কত দূরে ?' শ্বতার বাবার যেন মনে হল আকাশের চাঁদও যেন এর চাইতে দূরে। এইরকম ধরণের সৌভাগ্য চিন্তা করে ভয়ে তার গলাটা কাঁপতে রইল। ভূমিষ্ঠ হয়ে শিবশঙ্করের পায়ের উপর প্রণাম করতে গেল। শিবশঙ্কর ব্যস্ত হয়ে তার হাত দুটি ধরে—'থাক থাক ও কি করছেন আপনি' – বলে তাকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করল। প্রণবেশ পায়ের উপর মাথা রেখে ভক্তিপূর্ণ মন নিয়ে দিদির শ্বশুরকে প্রণাম করল শিবশঙ্কর বুঝল—সত্যিই এদের বংশটা অমায়িক।

—তাহলে এখন চলি।

—না না, কিছু জলযোগ করে বাড়ীতে যেয়ে তারপরে যাবেন। এখনই কি উঠছেন ! বৌমা, তোমার বাবা চলে যাচ্ছেন।

—যাক না বাবা, আর বাবা থেকে কি করবে !

শিবশঙ্কর—এ কি তোমার ভদ্রতা হল মা ? অতিথি দুয়ারে এলে তাকে অভ্যর্থনা না করে ছেড়ে দেওয়াটা কি যুক্তি সঙ্গত !

—না বাবা, তার জন্য নয়। এখান থেকে আমরা বাড়ী পৌছে যদি অভ্যর্থনা করে ছাড়ি তাহলে বাড়ী ফিরতে বাবার রাত হয়ে যাবে। ওখানে দেখা শুনা করবার তেমন কেউ নেই।

শি—তা না হয় একদিন একটু রাতই হবে তাতে হয়েছে কি! এটা যে না হলে ভাল দেখায় না।

নিখিল—ভাল দেখায় না—কি বলছেন আপনি! আমাদের মত চুনোপুঁটিকে নিয়ে অত চিন্তা করবেন না আপনি।

—ছিঃ ছিঃ ও কি কথা বলছেন ; মানুষ সবাই। যাক আপনার অসুবিধা হলে অবশ্য কিছু বলতে চাইনি।

—তাহলে আমরা যাই।

উদ্বোধন পর্ব শেষ হলে একে একে অতিথিরা সব বিদায় নিল। সরকারের তরফ থেকে যারা যারা এসেছিল এবং মানিকের অফিসের উপর মহলের কয়েকজন এদের প্রচেষ্টার খুব প্রশংসা করল। ঋতা, মহেন্দ্র, মানিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে সব সার্থক করে তোলে। সকলকে পাঠিয়ে এবার এরা যাত্রা সুরু করল। ঘরে ফিরে কোনমতে পোষাক পাল্টে ঋতা ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের উপর। তাড়াতাড়ি উনান ধরিয়ে, ভাত চাপিয়ে এদিকে এসে সকলের রাতে শোয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হল। শিবশঙ্কর এতক্ষণ ঠায়ে বসে খুটিয়ে লক্ষ্য ও বিচার করছিল। ওদিকে দুভাই স্কুল সম্পর্কেই পাঁচটা কথা আলোচনা করছিল। শিবশঙ্কর যত দেখছে তত তাক খেয়ে যাচ্ছে। আর মনে মনে শুধু এই কথাই ভাবছে—শ্রীমতীর কাছে কি জাতটাই এত বড়.হয়ে উঠবে। গুণ কি সে একেবারেই অস্বীকার করবে। তা কি করে হতে পারে! নিশ্চয়ই তা হবে না। শ্রীমতী যে আমারই হাতে গড়া। সেও সত্য আদর্শকে ঠিকই ভালবাসে। তা না হলে আমার সায়ে সায়, আমার রায়ে রায় হাসি মুখে এই তিরিশ বত্রিশ বছর কি করে দিয়ে এসেছে। তারপরে আর এক দিক দিয়েও তো বোঝা যায়—আসন্ন প্রসবা তাকে আমি ছেড়ে দেশের কাজে বেরিয়ে যাই। যদিও আমার চাইতেও জ্ঞানী গুণীর কাছে রেখে গেছিলাম—আমারই মা। কিন্তু ফিরে আসার পর যখন আমি শ্রীমতীর কাছে যাই তখন তার মনে এতটুকুও বিষন্ন ভাব ছিল না। উপর দিয়ে তার কাছ থেকে আমি আনন্দই পেলাম। সেই শ্রীমতী তো, তবে আজ সে মেনে নেবে না কেন! না না হতেই পারে না। এটা আর কিছু নয়—দূরে থেকে বহু রকম চিন্তাই হয়। যেমন মাটীর প্রতীমা দেখলে ইনি ঈশ্বর এই কথাই বলে প্রণাম জানানো হয়, কিন্তু প্রকৃত তাকে যে দেখার বা জানার ইচ্ছা করে তখন এই কথাই কি মনে হয় না—প্রতিমাটি আর কিছুই নয়। যেমন ফুল বেলপাতা পূজার উপাচার তেমনি প্রতিমাটিও ভক্তি ও ধরত্তির উপচার। তাই নয় কি? এই রকম নানা কথাই শিবশঙ্কর মুহূর্তের মধ্যে ভাবা সুরু করেছে।

ছুটে এসে কোলের কাছে দাঁড়াল পুত্রবধু—বাবা ও বাবা, না খেয়ে ঘুমোবেন না। আমার সব হয়ে গেছে। এবার আসন পাতব তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম। শিবশঙ্কর উত্তর দেবে কি স্তম্ভিত হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—তাহলে খাওয়ার যোগাড় করি ?

শি—এরা সব কোথায় ?

—ঐ তো দু'ভাই মিলে ওখানে বসে স্কুল সম্বন্ধে কথা বলছে।

শিবশঙ্কর মনে মনে ভাবল—এমন করা নিখুঁৎ বধূরূপ যার সে স্কুলের শিক্ষিকা হবে! উঃ এ ভাবলেও যেন কেমন লাগে।—তাহলে ওদিকেও ডাক। আর সময়ও ত আছে। অমরেশকে বল ত বৌমা। খাওয়া দাওয়া করে দিব্যি আমরা বারটার গাড়ীতে বেরিয়ে যেতে পারব।

ঋতা চমকে উঠল—না না কোনমতেই তা হবে না। আজ আর যেতে দিচ্ছি না।

—কেন মা, কাজ ত যা হবার তা হয়েই গেল। মিছে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় ?

—সময়! এতদিন পর একদিন আপনাকে পেয়েছি। আপনার কাছে আমি হয়ত খুব ঘৃণিত বা তাচ্ছিল্যের বস্তু। কিন্তু এ কথা কি ঠিক নয় বাবা যে আমার কাছে আপনি আজকে কত বড় ভক্তি ভালবাসার বস্তু। আজ আমি পথে পড়েছিলাম আপনার ছেলে আমায় উদ্ধার করেছে; তারই পিতা আপনি।

শিবশঙ্কর এমত অবস্থায় কি করে পা টেনে বের করে। বেরতে গিয়েও সে পারল না। শুধু এই কথাই ঋতার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—বৌমা তুমি সবই জান সবই বোঝ, তাহলে এরকম কথা বলছ কেন ? এ যদি ঘৃণিত হয় তাহলে প্রকৃত ঘেন্নার জিনিসকে কি বলবে ? সেইজন্য তোমায় আমি বলি—এ ধরণের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না।

—না বাবা, ঐ হল আর কি।

ঋতা সকলের খাওয়ার ঠাঁই এক জায়গায় করেছে। শিবশঙ্কর লক্ষ্য করল—তার দিকেই ঋতার যেন লক্ষ্যটা বেশী। হঠাৎ শিবশঙ্করের মনে ছুঁয়ে গেল—তবে কি আমার মন ভিজানোর জন্য এটা করছে! ছিঃ ছিঃ এ কার সম্বন্ধে কি ভাবছি! যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সে ঠিকই করছে, আমি যে সবার বড়—পিতা। তার উপর ঋতার শ্বশুর। সেই হিসাবে কৈ সে তো বাড়াবাড়ি করে না। এ রকম হলেই এর সম্বন্ধে অনেক কিছুই প্রশ্ন মনে ছুঁত।

খাওয়ার পর শিবশঙ্কর বিছানায় গিয়ে বসল। ঋতা আগেই সব গোছগাছ

করে রেখেছিল। তার যাতে একটুও না কষ্ট হয় সেদিকে শ্বতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কোয়াটারে তো সব জিনিস স্বচ্ছ ছিল না। দুজনের সংসার মাত্র। বুদ্ধিমতী শ্বতা সে যে আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। শিবশঙ্কর খাটের ওপর বসে আছে। শ্বতা কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—বাবা, আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি আপনার মশারিটা ফেলে দিই।

শিবশঙ্কর বলে উঠল, না বৌমা, অনেকখানি রাত হয়ে গেল তুমি এবার খেয়ে নিগে যাও। আমাদের চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম তোমার হয়েছে। আমরা কলমের কথাই চিন্তা করি। তোমার কলম খুন্তি দুইয়ের কথাই চিন্তা করতে হয়। পাশ দিয়ে আছে অতৃপ্তির প্রশ্ন।

সারাদিনের কর্ম ও কথা ভাবতে ভাবতে শিবশঙ্কর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। তার চেতন ও অবচেতন মনে কত কথাই না খেলে যায়।

এই শুভক্ষণ শুভদিনে
দাঁড়াল সমুখে আমার
কে ইনি—কে এখানে!
গলাতে অঞ্চল টেনে
শুধাই আমি—কে গো শুনি?
গলাতে অঞ্চল টানি
বধূরূপ ধারণ করে
পড়িনু চরণ পরে।
এসেছেন শ্বশুর মশায় জানি;
গুরু হতে গুরু ইনি।
নিতে হবে চেয়ে আমায়
ভিক্ষা দাও চাহিছি চরণে
তব পুত্রবধূ আমি।

জানি করিবে না স্বীকার তুমি।
ছিলে না ক্ষেত্র স্থানে
দেখ নাই তুমি সেখানে।
আজ পরিচয় তাই দিতে চাই

লহ গো করুণা করে
আমারে মেনে।

আমি পুত্রবধূ
তব চরণের দাসী জেনে
কর ক্ষমা, ক্ষমা কর আমায় তুমি ;
দয়া কর আমি অভাগিণী
অনাথ জনে।
আমি অভাগিণী অনাথ জেনে।
দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে,
কেউ ছিল না আমার বলি,
তব পুত্র, দয়ার যে তার
নেই তুলনা ;
দিল স্থান তারই
হৃদি মাঝখানে।
ক্ষমা কর আমি অভাগিণী
অনাথ জনে।

স্তম্ভিত হয়ে রহিনু দাঁড়ায়ে।
আমি মানিকের পিতা
কে বলে আমায় এখানে।
নও মা তুমি পুত্রবধূ।
মাগো, কুলের কালি—মা, প্রতিমা
তব তুলনা নাই যে গো মা।
জননী আখ্যা দিনু মা
তোমারে আমি।

ক্ষমা করো—ওগো মা,
পুত্র বলে নাও মা কোলে
মা বলে ডাকব তোমায়।
মা, সত্য আদর্শের
মাগো ছিনু ভিখারী—
ছিনু মা কাঙ্গাল;
তারই উত্তর দিলে মা,
ওগো মা ওগো মা।

ও পিতা—
কেন বল তুমি অমন করে!
কোথায় জননী, যাব সেথায় আমি।
পড়ে যাব তাঁর চরণ মাঝারে।
আসিবে জানি দেওর ননদিনী
কে বলে তারা দূর আমার!
জানি একই মায়ের সন্তান
আমরা সকলে আপনি।
মিশে যাব তাদের দলে।

ভাই অমরেশ, এস রে গোচরে
এস এস ভাই দাঁড়াও আমার
সমুখ পরে;
শুধাই তোমায় অমরেশ এস।
ছুটেছি যাহার তরে—
অমরেশ অমরেশ—,
দাঁড়াবে সেথায় তুমি তুমি।

ও অমরেশ, হবে শিক্ষক
তাদের মাঝে।
বলিব তোমারে ও দেবর দেবর
শুধাব কত গোপন কথা ;
দেবর আমার,
মিশে যাব আমি তোমাদের মাঝে।

ও পিতা পিতা
চরণের দাসী করে
নাও মোরে গৃহে তুলে।
পিতা, রব আমি রব সেথায়।
বহে যায় দুঃখ মায়ের
কেড়ে নেব দুখ-ভার
আমি আমার জননী বলে।

ক্ষ্যান্ত হও শান্ত হও
কেমন করে বধূবরণ
করব বল ?
তুমি যে আমার অন্তরালে
মা হও।

আজ সেই শুভক্ষণে শুভদিনে
এসেছেন আমার পিতা
দিয়েছি পরিচয় সবার মাঝখানে।
এই শুভক্ষণে শুভদিনে
করজোড়ে চাই আশীর্ব্বাদ।
ওগো পিতা পিতা—

করে যাও তুমি
করে যাও উদ্‌বোধন
আমার এ শিক্ষালয় এই স্থানে।
পিতা পিতা—
দিতে চাই জন্ম আমি শিক্ষালয়ের।
স্বীকৃতি, কর্ত্রী
যেন ধুলায় মিশে হতে পারি
—ওগো আমি।
ও পিতা, আজ শিক্ষালয়ের
জন্মদিন।

শুভক্ষণে শুভ এই একটি দিন
পিতা, আগে কর প্রবেশ তুমি।
ও পিতা,
তারই পিছে রবে তোমার
পুত্রবধূ
রবে তোমার দীপার পাশে শ্বেতা—
ওগো পিতা।
আজ শিক্ষালয়ের জন্মদিন
শুভক্ষণে এই তো শুভ একটি দিন।

দাঁড়িয়েছে ছাত্রগণ
বলি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি—
কে ইনি

এই করিলেন উদ্‌বোধন।

বলব আমি সবার মাঝে—

এবার দাঁড়াও তোমরা

এক হয়ে সব,

হয়েছি শিক্ষিকা

আমি তোমাদের মাঝে।

দাঁড়াবে করজোড়ে

বলব আমি তাদের মাঝে

বলব আমি আগেই তাদের

কর স্মরণ সবাই মিলে।—

হে প্রভু পরমেশ্বর —

শিখিতে এসেছি মোরা

হয়েছি শ্রেষ্ঠ মানব

দিতে চাই শ্রেষ্ঠ উত্তর।

হে পিতা পরমেশ্বর —

চাহিছি সত্য মোরা

চাহিছি আদর্শ—

নির্ভিক মন মোদের,

নির্জন হবে উত্তর।

হে প্রভু পরমেশ্বর —

দাঁড়াব দলে দলে

বলব মোরা সবাই মিলে —

ভয় নাই ভয় নাই,

নির্ভয় চাই ;

নির্ভয় প্রাণ সঁপেছি মোরা
চেয়েছি মোরা সত্য উত্তর

বল বল বল সবে
একই মন এক হও
এক হও তোমরা সবাই মিলে।

কে তুমি কে তুমি !
অন্তরের আশীর্বাদ
নাই যে আমার।
এখন চিন্তা করি
এসেছ গৃহে গৃহলক্ষী হয়ে
সবার জননী তুমি।
কে তুমি কে তুমি ?

জড়াল বাহু দিযে
দাঁড়াল পুত্রবধূ
শ্বশুরের চরণ দৃষ্টি করে।
দাঁড়িয়ে আছেন পাশে পতি।
এক হয়ে যাই এক হয়ে যাই –
এ কি মধুর মিলন !
শিব শঙ্করের
সেই চাওয়া পাওয়া
মেটালে কি আজ বিধি ?
আজ বিধি !

সে রাত শ্রীমতীর উৎকণ্ঠায় কাটে। সে এই কথাই ভাবছিল—নিশ্চয় শ্বশুরের মন জয় করেছে। নইলে তার মত মানুষ কি আর রাত কাটায়! আরে আমি আগেই জানি—অফিসে কাজ করা মেয়ে সে কখনো কি আর ভাল হয়!

দীপা মায়ের সগোতোক্তি শুনে বলে—আঃ মা তুমি এসব কথা ভাবছ কেন? একজনকে না জেনে শুনে তার সম্বন্ধে বিচার করা কি ঠিক হবে।

—নে তুই থাম্ ত, তোরা সবাই একই দলের দলি।

মন্টু—দলি আবার বলছ কেন? আগে বাবার মুখে তুমি সব শোনত।

আমার শোনা হয়ে গেছে, তোরা এবার শুনবি।—শ্রীমতী স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল।

বেলা গড়িয়ে শিবশঙ্কর এসে হাজির হল। অমরেশ কলকাতাতেই ওর হোষ্টেলে ফিরে গেছে। এসে নামতেই মণ্টু খবরটা আগেই পৌঁছে দিল—ওমা, বাবা এসেছে।

শ্রীমতী নিরুত্তর, সে তার কাজ করছে। সমঝদার শিবশঙ্করের বুঝতে বাকী রইল না—রাতে না ফেরায় অপরাধ।

দীপা কাছে এগিয়ে গেল—মা, তুমি কি করছ রান্না ঘরে? বাবা এসেছে তুমি আসছ না যে?

—আমার হাতে কাজ আছে তুই আগিয়ে যা না কেন।

মেয়ে বাপের কাছে এগিয়ে গেল।—বাবা কালকে রাতে তুমি এলে না কেন। থাক্ পরে শুনব। তোমার স্নান হয়নি নিশ্চয়? এত বেলায় কি আর স্নান করবে? মাথা ধুয়ে ভাত খেয়ে নাও।

এবার শ্রীমতী এসে পৌঁছেছে।—কি হল উত্তর দিলে না যে মেয়েকে, বেলা হয়ে গেছে বলল?

—হ্যাঁ বেলা হয়ে গেছে ঠিকই, তবে স্নান না করে মাথাটাই ধুব না কি ভাবছি।

শ্রীমতী মনে মনে ভেবেইছিল—খেতে দিয়ে কিছু কথা জিজ্ঞেস করবে, তার আগে কিছু বলবে না। ক্রোধ সে এমনই রিপু রূপ করে তার বিবেক হারিয়ে ফেলে বলে ফেলল—কাল রাতে এলে না কেন? অনেক কথাই তো বলেছিলে, আবার এত মিষ্টি লেগে গেল বৌকে?

সংযমী শিবশঙ্কর তার কথার জবাব ধীরে ধীরেই দিল। রিপুর উপর রীতিমত তার দখল আছে। তাই শ্রীমতীর কর্কস প্রশ্ন হলেও শিবশঙ্করের উত্তর হল মিষ্টি, ধীর।—ওরকম কথা বলছ কেন? একটা কথা কি খুব ঠিক নয় শ্রীমতী, শুনে বিচারের চাইতে দেখে বিচার ভাল হয়। তুমি যা ভাবছ তা নয়। সত্যিকারের তোমার আমার অজান্তে আমাদের ঘরে গৃহলক্ষ্মীই বল, মমতাময়ী আদর্শময়ী মা-ই বল—কি জানি ঈশ্বর কোন ইচ্ছায় এই অভাজনকে দয়া করেছেন। তুমি না দেখলে এতটুকুও বুঝতে ও বিশ্বাস করতে পারবে না। আগে তুমি আমায় ভাল করে চেন কি না বল? তা যদি চিনে থাক তাহলে তুমি জানবে তোমার স্বামী অঙ্গারকে কখনও সাদা বলবে না। তার বিচার করার ক্ষমতা ঠিকই আছে। আমি মানিকের পিতা হতে পারি—জন্ম দেওয়া পিতা, কিন্তু তার কর্মভারের জন্য নিশ্চয় পিতার উপর পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। কাজেই তার ভাল-লাগাকে আমি ভাল-লাগছে বলতে পারি না। আমি শুধু এই কথাই বলতাম—আমার করনীয় কাজ আমি করছি। হে ঈশ্বর আমার জ্ঞানের অল্পতা আমার অক্ষমতা আমি খুঁজে পাই নি। ছেলের কাজ ছেলে করেছে। আমার কাছে তার আহ্বানও নেই বিসর্জ্জনও নেই। কিন্তু শ্রীমতী তুমি জানবে বিসর্জ্জন ত দূরের কথা এ ক্ষেত্রে শত শত আহ্বান জানিয়েও যেন মনের তৃপ্তি পাই নি আমি। এ কথা হয়ত তুমি আমার মুখ থেকে শুনলে ষোলআনা বিশ্বাস করতে পারবে না। এটা শ্রীমতী তোমার দোষ নয়; এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি। যদি কেউ কাউকে ভালবাসব বলে তাহলে সে কোথায় যেন বাধা পায়, ভালবাসতে পারে না। যেমন মনে কর কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে যদি গোলাপ ফোটে তবে কি তাকে কেউ দেখতে পায়? যদিও দেখে, এড়িয়ে যায়। গন্ধ?—পাচ্ছি না। কিন্তু মৃদু বাতাস যখন বয়, গন্ধে চারদিক উমেদ করে দেয়। তখন আর অস্বীকার করার পথ থাকে না। ঝড়ের বেগে বাতাস বইলে গন্ধকে দাঁড়াতে দেয় না, উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। আর একেবারেই যদি না বাতাস থাকে তাহলেও গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ সে ঠিকই বর্ত্তমান। সেইজন্য বুঝতেই পারছ প্রয়োজন মৃদু বাতাস।

প্রকৃতি বায়ু যখন ছড়িয়ে দেয় তখন আর কোন্ যুক্তিতে তাকে অস্বীকার করবে—'না' বলবে। শত যুক্তি খাড়া করলেও তখন আর খাটে না।

যাক আমি যা তোমাকে বললাম ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে রাখবে। দু এক দিনের মধ্যেই তোমার মেজ ছেলে আসছে তাকে সব জিজ্ঞেস করো। আমার চেয়েও সে বেশী বলতে পারবে।

শ্রীমতী আর কোন কথা বলতে না পারায় সে গম্ভীর হয়ে গেল। তবে এবার রাগত নয়, বুঝে। দীপা সামনে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিল সেও ত আর খুকী নয়, তারই সমবয়স্কা একটি মেয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে। দুইটিই লেখাপড়া জানা মেয়ে। সে শুধু এই কথাই পিতাকে বলল—বাবা, আমরা কি ওখানে কেউ যেতে পারি না? তুমিই বা বৌদিকে সঙ্গে করে আনলে না কেন?

—আনতে কাউকে হয় না মা। যে যার কর্মে টানা হয়ে আসে। এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা কি আমি কিছু করেছি না, আমাকে করিয়েছে? এখানে তুমি আমাকে বাধ্য করিয়েছে বলতে পার না। মুগ্ধ হয়েছি বলতে পার।

দীপা চুপ করে সব কথা শুনল। তার পর যে যার মত কাজে চলে গেল।

রাতে শুতে যাওয়ার সময় শিবশঙ্কর শ্রীমতী ও দীপাকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে বলল—হ্যাঁরে; আমরা যে পুরীতে গিয়েছিলাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে যে আলাপ হল, তাদের একটা চিঠি দেওয়া হয় নি? দিলি না কেন একটা চিঠি? মেয়ের উদ্দেশ্যে বলেই স্ত্রীকে বলল—আর এগুলো তো তোমারই বলা দরকার। এসবগুলোও আমি বলে দেব! তাদের ছেলে মেয়ে কাছে ছিল না, তার উপর আমরা আগে চলে এলাম। তারা ভালয় ভালয় নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে কেমন আছে কি না—আছে সে সব খবর নিয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য নয় আগে খবর নেওয়া?

দীপা কি বুঝল কি না বুঝল—কিন্তু শ্রীমতীর বুঝতে বাকী রইল না। তাই সে স্বামীকে উত্তর দিল—কাল দুপুরে আমি দীপাকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে দেব।

ওদিকে বাবা চলে যাওয়ার পর মানিক চা খেতে বসে স্ত্রীকে কাছে ডাকল।

—কি বাবাকে কেমন বুঝলে?

—কি আর বুঝলাম! এইটুকুনই বুঝেছিলাম—ভগবান আমার সত্য-আদর্শ দীর্ঘ স্থায়ী করবে বলে অন্তের বাড়ীতে আমাকে মানুষ করিয়ে নিল। কালকে বাবাকে আর ঠাকুরপোকে যত দেখেছি ততই ভেবেছি—আজ যদি আমি এদের

বাড়ীর মেয়ে হতাম তাহলে আমার সত্য আদর্শ অস্থায়ী হত। ভগবানের কি অসীম করুণা যার জন্ত এদের বাড়ীর বৌ করে আমায় নিয়ে এল। কারণ আমার বাবাকেও দেখেছি আর শ্বশুর মশায়কেও দেখলাম। দুজনের মধ্যে সত্য-আদর্শের কত তফাৎ। কারো চন্দন সই—পাপগত দিন ক্ষয় আর, কারো স্থায়ী। দীর্ঘ দিন চেষ্টা করে সে এই অবস্থায় এসেছে—স্থায়ী ভিত্তির উপর তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠিত। তাই অপার করুণাময় আমায় এখানে টেনে নিয়ে এলেন। যদি কোন কিছু মনে গৌরব অহংকার দানা বাঁধ্‌তে চায় তাও তিনি কি ভাবে গোড়া মুছিয়ে কেটে দিলেন। আজ যদি আমি জাতের মেয়ে হতাম, অভাবী না হতাম তাহলে কি ঈশ্বরের আশীর্বাদ এমনি করেই বুঝতাম! তখন জনক জননীর উপরে কতই না দরদ উছলে পড়ত! কিন্তু শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী তিনি করবেন বলেই আগেই খোঁড়া করে দিলেন। এবার তার আশীর্বাদ আর আমার চেষ্টা। কে বলে আমি খোঁড়া! পঞ্চাশ জনের পায়ের বল আমার একলার পায়েই যে আছে।

মানিক ঋতার মুখের দিকে চেয়ে এই কথাই ভাবতে রইল—নিছক আমাদের বিবাহিত জীবন, এ ঈশ্বরের এক কৌশল। জিনিসটা তা না হলে ভাল করে গড়ে উঠবে না। যে আমার সামনে আমার স্ত্রী হয়ে এসেছে সে কি আমার শুধু স্ত্রী ই! শুধু স্ত্রী বলে যদি তাকে আমি মেনে নিই বা বলি তাহলে কি ঈশ্বরের প্রবল অভিশাপ আমার উপর বর্ষণ করবে না? "হে জ্ঞানবান ঈশ্বর আমি জ্ঞানের কাঙাল তোমার কাছে এই ভিক্ষাই চাই, যার যা গুণ তাই যেন সরল সহজ গলায় ব্যাখ্যা করে যেতে পারি। মানুষের হিংসা ঈর্ষা দূর কর। যার মূলে মানুষ আচ্ছন্ন থেকে অমানুষের পরিচয় দেয়। যেমন সূর্যকে মেঘ ঢেকে রাখলে আমরা অন্ধকার দেখি, সূর্যের কথা মনে করতেই পারি না তেমনি রিপুরা জ্ঞানকে ঢেকে রাখলে জ্ঞানের চিহ্ন থাকে না।

ঋতা মানিকের মুখের দিকে চেয়ে এই কথাই বলল—কি হল, অমন করে মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে!

—না ভাবছি—বাবার সঙ্গে তোমার ব্যবহার। আমার দেখে যা মনে হল তাতে বাবার মন জয় করেছ। বাবার মনের যা খোরাক তাই যেন তিনি পেয়ে গেলেন। তিনি তো তেমন কিসেরও পিয়াসী নন।

শ্বতা—হ্যাঁ বাবাকে দেখে আমার যা মনে হল তোমার কথাই ঠিক।

দু'জনে শান্ত নীরব থাকার পর হঠাৎ মানিক এক সময় বলল—হ্যাঁ, তোমার চাকরি সম্বন্ধে কি করা যায়?

—হ্যাঁ আমার ছুটির মেয়াদ ত ফুরিয়ে এল। তাহলে কি আরও কিছু-দিনের ছুটির দরখাস্ত করা যাবে, না কি করা হবে?

মা—এভাবে টানা পোড়ার কি দরকার। একেবারেই ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এস। দুদিক ত আর বজায় রাখা যাবে না, আর তা গেলেও বাঞ্ছনীয় নয়, কি বল?

শ্ব—হ্যাঁ তা ত বটেই। কাজে নামলে মন এখন ঢেলে দিতে হয়। তবে একটা কথা আমার কি মনে হয় জান—সেটা ঠিক হবে কি না তোমায় বলি শোন। মাস দুয়েক ছুটিতে থেকে যদি মাইনাটা নেওয়া যেত ত মন্দ কি? আমার তো কিছু ছুটি পাওনাই আছে।

মা—তা করলে করতে পার। তাহলে এদিকে তুমি কেমন কি গুছিয়ে নিচ্ছ? আমাকে কিন্তু তুমি সেই বিকেলেই পাবে। যা কিছু তোমাকেই করতে হবে।

শ্ব—হ্যাঁ আমার ঐ রকম পেলেই চলবে। সারা দিনের যা সমস্যা তাই আলোচনা করব সেই সন্ধ্যায়। চা জলখাবার তুমি ওখানেই খাবে।

মা—সে আমি যা হয় একটা করব—ওসব আমার অভ্যাস আছে।

শ্ব—মহেন্দ্র বলেছে দিদিমণি, আমার লম্বা ছুটি পাওনা আছে। সেইটা এখন নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কাজ করতে পারি। তারপর আমার যা বিরাট সমস্যা এসেছিল সে ত আপনিই সমাধান করে দিয়েছেন আমার আর চিন্তার কিছু নেই। আর ক'মাস পরেই তো আমি রিটায়ার করে যাচ্ছি। মহেন্দ্রর এই কথাগুলোতে আমি দারুণ ভরসা পেয়েছি। আর একসঙ্গে দুজনে কাজ করে পরস্পর পরস্পরকে চেনারও বাকী নেই।

মানিক প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল—তারপর তোমার ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কি দাঁড়াচ্ছে?

শ্ব—ভাব দেখে যা বুঝা যায় তাতে স্কুলটি ভাল ভাবেই একদিন দাঁড়াবে। তবে আমার যোগ্যতা আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ের মুখে শুনা যাচ্ছে—দিদিমণি জানেন, আমাদের বাবা বলেছেন কি, যাক এতদিনে এ এলাকায় একটা ইস্কুল হল, ছেলেমেয়েদের একটা সুব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। যিনি

স্কুলটি খুলেছেন সে যদি ভাল করে লক্ষ্য নেয় তাহলে না হয় সবাই মিলে সাহায্য করা যায়। দেখাই যাক না কি হয় জিনিসটা। 'ও তাই নাকি তোমার বাবা বলছিলেন'—আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বলে উঠল—হ্যাঁ দিদিমণি আমার মাও ঐ কথা বলছিল। এখানে সুবিধা নেই সেইজন্য মামার বাড়ীতে রেখে আমায় পড়াবে। যাকগে ছেলেপিলেদের মধ্যে এই রকম অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। তাই আমার মনে হয় নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করলে অর্থের অভাব হবে না। একটা কথা তুমি জানবে—সামর্থই অর্থকে নিয়ে আসে।

—হ্যাঁ সে ত ঠিক কথাই।

ঋতা নিয়মিত স্কুল যাতাযাত সুরু করেছে। মনে মনে তার ইচ্ছাই আছে—দিনকতক স্কুল চলার পর বাবাকে একখানা চিঠি লিখব। অবশ্য এ কথা মানিকেরও স্থির করা আছে। কিন্তু সে প্রকাশ করেনি। উভয়েরই মধ্যে একই ভাব কিন্তু কেউ কাউকে জানাবার সুবিধা সুযোগ পায় নি।

আজকে স্কুলে প্রণবেশ গিয়েছিল।—স্কুল ফেরৎ এই কথা স্বামীকে বলতে মানিক বলল—কি বলছিল ?

ঋ—বলবে আর কি! এখন বলার মত কিছু নেই তবে ভাবে বুঝলাম। কারণ আমিই এখন দারুণ খরচের মুখে দাঁড়িয়ে আছি বলে বাবা কিছু বলে পাঠাবার সাহস পায় না। তারপর দেখছে মেয়ের চাকরিও ত এখন নেই।

মা—থাক তাঁর কর্ত্তব্য তিনি ঠিকই করছেন তোমার কর্ত্তব্য হল তাঁকে তার মন বুঝে কিছু দিয়ে পাঁচ কথা বলা। একেবারেই বঞ্চিত করলে চলবে কি করে!

ঋ—হ্যাঁ আমিও তাই ভেবেছি। তোমার কাছে ঐজন্যই গল্পটা করলাম। ওকে কাল বাড়ীতে আসতে বলেছি। তুমিই যা হয় পাঁচ কথা বলে যা করার করবে।

মা—আমি! আমি কেন! আমি আগে ছিলাম না, আমি পরেও থাকব না। তুমি যা ভাল হয় তা বলবে।

ঋ—তা ভাল, আমিই বলব।

সকালে সময় মত ঠিকই প্রণবেশ এসে হাজির। দেখে ঋতার মনে হল—এরই নাম পাওনাদার। কিন্তু কথাটা সে আর প্রকাশ করতে পারল না। যাই হোক বিসর্জন না দিলেও খুব আহ্বানের সুর ছিল না ঋতার স্বরে। কারণ

ঋতা যে স্তরে যেখানে দাঁড়িয়ে সে গড়ে উঠেছিল বর্ত্তমান যে স্তরে দাঁড়িয়েছে দুটি আকাশ পাতাল তফাৎ। কোথাও আদর্শের বুলি আর কোথাও আদর্শের পালন। তাই সে আগে জিনিসকে অস্বীকার করতে না পারলেও খুব কিছু একটা দেখাতে পারবে না। কারণ তার যে জানা আছে।

—এই কিছু খেয়ে টেয়ে এসেছিস ?

মা—আসুক না আসুক তুমি তো তোমার খেতে দেবে। ও কি জিজ্ঞেস করছ তুমি!

—না তা না হয় দিলাম। ও কি খেয়ে এসছে এমনিই আমি জিজ্ঞেস করছি।

প্রণবেশরা গরীব হলে কি খুব একটা লোভী নয়। তার পেটে কি দানা পড়েছে তার দিদির কি কিছু অজানা ? সে যাই হোক এখন দিদি যেমন অজানা মন নিয়ে জিজ্ঞেস করল, প্রণবেশ তারই ত ভাই, সেইজন্য সেও কুটুমের মত উত্তর দিল—দিদি, আমি জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি; আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করো না।

যাই হোক মাঝখান থেকে মানিক ভাবল—এদের ভাইবোনের খবর এরা ভাইবোনে বোঝে কিন্তু কর্ত্তব্য হল শালাকে জলখাবার খাওয়ানো। সেইজন্য আর একটিবার সে জোর দিয়ে ঋতাকে বলে উঠল—ঠিক আছে, ও খেয়েছে ত খেয়েছে তুমি খাবার দাও ত।

ঋতা ভাইকে জল খাবারটা ধরে দিয়ে কাছে এসে বলল—হ্যাঁরে তোকে বাবা কেন পাঠিয়েছে—টাকা নিতে ?

প্রণবেশের মনে কোথায় যেন একটা লজ্জা ঘৃণা ছুঁল—সে যে ছেলে। কিন্তু হলে হবে কি উপায় নেই। বর্ত্তমান যা অবস্থা তাতে তাদিকে দিদির কাছে হাত পাততেই হবে। তাই সে সব পাঁকে পুঁতে দিয়ে পরিষ্কার বলে উঠল, এ যেন তার দাবী,—হ্যাঁ তুমি জান না ?

—হ্যাঁ জানি ত কত দিতে হবে বল ?

—সেটাও বিলক্ষণ তুমি জান। আমার বলার কিছু নেই। শুধু একটা কথাই বলার আছে—আমার চাকরির জন্য জামাইবাবু কতদূর কি চেষ্টা করলেন ?

—সে তুই তোর জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস করগে যা।—ঋতা ঘুরে এসে

পঞ্চাশটি টাকা ভাইয়ের হাতে দিল—এই এখন রাখ তারপর আবার পরে যাই হোক ব্যবস্থা করব, আর বাবাকে বলবি, জানছিস ত যে একটা কাজ ফেঁদেছি তাতে একবারে টাকা পয়সার হাত সব খালি। তার উপর চাকরিতেও ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ এই অবস্থাটা বেশীদিন থাকবে না।

—হ্যাঁ দিদি তুমিও ঠাকুরকে জানাও আমাদেরও যেন তোমার কাছে বেশীদিন আর না হাত পাততে হয়।

শ্ব—হ্যাঁ তাই হোক ভাই, তোর একটা কিছু সুব্যবস্থা হয়ে যাক। আগে তোর আমি না হয় দিদি ছিলাম কিন্তু এখন ত আর তা নয়, এখন দিদি হলেও পর।

ভাই বোনে অনেক কথাই হল। শ্বেতা শেষে বলল—যাক তাহলে দেখ তোর জামাইবাবু বাইরের ঘরে বসে কি করছে, একটু বলে যা।

প্রণবেশ জামাইবাবুকে রীতিমত ভয় ও শ্রদ্ধা করত। যাক তবুও সব সঙ্কোচ দূরে ঠেলে যেয়ে কাছে গিযে দাঁড়াল। জামাইবাবু বুঝতে পেরে বই থেকে চোখ তুলে বলল—কি হল দিদির সঙ্গে গল্প টল্প হল?

প্রণবেশ ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে সঙ্কোচের স্বরে বলে উঠল হ্যাঁ। পরক্ষণেই ধীর কণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় বলল—জামাইবাবু আমার চাকরির ব্যাপারে কতদূর কি করলেন।

মানিক আবার ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল—তাহলে তুমি চাকরি করাটাই স্থির করলে? কেন, আর পড়বে না! ভাল করেই ত পাস করেছিলে।

—না জামাইবাবু সে অবস্থা আমাদের আর কোথায়? দিদির কাছে আর কদিন হাত পাতব এভাবে! তবে আপনি দয়া করে যদি এ ব্যবস্থা করে দিতেন দিনে চাকরি রাতে পড়া তাহলে হয়ত কিছু আরও আগাতে পারতাম।

প্রণবেশের কথাগুলো মানিকের মনে ছুঁল। সে এই কথাই বলে উঠল—আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাই চেষ্টাই করব।

প্র—করব বলে আর দেরি করবেন না। এ অনাথ দরিদ্রদের দিকে একটু নজর দেন। পড়া হয় উত্তম, না হয় দুঃখ নেই, টাকা চাই।

মা—ঠিক আছে ঠিক আছে। যাতে শীগ্রিই হয় তাই দেখব।

প্রণবেশ জামাইবাবুকে প্রণাম করে বিদায় নিল।

মা—তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করলে না?

—হ্যাঁ ওখান থেকেই ত আসছি।

এও মানিক বুঝল, এদের মধ্যে খুব একটা আমড়াগাছি ভাব নেই।

পিয়ন এসে দাঁড়াল। কার চিঠি? শিবশঙ্করের। চিঠিখানা খুলেই দেখল—কল্যানীয় বৌমা ও মানিক”

আমি তোমাদের ওখান থেকে নিরাপদে পৌঁছেছি। যাক একটা কথা বলি—যে জিনিস আরম্ভ করেছ তার শেষ লক্ষ্য করবে। অনেকেই অনেক কিছুই আরম্ভ করতে পারে, কিন্তু তার শেষ কেউ লক্ষ্য করে না। সবই আধা হয়ে রয়ে যায়। তাই তোমাদের জীবনে এইরকম হাস্যকর জিনিস যেন না হয়। সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। টাকা পয়সা খুব হুঁসিয়ার। বৌমা ত আর নিশ্চয় চাকরি করতে পারবে না। বর্ত্তমান যদি কিছু প্রয়োজন মনে কর তাহলে জানাবে। তবু প্রতিষ্ঠানটি ঠিক মত লক্ষ্য নিয়ে চালাবে।

এখানে সব একরকম। তোমরা আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

তোমাদের বাবা।

পিতার এই আশীর্ব্বাদ স্বরূপ লেখাটি পেয়ে মানিকের যার-পর-নাই আনন্দ হল। হাসতে হাসতে যেয়ে ঋতাকে দিল—এই নাও বাবা কি লিখেছে দেখ।

—কি, কি লিখেছেন বাবা?

—কি আর লিখবেন। আমাদের বাবার উপরে তুমি ভাগ বসিয়েছ তাই লিখেছেন।

—ভাগ কি আর কেউ কারো উপর বসাতে পারে—ভাগ্য আর যোগ্য।

—ও তাই নাকি! তা বেশ।

ঋতা চিঠিটা পড়তে পড়তে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

শিবশঙ্কর আজ খেতে বসে জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ রে দীপা, সেদিন ওদের কি চিঠি লিখেছিলি?

—ঐ তো মা যা বলে দিয়েছিলেন তাই লিখেছি।

শ্রীমতি—হ্যাঁ আমি আর কি বলব—ঐ কতকগুলি মামুলী খবর দিয়ে ওদের সংবাদ জানতে চেয়েছি। কেন এ কথা আজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে তুমি?

—না বেশ কদিন হয়ে গেল ত চিঠিটার উত্তর এল না, পেল কি পেল না তাই ভাবছি।

—না অনেক সময় পোষ্টম্যানের গোলমালে দেরি হয় ত!

—হ্যাঁ সে কথা ঠিক।

পরদিন পিয়ন এসে চিঠি পৌঁছে দিল। দীপার চিঠির উত্তর লিখেছে তার জ্যেঠিমা—সুন্দর মিষ্টি ভাষায় চিঠিটা ভরা। পাশ দিয়ে শিবশঙ্করের কাছেও একখানি চিঠি এসেছে—সেটি লিখছে ছেলের বাবা।

ভাই শিবশঙ্কর—

আমাদের দুজনের মধ্যে কখনও কোন আলাপ বা পরিচয় ছিল না। কিন্তু কি জানি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের কি ইচ্ছা! ঐখানে ঐ ভাবে আমাদের এত পরিচয় হওয়ার কারণ কি! তবে কি চির পরিচয় ইচ্ছা করে? কারণ তোমাদের বংশকে আমার খুব, কেন জানি না, ভাল লাগল। তোমার ঐ সত্য সহজ সরল ভাষা আমার মনকে কোথায় যেন কাঁপিয়ে তুলল। যাক আসার পরে ঘরেই পাঁচটা আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। দীপার চিঠিখানা পাওয়ার পর ওর জ্যাঠাইমায়ের খুব ইচ্ছা হল এই রকম মেয়েই বৌ করেই ঘরে আনতে হয়। যেমন বাপ ভাই তেমন মা মেয়েও। দেখ বাবা খোকা, তুই একটা এরকম বিয়ে করে আমায় এনে দে না রে। মাতৃভক্ত খোকা সঙ্গে সঙ্গে মাকে উত্তর দিল—তুমি যদি ঐরকম আমার বিয়ে দিযে সুখী হও তবে আমার বলার বিশেষ কি আছে মা! আদর্শবতী শিক্ষিতা মোটামুটি দেখতে সুন্দরী, তবে এতে অমত করার কি আছে! সঙ্গে সঙ্গে তার মা বলে উঠে—সব ত হল বাবা মেয়েটির বড়দাদা 'বিজাতি' মেয়ে বিয়ে করেছে। মা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে চুপ।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথা টেনে নিয়ে আমি বলতে সুরু করি—হ্যাঁ গো এ আবার কি বলছ! সবগুণই যখন তোমার চোখে লেগেছে তখন বেজাত আর স্বজাত? জাত ত ঈশ্বরের নয়; গুণই ঈশ্বরের। তারপরে যে সব ঘটনা বলল তাতে ত সেও গুণে মুগ্ধ হয়েছে। ঐটেই যদি তোমার কাছে কারণ হয় তাহলে বড় দুঃখের হবে। উত্তরে মনরঞ্জনের মা বলে উঠে—তাহলে তুমি কি বল, বল?

বললাম না, আমার বলাবলির আর কি আছে। তুমি নিয়ে ঘর করবে আর ছেলের মত হবে বিয়ে করবে। তোমরাই মায়ে বেটায় বোঝাপড়া কর। আমি শুধু কর্তা। তবে খুকীকে একখানা চিঠি দিয়ে আমি জানি দেখি সে কি বলে। বললাম—তা বেশ।

ঐসব কথাই আমার মনরঞ্জনের মায়ের সঙ্গে হয়েছে। তা মেয়েটিকে এখন কি করবে—পড়াবে কি না পড়াবে—কি স্থির করেছ? এখানে একরকম সকলে কুশল, তোমাদের কুশল আশা করি। ইতি—

হৃদয়রঞ্জন সাহা।

চিঠিখানি শিবশঙ্কর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে হঠাৎ তার মাথাটা যেন কেমন ঝিমিয়ে উঠল—ঈশ্বর, কে বলে তুমি নেই! তুমি আছ, তুমি আছ। দীর্ঘদিন ধরে তার পালন, শেষে চিন্তাধারার বাইরে আসে তার উত্তর। এবং কেউ তাকে তা বোধ করতে পারে না। সত্য তার প্রকৃতি এই রকমই হয়। সে শুধু সহ্য করে সহ্য করে। আর কোথায় যেন মিট্ মিট্ দৃষ্টিতে শুধু হয় সাক্ষী। তারপর তখন সে চোখ তুলে চায়, তখন আর কার সাধ্য তার দৃষ্টি এড়িয়ে চলে। যা কখনও কোনদিন সম্ভব হতে পারে না মুহূর্তে কোন দিক দিয়ে কিভাবে অতি সহজে সম্ভব করে তোলে, তাই নয় কি?

এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে ডাক দিল শ্রীমতীকে—ওগো শুনছ? এদিকে একবার এস ত।

—আমি এখন যেতে পারব না, আমার হাতে কাজ আছে।

—কাজটা দীপাকে বুঝিয়ে দিয়ে তুমি এস।

মুহূর্ত পরেই দেখা গেল শ্রীমতী এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। শিবশঙ্কর—শোন মন দিয়ে চিঠিখানা।—বলে সে আবার চিঠিখানা পড়ে শোনাল। শ্রীমতী যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। শিবশঙ্কর অবশ্য আগে থেকেই নানারকম চিন্তা করেই রেখেছিল। শ্রীমতী কিন্তু এ সবের ধার দিয়েও যায় না। তবে সে মুখে একবার বলেছিল—এদের বাড়ীতে আমাদের দীপার বিয়ে হলে ভাল হয় না?—সেটা মৌখিক মাত্র। কারণ তার মনে কোথায় যেন একটা দ্বন্দ্ব ছিল—মানিকের অপরাধে তাদের সকলকেই কিছু কিছু ভুগতে হবে। কিন্তু এখানে এই চিঠি শুনে যা মনে হচ্ছে, বোধ হয় ঈশ্বরের চোখে মানিক অপরাধী নয়। এই যে সাময়িক আমরা মনে করেছিলাম তারই উত্তরে কি ঈশ্বর আমাদিগের

জবর শিক্ষা দিচ্ছে না ? দীপার বাবার পক্ষে একটা ইঞ্জিনিয়ার পাস ছেলে এবং উপার্জনশীল, অতবড় একটা কলেজের প্রফেসর একি সম্ভব হত কোনদিন! তার উপর ছেলের শিক্ষার কাছে মেয়ের শিক্ষা কিছুই নয়।

হ্যাঁ ঠিক তাই—ঋতা যে নিরপরাধি, বেচারীর কোন দোষই নেই তথাপি শাশুড়ী মায়ের চোখে বিষ। তাই ঈশ্বর নিজে দাঁড়িয়ে সেই বিষ সরিয়ে অমৃত ঢালছেন। এবার কেন না ঋতা তার শাশুড়ীর কাছে আদর পাবে! এক ত সে সব গুণের গুণমনি ; তার উপর রোজগারী মেয়ে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে ভাব ভাবনার শেষ হল। এখন মুখোমুখী। উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—তাহলে কি করব ?

শ্রী—কি করবে! সঙ্গে সঙ্গে এর উত্তর লিখে দাও।

—উত্তরটা কি লিখব ?

শ্রী—সে কি আর আমি বুঝি, তুমি যা বোঝ একটা লিখে দাও। তোমার চাইতে কি আর আমি বেশী জানি যে আমায় জিজ্ঞেস করছ!

শিবশঙ্কর চিঠির প্যাড টেনে নিয়ে বসল। শ্রীমতী রান্না ঘরে ফিরে গেল।

পরম পূজণীয় দাদা ও বৌদি,

দাদার আজ একখানা চিঠি পেয়ে আমি যে কি আশ্বস্ত হয়েছি তা লিখে বা বলে বুঝাতে পারব না। আমার মেয়েকে আপনাদের পায়ে যদি স্থান দেন তাহলে আমি কেন আমার বাপ ঠাকুরদা ধন্য হয়ে উঠবে। কারণ সব দিক দিয়ে আমি বিচার করে দেখেছি—আমার মেয়ে আপনাদেব ঘরের যোগ্য নয়। তথাপি যে দয়া দেব ভাব জেগে উঠেছে তাতে আমার বলার কিছু নেই। আপনারাই বলা বা ব্যবস্থা করবেন। শুধু আমি হুকুম তামিল করবার জন্যই রইলাম। দাদা যেন এই কথাই মনে করে—যেমন ছোট ভাই বলে এই দয়াটুকু দেখিয়েছেন তেমনি শেষ পর্যন্ত যেন সেই ভাবেই আমাকে দেখেন। আমি কেউ নয় কিছুই নয়। শুধু আমাকে কি দিতে কি কবতে হবে বলবেন। আপনাদের কাছে বলার কিছু নেই সবই দেখা বা বলা হয়েছে। প্রণামান্তে—

আপনাদের স্নেহধন্য

শিবশঙ্কর সাহা।

এদিকে ইউনিভার্সিটিতে চারদিকেই অমরেশের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধুদের প্রিয় ও বরাবরই। ব্যক্তিগত নীতি ও সত্য আদর্শের প্রতি প্রীতি তাকে সকলের অন্তরঙ্গ করে তুলেছে। মেয়েরাও ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কোন সঙ্কোচ করে না। প্রফেসররা সকলে ওকে ভালবাসে। গায়েই হোষ্টেল হওয়ার জন্য ওকে বাইরে বড় একটা দেখা যেত না, সময়ের সদ ব্যবহার সে চিরকালই করতে চায়। বন্ধু বান্ধব সকলে পাঁচটা বিষয়ে আলোচনা বা কোন বিষয়ে ওর মতামত নেওয়ার জন্য প্রায় ওর সঙ্গে এসে হোষ্টেলে মিলত। কিন্তু আলোচনা আর কখনও আড্ডায় গড়াত না। নিজের লেখাপড়া সে ভাল বুঝত এবং সকলকে সেটা বোঝাতে চাইত। অনেকের ধারণা ছিল ও খুব স্বার্থপর—নিজের পড়াশুনা গুছিয়ে নেয়; সেই ভুলটা ভাঙ্গবার জন্য ওর অনেক সময় লাগত। পড়ুয়া ছেলে প্রিয় হয়। এ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু অমরেশের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা গুণ ছিল যার জন্য ছেলে, মেয়ে, শিক্ষক সম্প্রদায় সকলে ওর দিকে আকৃষ্ট হত। ইউনিয়নের প্রধান কর্মকর্তা অমরেশ। সেদিকেও তার ব্যস্ততা কম নয়। তবে একথা কি ঠিক নয় যে তার অন্য ছেলেদের মত ঘ্যানর ঘ্যানর করে মুখস্থ করতে হয় না। মাথা তার এমনই যে একটু পড়লেই বোঝে ও অনেক কাজ করতে পারে। আর পড়ার কাজটা সে 'নিশুথি' রাতেই করতে ভালবাসত। যে সব মেয়েগুলি ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল তাদের অধিকাংশই ওকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখত—এমন কি তার নিজের ক্লাসের মেয়েরাও। যুবতীদের চোখে যুবক শ্রদ্ধার। কিন্তু এর কারণ কি এই নয় যে অমরেশের প্রখরতা দেখে সকলে ভয় পেত। এর মধ্যে কতকগুলি মেয়ে পারদর্শী ভাব নিয়ে শ্রদ্ধাচ্ছলে প্রেম চোখে দেখত তার দিকে। সকলেই মনে মনে ভাবত—কে জানে কার ভাগ্যে এই ফলটি আছে। যেই পাক সেই ধন্য হবে। কিন্তু হায় এটি যে কারোর নয় সে কথা কি কেউ জানত? একমাত্র খোদাই তার খবর রাখত। অমরেশের কাছে কিন্তু সবগুলিই স্নেহের ভগ্নী ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়েদের নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে খুব দলাদলি চলত। ঠিক ঠিক খবর আর কে জানে।

এর মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল ভাইস চ্যান্সেলরের মেয়ের মনে। মেয়েটি খুব বেশী জড়িয়ে পড়েছিল। বাপের একমাত্র মেয়ে। অমরেশের সঙ্গে এবার ফাইনাল দেবে। গীতিকার ইকনমিকস্। আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় গীতিকার বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা স্বতন্ত্র ছিল। একসঙ্গে তারা ইউনিয়ন করে,

একসঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে তর্ক আলোচনা করে এবং গীতিকা ছিল মেয়েদের দলপতি, তাই অমরেশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে উঠে। অমরেশ কিন্তু তার গুণেই মুগ্ধ হয়েছিল, তার রূপে নয়। গীতিকার ঐখানেই ছিল বোঝার দারুণ ভুল। সে ভেবেছিল তার রূপে অমরেশ আকৃষ্ট হয়েছে। তাই গভীরে বেশ ভাল ভাবেই প্রেমের বাসা বেঁধেছিল সে। গীতিকার যে বোঝা সে বোঝাটা একরকম মেয়েদের সকলেরই ছিল। দেখতে সুন্দরী, লেখাপড়ায় ভাল, একমাত্র মেয়ে ইত্যাদি একরকম সবই আগেই ত বলা হয়েছে। অমরেশকে প্রায় বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে ডাক পড়ে খাওয়ার। অমরেশও না করে না। খুব অন্তর না থাকলেও বাধ্য হতে হয়। কারণ আরও ত অনেক ছাত্রও আছে। তাকে আলাদা করে এভাবে খাতির করা কেন! যাক বাড়ীতে গেলে ওর বাবা মা ওকে ছেলের মতই লক্ষ্য করে। ছাত্র হলেও ওর সঙ্গে গীতিকার বাবা অনেক গল্পই করে। মা কাছে বসে ওকে খাওয়ায়। এক তো মেয়ের কলেজের বন্ধু, তার উপর স্বামী ও মেয়ের মুখ দিয়ে শুনেছে—ছেলেটি নাকি গুণমস্ত। কোন মেয়ের মায়ের মনে না লোভ হতে পারে! যদিও ওরা কুলীন ব্রাহ্মণ তবুও গীতিকার মায়ের মাঝে মাঝে মনে হয়—আঃ কোন্ গর্ভবতী এমন সন্তান গর্ভে ধরেছে। এ ছেলে যার ঘরের জামাই হয়ে ঢুকবে চাঁদ পাবে সে হাতে।

একদিনের ঘটনা—ছুটির বেলা। গীতিকা নিজে হাতে রান্না করেছে, তার বন্ধুকে খাওয়াবে বলে। অমরেশের আজ বিশেষ কাজ ছিল না। নিজের ছোট ঘরটির মধ্যে বসে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল। গীতিকা কিন্তু আগেই নেমন্তন্ন করে গেছে। অমরেশ সে কথা একেবারেই ভুলে গেছে। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে আজ তার কে জানে কেন, শিবানীর কথা বার বার মনে পড়ছে। মেয়েটা লেখাপড়ায় খুব না ভাল হলেও একেবারে তো খারাপ নয়। কে জানে কেমন বাড়ীতে ওর বাবা বিয়ে দেবে, মেয়েটা খুবই ঠাণ্ডা, শান্ত। এসব পাঁচ কথা ভাবছে এমন সময় ডাকে শিবানীর চিঠি এল। খামটি খুলে দেখে তাতে সকলেই লিখেছে। যেমন ভাইবোনদের অন্তর দিয়ে দাদার কুশল চিন্তা সেই স্বর সকলের লেখায় বর্তমান। শিবানী লিখেছে—

শ্রদ্ধেয় দাদা—

তোমার আশীর্ব্বাদে ও পরিশ্রমের ফলে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। তোমার

কথা বাবা মা বার বার করেই বলছে এবং আমার বিয়ের নানা দিক থেকে সম্বন্ধ আসছে। তুমি আসলে বাবা মা তোমার সঙ্গে আলোচনা করবে।

এই লাইনটি পড়ে অমরেশের মন যেন আরও কোথায় মোচড় দিয়ে উঠল। এ যে সত্যিকারেরই তার কাকা কাকী। চিন্তা ত আর কিছু নয়—সনৎ না হয় বেটাছেলে যাই হোক করে কিছু একটা করবে বা করার চিন্তা করবে। ভাবনা যত শিবানীকে নিয়ে। শিবানীর যা কিছু দায় দায়িত্ব তার অনেকখানি অংশ অমরেশের। দীপা শিবানী দুইটিই তার অনূঢ়া বোন।

এদিকে অনেক বেলা হয়ে গেছে। দেরী দেখে গাড়ী নিয়ে গীতিকা একেবারে হোষ্টেলে হাজির।—'কি ব্যাপার অমরেশ, তোমার কি নাওয়া খাওয়া সব সারা ?'—গীতিকা বেশ একটু দম্ভ ও দাবীর সুর নিয়ে বলল।

অমরেশ—না এখনও নাওয়া খাওয়া হয় নি।

গী—যাই হোক তোমার ভাব দেখে ত আমাকে আসতে হল। তোমার জন্য বাড়ীর এখনও কেউ খেতে পাচ্ছে না। বাবা মা উভয়েই উদ্‌বিগ্ন। তাই বাবা বললেন তুমি একবার গাড়ীটা নিয়ে দেখ। তা তোমার এতবেলা পর্যন্ত স্নান হয় নি—কি করছিলে এতক্ষণ ?

অ—না এমন কিছুই করি নি, ভাই বোনদের চিঠি এসছে সেইটিই দেখছিলাম।

গীতিকা দেখতে পেল চোখের উপর চিঠিটা পড়ে আছে। 'শিবানী ? তোমার বোনের নাম শুনেছিলাম দীপা।'---সে প্রশ্ন করেই একটু গুটিয়ে গেল। বুদ্ধিমান অমরেশ কৌতুহলের অবসান ঘটাল—'এই বোনটি আমার দীপারই মত। এর কথাই আমি এত চিন্তা করেছিলাম।' গীতিকার আরও যেন আতঙ্ক বেড়ে গেল—চিন্তার কারণ এই, জান গীতিকা মেয়েটি যেমন শান্ত তেমনি ধীর। শুধু তাই নয় চরিত্রবতী।

গী—চরিত্রবতী তা কি করে জানলে ?

অ—তা আবার জানব না কেন ? একটি যুবকের সামনে একটি যুবতী যদি সব সময় চলাফেরা করে, কেউ কাউকে জানতে বাকী থাকে না। আমি একে পড়াতাম। দীপার মত এও আমাকে দাদার শ্রদ্ধাই করে, যে সব মেয়ে লুটে খেতে জানে না তাদের জন্যই চিন্তা বেশী হয়। তারা কোন ঘরে কেমন করে পড়বে, জীবনে সুখী হবে কি হবে না---সেই রকম চিন্তাই হয়।

গী—লুটে খাওয়া! 'লুটে' বলতে তুমি কি বোঝ?

অ—এ আর তোমাকে খুলে আমি কি বলব। তুমি শিক্ষিতা। এমনিই ত পরিণত বয়সে সবাই সব কিছু বুঝতে পারে, তার উপর যদি থাকে বিদ্যা।

গী—নাও নাও তাড়াতাড়ি স্নান সার। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরব।

অ—দেখ গীতিকা, আজকে নেহাৎ আমাকে যেতে তুমি বাধ্য করছ, তোমার বাবা মা আমার জন্য এখনও খান নি উদ্‌বিগ্ন তাই। তা না হলে আমি এ রকম নেমন্তন্ন খাওয়া বা করা পছন্দ করি না। আমাকে এরকম ভাবে কেউ খাওয়াতে চেয়ে বিব্রত করবে তা আমি পছন্দ করি না। তার উপর আমরা এক ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী। বেছে বেছে আমাকে এত করে আহ্বান করা কেন।

গী—ও তুমি বোধ হয় এইসব ব্যাপারে একবারেই পক্ষপাতি নয়?

অ—তুমি এতদিনে বুঝছ আমায়। মোটেই না, আদোও ভালবাসি না। যাক গীতিকা আর দেরি করো না। আগিয়ে যাও।

গী—তুমি যাবে না?

অ—হ্যাঁ আমি যাচ্ছি পিছনে। তুমি গিয়ে তোমার মা বাবার চিন্তা দূর কর।

সুন্দরী শিক্ষিতা অহংকারী আভিজাত্য গীতিকার মনটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সে যেমন দাম্ভিক মন নিয়ে এসেছিল ঠিক তার বিপরীত ভাব নিয়ে সে গিয়ে গাড়ীতে বসল।

অমরেশ স্নান করতে করতে অনেক কথাই ভাবছিল। এবার সে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আর দেরি নয়, গীতিকা ত সঙ্গে সঙ্গে পৌছে গেছে। ঝামেলটা চুকিয়ে আসাই ভাল। পথে বেরিয়ে অমরেশ প্রথমে ভাবল গীতিকা কি মন নিয়ে তার কাছে আগিয়ে এসেছে? সে তাকে ভালবাসতে চায়। বড়লোকের বাড়ীর একমাত্র মেয়ে সুন্দরী শিক্ষিতা সব কিছুই তার রয়েছে। এবার পাশ দিয়ে ভাবা যাক ত দাদার কথাটা। অপরাধটা কে বেশী করবে—অমরেশ না তার দাদা? দাদার বিয়ের ঘটনা সবই জানা। পাশে ফেলে কি বাবা একবারও চিন্তা করবে না মানিক আর অমরেশকে? বাবার মনে অনেক আশাই দানা বেঁধে উঠেছে। এবং আশপাশে সকলেরই এক লক্ষ্য

এক আশা। আমিই—আমিই বা কি কম। সেই আশা থেকে কি আমিও বঞ্চিত। না মোটেই না। সবচেয়ে একটা কথা কি ঠিক নয়—অভাগিনী শিবানী আজ যে সব কিছু মুছে দিয়ে আমার শ্রেষ্ঠ পথকে লক্ষ্য করে ভগ্নী ভূমিকায় দাঁড়িয়েছে। তাহলে গীতিকার ভাবা, আশা বৃথা—অযৌক্তিক, অর্থহীন অবান্তর। না না না, অমরেশ সাহা এ সব কিছুই চায় না। যদি সে চাইত তাহলে শিবানীকেই প্রশ্রয় দিত। বিত্ত, প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা সবই সে ভালবাসে কিন্তু সবের উপর চাই আদর্শ। সত্য আদর্শই একমাত্র তাকে আকৃষ্ট করে। কোন ব্যক্তির বাহ্যিক রূপ—তার মূল্য কতটুকু! অন্তরের সম্পদই প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে। যে সম্পদ চিরস্থায়ী অমর অক্ষয় সেই সম্পদই অমরেশ চায়। তা চাইতে হলে সাধারণ চাওয়া পাওয়া ও দেহের ক্ষুধাকে অমরেশকে স্তব্ধ করতেই হবে।

মানবীয় প্রেমের আকর্ষণকে অমরেশ কোন দিনই তেমন গ্রাহ্য করে না। যদিও খোলের ধর্ম অমরেশকে বিচলিত হতে হয়েছে—এমন কি অনেক রাত হয়ত এসব কারণে ঘুমই হয় না তবুও একটা কথাই সে বার বার চিন্তা করে মনকে জোর জবরদস্তি স্তব্ধ করেছে। নইলে যে বীর অমরেশের বীরত্ব ম্লান হয়ে যায়। হযত ঈশ্বরের তাকে পাঠানোর কারণ—তার নিজের চাওয়া পাওয়াকে স্তব্ধ করে দেশের দশের হয়ে বিলিয়ে যেতে। অমরেশ ঐ কথাই মনে মনে ভেবেছে যেমন আগুন আমার মধ্যে রিপু, তেমনি আগুন আমার মধ্যে সত্য-আদর্শ। কেন কেন এ রিপুর পাশে এরা এসে দাঁড়িয়েছে এভাবে! শুধু কি দাঁড়িয়েছে, যখনই দেহ তার তৃপ্তি খুঁজেছে তখনই কোথা থেকে কে যেন বলে উঠেছে শ্রেষ্ঠ কর্মে ঈশ্বর সুযোগ্যকেই আশাই করেন। তবে এ সামান্য চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সে কি করে ঝাঁপ দিতে পারে!

গীতিকাকে পাশে রেখে সে যদি শৃঙ্খলার মধ্যে আজীবন শ্রেষ্ঠ কর্ম করে তাহলে? তাতে তো কোন বাধা নেই। সে তো বরং আরো সুবিধা। সব কিছুই ঈশ্বরের নিঁখুৎ করে লক্ষ্য করা যাবে। না না এ হয় না। এ অমরেশের মনের দুর্বল যুক্তি। তা হলে এক শিবানীকেই পাশে নিয়ে হতে পারত। তখন না হয় তার বয়স কম ছিল। কিন্তু যখন অমরেশের পরিণত বয়স হল তখন শিবানীর কথা কি ভেবেছিল। কিছুই না। তাকে ভগ্নী বলেই মনে স্থান দিতে চেয়েছিল বা চাইল। সত্যিকারের তাকে পাশে রাখলেই তাকে বন্ধ

করা হত। সে গরীবের মেয়ে। আর সহকর্মী যদি চিন্তা করা যায় তাহলে ভালই হত। আহা মেয়েটা কি বুকভরা চাপা দুঃখ নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল! সে সাহস করে অগ্রসর একটুও হতে পারে না। সে তুলনায় গীতিকা কি ভাবে আগিয়ে এসেছে। এখানে শুধু কি তার শিক্ষা ধরব? আর কি তার কিছু নেই? তাহলে অমরেশ কি করে আগিয়ে যেতে পারে এখানে! খুব চিন্তা করে দেখলে অমরেশকে ক্লীব লালায়িত ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। দাদা মানিক সেও যে কাজের কাজই করেছে। না না না অমরেশকে রূপ অর্থে বাঁধতে পারবে না কেউ। যদি অমরেশ কোনদিন কাউকে স্থান দেয় তা সে একমাত্র অসহায়কেই দেবে।

গীতিকা ফিরে এসেছে। মনটা দমড়ানো, মেয়ের মুখ দেখে মায়ের জানতে বাকী রইল না। তবুও জিজ্ঞেস করল—কিরে তুই একলা ফিরলি?

—হ্যাঁ ও পিছনে আসছে বলল!

সঙ্গে সঙ্গে বাবা বেরিয়ে এসে বললে—তোমার গাড়ীতে করে তুলে নিয়ে এলে পারতে।

গীতিকা কি আর বলে, এড়িয়ে গেল—ওর অনেক দেরি আছে বলেই আমি আগিয়ে চলে এলাম।

বাস থেকে নেমে হাঁটা পথে অমরেশ এসে পৌঁছল। গীতিকা চাপা প্রেমের অভিমানে মিছে কাজ নিয়ে না দেখার ভান করে যেন বাইরের ঘরে সে তার তানপুরাতে কি একটা খুট খাট সুরু করেছে। আজ তার গানের মাষ্টার আসার কথা। অমরেশ নির্ব্বিকার এসে ডাক দিল গীতিকা। গীতিকার ভিতরটা যেন ডাক শুনে মোচড় দিয়ে উঠল। তাই তার সাড়া দিতে একটু সময় লাগল।

—কে? যাই।

—ও আমার গলা বুঝতে তোমার দেরি হল বুঝি।

সে কথার আর উত্তর দিল না। দুর হতভাগা অমরেশ প্রেমে পড়তে হলেই পায়ে ধরতে হয়। তবে ত নারী ফিরে প্রেম নিবেদন করে। তা না করে তোর মন যেন ঘোড়া, চাবুক হাতে করে তুই। তাকে ছুটিয়েছিস।

অমরেশ যদি তা চাইত তাহলে কি গীতিকা গাড়ী নিয়ে একাই ফিরত! অমরেশ ত তা চায় না।

ভিতরে অমরেশকে নিয়ে গেল। মা এগিয়ে এলেন—গীতিকা, ওকে নিয়ে আয় অমরেশকে, খাবার দেওয়া হয়েছে রে।

গীতিকার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ ভিতরে গেল। তার মায়ের আহ্বানে অমরেশ রীতিমত আপত্তি জানাল।—আমাদের হোষ্টেলের জীবনে এ সব গুলো ভাল নয়। দেখুন ত আজ আপনাদের কত খাওয়ার বেলা হল আমার জন্য।

—তাতে আর কি হয়েছে বাবা! এরকম দেরি হয়েই থাকে।

—না না এ আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমাদের কখন স্নান কখন খাওয়া—

গীতিকা—থাক খুব হয়েছে। বক্তৃতা না দিয়ে এবার বস ত খেতে।

—তা তুমি বসলে না। তোমাকে দিলেন না?

—আমি আজ পরেই খাব।

—সে আবার কি! তোমারও ত বেলা হয়ে গেছে; যাক সে বেশী কথা বলার ছেলে নয়। মুখ বুঁজিয়ে খাওয়া সুরু করে দিল।

মা—আসলে হয়েছে কি বাবা জান—ও খেতে চাচ্ছে না, তোমাকে নিজে বসে খাওয়াবে বলে। ও চপ তৈরি করেছে।

অমরেশ—না না পড়াশুনার মেয়েরা এত খাতির আপ্যায়নে কি প্রয়োজন! এখনও গৃহী নয় আর কর্ত্রীও নয়। যদিও মেয়ে ছেলে তাহলেও যে ছাত্রী জীবন।

হঠাৎ অমরেশের চোখ গীতিকার মুখের দিকে পড়ল। উত্তর তো নাই-ই, উপরন্ত গোলাপী মুখখানা রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।—কি হল গীতিকা, চুপ করে রইলে যে—ঠিক বলছি না?

—জানি না।

—ও, কথাগুলো বুঝি অপ্রিয় হল—না?

—যাক অমরেশ নিজের মত খেয়ে উঠে গেল। হাত মুখ মুছে বলল—তাহলে এবার চলি? না হলে তোমার আরও খেতে দেরি হয়ে যাবে।

—যাক খুব হয়েছে। আমরা এভাবে অতিথিকে বিদায় দিই না। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়।

গীতিকা অমরেশকে লক্ষ্য করেই সে তার আজ ঘরটা গুছিয়ে রেখেছিল, কিন্তু যেমন ঘর তেমনই পড়ে রইল সে বৈঠকখানার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে

সবার উদ্‌যোগ করতে করতে বলল—আচ্ছা যাও আমি বসছি তুমি খাওয়া দ্বরে নাও।

বাধা দিল গীতিকা বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে—ওখানে কেন আমার ঘরে এস।

—আবার তোমার ঘরে কেন আমি এখুনি বিদায় নেব।

—কেন, কি ব্যাপার বলত তোমার কি এমন রাজকার্য আছে?

—রাজকার্য কি তা তুমি জান না! তুমি তো আমার সঙ্গেই থাক।

—তা হয়েছে খুব, তুমি এখন আমার ঘরে যেয়ে বস আমি খেয়ে আসি।

বেচারী গীতিকা আর অভিমান করবে কি, এরকম সেধেও যদি পায় তবুও সে জকে ধন্য মনে করবে, কিন্তু ভগবান তাতেও বাঁধ সেধে বসে রয়েছেন। সে থা কি গীতিকা জানে!

যাক গীতিকার কথায় আর আপত্তি না তুলে অমরেশ ওর ঘরে গিয়ে বসল। তিকাও পিছন পিছন যেয়ে দাঁড়াল।—বসলে কেন, শুলে না? একটু শুয়ে শ্রাম কর।

—কি ব্যাপার, খাতিরের এত বাহুল্য কেন? তোমার শোয়ার খাটে আমি াব!

হায় রে বেচারী গীতিকা কোথায় দাঁড়ায়! যে কথাই বলছে বুক ভাঙ্গা তুর আসছে তার। তবুও সে মরিয়া হয়ে বলে উঠল—তোমারই বিশ্রামের ন্যই আমার আজ এই চাদরটা পাতা।

—তার মানে, এ হেঁয়ালী তো আমি বুঝলাম না!

—তা আর বুঝবে কেন তুমি! তুমি আর কোন্‌টা বোঝ কোন্‌টা বুঝছ! ত মেহনৎ করে চপটা তৈরি করলাম তা পাত্তাই দিলে না তুমি। এই তো ামার বোঝা! আর না বোঝার জন্যই তো আমার চিন্তা বাড়াতে সুরু রছ।

—এ তুমি কি বলছ গীতিকা? যদি তাই বল না—সত্যিই তাই আমি। মার খাওয়া শোয়া আয়েস আরামের দিকে খুব একটা লক্ষ্য নেই। তবে হ্যাঁ কবারেও না হলে পারব না। মাঝামাঝি মাপিত মত একটা হলেই হয়।

গী—তার মানে তুমি কি বলতে চাও বলত? তোমার মধ্যে কি ভাব লবাসায় বালাই নেই!

জিভ কেটে অমরেশ বলে উঠল--তাহলে তুমি অমোকে এখনও বুঝতে বা চিনতে পার না। বিচার করে বুঝবে যেদিন সেদিন এর উত্তর তোমরা কাছেই পাবে। যাও যাও এখন বেলা হয়ে এসেছে তুমি খেয়ে এস দেখি, অনেকখানি বেলা হয়ে গেল।

—থাক আমার খাওয়ার জন্য তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এক সময় যেয়ে খেলেই হবে।

কোথায় সেই পুরুষ-সিংহ অমরেশ!

অমরেশ—একি একি হচ্ছে, এ যেন মনে আমার চোখে কুয়াসা নেমেছে! আর সেই কুয়াসার আড়ালে কোন্ শয়তান যেন চুপি চুপি অস্ত্র নিয়ে আগিয়ে এসছে। সে ভাল করে নিজের চোখ মুখ নেড়ে চাইল।—একি তুমি এখনও গেলে না?

নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গীতিকা তার আরও সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অমরেশ হাতটা বাড়ালেই সে তার হাতে হাত রেখে অনেকখানি আশ্বস্ত হবে! যাক বিধি বাধা দিয়ে দাঁড়ালেন। যতই হোক মা মেয়েছেলে অনেকখানি বোঝে। সেইজন্য সে নানা কাজের ভান করে গীতিকার জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ বাবা বেরিয়ে এসে বলল—কি হল তোমাদের এখনও খাওয়া হয়নি? খাওয়ার পর বিশ্রাম হয়ে গেল তার। ব্যস্ত লোক। আজ ছুটির দিনেও তাকে এই এখনই কি একটা জরুরী মিটিংএ বেরিয়ে যেতে হবে। বাপের গলা পেয়ে গীতিকা বেশ একটু লজ্জায় পড়ে গেল। যেন কোন পড়াশুনার আলোচনা হচ্ছিল এইরকম কোন ভাব নিয়ে সে রান্না ঘরের দিকে বেরিয়ে গেল। এই অবসরে অমরেশের মনে নানারকমের ঝড় উঠতে রইল। যতই গীতিকাকে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ততই সে মনে চেপে বসছে। এ ত মহা সমস্যা! এ ভাবে কোন নারী আত্মসমর্পণ করলে পরে কোন্ পুরুষের পক্ষে সম্ভব নিজেকে সম্বরণ করা! আগে না হয় তার তেজস্বী দাম্ভিক মুখ দেখে দূরে ঠেলে দেওয়ার উপায় ছিল। কিন্তু এখন! বর্ত্তমানে কোন্ যুক্তিতে তাকে সরাবে। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে সে দুকলম খস খস করে লিখে রেখে বেরিয়ে গেল।—গেটে দারওয়ান একটু হচকচিয়ে গেল তাকে এভাবে অসময়ে একাকী বেরিয়ে যেতে দেখে।

গীতিকা কোনরকমে দুটো মুখে দিয়ে উঠে আসে। শুধু অমরেশের সঙ্গে

ন্নের লোভ আজ। আজ খাওয়ায় সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। কিন্তু হায় একি হল! গীতিকার মাথায় যেন বাজ পড়ল। চারিদিকে খুঁজে দখে কোথাও অমরেশ নেই। শুধু তার বিদায় নেওয়ার সাক্ষী হয়ে পড়ে রয়েছে একখানা ছোট্ট লেখা। প্রথমেই মনে হল—না না এ চিঠিতে আমি হাত দেব না। এ তার কপটতা। এমন কি তার জরুরী প্রয়োজন পড়ে গেছিল যে আমাকে খেতে পাঠিয়ে দিয়ে সে চুরি করে পালিয়ে গেল। পরক্ষণেই ভেবে নিল—আমি চিঠি হাত দিই না-দিই অমরেশ যে রকম প্রকৃতির তাতে তার কি আসে যায়। সত্যিকারের কে কাকে চায়—আমি অমরেশকে চাই না অমরেশ আমাকে চায়? অমরেশ আমাকে চায় বললে ভুল করা হবে। তা তাকে আমার পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে চিঠিটা হাতে করে তুলল।

চিঠি খুলেই চমকে উঠল—প্রথম কোন সম্বোধন নেই শুধু লেখা আছে গীতিকা।—তুমি হয়ত এসে দেখবে আমি নেই। দেখার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশের সম্বন্ধে কত নাই ভেবে ফেলবে। যাক যাই ভাব না কেন, শেষে অমরেশকে বুঝতে বাকী থাকবে না। এরকম ধরণের ভাবাতে আমার কোন হাত বা উপায় নেই। কিন্তু আমি নিজের মনে জানি—আমি মিথ্যাবাদী বা কপট নয়। যদি গীতিকার খাওয়ার আশায় বসে থাকি তাহলে আমার আরও অনেক সময় নষ্ট হবে। তার উপর এড়িয়ে আসা মনে ব্যথা দিয়ে সেটুকুও চিন্তা করে দেখেছি। তার চেয়ে এটা আমার কাছে খুব সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে।

তুমি কি আমার মত পথ জান না! এই কাঁচা মনে পূর্ণ ক্ষুধার সময় যদি সামনে খোরাক আগিয়ে আসে, নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য তা থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় নয় কি? যাক আজ এই পর্যন্তই থাকল। সামনে কোন দিন সুবিধা সুযোগ হলে অনেক কথাই আলোচনার ইচ্ছা রাখলাম।

আজ ঋতা সকাল বেলা স্কুলে যাবে বলে তৈরি হয়েছে। মানিকও অফিসে বেরিয়ে যাবে। সে বলল—হ্যাঁ গো বাবার চিঠিটার উত্তর দিয়েছ?

—ও তোমার বুঝি এতদিন পরে মনে পড়ছে! বা বাঃ!

—কেন এর আগেও তো আমি একদিন বলেছি।

—তাই যদি বলেছ তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ?

—জিজ্ঞেস করার কারণ এই—বাবা ত উত্তর দিতে দেরি করেন না, এটায় দেরি হচ্ছে তাই একবার খোঁজ করলাম।

ঋতার স্কুল মন্দ গড়ে উঠে নি। সে বাচ্চাদের নিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। যে সমস্ত অভিভাবকরা মাঝে মধ্যে আসেন তারা সকলেই ঋতার আন্তরিকতা ও হৃদ্যতায় মুগ্ধ। তারা মহেন্দ্রর গুণেরও কম তারিফ করে না। ইতিমধ্যে কয়েকজন নূতন শিক্ষিকা বহাল হয়েছে। প্রত্যেকের চরিত্রের বৈশিষ্ঠ ধীর শান্ত ও ধৈর্য্যশীল। এ শিশু মহলে বর্ত্তমানে এখনও কোন পুরুষের সুযোগ হয় নি। সুরুতে নারী পুরুষ একত্র কাজ করায় ঋতা পক্ষপাতী নয়। তাই সে মানিককে পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছে—মেয়েদের মেয়েদের মধ্যে এই জিনিসটা আগে ভাল ভাবে গড়ে উঠুক। মেয়েরাই পারে শিশু মনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে। তবে একদিন যে পুরুষ আসবে না ঋতার তা ইচ্ছা নয়। প্রথমটা যদি গড়ে নিতে পারে তারপর কাঠামোর উপর এসে তারা খবরদারী করবে। প্রথমে দরকার অন্তর পরিশ্রম—মমতার সহিত নিঁখুৎ কর্ম। যখন কিছুই নেই তখন পুরুষের মন ধরে না তাই সে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারে না। যখন বড় হয়ে বিস্তারিত ছড়িয়ে পড়েছে তখন আর কুলোয় না নারীর ক্ষমতায়, তখন দাঁড়াতে হয় পুরুষকে। কারণ তারা যে পুরুষ তাদের লক্ষ্য বিশালের দিকে। তাদের মন ভরা খোরাক না পেলে তারা কি করে দাঁড়াবে। নারী যে অল্পতেই সন্তুষ্ট এবং তার সহ্যশীলতা পুরুষের তুলনায় বেশী।

ঋতার মনভাব কি তাই নয় ? কারণ সে যে পুরুষ ঘেঁসা মেয়ে, সে যে অফিসে কাজ করে এসেছে। অনেক পুরুষেরই চরিত্র তার চোখে পড়েছে। এবং অনেকের কাছ থেকে অনেক রকমের গল্পই সে শুনেছে। আর তার মেয়ে মহলের সহপাঠীদের কাছ থেকে যা জেনেছে। কাজেই দুই দিকেই তার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই সে সমস্তকে মেড়ে মচাড়ে নিয়ে নিজের মত করে ব্যক্ত করতে সুরু করেছে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে গুছিয়ে চলা ঋতার চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য।

আজ শনিবার। ঋতা ছাত্রী বা অন্যান্য শিক্ষিকাদের সবকে ছেড়ে দিয়ে

ছুটির পর অফিস ঘরে বসে বসে নিঁখুৎ কর্মে মননিবেশ করেছে। চারধারের হিসাব ইত্যাদির পর খাতায় কি সব লেখালেখি করে যাচ্ছে। তার আজ ইচ্ছাই ছিল সে গোটা দুপুরটা এখানে বসে কাজ করে বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরবে। এ কথা স্বামী মানিক জানত।

মেয়েটির এমনই স্বভাব ছিল—সে বহু বিষয়ে পারদর্শী ও যোগ্য। কিন্তু তা সে নিজের মনে কোন দিনই আমোল দিত না। প্রতি পদে প্রতি কর্মে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা ও তার আদেশ না নিয়ে করত না। এইটিই ছিল তার আর এক বিশেষ ধরনের গুণ। এ তার বরাবরের স্বভাব—আগে ছিল পিতা পরে হয়েছে স্বামী।

নিবিষ্ট মনে লিখে যাচ্ছে। কোন দিকে চাইবার তার অবকাশ নেই। কোন্ এক ফাঁকে উপর দিকে মুখ তুলে চাইতেই সে গোটাটা শিউরে উঠল। মুখখানা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একি এ যে দেবেন। কিন্তু দেবেনের চোখে মুখে চামারের হাসি ফুটে উঠেছে।—কি ব্যাপার ঋতাদেবী।

—ব্যাপার! তার মনে?

—না না, সব শুনেছি।

—না বলি আমার চাইতে মানিককে এত বেশী ভাল লাগল?

—একি বলছেন আপনি?—গম্ভীর গলায় প্রতিবাদ করল ঋতা।

—খারাপ কিছুই বলিনি বা বলছি তা ভালই বলছি।

—না ভাল আপনার এ কথা মোটেই নয়, জানেন আমার স্বামীর সম্বন্ধে আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন না।

—স্বামী! হ্যাঁ তা শেষকালে ঐ রকমই বলতে হয় ও না হলে তো আর সমাজে দেবী আখ্যা নেওয়া যায় না। আর সে মহাপুরুষকেও ধন্য। যেদিন সে আমার মুখ থেকে খোরাক ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল সেইদিনই বুঝেছিলাম। কারণ আমরাও ত আর ঘাসে মুখ দিয়ে চরিনি। দুকলম কালির অক্ষর পেটে রয়েছে।

—দেবেনবাবু সাবধান।

—আহা, আমি ত না হয় সাবধান্ হবই, আমার আগে তুমি সাবধান হও। যে গৃহস্থের মা ঠাকুরুণ হয়ে বসেছ সাবধানটা কার বেশী দরকার হবে?

—তাহলে? আপনি আমার কি বলতে চান?

—না, বলার আর বিশেষ কি আছে। বলতে এই চাই যে সেই যখন এই রকম খেলি তখন একজনকে ফাঁকি দিয়ে আর একজনের কাছ যেয়ে খাবার কি দরকার ছিল। এই রকম সতী চরিত্র কি না দেখালেই চলত না! আরে এর নাম দেবেন মুখুজ্জে। এ যতদূরেই চলে যাক না কেন খবর এ ঠিকই রাখে। তার পরে বাজারে একটা যে ফল দেখে সে ফল খেতে চেয়ে যদি না পায়— তাকে যদি কেউ তাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, দিয়ে সেই ফল সে নিজে ভক্ষন করে তাহলে আগের ক্ষুধার্তির কি অবস্থা হয় তা নিশ্চয় বুঝতেই পারছ?

—না না মোটেই এ জিনিস নয়। সাবধান দেবেনবাবু।

তখন ঋতা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে, যদিও দেবেনের কথাগুলো একটাও সত্যি নয় তা হলো মানিক যে তাকে বাজিয়ে বিবাহ করেছে। উভয়ের মনে কোন পাপই ছিল না। শুধু ঋতার মনে একটা গোপন লুকানো লোভ ছিল। কিন্তু লোভ তার কি! সে জীবনে স্থায়ী ও স্থিত হতে চায়। সুষ্ঠ ভাবে একটি পরিবেশ গড়ে কিছু প্রতিষ্ঠা করে যাবে এই তার মনের বরাবরের ক্ষুধা। সত্যিকারের তার যৌবনের ক্ষুধা খুব বেশী ছিল না। স্বাভাবিক দেহের যা ধর্ম তাই তার ছিল। তবে এ আজ এ লাঞ্ছনা এ অপমান তার ঘর বয়ে ঢুকছে! তার কারণ কি এই নয়—লুচ্চা দেবেন তাকে না পাওয়ার ফলে হিংসা বিদ্বেষ মন নিয়ে নালির কাদা তার গায়ে ছুঁড়ছে! মন না হলেও অন্তত দেহ তার অপবিত্র করে তুলবে বলে। দেবেন চেয়েছিল তাকে লুটে খেতে। আর মানিক সর্ব্বদিক বিচার করে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে —চেয়েছিল জীবন সঙ্গিনী করতে।

ঋতা ধমকে উঠল—যান আপনি, এখুনি আমার আফিস ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

—হ্যাঁ বেরিয়ে যাব আমি ঠিকিই। কিন্তু তার আগে কিছু একটা ব্যবস্থা করে যাব।

ঋতার ভয় যেন আরও বেড়ে গেল। তাইত আফিস রুমে আমি একা। আমাকে রক্ষা করবার মত কে আছে। আমি নারী ও পুরুষ; ওর শক্তির সঙ্গে আমি কি পেরে উঠব! চেষ্টা করব। চূড়ান্ত চেষ্টার মূলে শেষ-জীবন। হে ঈশ্বর, আজ আমি দারুণ বিপদ মুখ। সত্যিই আমার মনের মধ্যে যদি কোথাও পাপ বাসা বেঁধে ছিল, তাহলে আর যেন না আমার দেবদুর্লভ স্বামীর

সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমাকে একবার রক্ষা করে তার বুকে ঠাঁই দিয়েছেন। আবারও তার কাছে আমি কি বলে দাঁড়াব না না দাঁড়াব না। দাঁড়াতে চাই না। আমার শ্বশুর বাড়ীর প্রত্যেককে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা চলে। সে মত অবস্থায় আর আমি তাদের এ মুখ দেখা্ব না। আমি জানি ঈশ্বর—তুমি সত্য ন্যায়, তুমি কখনই অন্যায় অবিচার করবে না।

ঋতার ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবেন চেয়ার ছেড়ে উঠে তার আরও কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। ঋতা সজোরে তার কাছেই রাখা কাঁচের গ্লাসটা বাগিয়ে ধরে বলে উঠে—জয় মা রক্ষা কালী। বলেই সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দরজায় অমরেশ।

অমরেশ প্রথমে ব্যাপারটা আঁচ করতে না পেরে হচকচিয়ে গেছে। দেবেন চক্ষু কুকড়ে এইটুকু। 'ভাই ঠাকুরপো বাঁচাও'—ছুটে এসে ঋতা জড়িয়ে ধরল অমরেশকে। চুল তার এলোমেলো। দু'চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়ছে। এতক্ষণ যে কথার গতি চলেছিল তারই ফলে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে সুরু করেছে—জান আজ আমি দুপুর বেলা নিজের কাজে ব্যস্ত, কোথা থেকে এই মাতাল লম্পট আমাকে এসে আক্রমণ করে।

এদের কথার সুযোগ নিয়ে দেবেন পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। অমরেশ বাধা দেয়—থামুন। আপনি এত শীগ্রি যেতে চাইলে আপনাকে আমি যেতে দেব কেন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এমনও তো হতে পারে যে আমার বৌদি সমস্ত সাজিয়ে বলছেন। দাঁড়ান আপনার বক্তব্যও তা শোনা দরকার। সত্য মিথ্যার যাচাই করতে হবে ত।

মাতালের তখন নেশার ঘোর কেটেছে। সে অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে এই কথাই বলে উঠল—মাপ করবেন আমাকে। আমার বলার মতন কিছুই নেই। এতক্ষণ ধরে ঋতা দেবীর সব কথা যদি শুনে থাকেন তবে সত্যবাদী রিত্রবতীর কথা ঠিক বলেই জানবেন। আমি হচ্ছি মাতাল দেবেন মুখুয্যে।

অমরেশ মুখের দিকে চেয়ে একটু হচকচিয়ে গেল।—তবে যে শুনেছি আপনি দাদার সঙ্গে কাজ করতেন! একজন ইন্‌জিনিয়ার বড় পদ নিয়ে অন্য জায়গায় গেছেন।

—কথাগুলো হয়ত মিথ্যা নয়।

হয়ত বলার কারণই হল যে সে অত বড় একটা এগার'শ টাকা মাইনের

অফিসার তা তাকে দেখে কে বলবে। মদের আড্ডায় বসে তাকে এর ওর কাছে হাত পাততে হয়। তার ত আজ এই পরিচয়।

অমরেশ বলল—দেবেনবাবু একি বলছেন আপনি! সামান্য মদ তার কাছে আপনার মান, মর্যাদা, শিক্ষা, অর্থ সব জলাঞ্জলি দিয়ে দেবেন। না না এ আমি হতে দেব না আপনাকে ভাল হতেই হবে।

—এ আপনি কাকে কি বলছেন! দেবেন! দেবেন—সে মরে গেছে। যাকে দেখছেন সে লুচ্চা মাতাল।

—তা বললে কি হয় না কি। এ সব কি কথার মত কথা হল?

দেবেন পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল। অমরেশ শুধু তাকে এই কথাই বলল—যাচ্ছেন বটে যান কিন্তু আমার কথাগুলো আপনি স্মরণ করবেন। মানুষের শ্রেষ্ঠতাকে এভাবে নীচে নামাবেন না। আজ যদি আপনি অশিক্ষিত মূর্খ হতেন তাহলে আমার বলার বিশেষ কিছু ছিল না। এক অজ্ঞ মূর্খ যা করবে একজন জ্ঞানী শিক্ষিত যদি তাই করে তাহলে শিক্ষা বা জ্ঞান ম্লান হয়ে যায়।

দেবেন কিন্তু দাঁড়িয়ে সমস্ত কথাগুলো শুনে বেরিয়ে চলে গেল।

ঋতা বলল—তারপর ঠাকুরপো কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ আজকে এসময়ে? যাক তোমায় আর জিজ্ঞেস করব কি, এ ঈশ্বরের করুণা। না হলে আজকে আমার যে কি অবস্থা ঘটত, ভাবতেও ভয় পাচ্ছে।

অমরেশ ও কথার দিকে না যেয়ে শুধু সে এই কথাই বলল—না ভাবলাম তোমার নূতন স্কুল কেমন চলছে একবার দেখে যাই। তাই একদিনের মত চলে এলাম।

ঋতা—খুব ভাল হয়েছে ঠাকুরপো। আজকে বেশ সকলে মিলে এক সঙ্গে বসে অনেক কিছুই আলোচনা করা যাবে, উৎসাহিত মন নিয়ে কাজে ত নেমেছি। কিন্তু কি ভয় করছে রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে খেতে পারি না! এ জিনিস যদি ঠিক ঠিক মতন দাঁড় করাতে না পারি তাহলে একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠবে। শিব গড়তে বাঁদর গড়া হয়ে যাবে। অল্প মাইনায় চাকরি নিয়ে বেশ ছিলাম। কেন বৃহতে হাত বাড়াতে গেলাম—এই কথাই মনে হবে। ছিঃ ছি: ঠাকুরপো সে বড় লজ্জাকর হয়ে উঠবে।

অম—আঃ ও কথা ভাবছ কেন তুমি। একটা কথা তুমি জানবে বৌদি—

গভীর মনে যদি দৃঢ়তা থাকে তাহলে সে কখনই অকৃতকার্য হতে পারে না।
তবে হ্যাঁ নানা রকম ঝড় ঝাপটা আসবে বৈকি। তুমি যে বেশ চিন্তা কর তা
তোমার চেহারাতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এত বেশী ভেবে শরীর ভেঙ্গে
ফেল না। শুধু সূক্ষ্ম চিন্তা কর—কি করব।

—"দিদিমণি ও দিদিমণি। আপনি এখনও যান নি পাঁচটা বাজতে গেল।
তাইত অফিসরুম খোলা দেখে আমি একটু হচকচিয়ে গেছি।" মহেন্দ্র সে
কিছু চারা ও বীজ সংগ্রহ করে এনেছে। অবশ্য আগে থেকে আনার কথা ছিল।
মহেন্দ্র কথাগুলো বলতে বলতে ঘরেব দিকে এগিয়ে এসে দেখে অমরেশ।—'এই
য মেজবাবু কখন এলেন? নমস্কার।' বিনয়ে মাথা নীচু করল মহেন্দ্র।

প্রতি নমস্কার—থাক থাক।

শ্ব—আমার কেন দেরি হল জান—আমি চারটেয় চলে যেতাম। তোমার
বাবু হয়ত আমার জন্য খুবই চিন্তা করেছে। কারণ চারটেয় আমার যাওয়ার
কথা ছিল। এখানে বিরাট ব্যাপার হয়ে গেল। পণ্ড দেবেন এসে বেশ কিছুক্ষণ
গামেলা করে গেল।

ম—দেবেনবাবু! সর্ব্বনাশ তারপর কি করলেন দিদিমণি?

—কি আর করব! তোমাকে তো অনেক দিন অনেক কথাই বলেছি—
শ্বর তিনি ঠিকই আছেন। আমাদের দুরব্যবহারে হয়ত তিনি দূরে সরে
থাকেন। আর আমরা যখন তখন তাঁকে চাওয়া মাত্রই না পেলেই বলি—
শ্বর নেই। যদি প্রকৃত কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে সত্য পালন করে যায় তবে সব
জায়গায় সর্বক্ষেত্রেই সেই শক্তিমান পরমপুরুষ এসে দাঁড়ান! আমার আজকে
এমন অবস্থা হয়েছিল আর এমন মরশুমে ঈশ্বর এমনই সাহায্য করলেন যে তা
চিন্তা করতে পারব না। যখন আমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছি অসহায় তখন
আমার একেবারে সামনে ঠাকুরপো দাঁড়িয়ে গেছে। ঠাকুরপো না থাকলে
আমার বোধ হয় বাঁচার পথ ছিল না। একি তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলবে
না?

এদিকে মানিক খুব চঞ্চল হয়ে উঠে। তা উদ্‌বিগ্ন হবারই কথা। কথার
খলাপ এদের স্বামী স্ত্রীর জীবনে হয় না। ঋতার মধ্যে কর্ম করার
প্রবণতা বরাবরই। তবে মানিকের সংস্পর্শে কতকগুলো বিশেষ গুণ ঋতার
বেড়েছে। যাই হোক ভাবনার অবসান হল, এরা এসে পৌছল।

মানিক প্রথমে একটু হচকচিয়ে গেছিল অমরেশকে দেখে—কি ব্যাপার খোকা তুই যে। তা তুই বুঝি সোজা তোর বৌদির স্কুলে উঠেছিলি ?

ঋ—আর বল কেন, শুধু উঠেছে না, কি যে এক কাণ্ড হয়ে গেল।

মা—কাণ্ড! কি কাণ্ড ?

অম—থাক সে পরে হবে। এঁর আগে চা জলখাবারের ব্যবস্থা কর।

ঋতা ভিতরে চলে গেল। আর এরা দু ভাইয়ে মামুলী পাঁচটা কথা সুরু করল। মানিক এতক্ষণ স্ত্রীর জন্তই অপেক্ষা করছিল। সেও কিছু খায়নি। এর মধ্যে মানিক ভাইকে জিজ্ঞেস করল—কি ঘটনা হয়েছিল রে? মানিকের জিজ্ঞেস করার কারণই হচ্ছে স্কুলটা সবে মাত্র খোলা হয়েছে, ঋতা শিক্ষিতা চাকুরে হলেও তবুও তো সে মেয়েছেলে। তাই পাঁচটা আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই সে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু ঘটনাটি একেবারেই বিপরীত। এ মানিক কোনদিন ভাবতেও পারেনি। অমরেশ শেষে বলল—এবার বৌদির কাছে বিস্তারিত শুনবে।

ঋতা আসতে এরা সোজা হয়ে বসল। ঋতাও এদের কাছে নিজের চা নিয়ে এসে বলল—'এবার তাহলে গোটা ঘটনাটা বলি শোন। তোমার তো মহামান্য দেবেনের কথা নিশ্চয় মনে আছে ? আজ হঠাৎ তাঁরই আবির্ভাব।' বলেই সে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা নিঁখুৎ করে বলল। সহজ সরল ভাষায় সে বক্তব্য ব্যক্ত করে শেষ পর্যন্ত বলে।

মানিক ঋতার মুখের দিকে চেয়ে প্রথমটা একটু চমকে উঠেছিল—'দেবেন ?' শেষে ও বলল—আমার মনে হয় তুমি এভাবে আর একলা কোনদিন থাকবে না। নেহাৎ যেদিন কাজ থাকবে সেদিন মহেন্দ্রকে আটকাবে।—বলেই ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলল—কি অমরেশ, তাই না ?

ভাইও দাদার সায়ে রায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ ঠিকই। তবে ও এখানে থাকে না ত।

মানিক—থাকে না-কবে কোনদিন আসবে-মাতাল লোককে বিশ্বাস কি! মানিক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুধু এই কথাই বলল—ওঃ মানুষের পরিণতি কি হতে পারে! ভদ্রলোক ফার্ষ্ট ক্লাস নিয়ে বেরিয়েছিল। কি তার তুখার বুদ্ধি। আজকে কোথায় যেয়ে নেমেছে! এই রকমই হয়। জানিস খোকা, একটা ভাল জিনিস যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সকলেরই মনে এই রকমই

লাগে। আর একটা জিনিস জানবি ভাল হতে অনেক সময় লাগে আর খারাপ সে সহজেই ঠাঁই করে নেয়—তর তর করে নীচে নামিয়ে দেয়।

অম—তা ত বটেই ধাস খেতে আর সময় লাগে কতটুকু!

ঋ—আমার যতদূর মনে হয় বাড়ীর শিক্ষা ভাল ছিল না। তা না হলে এতদূর নামতে পারে!

এরপর স্কুল প্রসঙ্গে পাঁচটা আলোচনা সুরু হল। অমরেশ জিজ্ঞেস করল—ভাল কথা স্কুল ইন্সপেক্টর, এস, ডি, ও এরা সব এসে ঘুরে যায় নি?

ঋ—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে সে কথা বলা হয়নি। খুব প্রশংসা করে গেছেন। তোমার দাদার চেষ্টাতেই ওদের আসা যাওয়া মাঝে মধ্যে হয়। সরকারের তরফ থেকে কিছু পাওয়ার পথ করে দিয়েছে। এবার স্কুলের আয়তন বাড়ালে বাড়াতে পারি। বল কি করা সমীচীন?

অম—মন্দ কি, তাহলে এই ভাবে আর একটা সুবিধার দিক এগিয়ে এল।

পরদিন সকালে দুইভাই স্কুল দেখার জন্য বেরল। পুরনো জিনিস নূতন করে গড়বার জন্য বার বার দেখতে হয়। কোথায় কোনটি কি ভাবে বসবে। পথে মহেন্দ্রকে দেখতে পেল। সে ওদেরই কাছে যাচ্ছিল। কতকগুলো ফুলের বীজ নিয়ে সে এখন বাগান গুছাতে ব্যস্ত। স্কুলে বাগান না হলে চলে না। এই শহরে মানুষ প্রকৃতির আর কতটুকু ছোঁয়া পায়! বাগানের অভিজ্ঞতা মহেন্দ্রর ছেলেবেলা থেকে। অফিসেও সে সুন্দর একটি বাগান করেছিল।

এদিকে এদের স্কুল দেখে চারধার ঘুরে কাজ গুছিয়ে ফিরতে প্রায় বেলা এগারটা হয়ে গেল। গুণমন্ত বৌ ঘরের সর্বকর্ম সেরে যেন তাদের অপেক্ষায় বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কপাটের কড়া নাড়তেই তার আর বুঝতে বাকী রইল না যে এ তার দেওর স্বামী বৈ আর কেউ নয়। খুলেও দেখল তাই—কি হল তোমাদের এত দেরি?

—হ্যাঁ মহেন্দ্রকে যে রাস্তায় পেলাম। ওকে নিয়ে বাগানে বীজ ছড়াতে সময় গেল।

খেতে বসে অমরেশ রান্নার খুব প্রশংসা করছে। প্রশংসা করার মত বলেই প্রশংসা করছে কোন উচ্ছ্বাস নয়। এই শিক্ষা এরা শিবশঙ্করের কাছ থেকেই পেয়েছিল। শিবশঙ্কর স্বভাবই হচ্ছে যে যা তাকে তাই বল। যদি সত্যকে

গোপন করতে চাও তাহলে তার ফল ভাল হয় না। কারণ ব্যক্তি মাত্রেই জানে ভাল কোনটা মন্দ কি। ভালকে চাপবার চেষ্টা করলে তাতে নিজেরই বিকৃতির পরিচয় দেওয়া হয়। তবে হ্যাঁ কোন উচ্ছ্বাস থাকবে না। বরং খারাপকে ভাল পথে আনার জন্য অনেক রকম সাজিয়ে উৎসাহিত করতে হয়। এই হল তার নীতি। এই নীতিটিই এরা অনেকেই পেয়েছে।

গতকাল রাতেই অমরেশ তাঁর হোষ্টেলে ফিরে গেছে। আজ সোমবার। ক্লাস করতে গেলে গীতিকার সঙ্গে দেখা হবে। তা হলেই আর হয়েছে কি! ও আমার উপর মনক্ষুণ্ণ হবে ত। তা আর কি করা যাবে। যাক ও নিয়ে আর চিন্তা করার কিছু নেই।

অমরেশ ক্লাসে ঢুকছে আর ঠিক সেই সময় গীতিকাও ঢুকছে। গীতিকা না দেখার ভান করে পেরিয়ে গেল। অমরেশ কিন্তু সহজ সরল ভাষাতেই বলল— কি ব্যাপার গীতিকা তুমি যেন আজকে একটু সকালেই পৌছে গেছ।

অনেকেই অমরেশের দিকে ঝুঁকেছিল। ধোপে কেউই টেকে নি। যোগ্যতায় কে পারে এই পুরুষ সিংহের পাশে দাঁড়াতে। সকলেরই মনে তাই গীতিকাকে নিয়ে একটা সম্ভাবনার দানা বেঁধে উঠেছিল। পাঁচটা মুখরোচক আলোচনা প্রফেসর মহলেও ছড়িয়ে পড়ে। তবে অমরেশ বরাবরের ভাব ভঙ্গি এদের চিন্তাভাবনাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয়নি। বরং তারা মাঝে মধ্যে নিরাশই হয়েছে। গীতিকা সাধারণ চাওয়া পাওয়ার ঘরের স্বাভাবিক নারী। নিজের আগুনকে সে নিজেই বোধ করি অনুভব করতে পারে না। আর পারার কথাও নয়। তার লাগাম অমরেশের হাতে ধরা বলেই সে একটু আধটু অসুস্থ হলেও রোগগ্রস্থ হয়ে একেবারে বিছানা নেয় নি।

গীতিকা এড়িয়ে যেতে চাইল। অমরেশ ভুলেও পাত্তা দিতে চাইল না। গীতিকা ভেবেছিল এই ভাবেতে অমরেশ আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে টানা হয়ে আসবে। কিন্তু গীতিকার ভাবাটাই যে ভুল। তাহলে অমরেশ অত কাছে পেয়েও কখনও ছিটিয়ে দিয়ে চলে আসে! সে তার সহপাঠি হিসাবেই খবরটা নিয়েছিল। খানিক ক্ষণের মধ্যেই গীতিকা তার রূপ বদল করে জিজ্ঞেস করে—

'হ্যাঁ তখন যেন আমায় কি জিজ্ঞেস করছিলে ?' অমরেশ তখন আর একটি মেয়ের সঙ্গে খুব গল্পে ব্যস্ত। ইউনিয়নের সেক্রেটারী অমরেশ সাহার কাছে মেয়েটির একটি আবেদন আছে। নতুন ভর্তি হয়েছে। বাংলায় এম.এ. পড়তে ঢুকে সে এক বিভ্রাটে পড়েছে। বাংলার অধ্যাপক সমর সিংহ লক্ষ্য করেছে মেয়েটিকে। অসীমা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ন্যায় নীতি মোটামুটি মেনে চলে। বিলিয়ে যাবার পক্ষপাতি নয় বলেই আত্মরক্ষার জন্য অমরেশের শরণাপন্ন হয়েছে। অমরেশ দুঁদে ছেলে। অধ্যাপক মণ্ডলে সকলেরই স্নেহের পাত্র। কিন্তু যেই আজ প্রতিবাদের সুর নিয়ে সে পাঁচ কথা বলতে এগিয়ে গেছে অমনি সে সকলের সমালোচনার পাত্র হয়ে দাঁড়াল। পাঁচরকম সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল জন কয়েকের মনে। পরিস্কার সমর সিংহ তাকে বলেই বসলেন—কি ব্যাপার বলত তোমার এত interest কিসের ?'

অমরেশ কটাক্ষ প্রত্যক্ষ জেনেও রাগল না। কিন্তু পরিস্কার বলিষ্ট গলায় বলল—আর কিছু নয় স্যার, আমার বক্তব্য এই যে, যে যার প্রতি লক্ষ্য নেবে সে যেন তার শেষটুকু রাখে।

—তার কেন অমরেশ বলছ ? যদি সেরকম বুঝি যে শেষ তার রাখার মত নয় ? চলার পথে চলতে চলতে অনেক কিছু হয়। কিন্তু তাই বলে কি তার শেষ নিয়ে জড়িয়ে পড়া যেতে পারে।

—কথাটা ঠিক বলেছেন স্যার। তবে জ্ঞানী বুদ্ধিমানের এই করাই উচিত নয় কি ? চলার পথে পা ফেলে চলতে গিয়ে যা কিছু চোখের উপর পড়ল মুহূর্তে সেইরকম বিচার করতে হবে। এরই মূলে যাচাই হবে শিক্ষা জ্ঞান। একটা মূর্খ চলার পথে যা করবে এক শিক্ষিত কি চলার পথে তাই করবে স্যার ? তাই যদি হয় তাহলে একটা শিক্ষিতর মূল্য ! আপনি কি বলতে চান ! আমার কথাগুলো চিন্তা করে দেখুন—দু'দলের কেন এত প্রভেদ।

সমর সিংহ—অমরেশ, মনে কর একটা মাঠের উপর দৌড় দিয়েছি। সমুখে কেউ পড়েছে, তাকে তখন বিচার করার শক্তি কি থাকে ?

অম—এর উত্তরে আমি বলব—আপনার সামনে যে পড়েছে আপনি আপনার জীবনকে ধূলিস্মাৎ করে তার জীবন বাঁচান। স্পিড-এ ছুটতে যেয়ে দাঁড়িয়ে গেলে দুর্ঘটনটা আপনার উপর দিয়ে হয়ে যাবে তাই হোক। সমুখের জন বেঁচে যাক। তারই নাম শিক্ষা।

অমরেশ বলে চলে—আজকে যার জন্যে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলতে এসেছি, আপনি আজই কি তার সম্বন্ধে চিন্তা করবেন স্যার। দীর্ঘ দিন ধরে তার সম্বন্ধে চিন্তা করবেন—কোথায় অমরেশের স্বার্থ ছিল। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েটি। যদি আপনি ওকে লক্ষ্যটা ঠিক ভাবে নেন তাহলে ওদের প্রত্যেকের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তা না করে তার চলার পথে যদি বাধ সাধেন তবে বড় চিন্তার কথা। তিলে তিলে তার মনে আশা দানা বেঁধে উঠবে। তারপর সমস্তই একদিন তাকে সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তাহলে ভাবুন তো স্যার—সে এখন কোথায় দাঁড়ায়। দয়া করে শেষ উত্তরটা আপনিই আমাকে দেন। কারণ আপনি শিক্ষক আমি ছাত্র—অনেক কথাই বলে ফেলেছি।

সমর সিংহ অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে শুধু এই কথাই বলল—না এ আর বলা বলির কি, সব আলোচনা হচ্ছে।

অধ্যাপকের যে অমরেশের প্রতি রাগ হল না তা নয়, কিন্তু তিনি তা গভীরেই রাখবেন।

গীতিকা আড়ালে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া অমরেশকে লক্ষ্য করছিল। তার ভাবভঙ্গি বক্তব্য সব দেখে শুনে সে স্তম্ভিত। তার ভক্তি শ্রদ্ধা অমরেশের প্রতি উছলে উঠল। পাশেই অসীমা এই কথাই মনে করছিল—সবাই যে বলে এতদিন শুনতাম, যে গরীবের ভগবান। তাই আজ সাক্ষাৎ চাক্ষুস আমি প্রমাণ পেলাম।

ভিড়টা কেটে যাওয়ার পর সমর সিংহ ঘুরে অমরেশের কাছে এগিয়ে গেল—জান অমরেশ, তুমি যে ছাত্রটিকে দিয়েছ সে ছেলেটি বিশেষ সুবিধার নয়! গরীবের অনেক ঘোড়া রোগ দেখা দিয়েছে।

একটি কলেজের ছেলে অমরেশকে ধরেছিল। গরীব বলেই তার ব্যবস্থা করে দেয় অমরেশ। কিন্তু ইদানীং তার সম্বন্ধে পাঁচরকম শোনা যাচ্ছে। অমরেশ সেইজন্য খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়ে অধ্যাপককে বলে উঠল—ঠিক আছে স্যার আমি ওকে আমার হোষ্টেলে আচ্ছা করে ধাঁতিয়ে দেব।

অনেকক্ষণ ধরেই পা ঘসছে দাঁড়িয়ে গীতিকা। কি ব্যাপার—সবাই চলে গেল গীতিকা দাঁড়িয়ে! অমরেশের যা মনে ছোঁয় তাই মুখে ফেটে পড়ে।

গীতিকা আমতা আমতা করে উত্তর দিল—না কয়েকটা কথা ছিল।

অমরেশের যেন উত্তর ঠোঁটের ডগায় তৈরি ছিল—তা আজকে ত আর হবে না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্য এক সময় এস।

কথাটা শুনে গীতিকার বুকটা চুরমার হয়ে গেল—উঃ এরকমও পুরুষ হয়। আমার কি নেই! তবুও এর কাছে আমি যেন নিতান্তই মূল্যহীন। তবে কি অন্য কাউকে ভালবাসে! তাই বা বলি কি করে। চোখের উপরে তারও তো কোন লক্ষণ বা প্রমাণ দেখছি না। যেমন দুঃখ তেমনই তার আকর্ষণও বাড়তে রইল।

সত্যিই সত্যকারের যদি কারও সত্য আদর্শের ক্ষুধা থাকে তাহলে তার দেহের চাওয়া পাওয়া তাকে কতক্ষণ বিব্রত করতে পাবে। আজকে কি সেই অবস্থাই গীতিকার এসেছে না। দেহের ক্ষুধাতেই অমরেশের দিকে গীতিকা এগিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অমরেশের ভাব ভঙ্গি দেখে কোথায় এখন তার সেই প্রেম! কিন্তু প্রেম তার প্রেমই রইল। রূপ নিল সে অন্য। এই অমরেশের সঙ্গী যদি কেউ থাকতে পারে সাবাজীবন তাহলে কি সে তার জীবনকে ধন্য মনে করবে না। এত বড একটা সত্য আদর্শের আগুন, কি করে এ থেকে সরে দূরে থাকা যায়! এইখানেই বোঝা যায় যে গীতিকার মধ্যেও আগুন ছিল। কিন্তু ব্যক্ত হবার সুবিধা সুযোগ ছিল না। সেইজন্য সে এই ধরণের চাওয়া পাওয়াব মন নিয়ে এগিয়েছিল। এখন তার শযনে স্বপনে একমাত্র চিন্তা—অমবেশকে আমাব চাই। ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ মমতা এরাই স্থায়ী। প্রেম সে কামেরই উপচার। তবে কোথাও কখন দেখা গেছে স্নেহ মমতায সে বিলিযে যায়। সেখানে প্রেম তাব প্রকৃত রূপ ধাবণ বরতে পাবে না। কখনও অবস্থার চাপ কখনও মনের চাপ। কাজেই সেই জিনিসই সে রূপান্তবিত করে—ঠিকই কাজে লাগায। কোথাও বা সব চুরমার হযে যায।

শিবশঙ্কর যে একখানা চিঠি দিয়েছিল তার উত্তর সে সময মত পেল। হৃদয বাবু লিখছেন ; তার চিঠিব ভাষা খুব সহজ সরল।—তাদের এ কাজ করাতে আপত্তি নেই। তবে উচ্চ শিক্ষিত ছেলে দীপাব বিদ্যাতে একটু গাঁইগুঁই করেছিল। কিন্তু মাতৃভক্ত সন্তান মাযের দেখাতে ও মাযের বলাতে তাব আর কোন আপত্তি নেই। শিবশঙ্করকে আমন্ত্রণ জানিযেছেন তাদের বাড়ীতে মেয়ে ছেলেকে দেখা শুনার জন্য।

শ্রীমতী চিঠির বিষয় বস্তু জেনে বলল—তোমার আর দেরি করা চলে না, যত শীগ্রি পার যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

শিবশঙ্কর বলল—তাই ত আমার একার দেখতে কিরকম হবে—আমি একা কি বুঝব, খোকা সঙ্গে থাকলে ভাল হত। খোকাকে নিয়ে যেতাম।

শ্রী—তা একেবারে যেয়েই কেন, তুমি এবারটা দেখে এস না। তারপরে দরকার হলে খোকাকে ডাকা যাবে। এটা হচ্ছে সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে আত্মীয়তা করতে চেয়েছে। তোমাকেই ডেকেছে তাদের বাড়ীতে। তাই তুমিই আগে ফিরে এস। সেরকম দেখে পরে না হয় খোকাকে নিয়ে যেও।

শি—আর তুমি? তোমারও কি একবার দেখা উচিত হবে না?

শ্রী—আমি-আমি আর কি দেখব! ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার সঙ্গে যেভাবে আলাপ হল তাতে ত মানুষ চেনা হল। আর ঘর দুয়ার সেরকম আর দেখার কি আছে! শিক্ষিত ঘর কিছু কিছু ত অসুবিধা থাকবেই। সে মেয়েকে গিয়ে মানাতেই হবে। সে হচ্ছে নারীর গুণ। এক পরিবেশ থেকে আর এক পরিবেশে যেয়ে পৌছালে বহুরকমের অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু সেটাকে সামঞ্জস্য করাটাই হচ্ছে নারীর কৃতিত্ব। আমরা দেখব কি—ছেলেটি শিক্ষিত কি না, কর্মী, উপার্জ্জনক্ষম কি না, পয়সার অপব্যয় আছে কি না। বাকী খুঁটি নাটি গুলো দেখার আমাদের প্রয়োজন নেই।

শিবশঙ্কর সায় দিয়ে বলল—কথাগুলো ঠিকই। তাহলে আমি ভোরের গাড়ীতেই বেরিয়ে যাই।

শ্রী—হ্যাঁ তাই এস।

শিবশঙ্কর বাড়ীতে যেয়ে যখন পৌছল তখন সমুখেই শ্রীমান দাঁড়িয়েছিল। আজ রোববার। তাই কাজের তাড়া নেই। নিতান্তই অপরিচিত লোক সেইজন্য জিজ্ঞেস করল সে—কে আপনি?

উত্তরে শিবশঙ্কর বলল—তুমি কি আমায় চিনবে বাবা?

মনোরঞ্জনের চিনতে আর বাকী রইল না স্বর আর সুরেতে। আগেই অবশ্য চিঠি পত্রের মারফতে সে যে কিছু না জেনেছিল তা নয়। তাই বাইরের ঘরে আপ্যায়ন করে বলল—বসুন। ভিতরে গিয়ে সোজা বাপকে খবর দিল—বাবা, কে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।

কে আর অপরিচিত ভদ্রলোক হবে, তাহলে বুঝি শিবশঙ্কর বাবুই এসেছে। বাইরে হৃদয় বেরিয়ে এসে দেখে ঠিক যা ভেবেছিল তাই।—তা বেশ বেশ।

শিবশঙ্কর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হৃদয় হাত তুলে নমস্কার করতে উদ্যত, শিবশঙ্কর বলে উঠল—দাদা আপনি করছেন কি! বলেই সে তার শ্রদ্ধাযুক্ত প্রণাম মাথা হেঁট করে জানাল। শিবশঙ্করকে হৃদয় ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। অপরিচিত সে নয়। মনোরঞ্জনের মায়ের সঙ্গে আগেই ভালভাবে আলাপ হয়ে গেছে। মনোরঞ্জনের মা এগিয়ে এসে বলল—তা কখন রওনা হয়েছিলেন?

শিবশঙ্কর সহজভাবে কথা বলতে গিয়ে কোথায় যেন বাধা পেয়ে বলল—এঁ্যা---ভোর বেলায়।

আমার ছেলেকে দেখলেন ত? ঐ আমার ছেলে, মনোরঞ্জন।

—তা আবার দেখব না কেন বৌদিদি। সামনে চাঁদ থাকলে কি আর চোখ এড়ায়!

—না চাঁদ আর কি!

—হ্যাঁ তা ত আপনি বলবেনই।

মনোরঞ্জনকে সামনে ডেকে শিবশঙ্কর কয়েকটি প্রশ্ন করল। শেষে বলল—বাবা আমার মেয়ে ত অল্প শিক্ষিত, তোমার এই উচ্চ শিক্ষার পাশে মানাবে ত?

—দেখুন মানানোটা অনেক সময় মনের উপর নির্ভর করে। লেখাপড়াটাই যে খুব বড় কিছু, তা আপনি বলছেন কেন! তবে হ্যাঁ, শিক্ষার একটা দাম আছে।

—তাহলে তুমি কি ছাপকেই সব মনে কর না?

---গুণকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাই বলে যে একবারেই মূর্খ সেটাই বা কেমন করে হয়! সবের উপর জানবেন—এখানে আমার বাপ মায়ের উপর কথা বলতে আমি রাজী নয়।

শিবশঙ্কর বেশ বুঝল—তাদের সকলকে নিয়ে এদের ঘরে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হয়েছে।—তাহলে বাবা তুমি একদিন চল, দেখে আসবে।

হৃদয় কাছেই ছিল বলল—হ্যাঁ তা যাবে বৈকি। ও ওর বন্ধু বান্ধব নিয়ে একদিন দেখে আসবে। আর একটা কথা কি ঠিক নয় শিবশঙ্কর, খোলামেলাই

সব কিছু ভাল। আমরা যতই দেখে বলে ঠিক করি না কেন, ছেলেমেয়েরা নিজেরা নিজেদের দেখে নিলে পরে কোন চিন্তার কারণ থাকে না।

শি—তাহলে আপনারা কবে যাচ্ছেন আমি একটু জেনে গেলেই ভাল হয়।

হৃদয়—ঠিক আছে যাওয়ার আগে জানানো হবে।

শিবশঙ্কর রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে যায়।

পরদিন ভোর এসে বাড়ী পৌছল। শ্রীমতীর প্রশ্নের উত্তরে শিবশঙ্কর মোটামুটি তার অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করল। তারপর কয়েকদিন গেলে একদিন হৃদয়ের চিঠি এসে পৌছল।

ওরা সামনের রবিবার আসছে বলে লিখেছে। ছেলে তার তুজন বন্ধু সঙ্গে আসছে। সঙ্গে মেয়ে জামাইও থাকবে। শ্রীমতীকে চিঠিখানি পড়ে শুনিয়ে শিবশঙ্কর বলল—রবিবার দিন খোকারও আসার কথা আছে। কিন্তু যদি কোন কারণে আটকে গিয়ে থাকে! তাই আজই, সময় যখন নেই, একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুর ডাক পড়ল।—কিরে তুই পারবি গুছিয়ে কাজটা করে আসতে?

—কি কাজ? সব শুনে মণ্টু বলল—কি বল বাবা, পারব না কেন? খুব পারব।

শিবশঙ্কর ছেলেদের উপর বরাবরই বিশেষ আস্থা রাখে। তাই দ্বিতীয় কোন কথা না বলে ছেলেকে টাকা পয়সা দিয়ে বুঝিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র খোকা বেরবে স্থির করল। আজ শনিবার বিশেষ তাড়া নেই কলেজে। তাই সকালেই রওনা হবে। হঠাৎ দেখে হোষ্টেলে গীতিকা এসে হাজির। অমরেশ একটু চমকে উঠল—কি ব্যাপার গীতিকা এমন সময়?

—বাবা আজ সকালে চা খেতে বসবে। এমন সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

—তা কে দেখছেন? কি কারণে এমন হল? ইত্যাদি পাঁচটা প্রশ্ন করে অমরেশ সব জেনে নিল।

গী—পাশেই একজন ডাক্তার থাকেন। তাকে ডাকতে তিনি এসে বলেন—হাই প্রেসার। তা আমার ভাল লাগছে না, তাই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে এলাম।

অম—এ ত বড় চিন্তার কথা! আমার আজ একখানা টেলিগ্রাম এসেছে আমাকে বাড়ী যেতে হবে।

গীতিকা চমকে উঠে—টেলিগ্রাম!

—না না ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটা আমার বোন দীপাকে দেখতে আসবে।

—ও, তাহলে কি করা যায়?

—সে কথা তো ঠিকই। আমার মনে হয় যে ডাক্তার উনাকে দেখেছেন আগে চল তার সঙ্গে আলোচনা করি। এত ব্যস্ত হবার কি আছে।

—না আমার খুব ভয় করছে। জানত বাবা ছাড়া আমার আর অবলম্বন কেউ নেই।

—না তা ভাবছ কেন? এ কথা এরই মধ্যে ভাববার কি এমন দরকার পড়ে গেল। তুমি বড়লোকের বাড়ীর শিক্ষিতা মেয়ে।

—কিন্তু যতই বল—আমি তো মেয়েছেলে বটে। আমার তো একটা অবলম্বন আশা করব।

—ও ঠিক হয়ে যাবে—ও জন্তে চিন্তা করবার কিছু নেই।

মুহূর্তে গীতিকার মনে খেলে গেল—তবে কি অমরেশের মনে কোথাও কিছু আছে! কিন্তু তা নয় অমরেশ চারদিক চিন্তা করে সহজ সরল কথাই বলেছে।

অম—চল তাহলে আর না দেরি করে এখুনি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

গীতিকার মনে দুঃখ ব্যথার ভার চাপা থাকলেও এই কথা শুনে মনে অনেকখানি আনন্দ ছুঁল---এতটা পথ দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি একই গাড়ীতে বসে যাবে। কিন্তু হায় কার জন্ত কে ভাবে! তার ভাবাই বৃথা হল। অমরেশের এখন মাথায় ঘুরছে কতক্ষণে সে বাড়ী পৌছাবে। এখানেও সে অবহেলা করতে পারে না। সে যে কর্তব্য-নিষ্ঠ ছেলে। সেইজন্ত যেখানে হোক একজায়গায় বসলেই হচ্ছে। ঝপ্ করে সে গাড়ীর সামনের দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল। মুহূর্তে গীতিকার মুখখানা কাল হয়ে উঠল।

বাড়ীর দুয়ারে গিয়ে গাড়ী থেমেছে। গীতিকা নেমে বাড়ীর দিকে উঠে

গেল। পিছনে অমরেশ। মা বলে উঠল—এস বাবা, এতক্ষণে আমাদের একটা ভরসার লোক এল। মেয়ে কিন্তু খুব প্রফুল্লিত নয়। মা সেটা আড় চোখে লক্ষ্য করল। যাক সে নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই।

—ভরসা! ভরসা আবার কি! কি যে বলেন মাসীমা!

—হ্যাঁ তাই আবার নয়! জান তোমার মেসমশায়কে নিয়ে আমরা যে কি ভয় পেয়েছি।

—ভয় পাবার কিছু নেই। ডাক্তারে কি বলল বলুন ত? আমি আর এসে কি করব! ডাক্তারের কথায় আমাদের ভয় বা ভরসা। চলুন চলুন আগে দেখি যাই তাঁকে।

বলতে বলতে অমরেশ আগেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তার আগেই গীতিকা বাবার কাছে যেয়ে পৌঁছে গেছে। মুখের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে—বাবা, এখন কেমন লাগছে? এমন সময় এরাও যেয়ে ঘর ঢুকল।

মাসীমা—ডাক্তারে বলেছে জিনিসটা ভয়েরই জান? তবে উনি এই কথাই বলেছেন যে আজকের দিন হাতে রাখবেন, সেরকম সুবিধা না করতে পারলে আরও বড় ডাক্তার ডাকা হবে।

এতক্ষণ অমরেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। গীতিকা বাবার পাশে রয়েছে। মা-ই বলে উঠল—নে গীতিকা বসতে দে অমরেশকে। গীতিকা সে কথা মায়ের আগেই জানে। কিন্তু কি জানি কোথায় যেন তার একটা ব্যথা খচ্ খচ্ করছে। সেইজন্য সে বসতে যেয়েও বলতে পারছে না। তবে তাই বলে কি আর বলবে না? বলবে সে ঠিকই। একটু সামলে নিচ্ছে। মায়ের কথাটা পেয়ে সে বলে উঠল—হ্যাঁ বস না, এই তো চেয়ারটা।

—বস না বললে কি হয়। নিয়ে বসা, তোরা কথাবার্তা বল। আমি গিয়ে একটু চা করে আনি।

অমরেশ—আচ্ছা মাসীমা আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন ত? আমার বসা, চা খাওয়া এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ডাক্তারে কি চার্ট দিয়ে গেছে সেটাই দেখি আগে। চা খাওয়ার দিন পালিয়ে যায় না। আবার একদিন হবে। আমি আজকে কি ব্যস্ততার মধ্যে এসেছি জানেন—ভাল করে না জেনে বুঝে যেতে পারলে খুব চিন্তায় পড়তে হবে। কারণ আমাকে রাতের গাড়ীতে বেরিয়ে যেতেই হবে।

—রাতের গাড়ীতে! কোথায়, কেন—একসঙ্গে প্রশ্ন করে বসল মা।

খুব হাল্কা সুরে অমরেশ বলে উঠল—আজ বাবার একটা টেলিগ্রাম এসেছে—

—টেলিগ্রাম।

—না টেলিগ্রাম হলেও ভয়ের কিছু নেই। বোনের বিয়ে, মনে হয় পাকাপাকির একটা কিছু হবে তাই বাবা ডেকেছেন।

—তা বেশ বেশ ভাল। কথাটায় যতখানি আনন্দ হল বাবা, পাশ দিয়ে ততখানি ভয় বা আতঙ্ক দেখা দিল। তোমার মেসমশায়ের অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়েছিল। তারপরে তোমার কথাটা মনে হতে মনের কোণে কোথায় যেন একটু সাহস পেলাম।

অমরেশ উঠে যাবার ছেলে মোটেই নয়। অবশ্য মাসীমাও তার সে উদ্দেশ্যে বলে নি। যা সত্য তাই বলেছে। তাই অমরেশ বলে উঠল বেশী আর বলতে না দিয়ে—ছিঃ ছিঃ মাসীমা কি যে বলছেন! কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন! মেসমশায়ের নাম ডাক প্রতিপত্তি আর তাঁর কাছে আমি!

—না না অমরেশ ও কথা বলো না। অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা যাত্রীর মত ভিড়, কিন্তু ধীর স্থির বুঝনদার কজন আছে বলত? টাকার অভাব নেই—এ কথা সত্য। কিন্তু ব্যাপার কি জান—যে যেমন আসে শুধু মত প্রকাশ করে। আর আমার বাবা একটু বরাবরই বুঝে পা ফেলা অভ্যাস। আর তোমার মেস তোমার সম্বন্ধে আড়ালে আমাকে অনেক কথাই বলেছেন। আর গীতিরও তাই—অনেক বন্ধু বান্ধব রয়েছে কিন্তু ওর যেন একটা তোমার উপর বিশ্বাস সাহস ভরসা বেশী। তাই আমি যখন ভাবনায় পড়লাম তখন ঐ আমাকে বলল—অমরেশকে একবার খবরটা দেওয়া যাক না। এই বলে ঐ তোমাকে খবর দিতে গেল।

অমরেশের এই কথা শুনতে যেন আর ভাল লাগছিল না। সত্যি হলেও, এ সব যশ তার এখনও শোনবার সময় হয়নি। কাজ তার এখনও বাকী। খাটের পাশে চার্টটা লক্ষ্য করে উঠে গিয়ে সে দেখল। গীতিকার সঙ্গে সেই নিয়ে পাঁচটা আলোচনা সুরু করল। গীতিকার চাপা বেদনা থাকলেও সহজ ভাবেই উত্তর দিতে থাকে।

—ডাক্তার কি দুপুরের দিকে আর আসবে না, একেবারেই বিকেলে আসবে?

—না উনি বলে গেছেন সেরকম কিছু দেখলে খবর দেবেন। না হলে আমি বিকেলের দিকে আসছি।

এদিকে মাসীমা চা নিয়ে পৌঁছে গেল।

অম—মাসীমা আপনি দেখছি চা না খাইয়ে ছাড়বেন না। এ সব গুলো কিন্তু খুব অন্যায়।

—না না, এক কাপ চা না খেলে কি হয়!

—হ্যাঁ আমি তো সব চার্টটা দেখলাম। তবে চার্ট দেখে যা মনে হচ্ছে—এমন কিছু ভয়ের কারণ ত নয়। বিকেলে নিশ্চয় ডাক্তারবাবু এসে কিছু ব্যবস্থা করবেন। কারণ ডাক্তারদের উপর আমাদের ত কিছু বলার নেই।

—হ্যাঁ বিকেলের দিকে সুনীল বাবুই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন বলে গেছেন।

—সুনীল বাবু?

গীতিকা উত্তর দিল—দর্শনের—

—ও।

মাসীমা—হ্যাঁ উনিই প্রথমে খবরটা জানতে পাবেন।

অম—এখন ত দেখে মনে হয় ভালব দিকেই। না, কি মনে হয় আপনাদের?

মাসীমা—না এত শীগ্রিই বোঝার মত কিছু নয়।

এরপর আর পাঁচটা মামুলী কথার পর অমরেশ বিদায় নিল।

মাসীমা—গীতি, তুই একবার গাড়ী করে এগিয়ে দিয়ে আস না।

গীতিকার মনটা দপ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে নিভে গেল।—অমরেশ সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুলেছে—না না, সে কি করে হয়—বাড়ীতে রোগীকে একা ফেলে যাওয়া উচিত হবে না। আমি তাহলে এখন আসি। এসে নিশ্চয় ভালই শুনব।

গীতিকা কত কথা বলবে বলেও যেন বলতে পারল না। চাপা ব্যথায় নির্ব্বিকার সে শুধু একবার অমরেশের দিকে চেয়ে বলে উঠল—তাহলে আসছ কবে তুমি?

—আমি! পরশু নাগাদ ফিরব। কাল ত ওরা আসছে।

হোষ্টেলে ফিরতে বেলা হল। ওখানে খাবার কথা বলেছিল। কিন্তু ও পাত্তা দেয় নি। এখানে এসে দেখে আর এক কাণ্ড। এমনিই তার বেলা হয়ে গেছিল নাওয়া খাওয়া হয় নি। কিন্তু তা না হলেও একে সামনে ছেড়ে দিয়ে সব কাজ সারে কি করে!

প্রথমেই ছেলেটিকে প্রশ্ন করল—কে তুমি? কোথা থেকে আসছ? উত্তরে ছেলেটি বলল—আপনি আমাকে চেনেন না, আমি আপনাকে ভাল করে চিনি। আপনার নাম আমি অনেক জায়গায় শুনেছি। সেইজন্য ভাবলাম—কোথাও কিছু আমার হোক না-হোক আপনার কাছে আসলে ঠিকই আমার সুব্যবস্থা হবে।

—আঃ অনেকক্ষণ ধরেই ত বলেই চলেছ, ব্যাপারটা কি আগে তাই বলত?

—ব্যাপারটা আর কিছু নয়, আমি জীবনে মানুষ হতে চাই—বড় হব।

—খাসা, এ ত উত্তম কথা। এ আর বলার কি আছে!

—না দাদা, আপনি বুঝছেন না, কেউ বড় হব বললেই সে বড় হতে পারে না। কিছু তার অর্থ বা সামর্থ দরকার হয়।

—যাক নিজের তোমার চেষ্টা থাকলে সেগুলা বড় হয়ে দাঁড়ায় না। অল্প সময়েই সব জোগাড় হয়ে যায়।

—না তা বলছেন কেন আপনি? খুব জিনিসটা বুঝে ভিজে বলুন। একজন খুব ভাল খেলোয়াড়—সে খেলার মাঠ পেল না, খেলার জিনিস পেল না কি করে সে খেলবে!

—আঃ অত আবেদন কেন' তোমার অসুবিধা কি, তাই বলদেখিনি?

—অসুবিধা আমার এই—আমি যখন তিন বছরের তখন আমার মা মারা যান। আমি শিশু কিছুই বুঝি না। বড় হয়ে দেখলাম আমার মা ঘরেই রয়েছে। কিন্তু আমার সাথী সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা করে যা বুঝতাম তাতে তাদের তুলনায় আমার মায়ের কাছে আমি কিছুই পাই না। মাতৃ স্নেহ মমতা থেকে আমি অনেক দূরে। এর কারণ আমি নিজের মনে নিজেই খুঁজতে থাকি। কিন্তু আমাকে ভালবাসেন। ক্রমে ক্রমে আমি যত বড় হই ততই প্রতি মুহূর্তেই শুনি আমার নামে নালিশ—মানে, এমন কতকগুলো নালিশ যা আমি করিনি। যত সব অবান্তর মা বানিয়ে বানিয়ে বাবার কাছে করে চলেছেন।

অমরেশ থামিয়ে দিয়ে বলে বসে—আর তুমি তখন কি কর?

—আমি! আমার মনে মনে খুবই দুঃখ আক্ষেপ—আর রাগ যে হয় না তা বলব না। বাবা-মায়ের কথার মধ্যে কি বলব, বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকি। খুব ইচ্ছে হয়—বাবা এসে আমায় একবার জিজ্ঞেস করবেন, আমি বলব বাবাকে। কিন্তু সে রকম সময় সুযোগ আমার কপালে কোনদিনই হয় না। বাবা মায়ের কথা শুনেই সব স্থির করে ফেলেন।

—তাই নাকি! আচ্ছা এর কারণ কি—তোমার বাবা তোমার মায়ের সব কথা শুনে বিচার করেন? তোমার কোন কথায় কান দেন না?

—কি জানি দাদা, কারণ টারণ আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হয়—মা বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে দেখতেও খুব ভাল, তারপর শিক্ষিতা।

—ও বাবা তাই নাকি! শিক্ষিতা রমণী, তার এই গুণ! কতদূর লেখাপড়া শিখেছেন?

—শুনি ত আই. এ. পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছেন!

—আরে বল কি! শিক্ষা জ্ঞান তার মধ্যেই ত বেশী বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে। যাক আর একটা অভিজ্ঞতা হল আমার। মুর্খ সাধারণ ঘরের হলে রেহাই ছিল, এখানে যে কিছু কাটানের পথ নেই।

অমরেশের আর বুঝতে বাকী রইল না ভদ্রলোক কি কারণে এই ছেলেটির প্রতি দুর্ব্যবহার করে থাকেন। পুরুষ তার কি এইভাবেই পৌরুষ হারিয়ে ফেলে! হোক না সুন্দরী, যুবতী, শিক্ষিতা, বিত্তশালী বংশের। তাই বলে ঔরসজাত সন্তানের প্রতি এ কি দুর্ব্যবহার! উভয়কেই সামঞ্জস্য সমন্বয় করে রাখা কি উচিত নয়! মুহূর্তেই ভাবা শেষ করে অমরেশ জিজ্ঞেস করল—তোমার ভাই বোন কটি?

—ভাই একটি বোনও একটি।

—তারা তোমাকে কিরকম ভালবাসে?

—তারা ঠিকই আমাকে ভালবাসতে চায় কিন্তু মা দেয় না, শিখায়। এবং সম্পূর্ণ আমার থেকে তাদের আলাদা করে রাখে। কোন খাবার দাবার আনলে তারা যখন আমাকে দেওয়ার কথা বলে মা কখনও বকে দেয় কখনও আড়াল করে। শুধু তাই নয়—ভাইটি আমার দশ এগার বছরের হবে। কয়েকবারই তাকে বলতে শুনেছি—"আচ্ছা মা, আমি দোষ করলে বল না বাবার কাছে, আর দাদা কিছু করল কি না-করল দোষ দিয়ে বাবার কাছে তুমি অনেক কথা

বল—কেন ?" এর জন্য বেচারাকে মারও খেতে হয়েছে।—"আস্পর্দ্ধা ত মন্দ নয়, মায়ের উপর কর্তৃত্ব করা! হারামজাদা ছেলে।" এই বলে তাকে মাঝে মধ্যে উত্তম মধ্যম দিয়েছেন। যাই হোক এখন সে শিখে বুঝে অনেকখানি তৈরি হয়ে গেছে। আরও দেখুন দাদা যখন মামারা আসেন তখন তাদের কাছে মা আমাকে খুব একটা ভিড়তে দেয় না, এবং কোনদিনই আমাকে মা মামার বাড়ী নিয়ে যায় না। আগে আগে যখন আমি বুঝতাম না তখন কাঁদতাম। আর ভাবতাম—সবার মায়ের সঙ্গে সবাই মামার বাড়ী যায় আমিই বা যাই না কেন! যাক সে জিনিসটায় আমি এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এখন বুঝেছি। তাই এখন মা যখন যায় তখন শুধু নির্ব্বিকার থাকি।

—তোমার মামাবাড়া নেই, তোমার মামারা কোথায় ?

—হ্যাঁ আমার মামাবাড়ী আছে—টাটার দিকে—বাবার কাছে শুনেছি।

—তারা কেউ নেই ?

—না গল্প শুনেছি—মা, মায়ের একমাত্র ভাই ছিল। মায়ের বাবা নাকি দশ বছর বয়সে মারা যায়। দিদিমা যাই হোক করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে। তারপর আমি পেটে থাকায় আমার দিদিমা মারা যান। আর মামাটি খুব লেখাপড়ায় ভাল ছিল। সেইজন্য এখানে কষ্টে শিষ্টে পাস করে কি যেন একটা অফিসে চাকরি করত! সেই অফিসের বড় সাহেব মামার এই রকম মাথা দেখে তাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেয়। সেই থেকে তিনি ওখানেই। আর তার কোন খবর পাইনি।

—তোমার বাবাও কি তার কোন খবরের চেষ্টা করেন না ?

—না, তবে মাঝে মধ্যে আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা আমাকে এই কথাই বিদ্রূপ করে বলেন—এই সময় হয়ে এল, তোকেও সেখানে নিয়ে যাবে, ঐ সুখেই থাক, ইত্যাদি নানা কথা শুনায়।

কথার ধরণ দেখে অমরেশের বুঝতে বাকী রইল না—একে নিতান্তই অসহায় অযোগ্য জ্ঞান করে এর বাপ। অবশ্য মায়ের কথায়। সে প্রশ্ন করল—তা আজকে এভাবে আসার কারণটা কি ?

—আজ এভাবে আসার কারণ হচ্ছে এই—আমি বাবাকে আমাকে কলেজে ভর্ত্তি করার কথা বলেছিলাম। বাবা কিছুতেই রাজী হয় না। শুধু বার বার বলে—তোরও মাথায় আর কলেজ ঢুকে কাজ নেই। সঙ্গে সায় দেয় মা।

আমার সঙ্গে বেরিয়ে ছেলেরা প্রায় সকলেই কলেজে ভর্ত্তি হয়ে গেল। তারা বলে—কিরে তুই ভর্ত্তি হলি না! হবি না? আমি তখন ঐ কথাগুলো তাদিকে বলি। ওদের মধ্যে আমার কয়েকটি বন্ধু খুব ভাল আছে। তারা আমাকে সকলে মিলে একই উপদেশ দিল—দেখ, কিছু তোর বাবার এদিক ওদিক করে সরাবার ব্যবস্থা করদেখিনি। আর কিছুটা আমরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে তোকে দেব। এই করে ভর্ত্তি হওয়ার টাকাটা যদি তুই জোগাড় করে নিতে পারিস তারপরে পরে পরে সবই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি তখন বললাম নিয়মমত মাইনা কোথা থেকে দেব! তখন আমার আর এক বন্ধু বলল-ঠিক আছে আমার দুটো ছোট ভাই বোন আছে, তাদের তুই পড়াবি, তাই থেকে তোর মাইনাটা হয়ে যাবে।

যাক আমাদের ঐ সব আলোচনা হবার পর সেইরকম আমি চেষ্টা বা লক্ষ্য রাখি। কিন্তু এমনই ধরণের হিসাবী মা একটি পয়সাও নড় চড় হবার জো নেই। হওয়া ত দূরে থাক অনেক সময় মিথ্যার দায়ে আমাকে বাবার কাছে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে। অনেক দিন সহ্য করে থেকে থেকে যখন দেখলাম আর সময় নেই এবার আমাকে টাকা জোগাড় করতেই হবে তখন—মায়ের কানের রিং দুটি খুলে রেখে স্নান করতে গেছিল, আমি চুরি করে নিই। চুরি করাই তো আমার উদ্দেশ্য নয়। বাবাকে চেয়ে চেয়ে যখন না পেলাম তখনই বাধ্য হয়ে কাজে হাত দিলাম। কিন্তু চোর ধরতে তাদের বেশী সময় লাগল না। কারণ বাড়ীতে মা আর আমরা ভাইবোন ছাড়া আর কেউ ছিল না। তার উপর আমি একটা জায়গায় আড়াল করে রাখছিলাম সেটাও বোধহয় আমার বোন লক্ষ্য করেছিল। প্রথমেই মা এসে আমাকে ধরল। আমি না বলাতে আমাকে বেদম প্রহার করে। তবে "না" বলাটা আমার খুব জোরের ছিল না। তথাপি আমাকে অমানুষিক প্রহার করল। খাওয়া ত আর কপালে গোটা দিন জুটল না। বাবা অফিস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই মা বাবাকে নালিশ করল। নতুন করে শাসন সুরু হলে মন্দ কি—এই ভেবেই বোধকরি মা তার শাসনের কথা উল্লেখ করল না। বাবা আমাকে ডাক দিল—অজয় এদিকে আয়। মনে একটু সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলাম, ভয় কি সত্য ঘটনা বাবার কাছে বলব—আমিই নিয়েছি। তবু যেন কোথায় ভয় ঢুকছিল—না না পড়াশুনা আমাকে করতেই হবে, মাথ

আমাকে হতেই হবে। আমি একটা এতবড় যোল বছরের ছেলে স্কুল ফাইনাল পাস করেছি—এখনও মা আমার ধরে মারবে—মিথ্যা অকারণে! কেন পিতার প্রতি কি আমার কোন দাবী নেই! আমার মা কি কিছুই রেখে যায়নি যে আমি চিরদিন মার শাসন খেয়ে পড়ে থাকব! কোনদিন কোথাও যেতে দেয় না, কারও সঙ্গে মিশতে দেয় না। স্কুলের বেতন চাইলে কতরকম কুকথা শুনায়। আজ আমি সব কথাই বলব, কেন বলব না! ধীরে ধীরে আমি অগ্রসর হতে সুরু করেছি। বাপের কঠিন কণ্ঠ আবারও কানে এল—কিরে হতভাগা ছেলে, এখন এলি না যে! সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও আস্তে গলায় কর্কশ ভাষা এগিয়ে এল—তা এখন সামনে আসবে কেন, মিচকে পড়া শয়তান, চুরির বেলায় ত বেশ হাত আগায়! মুহূর্তে আমার সব বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে রুক্ষ গলায় বলে বসি—যাব না, যাব না আবার কেন! চুরি—চুরি আবার কি করেছি! অমনি মা ফাটিয়ে বলে উঠল—কিরে জানোয়ার, সঙ্গে সঙ্গে কবে সঙ্গে সঙ্গে না। এই যে মানুষ হয়ে গেছিস! আমি বলে উঠলাম—মানুষ আমি হইনি, এবারই মানুষ হব।

—চুপ কর হারামজাদা ছেলে, শয়তান।

সঙ্গে সঙ্গে দেখি বাবাও এসে কাছে দাঁড়িয়ে গেছে। মায়ের সঙ্গে যখন দু'চার কথায় এইরকম তর্কাতর্কি হয় সেই অবসরে বাবা তার অফিসের পোশাকটা খুলছিলেন। এসেই কোন কথা না শুনতে চেয়ে কানের কাছে হাত এগিয়ে আনতে আনতে বলেন—খুব ত তোর মুখ হয়েছে!

মুহূর্তে মাথা সরিয়ে নিয়ে বলি—মারবেন কেন, আগে বুঝুন।

—বুঝতে আমি কিছুই চাই না। তুই চুরি করেছিস কি না বল?

—চুরি! এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় না।

—ওরে জানোয়ার, তুমি চুরিকে আবরণ দিচ্ছ! তাই এক কথায় নয়। পাঁচটা কথা দিয়ে ঢাকবে! চুরি সে চুরিই, আর কোন কথাই শুনতে চাই না।

—চুরি আমি করি নি, নিয়েছি। আমার কলেজে ভর্ত্তি হতে হবে।

—আমার চাইতে তুই বেশী বুঝিস! আজ গয়না চুরি কাল তহবিলে হাত পড়বে। বেরোও আমার ঘর থেকে। দূর হয়ে যা জানোয়ার।

তবুও আমি নড়ি নি, দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল—বেরো বলছি।

অমরেশ গোটাটা শিউরে উঠল—উঃ এরই নাম পিতা! বলেই সে পাঁচটা কারণ মুহূর্তে চিন্তা করে নিল। আজ এ সবের মূলে কি? শুধু কি চাওয়া পাওয়া নয়। আজ পাওয়ার আশায় ঔরস জাতক সন্তানকেও বিদায় দিতেও বাধ্য হল। বলেই নারীর উপর আর এক ভাবে বিতৃষ্ণা জন্মাল। এই ভাবেই তো কবলে টেনে নেয় বা পড়তে হয়। পুরুষ তার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রথম বিয়ের পরই তার সবকিছু শেষ করে নেওয়া উচিত। তা যদি না হয় তাহলে সন্তানের প্রতি কি এইরকম দুর্ব্যবহার করাটা উচিত? দুদিক সমতুল্য বিচার বোধ সজাগ রেখে যার কাজ করার যোগ্যতা নেই তার এ ভাবে জীবনপথে পা বাড়ানোটাই অন্যায়। কারণ শিশুটি এক ত মা হারাল তার উপর বেচারার যদি বাপ থেকেও নেই, এই অবস্থা হয়—তাহলে সে দাঁড়ায় কোথায়?

অমরেশ যে সব কথাগুলি চিন্তা করল এগুলি নেহাৎ অনভিজ্ঞতার মূলে। ক্ষেত্র হিসাবে বিচার হয় এর। যিনি এ কাজ করেছিলেন তিনি নিশ্চয় এই চিন্তাই করেছিলেন—আমি এবং আমার ছেলেকে কে দেখবে! আমার বিবাহ হওয়া উচিত। দরকার। আমটি মিষ্টি বলেই বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে খেতে গেল। কিন্তু দেখা গেল আমটি টক। তখন ত আর ফেলে দিতে পারে না। নুন দিয়ে স্বাদ করে খেয়ে বলল—আমটি মন্দ নয়। এইটিই বলতে হয়। ঠকলে পরেও আমরা সান্ত্বনা চাই।

অমরেশ—তা তোমার এখন কি ইচ্ছাটা বল?

অজয়—আমার ইচ্ছা টিচ্ছা কিছু বুঝি না দাদা, আমাকে মানুষ হতে হবে এবং আপনাকে আমাকে মানুষ করতে হবে। আমি আপনাকে ছাড়া আর কিছু জানি না। আমি আপনার অনুগত ভৃত্য এই আপনি আমাকে জানবেন।

অম—ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলছ কেন? কে কাকে কি করতে পারে! ঈশ্বরের আশীর্বাদ মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টা। আর মানুষের শুধু সময় বিশেষে সাহায্য, আর কিছুই নয় ভাই।

যাক এখন তোমার কি অবস্থা বলদেখিনি—কিছু খাওয়া দাওয়া করেছ কি?

অজয়—হ্যাঁ যাদের বাড়ীতে কাল রাতে গিয়ে উঠেছিলাম সেখান থেকেই খেয়ে বেরিয়েছি।

—রাতেও তোমায় খোঁজ করেনি?

—আমার কাছে তো এসে কোন খবর পৌছয় নি। কি করে বলব!

—এখন ত সেইখানকেই ফিরে যাবে, না কি করবে?

—না, আর কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছা নেই আমার। তাদের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। তবে মা হারা বলে, আমার নির্যাতন—এই সব নানা কথা চিন্তা করে ওরা আমাকে খুব ভালবাসে।

—তাহলে ত বড মুশকিল হল। আমি এখন বেরিয়ে যাব। আজকে ফিবব না। কালও জানি না ফেরা হবে কি না। তা তুমি এখন কোথায় থাকবে?

—ও আপনি চলে যাবেন এখুনি। তাহলে আমি তাদেব বাডীতেই যাই। কবে আসব তাহলে?

—বেশ একবাবে মঙ্গলবার সকালে এসে দেখা করবে। আর এই দু'টাকা সঙ্গে রাখ। বাইরে খেযে নেবে। তাদের আমাব কথা বলো—আমি ফিরে তোমাব কিছু ব্যবস্থা কবব।

বেলা অনেক হযে গেছে। কোনমতে ঠাণ্ডা শক্ত ঢাকা ভাতগুলো গিলে অমরেশ বেরিযে পডল। রাতের আগে গাডী নেই। হাতে বেশ কিছু সময় পেযে ইউনিযনের কাজ কর্ম সেরে যাবে। ফিরেই মিটিং ডাকতে হবে। নানা সমস্যা।

ছাত্রদের কর্ণধার হয়ে যে যেমন খুশি কাজ করে গেছে। অমরেশ ছেলেটি স্বতন্ত্র বলে এর সমস্যাও নতুন ধরণের। ইউনিয়নের হাজার হাজার টাকা নিয়ে সে কারবার করে। কিন্তু কোথাও নেই এতটুকু উচ্ছ্বাসে ওর সায়। এইজন্য ছাত্র মহলে ও অনেকের অপ্রিয হলেও সকলের শ্রদ্ধাব বটে। তার লক্ষ্য অনাথ অসহায ছাত্র বন্ধুদেব দিকে।

বাডীতে পা দিতেই মা বলল—কিরে কালকে আসবি এলি না? তবে কি টেলিগ্রাম পেতে দেরি হয়েছিল?

আজ রবিবার। বাপ মা কাল থেকে ছেলেকে আশা করছে। মায়ের

সঙ্গে সঙ্গে বাবাও এসে দাঁড়িয়েছে। অমরেশ উভয়কেই লক্ষ্য করে উত্তর দেল—না আমি দু'একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তবে আমার এদিকে খেয়াল ছিল—আমি ঠিক সময়ে এসে পৌঁছাবই। জানি তোমরা আমার জন্ত চিন্তা করছ।

শি—হ্যাঁ উনাদেরও আসার সময় হয়ে গেল।

অ—হ্যাঁ, ওরা নিশ্চয় দুপুর বেলা এখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন?

—তাই ত, ওদের চিঠির ভাষাতে যা বুঝেছি তাতে এখানেই ত এসে খাওয়ার কথা। নিশ্চয় ওরা দুপুরের দিকে এসে সন্ধ্যার পর ফিরে যাবে।

শ্রীমতী ছেলেকে বলল—নে তুই কি খাবি তাড়াতাড়ি খেয়ে বাজারে বেরো।

সামনেই দীপা। অমরেশ ওর দিকে লক্ষ্য করে খাট গলায় বলল—কি রে দীপা কি আনব বল?

—আহা কি অসভ্য।

—আবার অসভ্য দেখলে কোথায়! তুইই তো ভাল করে বলে দিতে পারবি।

মাঝখানে মা মায়ের কথা বলে চলেছে—কি রে খোকা, কি আনবি লিখে ফেল।

দীপা—আহা, কি তোমার গুণমন্ত খোকা। দেখ না আমার সঙ্গে লাগছে।

অমরেশ—আরে বোকা মেয়ে চুপ কর। মা যা বলে বলুক তুই দু'একটা স্পেসাল জিনিস বলে দে, আমি এনে দেব এখন।—দীপার উত্তর না পেয়ে আবারও সে বলল—যাক বাবা, তুই এখন বলবি নি। কিন্তু মনে রাখিস তোর বাড়ীতে আমরা গেলে যেন ভাল করে খাওয়াস।

দীপা মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল। যাক গে, ছোট বোনের সঙ্গে কয়েকটা হাসি কথা বলে কাজে বেরিয়ে গেল।

বিরাট আয়োজন হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে অন্তর—নিখুঁৎ গুছানো। এ্যারিস্টোক্রেসির ধার দিয়েও যায় না, কিন্তু দাঁড়িয়ে কেউ যদি দেখে তাহলে বলবে—জ্ঞানী বনিয়াদী। নিন্দার মত কিছুই নেই।

ঠিক সময়েই পৌঁছে গেছে। অমরেশ ওদের আনতে ষ্টেশনে গেছিল। কারণ বাড়ী চিনবে কিনা, খুঁজতে হবে—এই সব পাঁচ কথা মনে করে বাপ ছেলেকে পাঠিয়েছিল।

যথারীতি অভ্যর্থনা হল। সঙ্গে সঙ্গে দীপার মা এগিয়ে এসে দেখে নিল কে কে এসেছে। ছেলেকে শিবশঙ্কর চিনতে পারল। শ্রীমতীর কাছে সকলেই কিন্তু অপরিচিত। কিন্তু সঙ্গে মেয়ে ছেলেটিকে দেখে তার কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না। নিজের মেয়ে জামাই জ্ঞান করে মাতৃভূমিকায় দাঁড়িয়ে আহ্বান করল—'এস মা, তুমি এদিকে এস।' মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে আগিয়ে গেল। শোবার ঘরে মেয়েটিকে বসতে দিয়ে কথাও বলতে রইল। সেই সঙ্গে আয়ত্বের মধ্যে হাতের কাজও চলছে। মেয়েটিও শ্রীমতীর আন্তরিকতা দেখে প্রশ্ন করল—'মাসীমা, এ মেয়েটি কে?'

—এ? এ আমার একরকম মেয়ে মা। দীপার দিদি বলতে পার। ও আমার এখানেই থাকতে বেশী ভালবাসে। পাশে ওদের বাড়ী। মা বাবাও অমায়িক। এবার কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে।—শ্রীমতী প্রশ্ন করল—তোমরা কি মা চান টান করে এসেছ ত, না চান করবে?

—না ওসব কাজ আমরা চুকিয়ে এসেছি। বাবা বললেন—ও সব সেরে যাও।

এদিকে চা জল খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শুনেই মেয়েটি বলে উঠল—এমন সময় মাসীমা চা।

—না, তোমরা চা খাবে না?

—না যা করেছেন ভালই করেছেন। আমরা অবশ্য এমন সময় আর চা খাব না। কিন্তু আপনার জামাইকে যতবার দেন ততবার খাবে। মিটিং ত লেগেই আছে। আর বুঝতেই পারছেন মাসীমা রাজনীতির কলবরে চা টাই হল প্রধান খাদ্য।

—তা জামাই কি করে? অবশ্য উনার মুখে শুনেছি।

—হ্যাঁ পার্লামেন্টের মেম্বার। তবে গদিতে এই আছেন এই নেই। রাজনীতির ব্যাপার সবই তো বোঝেন।

—তা জামাইরা ক'টি ভাই?

—চার ভাই।

—জামাই কোন্‌জন?

—ইনি মেজ। আমার বড ভাসুর না সরকারী চাকুরে। আর দুই দেওরের একজনের এই বছর পড়া শেষ হয়ে গেল। আর একজন সামনের বছর বেরবে।

—তোমার শ্বশুরের কথাই আলাদা। তিনি একজন ছোটখাট জমিদার।

—তা আর বলবেন না মাসীমা। সকলেরই অর্থ প্রয়োজন হয়। আমার শ্বশুরের যা আছে, তা তাকে একলা চিন্তা করলে, ছোটখাট জমিদার বলা চলে। তাই বলে ওটি যখন ভাগ হবে তখন? তখনও কি তাই বলবেন আপনি? তারপর যার যার মতন সংসার বাড়বে।

ওদিকে চা জলখাবারের পাট চুকে গেছে কিছুক্ষণ আগেই। শিবশঙ্কর পা পা করে রান্না দুয়ারে এগিয়ে এল। এরা তখন সেখানেই।—তা বেশ বেশ মা, তুমি খুব আলাপ জমিয়েছ, তোমার মাসীমার রান্নাঘর পর্যন্ত এগিয়ে গেছ।

ঝপ্ করে মাসীমাই উত্তর দিল—হ্যাঁ মেয়েটি অত্যন্ত ভাল। যেমন মন তেমন সরল। ভদ্রলোকের নামের সঙ্গে মেয়ে যেন অনেকখানি জড়িয়ে আছে।

—সে কথা বলছেন মাসীমা, আমি মায়ের কাছে যা শুনলাম—আপনারা যখন আমাদের ঐ পুরীর বাসা বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন নিজেদের খাতির নিজেরাই করে আনন্দের সঙ্গে বাড়ী ফিরেছিলেন। বাবা আমায় আসতেই বললেন—আর কিছু না হোক এমন মন খুব কম দেখা যায়। আজকে যাকে আমরা দেখতে এসেছি, আমাদের বাড়ীতে বৌ করে নিয়ে যাবে বলে, তার ব্যবহার—এরকম কেউ পারে নাকি—যে কথাও বাবা আমায় বলেছেন। উদার আন্তরিকতা—

শিবশঙ্কর মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল—বাদ দাও ত মা—যেমন ধনী তেমনি গুণী। সবই দয়া করে বলেছেন দাদা।

—ও কি বলছেন মেসমশই আপনি?

—আমি ঠিকই বলছি মা। যাক অনেকখানি বেলা হয়ে গেল। এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেল বুঝলে।

শ্রীমতী—হ্যাঁ আমাদের সবই হয়ে গেছে।

রান্না ঘরের ঠিক পাশেই ছোট একটি ঘর। সেইখানেই খাওয়ার জায়গা করা হয়েছে। মেয়েটিকে শ্রীমতী নিজের কাছে নিয়ে বসে খাওয়াবে, সেই ইচ্ছাই ছিল। খাওয়ার ডাক পড়তে শিবশঙ্কর ওদের সঙ্গে নিয়ে এসে বসাল। প্রথমেই জামাই খেতে বসে বলল—আরে বাবা, এ কি করেছেন এ যে অনেক কিছু করে ফেলেছেন!

ভুল বলছ বাবা, 'অনেক কিছু' কোথায়! কালিয়া পোলাও এ সব কিছুই ত নেই—আর অনেক কিছু কি দেখছ!—শিবশঙ্কর বাধা দিয়ে বলে উঠল।

ছেলের বন্ধু—তা না থাকলেও দেখে যেন মনে হচ্ছে—খুব অন্তর ও মেহনতের রান্না প্রত্যেকটি হয়েছে। এ রকম জিনিস ঝপ্ করে আর আজ-কালের দিনে কেউ ব্যবহার করতে চায় না।

কথাটা বন্ধু যা বলল তা সত্যই। জামাই মিলিয়ে দেখল। মনোরঞ্জনও বেশ লক্ষ্য নিয়ে ছিল জিনিসগুলির প্রতি।

শিবশঙ্কর বরাবরই বনেদীর পরিচয় দিয়ে এসেছে। সে নিজে একজন অফিসার হলে হবে কি! উপর মহলের ভাব তার মধ্যে কিছুই ছিল না। অফিসের বন্ধু বান্ধবকে যে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করে খাওয়াত না তা নয়। সকলেই এই ঘরটাকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখত। আজকালকার দিনে এরকম ঘর বড় একটা চোখে পড়ে না। আজ এই মেয়ে দেখার দিনেও শিবশঙ্করের বাড়ীতে ঠিক ঐ বনেদী ব্যবস্থাই হয়েছে।

চালটি খুব সরু নয়। মাঝারি সরু চালের ভাত। প্রথমেই শাক ভাজা তারপর শুক্তো। দু'একটা ভাজা পাশে পড়েছে। চিংড়ি মাছ আলু ফুলকফি দিয়ে ঝোল কালিয়া যাই বলো। তার একটি মাঝামাঝি। টাটকা বাটা মাছ। সরষা বাটা দিয়ে তার একটি মাখামাখি। নারকেল কুচি দিয়ে ভাজা মুগের ডাল। শেষে চাটনি। তবে দৈ মিষ্টিও ছিল।

এইরকম ধরণের ছিম্ ছাম্ রান্নাই সে পছন্দ করে। শিবশঙ্করের বরাবরই মনের ভাব ছিল—যা ভিতর তাই উপর হওয়া ভাল নয় কি! কারণ প্রকৃতির পরিচয় পেতে বেশী দেরি হয় না।

জামাই খাওয়ার মাঝে বলে উঠল—মেসমশয় কোথা লাগে কোর্মা কোপ্তা। বহুদিন যেন এসব জিনিস আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ আচার—বড় তৃপ্তি হচ্ছে। কি তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জনের বন্ধু উত্তর দিল—অতি সত্য কথা।

অমরেশ—এ যেন বড্ড বেশী বলা হয়ে যাচ্ছে না? অনেকে ত এইরকম ধরণের জিনিস পছন্দই করে না। সাক্ষাতে হয়ত আপনারা অনেক কথাই বলবেন। সীমানার বাইরে গিয়েই বলবেন—কি গোঁইপো, এদের মধ্যে এ্যরিস্টোক্রেসি কিছুই ঢোকে নি।

শিবশঙ্কর—তা তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু।

মনোরঞ্জন একবার অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখল—এই সেই ছেলেটি। সত্যই প্রকৃত গুণীর মধ্যে আত্ম অহংকার বলে থাকে না। মনে হল কয়েকটা কথা বলে কিন্তু পারল না—সে যে পাত্র। পাশের বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জনের উত্তর টেনে নিয়ে বলল—কি যে বলছেন আপনি! আপনার সব কথা না হলেও কিছু কিছু শুনেছি অবশ্য; বলুন ইচ্ছা করলে ও জিনিসগুলো হতে সময় লাগে না। খুব অল্প সময়েই হওয়া বা করা যায়। কঠিন হচ্ছে এই বনেদী আদর্শকে টিকিয়ে রাখা।

অমরেশ—তা কেন বলছেন।

—তা বলব না কেন? সরস্বতী এসেছে কিন্তু বিলাসীতা আসে নি। চিন্তা করে দেখুন ত আমার কথাগুলো ভুল হচ্ছে কি না?

—না ব্যাপারটা কি জানেন—আমাদের বাপ ঠাকুরদা থেকে এই রকম বুনেদী আদর্শ এসেছে বলে আমরাও বাইরে লেখাপড়া শিখছি এবং কলেজ হোষ্টেল ঘুরছি—চতুর্দিকে শুধু মিথ্যা ও নোংরামিতে ভরা। তাই শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে সত্যটুকুকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি। এর শেষ পরিণতি যে কোথায় কতদূরে কি ভাবে দাঁড়াবে তা এখন বলা অসম্ভব। এ পর্যন্ত ত যাই হোক একরকম চলে আসছে। আমার দাদাও যে বিয়ে করেছেন—অসাধারণ গুণবতী বৌদি। তবে সবর্ণ নয়—অসবর্ণ।

পূর্বেই কথাটা অবশ্য সকলের শোনা ছিল। শিবশঙ্কর আগেই ব্যক্ত করে দিয়েছে।

জামাই—হ্যাঁ জাতই ত আর বড় কথা নয়।

বন্ধু—জাতের সৃষ্টি মানুষের কাছে।

খাওয়ার পর মুখশুদ্ধিও সাজানো—লবঙ্গ কয়েকটি, সুপারীর কুচি, আর পাশে ধনের চাল ভাজা।

সন্ধ্যের পর ট্রেন ধরতে হবে। সেইজন্য বিকেল গড়াবার আগেই এরা মেয়ে দেখার পাট চুকিয়ে নিতে চায়। তাই জামাই বলল—তাহলে মেয়ে দেখানোর আপনাদের দেরি কি আছে?

শি—না দেরি আর কি বাবা! তোমরা বললেই আনা হয়।

—হ্যাঁ তাহলে আপনি ব্যবস্থা করুন।

এদের বসতে দেওয়ার জন্য গালিচা পাতা হয়েই ছিল। তারই সামনে

একখানি আসন পেতে মেয়ের বসার জোগাড় হল। পাশে এসে এদের কাছে হৃদয়বাবুর মেয়েও বসল। শিবশঙ্কর এবার মেয়েকে আনার জন্য উঠে দাঁড়াল। পাশের ঘরেই শিবানী তাকে গুছিয়ে দিচ্ছিল। শিবশঙ্কর দোর গোড়ায় গিয়ে বলল—কৈ মা, এবার এস। দীপাও বাপের কথা মত গুটি গুটি পা ফেলে আগিয়ে এল। বাপ সঙ্গে করে নিয়ে এদের সামনে পৌঁছে দিয়ে বলল—বস দীপা সকলকে নমস্কার করে বসল।

প্রথমেই জামাই প্রশ্ন করল—আপনার নাম কি ?

—দীপিকা সাহা।

এরপর পর পর জিজ্ঞাসা করে জানল কোন্ বছর পাস করেছে, ইত্যাদি।

বন্ধু প্রশ্ন করল—আপনি গান জানেন ?

—না।

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বাবুর মেয়ে প্রশ্ন করল গান শুনতে বা শিখতে ভালবাস ?

—তা আর বাসব না কেন। তবে নারীর জীবনে গানটাই ত সবচেয়ে বড় কথা নয়। মেয়েদের জীবনে যা সেইটিই আমি খুব ভালবাসি। মনোরঞ্জনের কথাটা খুব ভাল লাগল—কি হাল্কা প্রশ্নে কি কঠিন উত্তর দিয়ে গেল ত।

হৃদয়বাবুর মেয়ে বলল—তাক বাবার কাছে আমরা সবই শুনেছি আর দেখার কি আছে। এস ভাই তুমি এবারে।

মেয়েটি উঠে চলে যাওয়ার উপক্রম করেছে সঙ্গে সঙ্গে শিবশঙ্কর বলে উঠল—ভিতরে গিয়ে মা চা জলখাবারের ব্যবস্থা কর গে যাও। এদের গাড়ীর সময় হয়ে যাবে। এরা এখন বেরিয়ে যাবে।

মেয়ে জবাব না দিয়ে কাজের দিকেই এগিয়ে গেল। হৃদয় বাবুর মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—এই ত আমরা খেয়ে উঠলাম। এত শীঘ্রি চা জলখাবার—কি বলছেন আপনি !

—না তা হোক মা, শেষ সময় একটু চা ও মিষ্টিমুখ করে যাও। কি আর তোমাদের খাওয়ালাম—কিই বা করলাম !

জামাই—তা ভালই বলেছেন, তবে চায়েই ত মিষ্টি আছে।

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে শিবশঙ্কর অমরেশকে বলল—কি, যাবে নাকি আগিয়ে ?

অমরেশ—তা মন্দ কি, গেলেই হয়। ভদ্রতাকে ভদ্রতাও হল আর মনোরঞ্জনের ভাবগতিক একটু বোঝাও যাবে।

—তাহলে তুমি তৈরি হয়ে নাও।

—আমার আর তৈরি হওয়ার কি।

অমরেশ ওদের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াল—চলুন আপনাদের একটু আগিয়ে দিয়ে আসি।

বন্ধু ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—বেশ বেশ চলুন।

অমরেশ—আচ্ছা আপনার নামটাই আমার এখনও জানা হয়নি।

—আমার নাম আর জেনে কি করবেন—বদ্‌খৎ নাম।

মনোরঞ্জন—থাক ও আর বলতে হবে না। এর নাম দেবর্জ্যোতি সেন।

—দেবর্জ্যোতি? মন্দ কি, বেশ তো আপনার নাম।

জামাই—চলুন আমাদের হাতে ত এখনও বেশ সময় আছে। হাঁটতে হাঁটতেই চলি।

তার উদ্দেশ্য অমরেশ সঙ্গে আছে, পাঁচটা জিনিস দেখা বা জানা। সকলেই একমত। হাঁটা পথে তারা এগিয়ে চলল।

মনোরঞ্জন প্রশ্ন করল অমরেশকে—আচ্ছা আপনি কলকাতায় কোন্ হোষ্টেলে থাকেন?

—হার্ডিঞ্জ ছাড়া তো আর আমাদের গতি নেই।

—না যদি বাইরে কোথাও থাকেন?

দেবর্জ্যোতি—আচ্ছা আপনি না সেক্রেটারী?

—হ্যাঁ, তবে কতটুকু আর কি করা যায়। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় যেভাবে ঘুণ ধরেছে এবং তার মূলে ছাত্র মণ্ডলীতে যে বিক্ষোভ দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠেছে, এ দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে কাজ করা বড় শক্ত। তার পরে একটা কথা বড় সত্যি নয় কি যে সহযোগিতা করার মন কারুর নেই। নিঃস্বার্থ প্রাণ মন নিয়ে সকলেই যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে কাজ ত আপসেই হয়। সকলকে না পাই অন্তত জন কয়েক হলেও আনন্দের ছিল।

জামাই—ভাল কাজে কার না মন চায়। কিন্তু একটা কথা কি ঠিক নয়—পিছন টান থাকলে, আগাব মনে করলেও আগানো যায় না।

অমরেশ—কথাটা কিন্তু আমি সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারলাম না।

এ কথা অমরেশের বলবার মত বটে। কারণ সে যে তার বাবাকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখেছে।

যাক কথাটা টেনে নিয়ে মনোরঞ্জনই উত্তর দিল—জামাইবাবু, এ কথা আপনার ঠিক বলা হল না। মানুষের চেষ্টা ও ইচ্ছার মূলেই সব জিনিস সম্ভব হয়।

বন্ধু—তবে একটা কথা কি ঠিক নয়, যদি থাকে তার ধরতি মন। মনের কাছে সব কিছুকেই গোলমাল লাগিয়ে দেয়। জীবনে একলা হয়ে যে কাজ করা যায় তার চেয়ে পিছন লক্ষ্য করে সামনে চলা, সেটা কি আরও বাহাদুরি নয়?

অমরেশ—অতি উত্তম। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে চাওয়া পাওয়া তার কাছেই সে কাবু হয়ে যায়। সেইটিই যে না করে টেনে নিয়ে যেতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ। কারণ সকলেই যদি একলা একলা কাজ করবে তাহলে তো ঈশ্বরের সৃষ্টিই লয় হয়ে যায়।

বন্ধু—তাহলে নিশ্চয় আপনার জীবনে সেটা হবে না। আপনি নিশ্চয় আগে পিছু লক্ষ্য করে কাজ করবেন?

—আঃ আমার কথা বলছেন কেন! আমার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি যদি সাধারণ সত্য আদর্শের উপর দিয়ে কিছু চাই।

মনোরঞ্জন হঠাৎ চমকে উঠে অমরেশের মুখের দিকে চাইল। ছোট করে শুধু একটি প্রশ্ন করল—সেটা কি ধরণের, আমরা কি একটু শুনতে পারি?

—ধরণ টরণ কিছু বুঝি না। এখন বলার মতন কিছু নেই। তবে আমার করা-কাজই বলে দেবে আমি কি ধরণের কাজ করেছিলাম।

জামাই—আরে তুমি এটা বুঝতে পারছ না, ভদ্রলোকের মনের ভাব নিশ্চয় প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে লক্ষ্য রেখে কথাগুলো বলছেন।

অমরেশের কথাটা হৃদয়ঙ্গম হলেও মুখে সে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। সেইজন্য সে কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যই বলল—আপনি দেখছি খুবই তুলে দিচ্ছেন আমাকে। কিছুই করলাম না জানলাম না—আপনি এদিকে অনেক কিছুই নাম বলে চলেছেন। সব সময় যদি আমার জানা বা ভাবা স্থির হত তাহলেই ত হয়েছে।

এই কথা শুনে দেবজ্যোতি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে বলে উঠল—তা কেন বলছেন, অমরেশ বাবু। একটা কথা কি ঠিক নয়—অন্তরের সঙ্গে যে যা চায়

এবং চেষ্টা করে সে তাই পায়। তবে চাওয়া পাওয়ার পথে হয়ত অনেক বিঘ্ন আসতে পারে, কিন্তু অবশেষে সে পেয়েই থাকে।

এই রকম পাঁচটা গুরু গম্ভীর আলোচনার মধ্যে দিয়ে তারা ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছল। এদের প্রত্যেকের মনেই একটা সাড়া পড়েছে। এক জায়গায় সকলে গিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছে। শালা ভগ্নিপতে গেছে টিকিট কাটতে। মেয়েটি এতক্ষণ কোন কথাই বলে নি; শ্রোতা হিসাবেই পাশে পাশে চলেছিল। এখন সে বলল—তাহলে ভাই, তোমার সঙ্গে ভালই আলাপ হল। আমি মনোরঞ্জনের দিদি হলে তোমারও দিদি। দিদিকে মনে রাখবে ত?

—নিশ্চয়।

—তাহলে আমি কলকাতায় থাকতে থাকতে তুমি একদিন চল। কবে যাচ্ছ?

—আমি আজই রাতে রওনা হব। বলেই সে দেবর্জ্যোতির দিকে ঘুরে বলল—দেখছেন ত, দিদি আমার কি চালাক—পাছে দিল্লীর বাড়ীতে গেলে দিদির বেশী কিছু খরচ হয় তাই এইখানেই—

দিদি—কেন কেন, তুমি আমার দিল্লীর বাড়ীতেই চল না।

—আপত্তি কি বিমান ভাড়াটা দিয়ে দিন, ঠিকই একদিন পৌঁছে যাব।

দেবর্জ্যোতি—হ্যাঁ হয়েছে, দিদি জামাইবাবুর পয়সা বাঁচিয়ে এইখানেই কাজটা সারতে চাইছিল আর অমরেশবাবু আবার—

কথাটা উল্লেখ করবে কি তিনজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল। আর ঠিক সেই মরসুমে এরাও এসে পৌঁছল। জামাই বলে উঠল—কি ব্যাপার এত হাসির রোল কেন তোমাদের। দেখছি জমেই উঠল যে বিয়ে বাড়ী। ওহে মনোরঞ্জন আগাও আগাও, কি করছ!

বন্ধু—জমে আর উঠছে কৈ আপনাকে বাদ দিয়ে।

এই রকম হাল্কা কয়েকটা কথার মধ্য দিয়ে আরও কিছু সময় কেটে যায়। যথা সময়ে ট্রেন আসে। ওরা সে যার গুছিয়ে বসল। তারপর ট্রেন ছাড়লে অমরেশ বিদায় নিল।

শবশঙ্কর যেন অমরেশের অপেক্ষাতেই ছিল। ঘরে ঢুকতেই সে বলল—

গাড়ী ঠিক সময়ে পেয়েছে? শ্রীমতীও কাছে এসে দাঁড়াল।—রাস্তায় যেতে যেতে তোমার সঙ্গে পাঁচটা কথা নিশ্চয় হয়েছে? কি বুঝলে?

অমরেশ—না ও সব বিষয়ে আমার সঙ্গে আর কোন আলোচনা হয়নি।

—তাহলেও মনভাব কিরকম কি বুঝলে?

—মনভাব যা মোটামুটি বুঝলাম তাতে ত ভালই মনে হল। আমাদের ঘরটা ওদের দেখলাম বেশ ভালই লেগেছে।

শ্রীমতী—তা পাত্রের মুখ থেকে কিছু শুনলি না কি? তার ভাবটা কি বুঝলি?

—না তার আর আলাদা করে বুঝব কি। সে ত পাত্র। তাছাড়া কথা ত আর বিশেষ বলে না। তবে দু'একটা যা একটু ফুট্‌ ফাট্‌ করেছে তাতে মনে হল বেদনা এক তার মধ্যে রয়েছে। তা সে কতখানি তা কি আর একবার দেখলে বোঝা যায়। এমন কি কেউ আছে যার সত্য আদর্শের ক্ষুধা নেই? কিন্তু গভীরে বা পালনে সঙ্গে একজন পাওয়া যায় কি না। সকলেরই সব মুখে। কাজে কেউ নেই।

উত্তরে শিবশঙ্কর বলে উঠল—হ্যাঁ সে ত সত্য কথাই। একটা কথা কি ঠিক নয় অমরেশ, ভালবাসার আর ভাল হওয়া দু'য়ে দারুণ তফাৎ।

এদিকে ট্রেন চলছে। এদের মধ্যে কথা সুরু হয়েছে। প্রথম জামাই বলল—কি দেবজ্যোতি বাবু, কি রকম দেখলেন?

—আমার দেখায় কতটুকু আর যায় আসে। আপনি কিরকম কি বুঝলেন, তাই এখন বলুন?

—তা আপনার আর আমার তফাৎটা কোথায়। আপনিও বাইরের আমিও তাই।

মনোরঞ্জন—সব সময় জেঠোমি।

জামাই—না কথাটা আমি কিন্তু ঠিকই বলেছি। বোঝাপড়া তোমাদের ভাইবোনের।

রাজলক্ষ্মী—আহা ও যেন আর কিছু নয়। তুমি জানবে, বাবা তোমার কথাই সবচেয়ে বেশী ধরবেন, সেইজন্যই পাঠিয়েছেন।

—হাঃ হাসালে। তাহলে কি মনোরঞ্জন এখানে কেউ নয় নাকি? কি হে মনোরঞ্জন, বল তোমার দিদি।

মনোরঞ্জন—আচ্ছা খুব হয়েছে—আপনি এখন কি রকম দেখলেন বলুন ত?

—তাহলে দেখছি সকলেই আমাকে আদেশ দিচ্ছে। বেশ বলা যাক, তবে আমার জ্ঞান অভিজ্ঞতা কতদূর! আচ্ছা প্রথম কথা তোমরা বল দেখিনি—আমি পাত্রীর স্বপক্ষে দাড়াব না বিপক্ষে বলব?

মনোরঞ্জন—বিপক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে দেবজ্যোতি বলে বসে—স্বপক্ষে।

রাজলক্ষ্মী রাখ ত তোমাদের স্বপক্ষ বিপক্ষ সব মিলিয়ে যা বুঝেছ তাই বলে যাও।

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে কি একটা যেন বড় ষ্টেশনে এসে দাড়াল। সবকে ছিটিয়ে দিয়ে জামাই সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দেবজ্যোতি বলে বসল—কি ব্যাপার জামাইবাবু, এরই মধ্যে গলা শুকিয়ে গেল?

জামাই চোট খেয়েই সোজা হয়ে দাড়িয়েছে তা বুঝতেই পেরেছ যা হ'ক তাহলে ব্যবস্থা কর। অন্যের উদারতা দেখাও।

রাজলক্ষ্মী খাঁ খাঁ করে উঠেছে—উদারতার নিকুচি করেছি। ধন্য মানুষ বটে। কতটুকু সময় গেছে।

দেবজ্যোতি তৎক্ষণে উঠে পড়েছে—আহা দিদি, বিরক্ত হচ্ছ কেন। অ… অল্পে যদি কেউ সন্তুষ্ট হয় তাহলে চিন্তার তো কিছু দেখি না।

জামাই—তোমরাই বোঝাও ভাই। কি তাপ্পু আটপৌরে হয়ে গেছি হে, তাই আজ আর আমার গুরুত্ব নেই।

যাই হোক চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে জামাই একটা সিগারেট বার করে প্যাকেটটা দেবজ্যোতির দিকে এগিয়ে দিল।—নাও হে বন্ধু তোমার উদারতার পুরস্কার স্বরূপ।

রাজলক্ষ্মী—নাও এবার সুরু কর। তোমার দেখছি গলা খেড়ে কাশতেই যত সময় যাচ্ছে।

মহামান্য বিদ্যুৎ মণ্ডল এবার তার বক্তৃতা সুরু করলেন—তাহলে আমি দুইপক্ষ সমন্বয় করেই বলছি। মেয়েটি এক ধরণের—বড় সাধাসিধে গোছের। তারপরে লেখাপড়াও স্কুল ফাইনাল পাস শুধু। গায়ের রং এমন কিছু ফর্সা নয়।

তারপরে এদের খুব নাম ডাক একটা বংশ নয়। কি দেবর্জ্যোতি বাবু ঠিক বলছি?

হঁ্যা ঠিকই বলছেন তবে বিপক্ষে, স্বপক্ষে নয়।

—আসছি আসছি, সবেই আছি। এত ঘাবড়াবার কি আছে! ভাবছেন বুঝি আমি বিয়েটাই ভেঙ্গে দিলাম।

রাজলক্ষ্মী—তোমার আর ভাঙ্গা ভাঙ্গির কি, তোমার কথায় হবেও না তোমার কথায় ভাঙ্গবেও না। তুমি যা দেখেছ ঠিক ঠিক বলবে।

—তা বলছ কেন, আমার কথা তো বাবা অনেক শুনবেন। কি হে মনোরঞ্জন, তাই না? দেখুন দেবর্জ্যোতি বাবু, মনোরঞ্জন ঠিকই এখন ভাবছে একে নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছে।

মনোরঞ্জন—আপনি দেখছি জ্যোতিষী হয়ে পড়লেন; সবই বুঝতে পারেন।

—জ্যোতিষী না হলেও অন্তত তোমার মনটা বুঝতে পারছি।'

দেবর্জ্যোতি—নেন নেন বলুন তো আপনি কি বলবেন। এই করে দেরি করলে ঘরে পৌঁছতে আর কতক্ষণ!

—আরে মশয় থামুন না যখন আমার উপরই আপনারা নির্ভর করেছেন তখন দাম বাড়াতে দোষ কি! এত ব্যস্ত কেন! কেমন মজা বলুন ত—একটা করে কথা বলি আর ভাবেন এই বুঝি বলল। এটা দেখতে বা ভাবতেও আনন্দ লাগে ত।

রাজলক্ষ্মী—আর কেউ শুনবে না ত ওর কথা। বলতে হবে না ওকে। শুনব না আমরা।

—আঃ রাগছ কেন! এই দেখেছ ত তোমার দিদি এবার রেগেছে।

মনো—রাগবার ত কথাই আপনি শুধু ফক্কড়ি করে চলেছেন।

—না স্ত্রী রাগুক দুঃখ নেই, এবার শালা রেগেছে। আর না, বলতেই হবে।

উঁহু উঁহু দুবার গলা খ্যাকারি দিয়ে শুরু করল—না মোটামুটি আমি যা মেয়েটিকে দেখলাম জানেন দেবর্জ্যোতি বাবু, তা ভালই, মেয়েটি নম্র ধীর। চেহারার মধ্যেও মিষ্টতা রয়েছে। গৃহকর্মে নিপুণা লেখাপড়াও এমন কি মন্দ। ভালই বলতে হবে। আমাদের ঘরের মেয়েরা ত আর চাকরি করতে যাচ্ছে না। তার উপর যেন এদের বংশটাও আমার

কাছে ভালই লাগল। আর একটিই মাত্র বোন জামাই-আদরও মনোরঞ্জন কম পাবে না।

রাজলক্ষ্মী—কেন ওর দাদা যে অসবর্ণ বিয়ে করেছে সেটা বললে না?

—দেখ ও সব জিনিসগুলো খুব বেশী তুলে ধরবার মতন নয়। বিচারের উপরই নির্ভর করতে হয়। শ্বশুর মশয়ের কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে ত এটাকে খারাপ কাজ বলা চলে না। জাতের সৃষ্টি করেছে মানুষই। তারপর এর এই ভাইটিকে দেখলে—যাকে বলে একটি সোনার টুকরো। মোটামুটি আমার চোখে যেমন যেমন পড়েছে বললাম এবার ওরাই বিচার করবে।—বলে রাজলক্ষ্মীর দিকে তাকাল।

দেবর্জ্যোতি—তাহলে দিদি, এবার আপনার মন্তব্য শোনা যাক।

—আমি আর কি বলব! ভাইয়ের কিরকম পছন্দ হয়েছে সেইটিই হল জানবার। ওর ভাল লাগা নিয়েই কথা।

মনোরঞ্জন—না না দিদি, তুমি কি রকম কি দেখলে তাই বলবে—তা আমার সাইয়ে তোমার কি যায় আসে! যার যা মত বক্তব্য পেশ কর।

রাজলক্ষ্মী—আমি যা দেখলাম—তাতে মায়ের মনের মতনই বৌ হবে। বাবা বা ভাইয়েরা একটু অন্যরকম হয়েছে বটে কিন্তু মা বনেদী। ঘর একটু ছিম্ ছাম্ ভাব খুব ভালবাসে। আমার বেশ মনে পড়ে আমার যখন এদের বাড়ীতে বিয়ের সম্বন্ধ হয় তখন মা প্রথমেই বলেছিল—উট্‌কো শিক্ষিত উট্‌কো ভদ্রতা ঠিক মজবুত জিনিস হয় না। বনেদীর ধরণই অন্য রকম হয়।

জামাই বিদ্যুৎ বাবু, দেবর্জ্যোতির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল—এবার মহাশয় আপনার মতটা জানা চাই যে।

দেবর্জ্যোতি তখন মনোরঞ্জনের দিকে চেয়ে বলল—বন্ধু, তোমার মতটা আগে প্রকাশ কর, আমার মতের কি যায় আসে!

মনোরঞ্জন—এই কথাটা তো একটু আগেই হয়ে গেছে—যার যা ভাব, যার যা মত প্রকাশ করবে। তা ব্যস্ত হবার কি আছে। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এস।

দেবর্জ্যোতি আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে বলল—আমি এক কথায় বলছি, সব দিক বিচার করে আমার ভাল লেগেছে।

রাজলক্ষ্মী—সেই দিকগুলো একটু উল্লেখ কর—কোন দিক কেমন একটু বুঝি।

—না, আমার প্রথম কথাই হচ্ছে আজকালকারের দিনে যে জিনিসটি দুর্লভ সেইটই এদের ঘরে খুব বেশী। আর ছোটখাট দুএকটি দিক যা লক্ষ্য করলাম তাতেও অপছন্দ করবার মত নয়। আর এদিকে অপরূপ না হলেও মোটামুটি দেখতে ভাল। উচ্চ শিক্ষিত না হলেও মূর্খ ও নয় বটে। তারপর এবার বন্ধুর দলে কি রকম মিশবে সে বন্ধুই বলতে পারবে।

মনোরঞ্জন এতক্ষণ কথাগুলো ভাল করেই শুনল। আর ওর মনের গভীরে কোথায় যেন সব মিল খুঁজে পেতে রইল।

যাই হোক চারদিক একটু গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে। সকলের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করতে ব্যস্ত। ভাবতে হলেই ভাবনায় পড়তে হয়। এখন একটা কথা সকলের এক সঙ্গে মনে পড়ে যেতে একবাক্যে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল—এবার মূল আসামীকে ধর।

জামাই—কি হে চুপ করে থাকলে যে, বল? আর ভাবতে দেওয়া হবে না।

দেবজ্যোতি—না জামাই বাবু এটা আপনি ভুল করছেন—বন্দুকের ফাকা আওয়াজ, আর লক্ষ্য করে বন্দুক চালানো দুটো এক কথা নাকি? ও পাকা শিকারী গুলি চালালেই জানবেন লক্ষ্যভেদ হবে।

মনোরঞ্জন এবার নিজস্ব বক্তব্য জানাল। সে ধীর গম্ভীর গলায় বলে চলে—তোমাদের সবার মতই আমি বিচার করে দেখলাম। চলে যাবে। তবে এক দু জায়গায় আমার বলবার আছে। সাধাসিধে ভাবটা যেন বড্ড বেশী নয়? পার্টি না হোক বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে পাঁচটা কথা বলারও প্রয়োজন হবে ত।

জামাই—ওটা আর বেশীক্ষণ সময় নেবে না। তোমার দিদিকে আজ যা দেখছ আমি যখন বিয়ে করে নিয়ে যাই ঠিক এই রকমটিই কি ছিল?

না জামাইবাবু ওটা কিন্তু আপনার ভুল ধারণা। দিদি হয়েছে বলে যে সবাই হবে তার কি মানে আছে।—আপত্তি তুলল মনোরঞ্জন।

দেবজ্যোতি—এখানে কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে আমি একমত। সবাই সবাইকে তৈরি করব বললেই হয় না। মনে করুন এর যদি সত্যকারেরই প্রকৃতি হয়? তাহলে পাল্টাব বললেই কি আর পাল্টাতে পারবে! তাতে একটা মনোমালিন্য অশান্তি বৈ আর কিছু হয় না।

বাজলক্ষ্মী—ও এমন কি জিনিস যে ওকে নিয়ে অশান্তি করতে হবে? খারাপ ভাল করার জন্যই যত অশান্তি করলে মানায়। করে বা করতে বাধা হয়। এ ত আর খারাপ কিছু নয়, সত্যিকারের নারী সংসারের মধ্যেই শোভা বর্দ্ধন করে। তাই নয় কি?

দেবজ্যোতির উত্তরের আগেই বিদ্যুৎ উত্তর দিয়ে উঠল—এতে কিন্তু আমি একমত নই। আমি যদি এমন কথা বলি—যে এ না হলে আমি আমার জীবনকে মরুভূমি মনে করব। যেমন মনে কর—স্ত্রীর জীবনে স্বামী জুয়ারী বা মাতাল যে ধরণের নিন্দার, অপমানের বা অন্যায়ের সেইরকম স্ত্রী কারও সঙ্গে মিশতে পারে না—ঘোমটা দিয়ে সব সময় ঘরের ভিতর বসে থাকে এও বা স্বামী কি করে বরদাস্ত করবে?

রাজ—বা বা এ তোমার কি ধরণের কথা হল—কিসের পাশে কি? এর পাশে কি এটা বলা চলে?

—কেন মানাবে না! জীবন সঙ্গিনী আমার জীবনে যা কিছু সুখ সুবিধা তাই তাকে দেখতে হবে।

রাজ—হ্যাঁ তাই ত সে দেখবে, কেন উল্টোটা ভাবছ! স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে যাওয়া, স্বামীর জুয়াতে সায় দেওয়া সেইটিই কি সুখ সুবিধা হল জীবনের? মনে কর স্বামীর বন্ধু এসেছে বাজারের চপ, কাট্‌লেট্ নিয়ে এসে টেবিল চেয়ারে বসে গল্প করতে করতে কাঁটা চামচ দিয়ে না খেয়ে স্বামীর সঙ্গেই গল্প জমিয়েছে, ভিতর থেকে সুন্দর স্বাস্থ্যমত খাবার এসে দিয়ে গেল। নিজে হাতে তৈরি। বন্ধু হয়ত বলে উঠল—কি ব্যাপার আপনার দেখাই পাওয়া যায় না যে! উত্তরে বলল—কি করে আর পাবেন বলুন! আমি যে গৃহকর্মে ব্যস্ত। হয়ত এর পর বন্ধু বলবে বা মনে করবে—কি দরকার ছিল! বাজারের জিনিস এনেই ব্যবস্থা করলে কি মন্দটা হত! আমি ত আপনার সঙ্গেই গল্প করতে এসেছি। মনভাব বুঝে বন্ধুর স্ত্রী উত্তর দিয়ে উঠল—নিজে হাতে খাবার দাবার করলে নিখুঁৎ জিনিস হয়। এর মধ্যে কি কোন দোষ বা ভেজাল বা নোংরামী আছে? উনি এই রকম জিনিস পছন্দ করেন আর আমিও বরাবর তাই চেয়ে এসেছি। এইরকম বলতে বলতে সে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

জামাই—এ যদি না তার খোরাক হয়! তাহলে ত সে আসল খোরাক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেবর্জ্যোতি—ও জামাইবাবু, আদর্শের সঙ্গে আধুনিকের মিল খায় না। দিদি যা বলে যাচ্ছেন সত্যিকারের সুনিপুণা আদর্শ রমণীর কথা। আর আপনি যা বলতে চাইছেন তা তো হাটে বাজারে ফেরি করা নারীর কথা।

—হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিকই তবে বাজারের আমদানি মালই ত তুমি নেবে।

মনোরঞ্জন জামাইবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু ছোট করে একটি কথাই বলল—জামাইবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী তাহলে কি আমদানীর উপর নির্ভর করে নাকি?

দেবর্জ্যোতি বলল—আমদানি লক্ষ্য করুন আপত্তি নেই, তাই বলে নিজের বিচার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে নয়।

মনোরঞ্জন—ঠিক এইটাই উচিত কথা।

পথে দেরি হয়নি কোথাও। সকাল সকাল এরা বাড়ী পৌঁছে গেল। তবে কলেজ, অফিস, কাছারী থাকার দরুণ সকালে বড় একটা কথা জমেনি। শুধু দুপুরের দিকে মেয়ে জামাইকে নিয়ে হৃদয় সস্ত্রীক একটু আলোচনায় বসে ছিল। হৃদয় জামাইকে প্রশ্ন করল—তাহলে এবারে বিদ্যুৎ বলদেখিনি—কেমন মেয়েটি দেখে এলে?

বিদ্যুৎ—আমি আর কি বলব, আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করুন না।

—আঃ ওকে ত জিজ্ঞেস করবই। তারপর মেয়েছেলের চোখে মেয়েছেলে—ও ত অনেক কথাই বলবে। তুমি এখন কি দেখলে বল?

—আমি অবশ্য যা দেখেছি, ওদের কাছে গাড়ীতেই দু'একটি কথা ত বলেছি।

রাজলক্ষ্মী—আহা এ আবার কি হল? সেখানে কি বাবা ছিলেন নাকি! বাবা তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি বাবার কথার উত্তর দাও।

—বাবাকে আর এক কথায় আমি উত্তর দেব কি।

—আঃ কি মুশকিল। এক কথায় তোমায় উত্তর দিতে কে বলছে! তুমি যত ভাবে যা যা জেনেছ সব কথাই বল।

বিদ্যুৎ—না আমার নিজস্ব মত যদি চান আপনি, তাহলে বলি—আজকাল-কার দিনে এ যেন বড্ড সাদাসিধে। চৌকস ত একেবারেই নয়। আর ওদের ধরটাও সেইরকম ধরণের। রং মোটামুটি, খুব যে সুন্দরী তা বলতে পারবেন

মা। লেখাপড়া ত জানেনই। মানিয়ে যাবে ঐ পড়াশুনায়। তবে বুদ্ধি?
—সেটা না মিশলে আর কি করে বুঝব! একবার দেখাতে আর কি করে বলা যাবে!

শাশুড়ী—গৃহকর্মে কেমন দেখলে?

—সেটা আমার চাইতে আপনার মেয়েই ভাল বলতে পারবে। ও ভিতরের দিকে ছিল ওই জানে।

হৃদয়—তাহলে এখন তোমার আসল মতটা কি বল—এখানে কি কথা পাতব?

—সেটা আমি কি করে বলব! আপনারাই বুঝে দেখুন।

—না আমরা ত বুঝে দেখবই সে কথাটা ঠিক, তোমার মতটা কি সেইটাই জানতে চাচ্ছি।

—না আমার মত পুরাপুরি না থাকলেও অমত খুব নেই।

শাশুড়ী—আচ্ছা মনোরঞ্জনের ভাব কিরকম দেখলে? ও কি বলতে চায়?

—না ওর ভাব খারাপ দেখলাম না। মোটামুটি ভালই বলতে হবে।

হৃদয়—যাক গে খুকী তুই বল দেখিনি তুই কি দেখেছিস?

রাজলক্ষ্মী—আমি এক কথায় বলে দিচ্ছি—ঘর বা মেয়েটি সব দিক দিয়েই ভাল। তবে বাবা তোমরা মানিয়ে নিতে পারলে হয়।

হৃদয়—ভাল যদি হয় তাহলে না মানাতে পারার কি আছে!

—না সে কথা বলো নি। যেমন তোমার জামাই বলল—খুব চৌকস নয়। আমি ঘরে ঢুকে সর্ব্বক্ষণ তাকে যা দেখলাম—মেয়েটি গৃহকর্মে নিপুণা, ধীর স্থির বুদ্ধিমতি, স্বভাবে উগ্রতা নেই, সাজপোষাক মাঝামাঝি।

মা—হ্যাঁ খুকী তোর কথা একটা কিন্তু আমার মিলছে। পুরীতে যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না তখন তার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে সাদাসিধেই মনে হয়েছিল। তারপরে আমাদের বাড়ীতে যখন তোর বাবা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তখনও দেখেছিলাম মেয়েটির দরদী প্রাণ, আমার সঙ্গে এসে কাজে যোগ দিল।

হৃদয়—আঃ ও নিয়ে কি আর বিচার করা যায়, তার মা বাবা যদি তাকে পাঠিয়েছিল তাই সে গেছে!

—মা বাবা পাঠিয়েছিল ও কথা বলো না। ওটিই সব নয়। পাঠিয়েছিল

ঠিকই কিন্তু মন ত মা বাবা জুড়ে দেয়নি। মনটা নিজের। জানিস খুকী, আমার সঙ্গে ত চা জলখাবারের দিকে আগিয়ে গেল—চায়ের সরঞ্জাম যেখানে থাকে ঠিক সেই জায়গায় সেই রকম করে গুছিয়ে রাখল। রাখার আগে সেলফাটি হাত মোছা দিয়ে মুছে নিল। একটুখানি চা উদ্‌বৃত্ত হয়, লক্ষ্য নিয়ে বলল—এই চা-টা কি করব মাসীমা? বললাম—কি আর করবে, ঐটুকু চা ফেলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলল—মাসীমা এতখানি চা নষ্ট হবে! ঢেকে রেখে দিই। আপনি ত চা ভালবাসেন, এক ফাঁকে মুখে দিয়ে নেবেন।

হৃদয়—সে তুমি ভালবাস বলেই তাই বলেছিল, না হলে?

রাজলক্ষ্মী—না বলছ কেন বাবা তুমি! না ভালবাসলেও নষ্টর ভয়ে খেয়ে নেবে। আধ কাপ চায়ে এমন কিছু ত আর শরীর খারাপ হয়ে যাবে না। এখানে ভেবে দেখ, মেয়েটির নষ্ট করার মন নয়। এর পর থেকে সাবধানেই করবে যাতে বেশী করে তাকে না খেতে বা খাওয়াতে হয়।

মা—ঠিক বলেছিস খুকী।

বিদ্যুৎ—যাক মা মেয়ের যখন খুবই পছন্দ তখন আর বিশেষ চিন্তা করার কি আছে।

হৃদয়—হ্যাঁ, আমি ত আর নিয়ে ঘর করব না। ঘর করবে শাশুড়ী। তবে একটা কথা কি খুব ঠিক নয় বিদ্যুৎ—মনোরঞ্জনের পছন্দর উপরই সকলের পছন্দ নির্ভর করবে? প্রথম মনোরঞ্জন, যে তার জীবন সঙ্গী হবে। বাপ মা ক্ষণস্থায়ী। তবে হ্যাঁ, পাত্রের পরই পাত্রের মাকে দরকার। তার পরে বাবা, তারপরে আত্মীয় স্বজন।

জামাই—ঠিক কথাই।

সেইদিন রাতের ট্রেনেই খোকা রওনা হল। সকাল সকাল পৌঁছে যেতে মনে একটা আনন্দ ছুঁল ওর। অনেকগুলো কাজের সুরু দেখেই চলে যেতে হয়েছিল ওকে। এবার সময় সুযোগ বুঝে এক একটা ধরে শেষ করতে হবে। হোষ্টেলে ঢুকে তাড়াতাড়িতে নিজের ঘরটা গুছিয়ে নিল প্রথমে। কি অবস্থায় সব ফেলে যেতে হয়েছিল। খানিক বাদেই অজয় এসে হাজির।

—কি ব্যাপার অজয়?

—ন' দাদা আপনি আসতে বলেছিলেন যে। তাই এসেছি।

—তোর সঙ্গে এখন কথা বলব, না ফিরে এসে তোকে ধরব ভাল করে?

—কোথায় বেরচ্ছেন?

—ইউনিভার্সিটিতে রে।

—তাহলে আমি এখন কি করব?

—আমার মনে হয় এখনও আমি নেই মনে করেই তুই যা করছিলি তাই কর। আরও কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দে।

—আপনি নেই আর মনে করতে পারবই না আমি।

—এ মহা মুশকিল করলি তুই।

—মুশকিল আর কি! চেয়ে চিন্তে কতক্ষণ থাব। আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আমাকেও নিয়ে চলুন।

—আরে আমি যে অনেক জায়গায় ঘুরব। নাওয়া খাওয়ার ঠিক নেই। কখন ফিরব বলতে পারি না।

—সে কি বলছেন দাদা আপনি! আপনি এমন একজন হয়ে আপনার যদি স্নান খাওয়ার না ঠিক থাকে তাহলে আমি মূর্খ অভাগার চান খাওয়ার সময়টা কি এত বড় দেখলেন আপনি!

—সে কি রে পাগল, তুই আমায় কি বুঝলি যে এ কথা বললি!

—না দাদা তোমায় বুঝিনি বা বুঝবার মত আমার ক্ষমতাও নেই। তবে সাধারণ যেটুকু বুঝলাম সেই বুঝাতেই কথাগুলো বললাম। যেমন আপনি কলেজের সেক্রেটারী, পড়াশুনায় খুব ভাল ছেলে। সবচেয়ে একটা কি কথা জানেন আপনার বাবা আপনাকে ভালবাসে, আপনার মা বেঁচে আছে।

অমরেশ পিছন ফিরে কি যেন কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল হঠাৎ ওর মুখের দিকে ঘুরে চাইল। ওকে প্রশ্ন করল—কি বললি?

অজয় যেন একটু হচ্‌কচিয়ে গেল—তবে কি আমার কথাটা বলা কোন অপরাধের হল নাকি! কিন্তু ঘাবড়ে গেলেও ভয় পেল না। অমরেশের সঙ্গে যখন মিলতে এসেছে তখন নিশ্চয় ছাই চাপা তার মধ্যেও কিছু আছে। তা না হলে অজয় বেছে বেছে অমরকে খুঁজে নিল কেন? বিধিরও মনে কি ছিল কে জানে! দুটি জায়গায় দুটি সন্তান মানুষ হচ্ছিল। নামের মিল পাওয়া গেল অজয় অমর।

তাই সে একটু চিন্তা করে দাদাকে উত্তর দিল—আপনি ভেবে দেখুন, আমি ঠিক কথাই বলেছি। অবশ্য আপনি জানবেন আপনাকে যখন দাদা বলে ডেকেছি, আপনিও যখন এই অভাগাকে ভাই বলে টেনেছেন তখন আপনার মা যে আমার মা-ও সে। অবশ্য মা আমায় জঞ্জাল বলে তাড়িয়ে দেবেন কি না সেটাই চিন্তার।

—অজয় এ কি কথা বলছিস তুই। আমায় দেখে যদি তোর এরকম মনে হয় তাহলে বুঝে দেখ যে আমার মা—যে আমায় শিক্ষা দিয়েছে সে তোকে ফেলতে পারে না।

—তাহলে দাদা এখন বুঝে দেখুন আমার বলাটা ঠিক হয়েছে কি ভুল হয়েছে। আপনার মা আপনার জন্য কত নাই চিন্তা করে, আপনি গেলে পরে কতরকম দিয়ে আপনাকে খাওয়াবার কথা ভাবে, আপনি না থাকলে কত জিনিস খাওয়ার কথা উঠলেও আপনার মুখ চেয়ে আটকে যায়—ছেলে আসুক তারপরে হবে। যে দিন যখন আপনার যাওয়ার কথা থাকে সেদিন তখনই যদি দেরি হয়ে যায় মা আপনার অস্থির হতে থাকে। ভাবুন ত আজ কদিন আমি এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি আজ কেউ কি আমায় খোঁজ করছে। বাবা! বাবাকে আমি দোষ দিতে পারি না। তিনি তার সন্তানকে ঠিকই ভালবাসেন, আজ বিমাতা তাকে বাধ্য করিয়েছেন তাই তিনি আমায় ভুলে রয়েছেন।

—অজয়! আমি এ কথা মেনে নিতে পারলাম না। পিতা সামান্য একটা রমনীর কথাতে! হোক না তার চাওয়া পাওয়া! তাই বলে তার ঔরস জাতক পুত্রকে ভুলে যাবে! এ ত এক ধরণের ক্লীব বলতে হবে। অমানুষ বললে কিছু ভুল হবে না। সাধারণ মানুষের যে জ্ঞানটুকু তাও সে হারিয়ে ফেলেছে!

—না দাদা, ও কথা আপনি বলবেন না। শান্তিই মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শান্তি চিন্তা করেই পিতা এই কাজ করেছেন।

—শান্তি। সত্য বড় না শান্তি বড? সত্যকে গোপন করে শান্তি চাই! সত্য কি এ অপমান সহ্য করে শান্তিকে স্থায়ী করবে! না না অজয় এ হতে পারে না। বল আয়েসী আপ্ত সুখী। এ ছাড়া তোমার পিতার আখ্যা আমি কোনরকম দিতে পারি না।

প্রথম কথাই ত হচ্ছে—কেন সে বিবাহ করেছিল? যাক সে দিক থেকে

তোমরা হয়ত অনেক যুক্তি তর্ক দেখাবে হয়ত ঠিক বলবে। তার উত্তরে আমি বলব—তার ওজন না বুঝে না চিন্তা করে সে কেন মাথায় নিয়েছিল?

—দাদা ও কথা আপনার ভুল। কি করে বাপ জানবে যে এরকম হবে বলে।

—হাসালে অজয়। যেমন তোমার বাবা নিজের সুবিধা অসুবিধা মনে করেছিলেন সেইরকম কি তার ভাবা উচিত ছিল না যে আর একজন সমস্ত সুখকে জলাঞ্জলি দিয়ে জননী হয়ে সন্তানকে বুকে তুলে নেবে—এ কি করে হতে পারে। এই কথা তার ভাবা উচিত ছিল। তিনি যদি সুখ ভোগ করেও সুখের আশা ত্যাগ করতে না পারেন, আর একজন ভোগ করব বলে এসে বা ভোগ করাব বলে ডেকে কি করে ত্যাগ করব বা ত্যাগ করাবে! চিন্তা করেছিল কি?

যাক গে অজয়, এ অনেক কথা, এ সব কথার মর্ম তুমি হয়ত বুঝবে না। আমিও এখন তোমায় বোঝানোর পক্ষপাতি নয়। শুধু একটা কথাই তোমায় আমি বলে রাখি,—পিতা পতি এ দুয়ের সমন্বয় বিচার সে কেন না করল? শাস্তি—শাস্তি সে রাখতই তাই বলে কি আর একজনকে লাঞ্ছিত করে, না একজনের প্রতি কর্তব্য জ্ঞান হারিয়ে!

উভয়কে উভয়ের মত ব্যবস্থা করলে এত কথা উঠত না, এক কথাই জেনে রাখ—অযোগ্য ক্লীব। এর উত্তরে সে আমায় দেখাবে—ছেলে সে অমানুষ। সে মানুষ নয়। তাকে নিয়ে আমি অনেক চেষ্টাই করেছিলাম, কৃতকার্য হতে পারি নি। তার উত্তরে আমি বলব সবাই অমানুষ, কে আর মানুষ। প্রত্যেকটি বাপ ম্যকে লক্ষ্য করেই প্রত্যেকটি শিশু আসে—ঈশ্বর পাঠান। মানুষের পেটে ছাগল হয় না, ছাগলের পেটে মানুষ হয় না—এ কথা ঠিক ত? এখন বল শাসনে বনের বাঘকেও কায়দা করতে পারে মানুষ। শুধু কি ইলেট্রিক চাবুকের সাহায্যে, না খাদ্য, পিঞ্জরা, তদবির সকলের সহায়তায়?

এর উত্তরে হয়ত বলবে—যে সেগুলো ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ক্ষমতা যদি না থাকে আমার?

—সবের শেষে তাই ত বলছি—হে মহাপুরুষ, এই সব বুঝে সুঝে কাজ না করলে এই রকম বিপদই আসে। কিন্তু যে পক্ষকেই ছেড়ে দাও না কেন ঈশ্বর, সমাজ এবং সেই ব্যক্তি নিজে—কারও কাছে তার রেহাই নেই। এ

তিনের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাকে শুধু গবেষণা করতে হবে চেষ্টা করতে হবে যে কি করলে আমি ধর্ম বা নিন্দার কাছ থেকে বাঁচতে পারি। আর তা না হলে এই অবস্থাই শেষ পর্যন্ত ঘটবে। থাক আরও পাঁচটা কথা মনে আসছে। যাক গে তোকে আর এখন শুনতে হবে না। তুই যেন না আবার এ তিন পাপের অধিকারী হয়ে যাস।

অজয় মুখের দিকে চেয়ে একেবারে হ্যাঁ হয়ে বসে আছে। তখন ভেঙ্গে অমরেশ বলে দিল – আরে বোকা বুদ্ধু, তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে পিতৃ কর্ত্তব্য পালন করবি, বুঝলি? চল বেরিয়ে যাই।

কথাটা অজয়ের কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল—পিতৃ কর্তব্য! করব না তাই মনে করে নয়, তার আর নিজের উপর আস্থা বিশ্বাস নেই। সে কি আর কোনদিন মানুষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, না চিরদিনই নিজের পেট চালাবার জন্য তাকে 'বয়ের' কাজ করতে হবে? অজয় শুধু ছোট গলায় বলে উঠল—না দাদা, তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর সত্যিই আমি বাবাকে শ্রদ্ধা করি। যেন বাবার সব কষ্টের মাঝে যেয়ে দাঁড়িয়ে আমি যেন সাহায্যকারী হতে পারি।

অমরেশ—তবে যে। কে বলে ছেলে মানুষ হবে না। আমি যে দেখছি তুই মানুষের উপর দিয়ে—তুই ঘোড়া। লাগাম ধরার অপেক্ষায়; অমনি পথ চিনে ছুটবি। খানিকটা আগিয়ে এসে সস্নেহে মাথায় একটা ছোট্ট চাঁটি দিয়ে বলল—চল চল তালা লাগাই চল। কিরে মুখ কাঁচু মাচু করছিস কেন? কি ব্যাপার বল?

—খিদে পেয়েছে।

—সর্ব্বনাশ! তুই আবার বেরোবার মুখে এ কি বললি! বেড়ি নেব না বললে উপায় আছে! তুই তো একটা বেড়ি হয়ে গেলি আমার। বেরাব, এখন তোর খাবার চিন্তা। আর কি যে খেতে দেব—সে আবার আমার চিন্তা। চল ত এখন পথে বেরিয়ে পড়ি। যা পাওয়া যায় খাওয়া যাবে। ও ও ঠিক বটে দাঁড়া দাঁড়া পকটে কি আছে দেখি দেখি। পকেট হাতড়ে একটা সিকি তার হাতে উঠল।—এই নে এটা রাখ্। তাহলে এটা দিয়ে কি খাবি। যা হবে তা ত আমি বুঝতেই পারছি। একটা পাউরুটি হবে। কিনে এনে খাবি। আমি তাহলে চললাম।

—ও দাদা তা হবে না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

দূর গঙ্গু, তুই কি আমার সঙ্গে যাবি। তোর খাওয়া দাওয়া অনেক দেরি হবে। তুই থাক। আমি চলে যাচ্ছি।—হাসিভরা শাসনের সুরে সে বলে বেরিয়ে গেল।

নেহাৎ বেকায়দা দেখে, অজয় বলল—তাহলে দাদা তুমি কোথায় যাচ্ছ বল, আমি সেখানকে খুঁজে যাব।

—আরে তুই আমাকে খুঁজে যেতে পারবি। কি করে পাবি? আমি সেই ইউনিয়ানের কাজ সেরে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ী যাব। তারপর কোথায় কখন কতটুকু সময় থাকব, কিছু ঠিক নেই।

অমর বেরিয়ে গেল অজয়ও গুটি গুটি দোকানের দিকে পা বাড়াল। অজয় এবার ধীরে ধীরে দাদার খোঁজে বেরাল। খিদার মুখে একটা পাইরুটি আর কতক্ষণ। নস্তিবৎ। সন্ধান করে ও যেখানে যেয়ে দাঁড়িয়েছে, খোঁজ করে জানল, আর খানিকটা গেলে দাদার ইউনিয়নের অফিস ঘর পায়। দেখে একটি মেয়ে দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। অজয় সাত পাঁচ ভাবল—ভেবেও যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে slip করল—ইউনিভার্সিটির ইউনিয়ন অফিস কোথায়?

গীতিকা চাপা গম্ভীর মেয়ে নয়। তাই সে সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করল—কেন সেইদিকে তোমার কি দরকার?

—আমার দাদা আছে।

—তোমার দাদা। কি করেন তিনি?

গীতিকা ভাবতেই পারে নি—সে যাকে গোপনে খুঁজছে এই সামান্য ছেলেটির কাছে সে যেন কত পরিচিত এবং নিঃসংকোচে তার কথা জিজ্ঞেস করতে পারে। বললও তাই—আমার দাদা না ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

—সেক্রেটারি!—তখন মাথা ঘুরে গেছে এর। তবু একটা কপট ভাব নিয়ে এসে আরও যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করল—কি নাম?

—কেন আপনারা জানেন না—যার নাম এত খ্যাত।

—কি করে আর জানব বল। বিখ্যাতকে জানতে এবং চিনতে হলে তো ভাগ্য চাই আর তুমি তো ভাগ্য করেই বসে আছ—তোমার দাদা।

—তাহলে আমি সেই দিকেই যাচ্ছি এস আমার সঙ্গে।—ওকে সঙ্গে করে

গীতিকা নিয়ে যেতে যেতে পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করল। —তুমি ওর কিরকম ভাই হও ?

সে আর বলেন কেন। আমি যে দাদার ভাই না, সে সহোদরের উপর দিয়েও সহোদর।

তার মানে —একটু হচকচিয়ে গেল গীতিকা।

তার মানে আপনাকে আর আমি বোঝাতে পারব না। মোটের উপর এক কথায় জানি আমার দাদা। এ ছাড়া আর কিছু জানিনা।

গীতিকার আর বুঝতে বাকী রইল না, সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। —তা তোমার নাম কি ? পড়াশুনা কতদূর করেছ ?

আমার নাম হতভাগা। আর পড়াশুনায় গণ্ডমূর্খ।

—যাঃ বাজে কথা বল কি করতে।

—বাজে বকছি না দিদিমণি, ঠিক বলছি আমি।

—না এ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন একটা চাপা ব্যথার সুর।

—চলুন ত চলুন ত, পরিচয়ে পথ চেনার অসুবিধা হবে।

গীতিকাও আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেল। যা কিছু এর দাদার কাছ থেকেই এর সম্বন্ধে জানা যাবে, একে আর ঘাটিয়ে লাভ নেই। তবে একটা কথাই গীতিকার মনে হল — ছেলেটা যতই দুর্ভাগা হোক না কেন তবুও সৌভাগ্যবান বলতে হবে। যাকে পাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না তার আজ ভাই হয়ে দাবী অধিকার নিয়ে বসেছে।

সামনেই দেখে অমরেশ কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। চেয়ে দেখার অবকাশ তার ছিল না। কিন্তু গীতিকার মনে সন্দেহ কে ছাড়ায়। সে ভেবে নিল আমাকে দেখে ও ফিরে চাইল না। অজয় ডেকে উঠল—দাদা।

মুখ তুলে অমরেশ ফিরে চাইল — কি রে তুই তাহলে খুঁজে আসতে পেরেছিস ? পাশেই দাঁড়ালো গীতিকা।

—না আমি খুঁজে এসেছি বললে মিথ্যা কথা বলা হয়।

—কেন ?

—এই যে দিদিমণি না — একে আমি চিনি না, একে আমি জিজ্ঞেস করলাম। ইনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন।

গীতিকা—তাহলে আমি না আনলে তুমি আসতে পারতে না ত ?

—ও দিদিমণি ও কি ভাবছেন! দাদাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করতাম। তবে একটু সময় লাগত। পারব না মানে!

অমরেশ—তাই না কি! কে বলে তুই বোকা। তুই ভাইয়ের চালাক দেখছি।

এটার আর বোকা চালাকে কি আছে! দাদা ইউনিভার্সিটির কথা জানিয়ে ইউনিয়নের কাজে এসেছে তা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হবে কেন? এমন কি ঘাসে মুখ দিয়ে চবি আমি! দাদা না হয় আমাকে বোকাই বলে তাই বলে কি আমি গাধা!

গীতিকার সঙ্গে এতক্ষণ অমরেশ কোন কথাই বলে নি। অভিমানের মন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু দেখল একটার পর একটা মোড় ঘুরেই চলেছে সুযোগ আর আসছে না। তাই সে বলে উঠল—অমরেশ এটিকে পেলে কোথায়?

—পাব আর কোথায়? অমনিই এসেছে।

—এসেছে মানে! কে?

—কেন, কে ও ত পরিচয়ই দিচ্ছে। আমি ওর দাদা। তাহলে যে হয় ও বুঝে নাও।

—দয়া করে একটু হেঁয়ালিটা কমিয়ে বলবে?

—এই ত ঠিক কথা বললে হেঁয়ালী হয়ে যায়।

—মোটেও এটা সত্যি নয়।

—কেন ওকে দেখলে কি আমার ভাই বলে মনে হয় না?

—তা আবার মনে হবে না কেন! কেউ দাদা বলে ডাকলেই ভাই বলে মনে হয়।

—তবে শোন সত্যি মিথ্যা কিছু নয়—এ ছেলেটির ব্যাপার—এই বলেই গোটা ঘটনাটা বলে গেল। এর মধ্যে ততক্ষণে আরও পাঁচ সাত জন বন্ধু এসে জমেছে। গোটা ঘটনা শুনে ছাত্রদের সকলেরই মনে দয়া দরদ ভরে উঠল। সকলেই একবাক্যে অমরেশকে বলে উঠল—ঠিক আছে একটা ছেলেকে যদি সকলে মিলে লক্ষ্য করা যায় তাহলে এ নিশ্চয় মানুষ হয়ে উঠবে। না হয়ে যাবে কোথায়। পাশে আর একজন বলল—হ্যাঁ কথাটা ঠিকই। তবে প্রতিজন অভিভাবক হলে চলবে না। যে যখন যা পারবে ওর অভিভাবকের হাতে দেবে। তাহলে জিনিসটা ঠিক হবে। অমরেশ কিন্তু এ বিষয়ে নির্বিকার।

সে খুব একটা সাহায্য নেওয়ার পক্ষপাতি নয়। কিছু প্রকাশ করলে পাছে তাকে কেউ ভুল বুঝে আত্ম অহংকারী মনে করে তাই সে চুপ করে রইল। শুধু ছোট করে একটা কথা বলল—তা ত বটেই একটি হাতী পুষতে হলে অনেকের সাহায্যই দরকার হয়। তবে মাহুতের উপর নির্ভর করাটাই উচিত নয় কি? মাহুত না পারলেই সে জানাবে। তোমাদের কাউকেই বলতে হবে না। আমিই বলব—যখন যা প্রয়োজন হবে।

গীতিকা এতক্ষণ চুপ করে এদের সব কথা বার্তা শুনছিল। সে কোন উত্তরই দেয় নি মনে মনে এই কথাই ভাবছিল—যাক একে দিয়ে হয়ত অনেক সুবিধা সুযোগ হতে পারে। এ দেখছি অমরেশের খুব প্রিয়জন। তাই সে অন্তরের কথা অন্তরে চেপে বলে উঠল—আমি না হয় আমার ওখানেই নিয়ে যাব। ও ওখানেই খাওয়া দাওয়া করবে থাকবে।

অমরেশ—একটা কথা কি খুব ঠিক নয় গীতিকা, কুকুরের পেটে মৃগের পক্ষি সহ্য হয় না?

অজয়—ঠিক বলেছ দাদা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথ্থাও যাচ্ছি না। মেয়েছেলে কে কাকে কত ভালবাসে সে আমার জানা হয়ে গেছে। আমি তোমার কাছেই হোষ্টেলে পড়ে থাকব। তেমন দরকার হলে তুমি আমায় বল দেবে—আমি রান্না করব তোমায় আমায় খাব খুব ছিম ছামের মধ্যে—তাহলে আমাদের পয়সা খরচ কম হবে।

গীতিকার মনটা দারুণ ভেঙ্গে গেল। তা সত্ত্বেও সে প্রশ্ন করল অজয়কে—কেন মেয়েছেলের উপর তোমার এত ঘৃণা এল কিসের জন্য?

—না ঘৃণা নয় তারা নিজের স্বার্থটাই খুব বড় করে বোঝে। তাদের ভালবাসার মধ্যে নিঃস্বার্থ জোর মনোবৃত্তি নেই।

অমরেশ—না অজয় কথাটা তোর ঠিক বলা হল না। তুই যে মনে করে কথাটা বলছিস না সেটা নিতান্তই গণ্ডী বিচার করে। ব্যাপকে খুঁজে কি জ্ঞান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিস যে এই কথা বলছিস?

—ঐ হল দাদা, এক দেখেই একশ বুঝা যায়।

—না ভুল। তুই জানবি—সবার মধ্যেই সব জিনিস রয়েছে। নারীই কি পুরুষই কি—চাওয়া পাওয়ার কাছে সকলেই বাঁধা। এখানে তুমি যেমন

গণ্ডী টেনে বলেছ আমিও সেই গণ্ডী টেনে কথা বলি—এমন পিচাস পিতা দেখা যায়?

অজয়—আর আমি যদি এ কথা বলি দাদা, যে নারীর শিক্ষায় পুরুষের এ অবস্থা।

গীতিকা—নারীর কথায় পুরুষের এ অবস্থা—তার মানে? পুরুষ তার পৌরষ নিয়ে কথা।

অমরেশ—যাক গে যাক ছেড়ে দাও ত, পরিস্থিতির মধ্যে না পড়লে ও সব বোঝা যায় না। ও সব পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। পরিস্থিতির চাপে নিজেকে না ঠিক রাখতে পারলে এক অবস্থা হয়। এবং তখনই তার নানা রকম আখ্যা বেরয় সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক।

গীতিকা—তাহলে অজয় তুমি বলছ আমার ওখানে থাকবে না তোমার দাদার ওখানেই থাকবে? কেন আমাকে দিদি বলবার ইচ্ছা করে না তোমার?

—কেন করবে না খুব করে। তবে দাদাকে ছেড়ে নয়।

অমরেশ—যাক গীতিকা ও সব ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি। আমার কাছেই ও এসেছে আমিই ওর কত দূর কি করতে পারি দেখি।

—হ্যাঁ তা ত তুমি বলবেই। তুমি যে এ কথাই বলবে সে আমি জানতাম। তুমি যে যোগ্য পুরুষ তোমার কাছে আমরা কেউ না কিছু না। না কিছু হলেও গরীবের দিকে ত একবার মুখ তুলে চাইতে হয়।

—ছিঃ ছিঃ গীতিকা, কি যে বল না। তুমি দেখছি প্রলাপের বকে চলেছ। কে যে যোগ্য কে যে অযোগ্য—তুমিই বা কি কমটা। অত বড় শিক্ষিত স্বনামধন্য মানুষের একমাত্র মেয়ে। অবস্থাপন্ন পরিবারের শিক্ষিতা সুন্দরী।

—থাক থাক। অত আর বলতে হবে না। তোমার কাছে ত অস্থত নয়।

—আমি! আমি একজন কে বিশ্বের মহামানব যে আমার সার্টিফিকেটটাই তোমার কাছে এত বড় বলতে চাও।

গী—আর আমি যদি বলি—আমাকে নিয়েই বিশ্ব। আমি যদি বিশ্বের একজন হয়ে বলি যে যাই বলুক তোমার বলাটাই সবচেয়ে সেরা আমার কাছে।

কথাগুলো যখন হচ্ছে তখন অজয় কাছে থেকেও নেই—তবে যে দু'একটা

কথা [illegible]কে যাচ্ছে তাতে মাঝে মধ্যে একটু খট্‌কা লাগছে বৈকি।—তাহলে এদের মধ্যে সম্পর্ক কি ?

গী—কি অজয়—তোমার কি আর এমন দাদা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া পছন্দ হবে ?

অজয়—সে কথা ত আপনি জানেনই তাহলে আর বলছেন কেন ?

অমরেশ—ভাবদেখিনি তোর দাদা যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তাহলে তুই কি করবি ! তখন ত তোকে ঐ দিদিমণির কাছেই যেতে হবে।

অমরেশ এক মন নিয়ে বলল আর অজয়ের আগেই গীতিকার চক্ষু ছানাবড়া। অজয় দাবীর সুরে বলে উঠল—তুমি নিরুদ্দেশ হলে আমিও নিরুদ্দেশ।

গী—কি উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশটা হবে সেটা শুনতে পারি কি ?

অজয়—আর কি দাদার নানারকম ঝামেলা—মনের দুঃখে।

অমরেশ মুহূর্ত্তে ভেবে নিল—বাঃ কে বলে ছেলেটার বুদ্ধি নেই। এ কি বেশ কিছু লক্ষ্য করে এই উত্তরটা দিল ? আর গীতিকাও ত দেখছি ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। আমি কিন্তু কোন মন নিয়েই বলিনি। বলতে চাইলাম—গরীবের কি ও অহংকার সাজে ! আজ গীতিকাকে এ ভাবে ছিটিয়ে দিয়ে একদিন যদি ওর কাছেই আশ্রয় নিতে হয় ! আমার। আমার কথা আমিই ভাবতে পারি নি—কোথায় কখন কি ভাবে যে কাটবে ! সেইজন্যই সকলের কাছে নত হয়ে ওর থাকা উচিত নয় কি ! এবার অজয়ের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল সে—অজয় তুই আমার কি দুঃখটা বুঝলি ?

সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল অজয়। ভাবল কথাটা বলায় বোধহয় অপরাধ হয়েছে। তাই সে বলে উঠল—না দাদা আমি আমাকে দিয়েই বলছিলাম। যে, আমি তো তোমার একটি পায়ের বেড়ী হয়ে উঠলাম সেইজন্যই তোমার দুঃখ।

অমরেশ লক্ষ্য করল—এ অজয়ের আর এক ধাপ। তাই সে হাল্কা উত্তরের কঠিন উত্তর দিল—তুই আমার পায়ের বেড়ী কি রে ! ও, চাবি বিহীন বেড়ী ! যে কোন মুহূর্ত্তেই সরিয়ে দেওয়া যায় তাই বলছিস ত- --হ্যাঁ তা বটে !

গীতিকা এতক্ষণ ধরে এদের কথাগুলো শুনছিল। মুখখানা তার আগে

থেকে সাদা হয়ে আছে। অমরেশ এবার গীতিকাকে উত্তর দিল—কি তোমাকে আর কি উত্তর দেব!—ওর প্রশ্নের জের টানল।

গীতিকা বাঁকা ভাবে কথাটাকে নিয়ে বলল—হ্যাঁ তা ত বলবেই-আমি আর কে এমন—

থামিয়ে দিল অমরেশ—আরে তুমি উল্টো বুঝছ কেন! আমি দেখছি আমার কথা বলাটাই অন্যায়।

গী—অন্যায় ন্যায় কি হল! তুমি ভেবে দেখ দেখনি তুমি একটা কে কথা বলেছ!

—আরে অজয় না হয় বোকা! তুমি বোঝ না, ও আমার শিক্ষিত ভাগিনী, আমার কর্মটা কি?

হঠাৎ গীতিকার যেন আকাশটা মাথায় ভেঙ্গে পড়ল—অমরেশ।

—হ্যাঁ ঠিক বলছি কি না বল?

আর মুহূর্তও না দেরি করে বেলা হয়ে গেছে এই ভান করে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল। অমরেশ কথাটা খুব সহজ ভাবেই বলেছিল। কিন্তু ঠিক কি তাই? গীতিকা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন অমরেশের মনে একটা হাহাকার জেগে উঠল।—সে যে একটা পূর্ণ যুবক। গীতিকা লন-এর বাইরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমরেশ একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। অবশ্য খুব সন্তর্পনে, সামনেই অজয়। মনে মনে এই কথাই সে ভাবল-আমার জীবনে একদিন শিবানী এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন এতটা হাহাকার আমি বুঝতে পারিনি। আজ একি হল! যেন কোথায় মনের কোন পূর্ণ স্থান শূণ্য করে দিয়ে কে যেন হারিয়ে গেল।

এ ভাবাটা কি তার অন্যায়? মোটেই না, মহাপুরুষ হয়ে কেউ কি জন্মায়? মহাপুরুষ হতে হয়। সেই মহাপুরুষ হওয়াটা শুনতে শুধু মাত্র একটি কথা কিন্তু পালনেই তার গভীর অর্থ তাৎপর্য সব হৃদয়ঙ্গম করা চাই।

এবার অজয় অমরেশকে একটুখানি লক্ষ্য করল। হঠাৎ এমন কি কথা হল দিদি বেরিয়ে চলে গেল? অবশ্য দেরি হয়ে গেছে—এই অজুহাত, কিন্তু এ কি ঠিক? দেখল—না, এ ত দাদাকে আনমনা বলা চলে না। দাদা ত ঠিকই কাজ করছে। তবুও একটা কথা অজয় অমরেশকে জিজ্ঞেস করল—দাদা, দিদিদের বাড়ীটা কত দূরে যে এত তাড়াতাড়ি দিদি চলে গেলেন?

—না রে দূর আছে একটু। খুব সহজ ভাবেই অল্প কথায় উত্তর দিয়ে ছেড়ে দিল।—চল আমাদেরও ত এবার যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মনোরঞ্জন সেদিন যথা সময়ে কলেজ থেকে ফিরল। পোশাক পাল্টাবার সময় হৃদয়বাবু একটু এগিয়ে এসে শুধু একটা কথা ছোট করে বলল—আজকে তুমি বাইরে বেরিও না। কয়েকটা কথা আছে।

মনোরঞ্জন বাপের মুখের দিকে চেয়েই বুঝে নিল—কি কথা আছে।

যাক চা জলখাবার খাওয়ার পর মনোরঞ্জন বৈঠকখানায় বসেছে। জামাই অবশ্য আগে থেকেই সেখানে অন্যমনস্ক ভাবে খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখে বসে। মনোরঞ্জন আগে জামাইকে—কি ব্যাপার জামাইবাবু?

—ব্যাপার আর কি, এবার আমার দলের দলি হবে এস।

—না না বাবা কি জিজ্ঞেস করবেন আমাকে?

—ও তো সাধারণ কথা—কেমন পছন্দ টছন্দ হয়েছে এই সব পাঁচটা কথা।

বলতে বলতে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন।—না আর কিছু তোমাকে বলবার নয়। বলছিলাম কি তোমরা যে পাত্রীটি দেখে এলে সে কেমন?

—দিদি জামাইবাবু তো দেখেছেন। ওরাই বলবে।

পিছনে পিছনে মা-ও এসে উপস্থিত।—তা কেন বলছিস। তুই কিরকম দেখেছিস, তোর মতামতটা তো শুনতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কথা কেড়ে নিয়ে জামাই বলে উঠল—সে কথা ত নিশ্চয় বিসে ত তুমি করবে।

দিদিও সে কথার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল—তুমি ভাই একটা শিক্ষিত ছেলে পাঁচ দিকে পাঁচটা তোমার তো চোখে পড়েছে। আর এমন নয় যে বহু জায়গা থেকে বহু সম্বন্ধ এসে এসে ফিরে যাচ্ছে। যখন তুই সেই প্রথম কলেজে প্রফেসরীতে ঢুকলি সেই সময় যা একটা সম্বন্ধ এসছিল—তাই নয় কি মা?

মা—হুঁ! তাই আবার নয় কি! ও তো এতদিন বিয়েতে রাজীই ছিল না। যার জন্য সেই মেয়েটিকে দেখা শোনাই হলনা।

জামাই—ও তাই নাকি, সে দেখাশুনা কি একবারেই হয় নি! তা কিরকম কি শুনেছিলেন তার সম্বন্ধে?

হৃদয়—কি আর শুনব—ভদ্রলোকের দুটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি বি. এ পড়তে ঢুকেছে। বড়টির বিয়ে হয়ে গেছে তখন। দেখতে শুনতে মন্দ ছিল না। শুনেছিলাম, দেখিনি ত আমরা।

—বাড়ী?

—বাড়ী ঐ আসানসোলের দিকে। তারপরে এমনি মাঝেমধ্যে এ ও পাঁচজন ঢিল ফেলেছিল। কিন্তু ও রাজী ছিল না বলেই কোথাও কথা পাড়িনি।

জামাই—তাহলে তুমি ত সবই এখানে খোলাখুলি জানলে দেখলে—দেখ মত দিবে না আর পাঁচটা দেখার তোমার ইচ্ছা আছে? কেন না, এই ত সবে সুরু।

মনোরঞ্জন—সুরুই হোক আর শেষই হোক বাজার ঢুকা মাত্রই যদি সামনেই সরেস বাক্সীর বেগুন দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আর ভিতরে ঢুকে মুক্তকেশীর খোঁজ করার কোন মানে হয়? শুধু হয়ত এই হতে পারে—সাইজে একটু ছোট বড়। কিন্তু স্বাদে এই রকম। অনেক সময় মাটির গুণে মুক্তকেশীর স্বাদ ভাল দাঁড়ায়, বাক্সী স্বাদে খেল হয়। অনেক সময় উল্টোটাও হয়। তেমন আবার এদিকটাও ভাবুন এই যে সময় নষ্ট করে গোটা বাজার হাণ্টানো—খোঁজা, তারপরে দোমনা—এটা নেব না ওটা নেব, এটা নেব না ওটা নেব। এখানে মনের উপর মোটামুটি একটা বিশ্বাস করতে হবে—নির্ভর করা চাই। বাজার'ঢুকার সঙ্গে সঙ্গেই যখন এই ভাল জিনিসটা আমার চোখে পড়েছে তখন এমন কেউ অদৃশ্যমান হয়ত আমার সময় আর নষ্ট করতে চাইছেন না। তিনি ভিতরে যেতে না করছেন।

জামাই—তা তুমি কি করে বুঝলে? এমনও ত হতে পারে যে নামটা লোভনীয়, কেটে দেখলে বিচার। তখন সেই অদৃশ্যমান কি বলবেন না—তুই সামনে দেখেই লোভে ঐরকম কিনলি কেন? সময় দিয়ে ভিতরে ঢুকে কেন খুঁজে দেখলি না?

মনো—আর আমি যদি বলি জামাইবাবু,—ভাল জিনিস খুঁজেই পেতে হয়। ঈশ্বর তিনি হচ্ছেন জ্ঞানী, আমরা অজ্ঞ। আমাদিগে যে মোটামুটি জ্ঞানটা

দিয়েছেন সেই জ্ঞানেই বিচার করত। সামনেই এই ভাল জিনিস রাখার কি অর্থ ছিল? তা না হলেই ত আমি আগাতাম।

হৃদয—খোকা, তোমার এ কথাতে আজ আমি অত্যন্ত ভরসা ও বল পেলাম। আমি জানি এই ভিত্তির উপর ঈশ্বর বিশ্বাস ঘাতক হতে পারেন না। এখানে যে তুমি বিচার করনি—তা নয। কিন্তু যে আস্থা রেখে তুমি কথা বলছ তাতে মুক্তকেশীকে খেল হতে হবেই। কি বিদ্যুৎ, তাই না?

বিদ্যুৎ চোখের উপর চোখ ফেলে ইচ্ছা অনিচ্ছার মাঝে বলল—হ্যাঁ তা ত বটেই।

মাঝে দাঁড়িযে যায খুকী—বটেই মানে? মনোরঞ্জন যে কথাগুলো বলল লক্ষ্য করলে? এর কোন্ কথাটা বাদ দেওয়ার আছে বলত?

জামাই—তা আমি কি তাই বলছি নাকি—বাদ দাও তোমরা।

—না তা না বললেও সহজ সরল ভাবে উত্তর দিচ্ছ না ত তুমি।

জামাই—আমার বাঁকা ভাবটা তুমি দেখলে কি? তোমার ভাই বিয়ে করবে তোমাদের বাড়ীর বৌ হবে—

মা—কি হচ্ছে খুকী, ওর আবার বাঁকা ভাব দেখালি কোথায়।

মেয়ে—না মা, তুমি বোঝ না। তুমি লক্ষ্য করেছ—কথাগুলো কি ভাবে বলছে? উৎসাহিত করা ত দূরের কথা বরং গুপ্ত ভাবে বাধাই টানছে। যেমন তেমন বিচারই ত করবে, তার বেশী আর করবে কি বল।

জামাই—সাবধান! আমি দেখছি তোমার মুখে কিছু আটকায না, যা ইচ্ছা তাই বলতে চাও।

হৃদয—উঃ কি হচ্ছে খুকী!—সমঝদার পিতার বুঝতে কিছু বাকী রইল না। তাই সে মেয়েকেই দোষী করে থামিয়ে দিল। আর বাচাল জামাইও নিশ্চয বুঝল বৈকি।

বাবা—যাক মনোরঞ্জন, তুমি বলদেখি আমি এবার তাহলে অগ্রসর হব কি না? ভদ্রলোককে তাহলে ডেকে কথা বার্ত্তা স্থির করে নিই।

—দেখুন সে আর আমি কি বলব।

—না তোমার তাহলে কিছু আপত্তি নেই তো? বা তোমার ব্যক্তিগত সখ দাবী কি সেটা জেনে থাকলে কথা বলার সুবিধা হবে

মা ঝাঁপিযে বলল—কেন রে খোকা, তুই যে ঐ একটার সখ করছিলি সেইটিই বল না।

হৃদয়—কি সেটা বলত ?

—ঐ যে ছাই আমার নাম মনে পড়ছে না।—ঐ যে গো, গরম কালে ঠাণ্ডা রাখে জিনিস সব।

—মনে পড়বে না আর বলো না—বল যে উচ্চারণ করার কষ্ট আছে।

খুকী—আহা বাবা যে কি বলেন, মায়েদের তখনকার কালে কি এই সব জিনিস ছিল যে মা বলতে পারবেন।

মা—তাই বল্ ত মা খুকী। আমাদের আমলে ছড়া, ঝাঁট, ঠাকুর দেবতা—এই সবই ছিল। এখনই যত সব হাল ফ্যাসানের জিনিস হয়েছে।

বাবা—যাক তাহলে তোমার মা যেটা বলছে সেইটিই তোমার, না আর কিছু ?

—না আবার কি।

জামাই—কেন তোমার ঘড়িটা যে মেকারের আছে সেটা বাতিল করে একট দামী মেকারের ত নিতে পারতে।

মনোরঞ্জন উত্তর দিল—না না। অবশ্য মনোরঞ্জনের উত্তরের ধারাতে কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক খুকী আর খুকীর বাপ বুঝল—অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুর ছিল।

মা—তাহলে শুভক্ষণ শুভদিন বুঝে তুমি একটা চিঠি লিখে দাও ভদ্রলোক আসুক।

হৃদয়—বেশ যখন তোমাদের সকলের এক মত তখন তাই হবে তাহলে।

খুকী—তাহলে বাবা তোমরা কি এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিয়ে ঘর ধরবে ?,

বাবা—দাঁড়ারে বাবা, তুই যে ব্যস্ত হচ্ছিস। আমার ইচ্ছা থাকলেই কি আর হল ! মেয়ের বাপের ত আবার যোগাড় যন্ত্র আছে। মেয়ে বিদায় করা মা—এ চাটিখানি কথা নয় মা।

মা—কেন আজ ত সবে দশই অগ্রহায়ণ। বিশে একটা দিন আছে। সেইটাই আমরা ধরতে চাইব। তাতে আপত্তি থাকলে ২৯ তারিখে শেষ দিনটা না হয় ধরা যাবে।

—দেখ্ দেখ্ খুকী, তোর মা বৌ আনার জন্য একেবারে ব্যস্ত। দিন টিন সব বেঁধে গুছিয়ে রেখেছে।

খুকী—তা আবার হবে না কেন, সেই কবে আমি বাড়ী থেকে চলে গেছি আব একটা মেযে বলতে মাযের হাতের কাছে কেউ নেই।

—আর তোর মা যা ভাবছে তা যদি না হয়।

—সেটা ত দূর ভবিষ্যৎ তুমি বলছ।

সবাই খেতে বসেছে। মা বলল—খুকী, তোরা কালকে যাওযার কথা বলছিলি ত, আমার মনে হয় ওদিকে যে চিঠিটা দেওযা হল তাব উত্তরটা এলে ভাল হত না? যদি ঠিকই হযে যায তাহলে বিযে ঘর সেবে একেবারে যেতিস।

জামাই খুকীব উত্তব দেওযার আগে উত্তর দিযে বসল—না না কালকে আমাদের বওনা হতেই হবে।

শাশুড়ী—না, আমি কেন বলছিলাম জানত বাবা, আমাদের ঘরে ত লোকজন কম। সেইজন্য আবাব আনা নেওযার একটা হাঙ্গামা আছে ত।

জামাই—না না মা, পার্লামেণ্টে শীতকালীন অধিবেশনের জন্য তৈরি হতে হবে। কেন, আপনাদের বিযে ঘর লেগে গেল তখন বাবাকে চিঠি লিখবেন। আমি যদি এবাব বেখে যাই তাহলে মা বাবা অসন্তুষ্ট হবেন। ও দু'একদিনেব জন্য না হয একটু পডা কামাই করে সৌরেনই গিযে নিযে আসবে।

শাশুড়ী—এই উপকারটা বাবা তুমিই যদি কর? কেন তোমাকে কি আনতে নেই? তাবপর তোমাকে ত কযেকদিন আগে আসতে হবে। কাবণ বডছেলের মত তোমাকে ত আমার সংসারে অনেক কাজই করতে হবে।

—না না আমার মোটেই সময নেই। আমি বিযেব দিনই থাকতে পারি কি না!

—সে কি! আমার একমাত্র জামাই আর, বিয়েতে তুমি থাকবে না—এ কি কথা বলছ তুমি, বিদ্যুৎ?

—কেন আপনাব মেযে ত থাকছে। মেযে ত আপনার আসছে।

—ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। আমার অনেক চারদিকে কুটুম নেই। তোমাব মা বাবা বাডীর সকলকে আসা চাই। কুটুম বলতে তোমাদের বাডী, আমার বাপেব বাডী, আব কয়েক ঘর এদিক ওদিক করে।

—আচ্ছা আচ্ছা হবে, সে এখন পরের কথা।

খুকী—মা বলে যাচ্ছে, তুমি যে দেখছি খুব উঠে যাচ্ছ। একমাত্র জামাই বলে কি এত আদরের নাকি।

বিদ্যুৎ পেপার থেকে মুখটা তুলে খুকীর মুখের দিকে চেয়ে ছোট করে বলল—হুঁ তুমি আর কি বুঝবে বল।

—বুঝব না আবার কি, সব বুঝি। এ যদি তোমার ভাইয়ের বিয়ে হত ?

—যদি হত। সে আর এখন হচ্ছে না ত, হলে দেখা যেত।

মা—আঃ চুপ কর না মা রাজলক্ষী, কেন সব সময় ঐ রকম কথা বলিস।

জামাই—চুপ করলে আর টেকা দেওয়া হবে কি করে বলুন।

খুকী—এই দেখছ ত মা।

যাক এই রকম কথা কাটাকাটির মাঝে হৃদয় এসে ডাক দিল—কৈ কোথায় গেলে ?

—হ্যাঁ এই যে যাই।

তাহলে ভোরেই বিদ্যুৎ সস্ত্রীক রওনা হবে, এই কথাই সে জানিয়ে দিল।

হৃদয় ভিতরে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল—বললে না কি বিদ্যুৎকে ?

—বললাম ত, ও সব ছেলে এক ধরণেরই।

—কেন কি আবার হল ?

—ও খুকীকে কালকেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, রেখে যাবে না। আর নিয়েও আসবে না। ও সৌরেনকেই পাঠাতে হবে নিয়ে আসতে। আদিখ্যেতা জান না।

—সৌরেন। সৌরেন কি করে যাবে এখন। এই বিয়ে ঘরের মধ্যেই সে যোগ দিতে পারবে কি না সন্দেহ। এবারই সে আই.এ. এস দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সেদিন দেখলে না খুকীকে কি একটা বলছিল—খুকী যখন ওকে পাত্রী দেখতে যাওয়ার কথা বলছিল—ও আমার এখন সময় হবে না। তোমরা এমন সময় বিয়ে বাড়ী আরম্ভ করতে যাচ্ছ আমি কিছুই দেখতে পাবব না।

স্ত্রী—সেই কথাই ত আমি জামাইকে বললাম।

হৃদয়—আমি একবার বলে দেখব নাকি ?

—ও বলে লাভ হবে না—দরকার হলে তেমন, দেবজ্যোতিকে না হয় পাঠানো যাবে।

হৃদয়—তাও চলে কিনা দেখ। ওদের ঘর যা না, পাঠালে হব। যাক গে পরে এখন ভাবা যাবে, ওসব কথা থাক।

শিবশঙ্কর আজ হৃদয়ের একখান চিঠি পেয়েছে। শ্রীমতীকে এসে চিঠিখানা হাতে করে বলতে সুরু করল—শুনেছ, কোথায় তুমি? দীপা, তোর মা কৈ রে?

—এই যে বাবা মা এখুনি আসছে, ঠাকুর ঘরে গেছে।

বলতে বলতেই শ্রীমতীও বেরিয়ে এল—কি বলছ, কেন?

শিবশঙ্করের হাতে চিঠিখানা দেখে মা মেয়ের বুঝতে বাকী ছিল না।

শিবশঙ্কর—আমাদের হব বিয়ের একখানা চিঠি এসেছে যে।

কথাটা শেষ না হতে হতেই দীপা সেখান থেকে সরে পড়েছে। দীপার মা খুব আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল—কি লিখেছেন?

—লিখবে আবার কি। ওদের পছন্দ হয়ে গেছে, পাকা কথা বলতে ডাকছে, অগ্রহায়ণেই ইচ্ছা ওদের শুভকাজ শেষ করে।

শ্রী—তাহলে তুমি যাওয়ার ব্যবস্থা কর। খোকাকে ডাকবে নাকি?

—আরে সবই ত হল, আসল রুপিয়া। এ ভদ্রলোককে ত খুবই ভাল মনে হয়েছিল এখন কি যে হেঁকে বসবে সেই হচ্ছে কথা।

শ্রী—না না, দেখলে ত মনে হয় না চামার বলে। তা যাই হোক এখন বিয়ে ত মেয়ের দিতে হবে। তারপর আর একটা কথা অন্যান্য দিকগুলো যখন আমাদের পছন্দ হয়েছে ভাল লেগেছে তখন টাকায় পেছ পা হলে চলবে না। তার উপর দীপার সম্বন্ধ কৈ এল। তাতে ত তোমার কিছু টাকা খরচ হত, সে টাকা ধরা আছে। এক সম্বন্ধেই মেয়ের বিয়ে হওয়া এটা একটা ভাগ্য বলতে হবে আমাদের।

শিবশঙ্কর বিচক্ষণ লোক। গোঁয়ারতমি সে একবারেই জানে না। আর আমিত্ব অহংকার তার নেই। তাই সে স্ত্রীর কথাতে সরল মনে সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ সে কথা ত একশ বার। যাক তাহলে এবার ভদ্রলোককে একখানা চিঠি লিখে দিই, যে আমরা কয়েকদিন পর যাচ্ছি।

শ্রী—ওরকম ভাবে লিখলে চলবে কি করে? তোমাকে ঠিক ঠাক করে লিখতে হবে কোন্ তারিখে যাচ্ছ।

—হ্যাঁ সে কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছ। আমি খোকার কথা চিন্তা করেই এটা বলছিলাম। খোকা কবে আসতে পারবে কি না পারবে।

—সে কথা বললে ত আর চলবে না। খোকাকে বরং একটা তারিখ দিয়ে লিখে দাও—তুই এই সময়ের মধ্যে পৌছা। আর সেই সময় ধরেই তাদের একটা দিন লিখে দাও।

—না খোকাকে ত আমার ডাকতে হবে না। ডাকব কেন?

—ও হ্যাঁ তাই ত! শুধু ওকে ঠিক হয়ে থাকতে বলা, ঐখান থেকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে।

সেদিন অনেক বেলায় অমরেশ হোষ্টেলে ফিরেছে। বরাবরই সঙ্গে অজয় ছিল। দুপুরে কোন মতে দুটো মুখে গুঁজে আবার অজয়কে নিয়েই বসেছে। কি দিয়ে কি করবে—এ এক নতুন চিন্তা। কোথায় ছেলেটাকে ভর্ত্তি করবে। তারপর কথা নেই বার্ত্তা নেই হুট্ করে একজনের অভিভাবক হওয়ার মূলে অনেক ঝামেলার প্রশ্ন উঠে। সবচেয়ে বড় কথা অজয় গরীব বটে কিন্তু অনাথ নয়। তাও কি, বর্ত্তমান অবস্থার চাপে সে এক অতি দরিদ্র অসহায়।

এতদিনে অজয়ও যেন জীবন পেয়েছে। মা হারানো বাপ খেদানো ছেলে এতদিন হালে হালে ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অমরেশ অজয়কে জিজ্ঞেস করল—কি রে তোর সম্বন্ধে কি করি বলদেখিনি? তোকে নিয়ে আমার যত সমস্যা। কি যে করব, যত না ভেবে স্থির করতে পারছি ততই যেন সমস্যা বেড়ে চলেছে।

—সমস্যা টমস্যা আবার কি! যদি দেখ আমাকে পড়ালে পড়াতে পারবে তাহলে পড়াও। আর না হলে এই ভাবেই তোমার কাছে আমার জীবন কাটিয়ে দেব। কিছু না হতে পারলেও অন্তত এইটুকু ত হতে পার একটা নিঃস্বার্থ প্রাণের কাছে আমার প্রাণ উৎসর্গ করে সুখে দিনগুলো আমি কাটিয়ে যাব।

অমরেশ হাঁ অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে।

—কি গো দাদা, অমন মুখের দিকে চেয়ে তুমি যে অবাক হয়ে গেলে? আরে তোমার বোকা ভাই আর কিছু করতে না পারলেও অন্তত বয় বা বাবুর্চি

হয়ে তোমার রান্নাটুকু ত করে দিতে পারবে। তাহলেই আমি আমার জীবন ধন্য মনে করব।

আগুন অমরেশ আরও আগুন হয়ে উঠল।

—অজয়, কি বলছিস তুই! সত্যিই আমি তোর দাদা যদি হই তাহলে যেমন করেই হোক তোকে আমি পড়াব বা পাস করাব। বয় বাবুর্চি—ভুলে যা ভুলে যা ও সব কথা। আমিও যে ভৃত্য বই অন্য কিছু নয়।

—দাদা! কি বলছ তুমি! আজ তোমার মত নিঃস্বার্থ মহাপ্রাণ না থাকলে আমাদের মত অভাগা হতভাগ্যের দল কোথায় গিয়ে দাঁড়াত।

—কি যে বাজে বাজে কথা বলিস অজয় তুই।

—না দাদা, তুমি বুঝে দেখ আমি একটুও বাড়িয়ে বা উচ্ছ্বাস বশত কোন কথা বলছি না। ভাবত আজ আমি—আমার মত এরকম কত জনই ত এসে তোমার কাছে আশ্রয় চাইলে আশ্রয় পাবে।

হঠাৎ অমরেশ একটু যেন আনমনা হয়ে গেল।—সত্যিই কি তাই? আমার কাছে অনেকে আশ্রয় চেয়ে আশ্রয় পাবে। কথাটায় কৌতূহল হলেও তেমন কিছু নয় বলেই মনে হল। মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগের সেই একটা ছোট ঘটনা—সেই যে সেই ছেলেটা উঠেছিল জাম গাছে—আর নামতে পারে না—নীচ থেকে সবাই মজা দেখছে—হঠাৎ যাই হোক কোনরকম তাকে নামিয়ে দেওয়ার পর সে যেন আনন্দে আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি শুধু বলেছিলাম—বোকা ছেলে আর কোনদিন এরকম করে উঠিস নি। কাকাবাবুও কি এই মন নিয়ে একদিন সনৎ শিবানীর কথা আমার কাছে বলেছিলেন? শিবানী নামটা মনে হতেই কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল। —না না না একি আমি আজে বাজে সব ভাবছি। না না না আমি কেউ না আমি কিছু না।

—কি হল দাদা, অমন করে কি ভাবছ তুমি?

—না রে না কি আর ভাবব? ভাঙ্গা ঘরে শুয়ে অট্টালিকার স্বপ্ন দেখছি।

—না নিশ্চয় তুমি কিছু ভাবছিলে, আমাকে গোপন করছ।

—দূর বোকা ছেলে, কিছুছুই আমি ভাবি না।

—ভাগ্যিস! আমার কি মনে হয়েছিল জান—তোমার ঐ মুখ দেখে—এই রে দাদা বুঝি আমার ভার নেবে না, আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

—এ কথাটা তোর কি করে মনে হল, অজয ? ছোট ভাইকে কোন দাদা বুঝি তাড়িযে দেয ! তুই দেখছি সব দিক দিযেই বুদ্ধু ।

এমন সময হঠাৎ বাইরে একটা ভারি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ইটিই কি অমরেশ বাবুর হোষ্টেল ?

[ দারুণ ঘোর মায়ের । শুয়ে শুয়ে কত কাজ চলছে । কি কাজ কত—সে ত উপলব্ধির বস্তু । এরই এক ফাঁকে না-বুঝে ঝপ্ করে এক আবেদন করে বসি । তাই বলেছেন মা । ]

অমর, তুমি অসীম জেনো
এসেছ সীমার মাঝে ।
কেন অমন করে ভাব অমব
চেযে দিকে দিকে ।
অমর, তুমি অসীম জেনো
এসেছ সীমার মাঝে ।

ও অমর ভয করো না
কিসেও যেন ।
অমর, কর্ম তোমার বাণী তোমার
রইবে অমর হয়ে ।
অমর, তুমি আগুন জেনো ,
কেন সীমার মাঝে
বন্ধন আন !
ভুলে যাও বন্ধন তুমি ;

অজয় তোমার ভয় ভাঙ্গাবে
এসেছে অনাথ
অবুঝ হয়ে পড়েছে কোলে ।

থাকবে না যে কিছুই তোমার
ও অমর অমর—
তোমার সাথী হয়ে বলে
বাঁধন তোমার কঠিন হবে।
অমর অমর,
অজয় বাঁধন বেঁধে দেবে।

অমর, আগুন জেনো তোমায় তুমি
করবে না ভয় কারেও যেন
জানবে তুমি ভব চূড়ামণি।
ও অমর অমর
কেন অমন করে ভাব বারে—
চমকে উঠ বারে বারে।
"আমি যুবক আমি আগুন
কেমন করে করব দমন
কেমন করে হব গুণি।"

ও অমর—
অভাগা অজয় বাঁধ বাঁধিবে
পড়ে যাবে তোমার কোলে।
অমর, চাইবে তুমি বারে বারে
ম্লান হবে সেই আগুন তোমার।
ও অমর—
তুমি এসেছ সীমার মাঝে।
জান নাই অমর তুমি
তুমি তোমার কি যে?
তুমি অমর, আগুন জানি

মিথ্যা তোমার কাম কামনা।
করবে পাগল একটুখানি।
সেই আগুনেই—
সেই আগুনেই করবে শীতল—
ঐ অজয়ের দুঃখ বেদনা।
'অজয়, আয় ছুটে আয়
এ যে তোর দাদামণি।'

কোলে তুলে নিবে
আয় আয় বলে।
মা-হারা হয়েছে ভাই
কোথায় খুঁজে পাব তায়।
হবে জননী—
"একাধারে আমি হব পিতা
ভ্রাতা জানি।"

[ আবেদন নামঞ্জুর হতে পারত। কিন্তু মা যে পরম মমতাময়ী অদ্বিতীয় সত্ত্বা।

বলেছিলাম—মা, খোকা উপন্যাসে কবিতা গান, এর মৌলিকত্বের অসাধারণত্ব। এখন উপন্যাস যে মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সেইখানে একটা গান জুড়ে দাও।

মা—কি কাজ চলছে জানিস—শুধু জঙ্গল পরিষ্কার। শুধু আগাছা শুধু আগাছা। এই আগাছা কেটে এরই মাঝে মাঝে যদি ভাল বীজ চাষ করা যায়।—এই নিয়ে কথা চলছে। বিরাট ভাবে কাজ ধরেছেন। তবে এ ঘোর বরদাস্ত করলে চলবে না। এখনই গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু এমন ঘোরে থাকলে কি নাই ভাল লাগে। হ্যাঁ কি বলছিলি?

বলতে মা সুরু করেছিলেন, আবার ধরলেন মা— ]

অমর, তুমি অসীম বলে
দিক্ বিদিকে জয় করিবে
বিজয় মালা তোমার গলে।
ও অমর, তোমার মাঝে
আগুন আছে
জান নাই অমর তা কি ?
কোন্ আগুনে রেখেছে ঢেকে।
তাই ত অজয় অনাথ হয়ে
এসেছে তোমার কাছে।

মিথ্যা তোমার আশায় বাসা
দেবে না বাঁধতে অজয়।
ও অমর, অসীম তুমি
জান না তোমায়।

জানবে তোমায় সবাই যখন
অমর অমর—
বীর সন্তান তুমি বীর্যবান—
দাঁড়িয়ে সবার মাঝে
জয় করিবে,
ভয় নাই আমি তোমার
তুমি চির অমর সবার মাঝে।
অমর, তুমি অসীম জেনো
এসেছ সীমার মাঝে।

[ আর বলব নি।

এ কি শুধু সজ্ঞান সমাধি, অসাধারণ সাধারণ জ্ঞান নিয়ে অতি সচেতন মনের এক বিচিত্র খেলা। কোথায় কখন কে উঠে দাঁড়িয়েছিল, কে গানের মাঝে মন্দির ছেড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল, কখন আমি একটা ছবি তুলে

*নিয়েছি সব মায়ের নখদর্পণে। নিখুঁৎ খুঁটিনাটি এত হিসাব মা কোন্ জ্ঞানে দেয়! ]*

স্বর শুনেই অজয়ের মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে অমরেশের বুঝতে বাকী রইল না। তবুও সে না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার অজয়, কে রে? ভদ্রলোককে তুই চিনিস?

—হ্যাঁ দাদা, গলা শুনে মনে হয় আমার বাবা।

—বাবার গলার স্বরে এত ভয় পাওয়ার কি আছে রে। মানুষ যে বাঘকেও এত ভয় করে না। পিতা সে শ্রদ্ধার পাত্র। তাকে দেখলে সাধারণত সন্তানের বুক গর্বে ভরে উঠে। আর এ যে তোর দেখছি উল্টোটা। তা না হওয়ার আর কি আছে বল! তোর কাছে যা শুনেছি—

কে?—গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল অমরেশ।—দারওয়ান, খবর নাও ত, কোথা থেকে এসেছেন? কি প্রয়োজন? নামই বা কি?

অজয়ের বাবা বসন্ত সরকার দারওয়ানের সকল প্রশ্নের উত্তরে খুব বিনয়ের সঙ্গে অপরাধীটির মত বলল—আমি একবার অমরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অমরেশের কথা বসন্ত বাবু আগেই শুনে টুনে এসেছে। যার ফলে নিজেকে সে এত অপরাধী জ্ঞান করছে। দারওয়ান ভিতরে গিয়ে ভদ্রলোকের আবেদন শোনাল। অমরেশ খুব ব্যস্ত। তার বাইরে এসে দেখা করার সময় নেই। সামনের সপ্তাহে ইউনির্ভাসিটি-পত্রিকা প্রেসে যাবে। তাই সে বাৎসরিক রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত ছিল। মুখ তুলে বলল—তুমি বল যাও, এখানে আসতে।

অজয় দাদার দিকে মুখ তুলে বলল—দাদা!

—কিরে?

—এখানে আসবে।

—হ্যাঁ আসুক না কেন, তোর ভয়ের কি আছে। তুই যা করছিস কর না। অমরেশ একটা গোপন লক্ষ্য নিয়ে অজয়কে দিয়ে কতকগুলো কাজ করাচ্ছিল। ওকে কলেজে ত ভর্তি করতে হবে। ছেলেটার জীবন এইভাবে ত কাটতে পারে না। ভদ্রলোক গুটি গুটি পা ফেলে ভিতরে এলেন। অমরেশ পিছন ঘুরে কাজ করছিল, তিনি ঢুকে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবে অমরেশ বুঝতে পেরে বলল—বসুন, কে আপনি? অবশ্য তার অনেক আগেই পিতা পুত্রের

ভাবের আদান প্রদান হয়ে গেছে। কেউ কারো অপরিচিত—এমন ত নয়। তবে উভয়েই নির্বাক।

—কোথা থেকে এসেছেন?

—আমি অজয়ের বাবা।

—অজয়ের বাবা আপনি! এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—কেন, বিশ্বাস না করার কি আছে?

—না, অবিশ্বাসের এই যে—আজ কদিন হল একটি কিশোর এই ভাবে শূণ্য হাতে ঘরছাড়া, তার খোঁজ খবর কেউ করেন নি।

—এ কথা আপনি কি করে বলছেন?

—না আমার এখানে কেউ আসেনি তাই বলছি।

—কেন, এমন ত হতে পারে যে পাঁচ দিক হাল্‌টে শেষ এইখানকে এসেছি।

—তা যদি বলেন তাহলে আমার বলার কিছু নেই অবশ্য। কিন্তু তা নয় ও ত জানিয়েই একরকম এসেছে।

ঝপ্‌ করে কোন্ কথা জোগাতে না পেরে বসন্ত একটু চুপ করে গেল। অমরেশ বলল—যাক সে সব কথা পরের কথা—কি ব্যাপারটা বলুন ত? কি হয়েছিল?

—হওয়া হয়ির আর কি! দেখুন, কোন বাপ তার ছেলেকে কোন নোংরামী কাজে প্রশ্রয় দিতে পারে কি?

—তার মানে?

—তার মানে—বাড়ী থেকে গয়না চুরি করেছিল।

—গয়না চুরি করেছিল! কি রে অজয়, এ কথা সত্যি?—ঘুরে প্রশ্ন করল সে।

অজয়—না।

বাপ গর্জে উঠল—না! চোর ছেলে এখনও তুই ঐ কথা বলছিস?

—হ্যাঁ বাবা, আমি সত্যকথাই বলছি।

—চুপ কর জানোয়ার।

অমরেশ—থামুন এত ক্রোধান্বিত হচ্ছেন কেন? অজয় যে চোর নয় তার প্রমাণ আমিই দেব।

বসন্ত—কি আপনি দেখাবেন ! ও চুরি করেছে আমি হাত থেকে গয়না ছাড়িয়েছি।

—তাই যদি আপনি বললেন তাহলে আমি একটা কথা বলি—এমন ত হতে পারে যে গয়নাটি অসাবধানতা বশত অন্য কোথাও পড়েছিল, ও ঘরের জিনিস বলে কুড়িয়ে রাখতে গেছে এবং ওর হাতে গয়না দেখেই ওকে চোর বলা হয়েছে।

—না এই কথাটা একেবারেই মিথ্যা। এই বুঝি ও সাজিয়ে বলেছে ?

—এই তো দেখা যাচ্ছে—আপনি যা কিছু বলছেন ওর সম্বন্ধে তা আক্রোশ বশত।

—আপনি কি বলতে চান—আমার ছেলের উপর আমি আক্রোশ করব ?

অজয় ত ভয়ে কাচুমাচু ! ওর দিকে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করছেন তাতে মনে হয় পায় ত তাকে কাঁচাই গিলে খায়। অমরেশ ভাবল—যাক না খুলে গোটা কয়েক কথা বলি। চির জীবনের মতন শিক্ষা পেয়ে যাবেন। ছিঃ ছিঃ এ আবার কি ভাবছি, এই কি ঠিক সমাধানের পথ হবে ! না, এ শুধু প্রতিহিংসাই বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

যাক অমরেশ নিজেকে ঝপ্ করে পরিবর্ত্তন করে নিয়ে বলল—যাক কাকাবাবু। আপনি রাগছেন কেন, না রেগে সমস্যার সমাধান কি করে করা যায় সেই চিন্তাই করুন।

হঠাৎ এই কথাতে কাকাবাবু কোথায় কি একটা যেন খুঁজে পেতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের মায়ের কথাও মনে পড়ে গেল সত্যিই কি অজয়ের প্রতি আমার দুর্ব্যবহার কিছু হয়েছে ? তা না হলে আজ কে অজয়ের এমন করে অন্তর দিয়ে দাদা হতে চাইছে। একি অজয়ের স্বর্গীয় মায়ের আশীর্বাদ নয় ? ঝপ্ করে বসন্ত পাশাপাশি তার দুটি স্ত্রীর চরিত্র মিলিয়ে নিল। —হ্যাঁ সত্যিই অজয়ের মা অসিতের মায়ের তুলনায় ভালই বলতে হবে। সে মনে মনে অনেক কথাই চিন্তা করল। কিন্তু আর কিছু ব্যক্ত না করেই শুধু এই কথাই অমরেশের দিকে চেয়ে বলল—তা তুমিই বল না বাবা, কি করব ওর সম্বন্ধে আমি ?

এই ত মোকা। অমরেশ ভাবতে সময় নিল না—আমি ! আমি কি বলব।

আপনি ওর বাবা—অভিভাবক। আমারও বয়জ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য কাকা। যা আপনি ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

'আপনি' ত অনেকক্ষণ আগে উঠে গেছে। বসন্ত খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল—না বাবা তুমি ওকে যখন কোলে টেনেছ তখন তুমিই ওর ভাল মন্দ সব কিছুর ভার নাও। ওর মাকে আমি খুব বনেদী ঘর থেকে এনেছিলাম। যাই হোক ওর ভাগ্য ভাঙ্গল। যার জন্ম ও অকালে জননী হারা হল। মামা বাড়ীর আদুরে নাতি। কিন্তু সব দিক দিয়ে ওর এমনই দুর্ভাগ্য যে ওর এক মাত্র মামা—সেও বিদেশে। দীর্ঘদিন তার কোন খবর নেই। আর এ তরফে সবই নিঃশেষ।

অমর সত্যবাদী অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে একবার সব ঘটনা মিলিয়ে নিল। তারপরই আবার কাকাবাবুর দিকে চেয়ে বলল—এটা কি ঠিক করছেন কাকাবাবু—লঘুজনকে গুরুভার দেওয়া ?

অমরেশ, কি বলছ তুমি। আমি তোমার সম্বন্ধে যে বাবা অনেক কথা শুনেছি। তুমি আর নিজের স্বরূপ ঢেকে লুকিয়ে কতক্ষণ থাকবে। আমি এতদিনে একটা সত্যই অজয়ের অভিভাবক পেলাম।

—কাকাবাবু, এ কি কথা বলছেন আপনি। আপনি নিজেকে এত খেল করছেন কেন ?

—না না অমরেশ তুমি বুঝতে পারছ না, আমি নিজেকে মোটেই খেল করি নি। আর এসব কথা থাক। আমি যে ওর পিতা ওর অভিভাবক তারই প্রমাণ তোমার কাছে দিচ্ছি শোন। আমি বাপ হয়ে বলছি—অজয়ের যা কিছু দায় দায়িত্ব সব কিছু তুমি বহন করবে। এখন থেকে আমি অজয়কে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, ওর ভাল মন্দ আমি কিছু জানি না। আমি শুধু এই কথাই বর্তমান চিন্তা করে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে আমার কৃতিত্ব কিছু নয়। এ হচ্ছে ওর স্বর্গীয় মায়ের গোপন আশীর্বাদ। আমি আর কিছু বলতে চাইনা। অজয় আজ থেকে জানলাম—অজয় আমর—সেই হারিয়ে যাওয়া প্রতিভার দুটি ছেলে। তা না হলে বাবা এরকম ভাইস্নেহ আসতে পারে না।

অজয়—বাবা !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ থেকে তুমি জেনো, নিশ্চয় তোমার মায়ের অন্তরে এমন কিছু ছিল যে তারই ফলে তার এই মানস পুত্র। যাক অমর, আমার শেষ

একটা কথা তোমাকে বলবার রয়েছে—হয়ত সেটাও তোমার কাছে বলবার মতন নয়। কিন্তু তোমারও যে ব'ন্ধ ছাত্রজীবন তাই বলতে সাহস করছি—ওর মাসিক খরচটা আমি পাঠিয়ে দেব। পঞ্চাশ থেকে আশীর মধ্যে যে মাসে যেমন পারব পাঠিয়ে দেব। কারণ আমিও ত—তোমাকে খুলে বলার কিছু নেই, তুমি বোধহয় অজয়ের মুখ থেকে সব শুনে থাকবে।

—সে আপনি বাবা, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই পাঠাবেন।

অমরেশের এই নিরপেক্ষ উত্তরের তাৎপর্য কি এই নয় যে পাঁচ দুয়ারে হ ত পাতার চেয়ে যে যার ছেলে সামলাবে এই ভাল। তিনি পিতা, না দিয়ে দূরে সরে থাকবেন আর এদিকে অজয় ভিক্ষায় মানুষ হবে—তা বা কেন হতে দেব। এসব ধরণের লোক না দিতে হলেই বেঁচে যায়। মূল কারণটা কি এই ছিল না যে অজয়ের কলেজে পড়া নিয়ে ত গণ্ডগোলটা বাধে। তারপর যে টাকা সে দেবে বলে স্বীকার করছে তাই দিয়ে কি অজয়ের সম্পূর্ণ চলবে। পিতার করনীয় কর্ত্তব্য কি? ছেলেকে গড়ে তুলতে হলে যা স্থায্য প্রয়োজন তাই দিতে হবে। তা না করে আজে বাজে অবস্থা পাঁচ রকম দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। যাক এখন ত ঐ দিয়ে আমি হ্যাঁ স্বীকার করলাম। তারপরে যেমন যেমন বুঝব তেমন তেমন করব।

অজয়ের খরচ একা ত গীতিকাই দিতে চেয়েছিল। সেইটিই কি ঠিক হত? সে যে ভিক্ষা প্রার্থী। না না না—অজয় যে অমরেশেই ভাই। সে যে কোনদিন কারও সাহায্য এভাবে নিয়ে মানুষ হতে বা হওয়াতে চায় না। তাই বলে কি পিতার কাছেও না কি?

বসন্ত বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজয় যেন একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল—কিরে তোকে দেখছি দারুণ আশ্বস্ত হলি।

—যা বলেছ দাদা। আমার কি ভয় করছিল জান। তুমি নিশ্চয় মুখ দেখে বুঝতে পেরেছ।

—কেন রে বাবাকে দেখে এত ভয়! মানুষ ত বাঘকে দেখেই ভয় করে।

—না দাদা তুমি জান না। কবে সেই ছোট বেলায় মা মরে গেছে তার পর জ্ঞান হওয়া থেকে আজ ১৬।১৭ বছর বয়স হল সব সময় দিনরাত যে আমার কি ভয় ভাবনায় দিন কাটত না তা বলে বোঝাতে পারব না। তাই

ভাবছিলাম – দুর্ভাগা অজয়ের কোনদিনই বোধহয় ভাগ্যে সুখ নেই। যেদিন দাদা তোমাকে আমি প্রথম পেলাম সেইদিন কে যেন আমায় বলে গেল—কে বলেছে আমার মা মরে গেছে! দাদা যদি আমার দাদা হয় তাহলে মা-ও আমাদের এক। যাক বাবা বাঁচলাম। কিন্তু হঠাৎ পিতৃদেবকে দেখে মনে হল – এই রে, কি জানি আমার কপালে আবার কি ঘটবে। দাদা, তুমি আর আমাকে কিন্তু পাঠিও না। আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।

দাদা ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে একবার ভেবে নিল—ভগবান কি ঐ জন্যই অমরের সঙ্গে অজয়কে এনে মিলাল।—না না তোর ভয় নেই। তুই আমার কাছেই থাকবি। কিন্তু আমার কাছে থাকলেই ত আর হবে না, প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হতে হবে। নইলে সকলেই বলবে ছেলেটা বাপের কাছ থেকে ছেড়ে যেয়ে গোল্লায় চলে গেল।

না দাদা, তুমি যা বলবে তোমার কথা মতনই চলব। আমারও ভাল হওয়া মানুষ হওয়ার খুব ইচ্ছা করে।

– ইচ্ছা আর কার না করে বল! সাধ থাকলেই ত আর হল না। তার সঙ্গে চাই চেষ্টা।

যাক এইরকম দু পাঁচটা কথা হওয়ার পর ওকে শুধু এই কথাই বলে দিল— তুই এখন কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তৈরি হ।

মাথা হেঁট করে প্রত্যেকটি কথা যে স্বীকার করে নিল।

পরদিন সকালে অমরেশ দাঁত মাজতে মাজতে ওকে বলল – দেখ রে আমি একবার বেরিয়ে যাব। তুই ঘরে থাকবি।

– হ্যাঁ দাদা আমারও ইচ্ছা আছে কয়েকটা কাজ সেরে নেব।

– কি কাজ করবি রে?

– তোমার ঘরটা ভাল করে ঝেড়ে মুছে গুছাব। কয়েকটা জিনিসও কাচাকাচি করব।

অজয়ের খুব একটা জিজ্ঞেস করার অভ্যাস ছিলনি – কোথায় যাবে কি করবে। কিন্তু অমর ওকে একটু যেচেই বলতে চাইল – দেখ আমার দেরি হলে চিন্তা করিস নি। আমি তোর দিদিমনির ওখানে একটু যাব।

– তা তোমার কত দেরি হবে?

—না বেশী দেরি হবে না বলেই ত মনে হচ্ছে। তবে ওর বাবার যদি অসুখটা বাড়াবাড়ি দেখি তাহলে কি যে হবে বলে যেতে পারছি না।

—আচ্ছা দাদা গীতিকাদির বাড়ীটা কোনখানে?

—কেন রে তুই যাবি নাকি?

—না এই সবগুলো কি জান জেনে রাখা ভাল, যদি মনে কর তোমাকে কেউ খুঁজতে এল?

—কে আর খুঁজতে আসবে আমাকে।

—বাঃ কেন খুঁজতে আসবে না? তুমি এমন একজন।

অজয় কিন্তু উচ্ছ্বাস বশত কথাটা বলেনি। ও ঠিকই বলল। অমরেশের একটু বোঝার ভুল হল—তুই আমাকে কি ভেবেছিস বলত? আমি একটা কি কেউ কেটা?

—আমি ভাবিনি আমার ভাবায! তুমি মনে কর কেউ বিপদ আপদে পড়ে তোমায় খুঁজছে। আমি তখন জানলে ত তোমায় ছুটে ডেকে আনতে পারব।

—নে নে সবাই আমাকে ডাকছে।—বলে বাড়ীর ঠিকানা দিযে বেরিয়ে গেল

গীতিকা পড়ার ঘরে আনমনা বসে কি যেন একটা ভাবছে। অমরেশ বাহির থেকে সেটা দেখতে গেল। গীতিকা কিন্তু ওকে দেখতে পায় নি। গীতিকার বসা বা ভাব দেখে অমরেশের মনটাও যেন কেমন একটু হয়ে গেল। কি যেন একটা ভুলে যাওয়া জিনিস হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল। গীতিকাকে একটু লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে ওদের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কপাটের কড়াটা নাড়ল। মা রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল—কে? দেখ ত মেয়ে—ঝিকে সম্বোধন করে বলল—বাইরে কে ডাকছে।

—আমি অমরেশ

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা হাঁকল—গীতিকা ও গীতিকা, এই দেখ কে এসছে।

অবশ্য মা আগেই একটু টের পেয়েছিল—মেয়ে একটু যেন মনমরা। সেই কারণ মায়ের বুঝতে বাকী ছিল না—নিশ্চয় এদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। গীতিকার ভাঙ্গা মন সামলে উঠতেই মা এসে দরজাটা খুলে দিল।

—কি ব্যাপার মাসীমা গীতিকা কোথায় ?

—ঐ যে বাবা গীতিকা ঘরে। কি যেন ওর হয়েছে।

অমরেশ চমকে উঠে—কি হয়েছে ?

—না না ভয় পাবার কিছু নেই। ওর মনটাই ভাল নয়। মনটাই যেন কেমন দমড়ানো।

তেজস্বী বীর্যবান অমরের বুঝতে বাকী রইল না। সেইজন্ত তার চোখে মুখে কিছুই ভাবের প্রকাশ মাসীমা দেখতে পেল না।—আচ্ছা যাক মেসোমশয় এখন কেমন আছেন বলুন দেখিনি ?

—উনি ত শোয়া। ডাক্তারে উঠা বা চলাফেরা করতে বারন করেছে।

গীতিকাও চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে ঘরের দরজায় এগিয়ে এসেছে, অমরেশও যেয়ে পৌঁছেছে—যাক তোমাকে আর কষ্ট করে যেতেই হল না আমিই এসে গেছি।

—থাক খুব হয়েছে।—কথাটা ছোট বা আস্তে হলেও যেন একটা আগুনের টুকরো অমরেশের গা দিকে ফিকে দিল। অমরেশ ত সে তেমনিই ছেলে, ঝপ্‌ করে কথাটাকে হজম করে অন্য মহড়ায় ঘুরিয়ে দিল—হ্যাঁ তা ত বলবার কথাই, বলবেই ত। কি ব্যাপার জান এত চারদিক থেকে ঝামেলায় পড়ে যাই যে ইচ্ছা থাকলেও পারি না। যাক এস এখন মেসোমশইয়ের কাছে যাই তারপর না হয় বসা যাবে।

—যাও না তুমি, আমি এই বাবার কাছ থেকে আসছি।- গীতিকা এটা ইচ্ছা করেই করল ? আমি শুদ্ধ গেল যদি বাবাকে দেখে ঐ দিক দিয়ে সরে পড়ে। আমি এখানে বসে থাকলে নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

অমরেশ এগিয়ে গেল মেসোমশয়ের ঘরের দিকে। অমরেশকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে মেসোমশয় বলে উঠল—কে বাবা অমরেশ ?

—হ্যাঁ মেসোমশয় আমি, আপনি কেমন আছেন ?

—আমি আর কেমন থাকব ! বস বস। গীতিকা কৈ ? গীতিকার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি ?

—হ্যাঁ হয়েছে।

—ওর মনটা কাল থেকে যেন খুব ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাগছে—কি ব্যাপার ? ইউনির্ভাসিটিতে তোমাদের কিছু হয়েছে নাকি ?

—না না কিছুই আমাদের হয়নি। তাহলে আপনার অসুখের জন্তই বোধহয় ওর মনের গোতিটা খারাপ।

—না না সেটা ঠিক কারণ নয়। আমার বাড়াবাড়ির মুখে ওর এরকম মনভাব ছিল না। আমি ওর কথা চিন্তা করতে ঐ বরং আমাকে সাহস দিয়েছিল। —ও সব নিয়ে বাবা তুমি চিন্তা করবে না ত—ও পরের কথা থাক। ওর নিশ্চিন্ততে আমিও যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কারণ আমি জানি ত—কোন পাত্রের তুলনায় ও অযোগ্য পাত্রী নয়। তাই না অমরেশ —তুমি কি বল? তোমাদের চোখেই এগুলো বেশী ধরা পড়বে। আমি অহংকার মূলক কিছু বাড়িয়ে বলছি কি না।

—ছিঃ ছিঃ মেসোমশয়, আপনি যে কি বলেন না!

অমরেশ যে কথাগুলো শুনে যাচ্ছে তার কিন্তু ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায় নেই। মেসোমশয় ত আর সাধারণ লোক নন। তিনি একজন এত বড় ইউনিভার্সিটির সর্ব্বময় কর্ত্তা। তারই ছাত্রছাত্রী এরা দুটি। কাজেই মাঝে মাঝে অমরেশের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন সেটাও অমরেশ বুঝতে পারছে।

হোক না শিক্ষিত প্রবীন, অমরেশও কি কিছু কম যায় নাকি। একজন চর্চ্চা করে জ্ঞান লাভ করেছে আর একজন ঐশ্বরীক জ্ঞান নিয়ে এসেছে—এ দুয়ের যে অনেক তফাৎ। তাই অমরেশ সেই দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলে খুব সহজ সরল ভাবই প্রকাশ করে যাচ্ছে। মেসোমশয় ভাবছে—তাই ত কি ব্যাপার! তবে কি আমার মেয়ে অন্ত কারও উপর লক্ষ্য করেছে? আমার মেয়ে হয়ে এত বোকা বা অবুঝ হবে! এমন একটি হীরে সামনে থাকতে সোনা রুপার দিকে তার দৃষ্টি পড়বে!

মাসীমা এসে ডাক দিল—অমরেশ, আজকে তাহলে এইখানেই খাওয়া দাওয়া করে যেও কিন্তু। প্রীতির মনটা খারাপ, দু'জনে মিলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবে।

মোসামশয় অময়েশের উত্তরের আগেই ঝাঁপিয়ে উত্তর দিল—হ্যাঁ হ্যাঁ ও আর তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন?

অমরেশ একটা ইংরাজী নভেলের উপর চোখ বুলাচ্ছিল। হঠাৎ চমকে উঠে বলল—না না না মাসীমা আমার ওখানে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মেসোমশয়—ব্যবস্থা! ব্যবস্থা আবার কি! সেটা না হয় পরেই হবে।

—না মেসোমশয়, আমার ভাই আমার জন্য বসে থাকবে।

—ভাই?

অমরেশ তখনই অজয়ের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে সুরু করল। মেসোমশয় অমর সম্বন্ধে আরও স্তম্ভিত হয়ে পড়ল।

অমরেশ—হ্যাঁ তাহলে বলুন ত, ডাক্তার কি বলেছে আপনাকে?

—বলা বলি আর কি? বিশ্রাম নিতে বলেছেন। অবশ্য বিশ্রাম প্রাপ্তির আমার আর সময় কোথায়। সে অবসর না হওয়া পর্যন্ত আমি কি আর বিশ্রাম নিতে পারব!

অমরেশ জিনিসটা বুঝেও বুঝতে চাইল না বা বুঝেও না বুঝার ভান করে বলল—কেন, আপনি ইচ্ছা করলেই বিশ্রাম নিতে পারবেন, আপনি এখন সর্ব্বময় কর্ত্তা, আপনার আর কি।

—আঃ কি বলছ। দেহের বিশ্রাম হলেই কি মনের বিশ্রাম হয়? যাক ওসব কথা পরে হবে এখন। গীতিকা কোথায় গীতিকা? সে এখনও আসছে না—দেখ গীতিকা কি করছে। ওর সঙ্গে আলাপ কর।

মেসোমশায়ের একমাত্র মেয়ে গীতিকা। অর্থের অভাব নেই, রূপে গুণেও সাধারণ নয়। সেইজন্য সর্ব্বদিক তাদের পূর্ণ করে রেখেছে। মেসোমশয় তাকে সুপাত্রের হাতে দিয়ে অবসর চাইছেন—এই হল তার আসল উদ্দেশ্য।

অমরেশ—তাহলে আসি। গীতিকা কোথায় দেখি।—বলে বেরিয়ে এল। —গীতিকা কৈ তুমি কোথায় গেলে? আরে তোমার যে সাড়াই পাওয়া ভার। তবুও কারও সাড়া নেই। ধীরে ধীরে পা ফেলে গীতিকার ঘরে অমরেশ প্রবেশ করল। গীতিকা জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় চেয়ারের উপর 'থবলা' হয়ে বসে আছে। অমরেশ যেন গোবেচারীটির মত দাঁড়িয়ে বলছে—কি ব্যাপার বলত তোমার? কি এখানটায় বসতে পারি?

গী—আমার কাছে বসলে যদি তোমার মন অপবিত্র হয়ে যায়?

—কি বলতে চাও বলত গীতিকা? কেন আমি কি তাই বলেছি কোনদিন?

হঠাৎ অমরেশের পাহাড়ের মত মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। শুধু এইটাই তারমনে হতে লাগল—একবার একবারটি পিঠের উপর হাত রেখে ওর রাগ

অভিমানের সঙ্গী হই না কেন। কিন্তু বাড়াব মনে করলেও বাড়াতে পারছে না।

গীতিকার কোথা থেকে মান অভিমান জড়তা তাকে আচ্ছন্ন করছে। সেও এই কথাই ভাবছে—না না সব কিছু আমার চুরমার করে দিয়ে আমি ওরই পায়ে মাথাটি রেখে আমার জীবন সঁপে দিতে চাই ওকে। কিন্তু যদি না আমাকে গ্রহণ করে, তাহলে? করবে না? আমি পারব না পারব না, অমরেশকে ভুলে আমি আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। তেজস্বী, বীর্যবান অমরেশ মুহূর্তে যেন স্থবির হয়ে সে গীতিকার দিকে চেয়ে ভাবছে একবার আমার বুকে মাথাটা রাখুক না কেন—ক্ষতি কি?

কেন ভাব অমরেশ, অমন করে?
দাঁড়ায়ে রয়েছি সমুখে তোমার
লহ অস্ত্র, করিতে এসেছি দান।
তুমি বীর্যবান—
যেও না যেও না ভুলে।

কেন ঝাঁপ দিতে চাও
আমায় বল?
জলন্ত অগ্নি শিখা
জান না কি?
জান না কি—
করেছে আঁধার তোমায়?
তারই ছায়ায়
ফিরে এস গুণমণি।

জান না কি, তুমি বীর্যবান
করিবে কাঙাল কত জনে।
আসিবে দুয়ারে চাহিবে ভিক্ষা।
হবে রাজা হবে ধনী।
ফিরে এস গুণমণি।

ভুল করো না তিলেক যেন
ও অমরেশ মরিবে না
ধরার বুকে।
এসেছ জয় করিতে
জয় মাল্য আমার হাতে।

টেনে নাও বক্ষে তোমার।
রয়েছে দাঁড়ায়ে চেয়ে দ্যাখ।
না চেয়ে বক্ষ পানে,
চাও অমরেশ বদন পানে।
ভাব তুমি ক্ষণে ক্ষণে—
মানস কন্যা আমার ;
আমি পিতা হব জগজনের।

অমরেশ—
দুর্বান্ত কাম কামনা
ঠেলে দেবে তারে
তোমার আশে পাশে,
রয়েছে ঘোর শত্রু জনা জনা।
রয়েছি তোমার মাঝে,
অমরেশ, ধারাল অস্ত্র তোমার
একবার চাও না এসে।
চেয়ে দেখ একটুখানি
বেরিয়েছে জ্ঞান বিবেক।

ও অমরেশ—
বীর্যবান—
মা।—
জানবে তুমি।
বারে বারে ডাক তায়

ভুলে যাও তুমি তোমায়।
এস গীতিকারে সাথী করি।—
"করিব কর্ম না বুঝে মর্ম
জানি করিবে বিচার
মালিক যিনি।"

"এস গীতিকা সঙ্গে আমার
করে যাই কর্ম শুধু
ভুলে যাই আপনাকে
আমি আপনি।"
ভুবন ভরা কামের মেলা
কাম কামনা সদাই ঘেরা।
রয়েছে মেতে জনে জনে।
এস গীতিকা
ভুল ভাঙ্গিব দুজনায়—
দুজনায় দুজনে।
গীতিকা—
এস আমার সমুখে তুমি।
জান না কি?
ভেবে দেখ একটুখানি।

জড় স্তম্ভিত—একি অমরেশ! আমি—আমি অমরেশ! এ .কন আমি স্থবির হয়ে যাচ্ছি। আমি!

ধীরে ধীরে অমরেশ পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে গীতিকার কাছে বসে শুধু বার বার গীতিকার আপাদ মস্তক দৃষ্টি করতে লাগল। অমরেশের চাউনি মোটেই সহজ নয়। সহজ ভাবে চাইব মনে করলেও কিসের নেশায় তার চোখ যেন শুধু জড়িয়ে আসছে। হঠাৎ গীতিকা অমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে সে সাহসী রমনীর মত বলে উঠল—অমরেশ, তুমি আর কতদিন আমাকে কাঁদাবে—আর কত আমার থেকে দূরে দূরে থাকবে আমি জানতে চাই?

অমরেশ উত্তর দেব মনে করলেও সে উত্তর দিতে পারছে না। ভিতরে দারুণ ভাবে তার জড়তা এসে পৌঁছে গেছে। আর এই কথাই মনে হচ্ছে—একবার একবার আমি গীতিকার দিকে আগিয়ে যাবই যাব। অসম্ভব একে দমন করা। না না আমার দ্বারাতে হতে পাবে না। আমি পারব না পারব না, যতই হোক আমি ত একটা যুবক, আমার রক্ত মাংসের দেহ। আমার ত ক্ষুধা বলে আছে। না তাকে আমি অস্বীকার করব না, তা আমি করতে পারি না। চেয়ারটা আরও কাছে করে গীতিকার দিকে আগিয়ে অমরেশ আরও নিকটবর্ত্তী হল।

অমরেশের জীবনেব সমস্ত স্বপ্ন যেন এক মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার হতে চলেছে। অমরেশ মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে—গীতিকাই হবে তার জীবনের সঙ্গিনী। জীবনের অনেক কিছুরই উপরে গীতিকার এসে যাবে অধিকার। এ কিন্তু সে অমরেশ নয়। হঠাৎ অমরেশ কোথায় হারিয়ে গেছে। অমরেশের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে এখন অশান্ত কাজ করছে। যাক অনেক দিনেব স্বপ্ন বা আশা আজ গীতিকার পূর্ণ হল। গীতিকা দারুণ বল পেযে যেন চেয়ারের মুখ ঘুরিযে অমরেশের মুখোমুখি এগিযে এল। পরিস্কার অমরেশ তার বুকের দিকে চোখ ফেলে নিজের দৃষ্টির ভিতরে নিজেকে উপভোগ করাতে চাইল। এবার অমবেশেব মনের অবস্থাটা কি? ভরে উঠেছে কাম কামনায। পরিস্কার বুকেব উপরে চোখ ফেলতে যাবে কে যেন হঠাৎ কোথা থেকে টান দিযেছে—'দাদা।'

চমকে উঠে অমরেশ—কে?

—আমি অজয়।

অমরেশ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল—আমি অজয়ের দাদা অমর! হঠাৎ সে চেয়ার ছেড়ে একবারেই বাইরে এসে দাঁড়াল। আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সে গীতিকাকে কোন জিজ্ঞাস করা প্রয়োজন মনে করল না।

সামনেই অজয়।—কিরে কি ব্যাপার?—জড়িয়ে ধরল অজয়কে।

—দাদা জান বাবা এসেছে।

—বাবা? কে বাবা রে?

অভাগা অমরেশ এখনও কি ভুল?

অজয়—জান না তুমি যে দিদির বিয়ের জন্ত গেছিলে তাই বাবা এসেছে।

অমরেশ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি ক্লীব। আমি অমানুষ। আমি পশু। আমি অধম। অজয় এসে আজ আমাকে দাদা বলে কি পরিচয়টাই না দিল।

—তারপর বাবা কি বলল? কতক্ষণ আগে বাবা এসেছে?

—জান দাদা বাবা না প্রথমটা আমাকে চিনতেই পারে নি। আমি বলছি —আমি দাদার ভাই—আমি অজয়, তবু চিনতে পারছে নি।

গীতিকাকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে অমর অজয়ের সঙ্গে কথা বলছে। প্রথমেই গীতিকা মনে মনে ভাবল—উঃ এ সময় কে এসে এভাবে ডাকল। যাই হোক সবই ত বুঝতে পারছে। ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বার হয়ে অমরেশের দিকে এগিয়ে এল। গীতিকার মনে তখন নানারকম প্রশ্নের তোলপাড় চলছে। অমরেশও অজয়ের সঙ্গে সহজ ভাবেই কথা বলছে। যাই বলুক যত সহজই হোক না কেন, ছাড়ব বললেই কি এ জিনিস ছাড়া যায়! এ যে ধোয়া মোছার জিনিস নয়। গীতিকা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই অমরেশের মনটা আবার যেন কেমন হয়ে গেল। দৃষ্টি না ফেলবার ইচ্ছা থাকলেও আপসেই তার দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। যেন মনে হল সে কত বেচারী অসহায়। উভয়ের মধ্যে আবার নীরব চাওয়া চায়ি। অজয় একটু হচকচিয়ে গেল।—

—ও দাদা চল। বাবা দাঁড়িয়ে থাকবেন যে।

'হ্যাঁ, ভাই চল যাচ্ছি।'—পা দুটো যেন গীতিকার কাছ থেকে আর কিছুতেই সরতে চাচ্ছে না। আর গীতিকাও ভাবছে—অজয় আজ আমাদের দুজনের মাঝে রীতিমত পাহাড় সৃষ্টি করল। অজয়কে কি যে করবে কি যে বলবে কোন যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। অমরেশ কিন্তু অজয়কে লক্ষ্য করেই বার বার এই কথাই চিন্তা করছিল—অজয় এ সময়ে এসে বাধ সাধল কেন? নিশ্চয় এর কিছু একটা গূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু মনে করলে কি হবে চোখ ফিরাতেও পারছে না। আর তার সঙ্গে আরও মনে হচ্ছে—উঃ কি দুরন্ত এর গতি। কি নির্ভীক এর আশা। এ যেন কারও বাধা মানতে চায় না। দাদা—দাদার কথা কি আমি একদিন এই ভাবে তলিয়ে চিন্তা করেছিলাম? দাদা কি বৌদিদিকে এইভাবে ভালবেসেছিল? দাদার কি বৌদির প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল? নিশ্চয় ছিল। না না না—এ কি আমি আবোল তাবোল ভাবছি! আমি ছোট ভাই হলেও আমাদের সকলের সামনে যে দাদা একদিন সব কথাই খুলে বলেছিল। দাদা তাদের দরিদ্রতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাহলে?

ঝপ্ করেই মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে অজয়ের পিঠে দু'একবার চাপড়িয়ে বলল—চল। এক দু' পা আগাতেই মায়াবিনী সুর যেন অমরকে আবার ফিরাতে চাইল।—সত্য সত্যই তুমি তাহলে এক্ষুণিই চলে যাচ্ছ?

অমরেশ ঝপ্ করে আপনার দিকে আপনি চেয়ে বায়ুর বেগে বেরিয়ে গেল। শুধু ফিরানো মুখে এই কথাই বলে গেল—হ্যাঁ এখনই আমাকে যেতে হবে।

এ কথা শুনেও—তাহলে আবার কখন আসবে—পাল্টা প্রশ্ন।

অজয় তখন বেশ খানিকটা আগিয়ে চলে গেছে। অমরেশ হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। আমি? আমি! তাহলে কি এই ভাবেই বসন্ত বাবু ডুবেছে? অজয়ের আজ তাই দুর্ভাগা কপাল। যেখানে আমার কোন বন্ধন নেই সেখানে হঠাৎ কেমন যেন বন্ধনের সৃষ্টি হচ্ছে। এর পিছনে শুধু কি ঐ একটিই কথা নয়—চাওয়া আর পাওয়া। আমি যদি ওকে না চাই তাহলে ও আমাকে পাক না কেন? ও যদি আমায় বেঁধে শান্তি পায় বাঁধুক, আমি ত আর ওকে বাঁধছি না।

—আসা যাসির আমার আর নির্দ্দিষ্টতা কি আর বল। যখন খুশী তখনই আসব।

যাই হোক অমরেশ আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেল। গীতিকা ওর যাওয়ার পথে হাঁ করে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল। যখন অমরেশকে আর দেখা গেল না তখন গীতিকা ধীরে ধীরে মন মরা ভাব নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে কত কথাই না ভাবতে সুরু করে দিল। হঠাৎ ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল—ওদের সেই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ইউনিভার্সিটিতে যে ফটোটা তোলা হয়েছিল, সেই ফটোটা হাতে করে নিয়ে অমরেশের দিকে দৃষ্টি রেখে মনে হতে রইল—আমি কি তোমার অযোগ্য? তবে কেন এভাবে আমাকে তুমি বার বার করে ছিটিয়ে কাঁদিয়ে সরে যাচ্ছ? না না আমাকে ত ছিটিয়ে সে যায় না। সে কি আমার জন্য এসেছে? তা ত নয়। আমার মতন কত গীতিকাই তার সামনে দাঁড়াবে কিন্তু সে ত কাউকে আলাদা করে ভালবাসতে পারবে না। সে যে কপট, মিথ্যাবাদী নয়। আমার কাছে ত সব কথাই ইঙ্গিতে ভাবে খুলে বলেছে। তাহলে? আমিই স্বার্থপর। আমি আমার একার জন্যই তাকে আমার করে কাছে টানতে চাইছি। তাই বা কি করে বলব। কেন, আমাকে কাছে নিয়ে সে সকলের কাজ করুক না কেন—আমি

ত বারণ করছি না। তা কি করে হতে পারে! বন্ধন—তার মধ্যে যে সৃষ্টি। অমরেশ অমরেশ, না না একি তোমাকে আমি ভুল বুঝছি!

কিন্তু গীতিকা শত কথা মনে ভাবলেও যে ক্ষুধা তার এসেছে যে বাঁধ তাব ভেঙ্গেছে, তাতে কোন মতেই ঢেউ আটকাতে পারে না। তাই মুহূর্তেই আবার তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। না না তোমাকে আমার চাই—চাই। এ হতে পারে না। আমি তোমাকে না হলে এক মুহূর্তও কাটাতে পারব না। তুমি কি জান না—তুমি এত নিষ্ঠুর—তোমাব মনে কি দয়া মায়া ভালবাসা কিছু নেই যে তুমি এভাবে আমাকে ছিটিয়ে দিয়ে যেতে পারলে। আবোল তাবোল সে ভেবে চলেছে। হাতে তার কটোখানি ধরা। হঠাৎ মা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে; সে একটুও টের পায় নি। মায়েব ত এমনিই বুঝতে বাকী ছিল না; আজকের ব্যাপারে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই সে নিঃসঙ্কোচে মেয়ের দিকে এগিয়ে এসে বলল—গীতিকা, কিরে কি ভাবছিস অমন করে? অমবেশ কি বলে গেল?

—জানি না যাও।

—কি হয়েছে তোদের বলত? কি ব্যাপার আমাকে বলদেখি?

শিক্ষিত বুদ্ধিমতী মা বলেই এই ভাবে মেয়েকে প্রশ্ন করল। মা তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিল—যৌবনের-ঢেউ যৌবনের ক্ষুধা তার ত আর জানতে বাকী নেই। সে সব ধাপ সে পার হয়ে এসেছে। তাই এই মরশুমে মেয়ের প্রতি কি ব্যবহার করা উচিত তা সে ভাল করেই বোঝে। সন্তান যখন কিছু বোঝে না—শুধু স্নেহ মমতা, তখন তাকে দুটো বকা মারা শাসন চলে। কিন্তু সন্তান যখন প্রমাণ হয়—তার যখন খাদ্য অন্বেষণ করার বয়স ও সময় হয়ে যায় তখন আর সে শুধু স্নেহ মমতায় ভুলতে চায় না। তাহলেও ত উপায় নেই—সহযোগীতা-বা আন্তরিকতা দেখালে হয়ত তার বেগের কিছু কমতি দেখা দেবে—আশা পায়। তাই মেয়ের ঐ বিরক্তির উপরেও মা মেয়ে তার স্নেহ পূর্ণ হাতখানি মাথাতে রেখে বলল—ঠিক জানিস, আমায় বলবি নি—তাই বল।

—জানি নি বলছি, তবু আমায় বিরক্ত করছ কেন?

এইখানেই দেখ জননীর এগিয়ে আসা সার্থক হয়েছে কি না? মুহূর্তে গতি দাঁড়িয়ে গেল।

মা আবারও তাকে বলল—গীতিকা, আমি ত তোর মা, আমার কাছে পাঁচটা কথা তোর খুলে বলতে দোষ কি—কি ব্যাপারটা আমায় বলত ?

—কি আবার ব্যাপার !

বুদ্ধিমতী জননী ঝপ্ করে মোড় ঘুরিয়ে দিল—দেখ অমরেশ ছেলেটি কিন্তু দেখতে বেশ, আমার খুব ভাল লাগে। ওটিকে জামাই করলে কেমন হয় বলদেখি ? তোর বাবাও একদিন আমাকে বলছিল। অবশ্য আমি তাকে বলেছিলাম।

ঝপ্ করে ফটো থেকে মুখ তুলে গীতিকা মায়ের দিকে চেয়েছে—হ্যাঁ হচ্ছে তোমার জামাই।

—কেন না হওয়ার কি আছে ?

—তুমি ওর সম্বন্ধে কিছু জান ?—বলেই অমরেশ সম্বন্ধে পাঁচটা কথা গীতিকা মাকে বলতে সুরু করল।

মা তখন গীতিকাকে বলল—আমরা একদিন কথা পাতি না, কি বলে দেখি না।

—কথা পাড়াটা তোমাদের বৃথাই হবে। তবে অন্যদিক দিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করতে পার।

যাই হোক মেয়ে যেভাবে আগুনের মত হয়ে উঠেছিল মা যেন তার কিছুটা নাগাল পেল। প্রকৃত সন্তানের পিতা মাতা হলে ঠিক তাদের পিছন লক্ষ্য করে তাদিকে কাছে টানা চাই। অবশ্য এ আর কতটুকু ! এমনও অবস্থা আসে বা আসতে পারে যে সেখানে লগি চালানোর কোন সম্ভাবনা নেই। সেখানে বুঝতে হবে ভুলটা সুরুতে হয়েছে, বা পিতা মাতার প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই সন্তান গড়ে উঠেছে। তথাপি শেষের দিকে যদি নিজের সমস্ত অক্ষমতা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করে বার বার চেষ্টা করে—যা হবার তা হয়ে গেছে আর ফেরাবার নয়, হে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও আমি আমার সন্তানকে হ'ত দেব না—তার জন্ম নিজেকে প্রাণপাত করে ফেলতে হবে। এই হলেই ঘুরাবার সম্ভাবনা থাকে।

শিবশঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে। অমরেশ এসে পৌছল।—কি ব্যাপার, কোথায় গিয়েছিলে ? পড়াশুনা কেমন হচ্ছে এখন ?

—হ্যাঁ এই হচ্ছে।

—ভাইসচ্যান্সেলরের বাড়ীতে গেছিলে বোধ হয়?

—হ্যাঁ ঐখানেই ছিলাম। উনার শরীর খুব অসুস্থ তাই দেখতে গেছিলাম। কি হয়েছে?—শিবশঙ্করের একটু উদ্বিগ্ন স্বর।

—প্রেসার বেড়েছে। তবে এখন একটু ভালই আছেন। তা বাবা তুমি?

—হ্যাঁ আমি ঐ দীপার ব্যাপারে এসেছি। পাকা দেখাটা করে আসতে হবে, ওরা চিঠি দিয়েছে। তাই ভাবলাম তোমাকে চিঠি লিখে বাড়ীতে না ডেকে, এখানে এসে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে। তোমার মা-ও তাই বলল।

—তাহলে আমাদের কখন বেরুতে হবে?

—আজকে ত আর দেখছি সময় নেই। তাহলে বরং কালকে সক্কালেই বেরুনো যাবে।

—তোমার নাওয়া খাওয়া তাহলে?

—না আমার ও সব আর কোথায় হল!

অজয়—দাদা, তাহলে মেসে আমি বলে দিয়ে আসি?

—এত বেলায় কি আর তুই বলবি এখন? আমি এখন যা হোক খেয়ে নেব—বাবা ঐটিই খাবেন।

অজয়—না দাদা, আমি পাউরুটি খেতে ভালবাসি আমি বরং তাই খেয়ে নেব। তোমরা না হয় ভাত খাবে।

শিবশঙ্কর—ছেলেটি কে বলদেখিনি?

—ছেলেটির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবার আছে। বর্ত্তমান জেনে রাখুন ছেলেটি আপনারই ছেলে।

—আমারই ছেলে, বাঃ বাঃ মন্দ কি! অজয়ের খুব আন্তরিকতা দেখে মাঝে মাঝে শিবশঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে পড়ছিল। তার মধ্যে তার একটু জানার ইচ্ছাও এসেছিল না? তবে সে বড় চাপা মানুষ, উচ্ছ্বাস একেবারেই পছন্দ করে না। জানত—যদি কিছু বলার থাকে, অমরেশ ঠিকই সুবিধা সুযোগ বুঝে তাকে বলবে। আর হলও তাই।

রাতে খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নিয়ে কে কোথায় শুবে এই কথাতে অজয়

বলল—দাদা, তোমার ঐ যে খাটটা সেটাতেই বাবাকে দিয়ে দাও। তোমার আমার নীচে বিছানা পেতে শোব।

শিবশঙ্কর বলল—না না তা কেন। আমারই একটা নীচে বিছানা করে দাও না।

না, তাই আবার হয়!—অমরেশ।

এই সবশুমে অমরেশ বলল—তুই তাহলে বিছানাগুলো ঠিক করে ফেল। অমরেশ এবারে আরম্ভ করল—তাহলে বাবা এবার অজয়ের কথা একটু বলি শোন।

শিবশঙ্কর—অজয়ের কথা কি আর শুনব। শুনলামই ও—আমার ছেলে। অবশ্য বাপ জেনেও অজয়কে আন্তরিকতা দেখাবার জন্য এই কথা বলল।

অজয়—না বাবা, আপনি দাদা যা বলছে একটু শুনুন।

—কেন, শুনতে হবে কেন?

—না শুনলে আপনি সব কথা মাকে যেয়ে বলবেন কি করে?

অমরেশ তখন অজয়ের কথা আরম্ভ করে দিয়েছে। প্রথমটায় শিবশঙ্কর একটু স্তম্ভিত হয়ে গেল বসন্তবাবুর কথা চিন্তা করে। যাক মোটামুটি খানিকটা শুনেই শিবশঙ্কর এই কথাই অমরেশকে বলল—ভদ্রলোক বড্ড নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল—তাই নয় কি? ঠিক আছে তোমার কাছে ওকে রাখবে। ওর যদি কিছু লাগে টাগে তাহলে আমাকে সেটা জানিও।

অজয়—আচ্ছা বাবা, আমার পিতৃদেব যা টাকা দেব বলে গেছেন দাদার কাছে, সে টাকা নেওয়ার কি প্রয়োজন? দাদা বলল—নেব। আমার কিন্তু এককেবারেই ইচ্ছা ছিল না। আমার যতদূর পড়াশুনা হয়েছে ঐ পর্যন্তই থাকত। আমি আর পড়তাম না। দাদার কাছে আমি দাদার শিক্ষা গ্রহণ করতাম।

—না না তা আবার কখনও হয় ও কি বলছ? তোমার দাদা যদি তোমার পড়াশুনা ভাল মনে করে তাহলে তোমাকে পড়ানো উচিত। আর টাকার জন্য কি যায় আসে। আমি ওদের তিনজনের যেভাবে কষ্টে শিষ্টে জোগাড় করেছি সেভাবে তোমারটিও জোগাড় করব। কিন্তু তোমার বাবার টাকা তোমাকে নিতেই হবে।' তুমি যদি টাকা না নাও তাহলে তাকে পরোক্ষে অপমান করা হবে।

—না তিনি ত আমাকে টাকা দেওয়ার ব্যাপারেই এত অশান্তি হয়েছিল—আমাকে মানুষ করতে তিনি নারাজ।

—ছিঃ ছিঃ এ কি কথা বলছ? পিতা তোমার প্রতি যাই ব্যবহারই করুক না কেন তুমি তার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রেখে চলবে। ভুল তার সে ঠিকই একদিন বুঝতে পারবে। ভুলের উন্মূল বা ভুলের নির্মূল—দুইটিই ঈশ্বরের হাতে। মানুষ হয়ে যদি কেউ মানুষকে শাস্তি দেব বা অপমান করব মনে করে তাহলে তার মতন আর বোকা নেই। শুধু কি তাই—ঈশ্বরের কাছেও বিচার তখন খেল হয়ে যায়। সেইজন্যই নিয়ম কি জান অজয়—নিজের চলার পথ লক্ষ্য করে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাও, পিছন দিকে চেও না। তোমাকে কে কি করেছে সে মনেও রেখো না। সে মনে রাখলেই মনকে তোমার পুড়িয়ে দগ্ধ করে দেবে। পাশে প্রতিহিংসা ঘর বাঁধবে। ফলে হবে কি—তুমিও ধাস্ হয়ে যাবে।

কথাগুলি খুবই মন দিয়ে অজয় অমর উভয়ই শুনছিল। অমরেশের বুক গর্বে ভরে উঠল। অজয়েরও তার চাইতে কিছু কম যায় নি। সে শুধু ঈশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানিয়ে এই কথাই স্মরণ করছিল—হ্যাঁ ঈশ্বর তুমি আছ। আজ তা না হলে আমার জীবনে এরকম পিতা এসে পৌঁছায় কি করে। হে ভগবান আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন প্রকৃত মানুষ হতে পারি—নিজেকে গড়ে তুলতে পারি।

পরদিন সকাল সকাল চা খেয়ে রওনা হল ওরা যাদবপুরের দিকে। পথে যেতে যেতে অমরেশ জিজ্ঞেস করল—আমরা যে যাচ্ছি উনারা জানেন ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সে খবর তাদিকে আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। ভাল কথা, তুমি অজয়ের কি ব্যবস্থা করে এলে? আমরা কখন ফিরব টিরব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সে আমি ওকে সব বলে এসেছি। আমরা কখন ফিরব ঠিক নেই—তুই তোর খাওয়া সেরে নিবি।

যথা সময়ে হৃদয়ের ওখানে যেয়ে বাপ বেটায় পৌঁছল। হৃদয় অবশ্য বাড়ীতেই ছিল। দরজা খুলেই যখন তাদের দেখল—'ও আসুন আসুন' অভ্যর্থনা করে হৃদয় ভিতরে নিয়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর কথা পাড়া হবে—

এইটিই স্থির ছিল। জলখাবারের ব্যবস্থা হতে শিবশঙ্কর বলল—দাদা, ওসব আবার কি করছেন? আমরা ওসব পাঠ চুকিয়েই বেরিয়েছি।

—তা হোক না, একটু মিষ্টি মুখ ত করতে হবেই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে রান্না ঘর থেকে গিন্নী বলে উঠল—আমরাও জানি, না খেয়ে কেউ আসে না। না কি অমরেশ, তুমি আমার দিকে হও ত; তোমার বাবা বলছেন—খেয়ে এসেছি।

অমরেশ—না মাসীমা, ব্যাপারটা কি জানেন ত, এই এখুনি খাওয়ার পর আবার খাওয়া—খাওয়ার উপর খেলেই ত আর হল না—

—না সেরকম কেন, অল্প স্বল্প।

বলতে বলতেই আয়োজন সামনে এগিয়ে এল। সামান্যই গ্রহণ করবে শিবশঙ্কর স্থির করে নিয়েছে। অবশ্য নানা রকমের সাজানো সব। সংসারের মামুলী কথা নিয়ে কিছু সময় কাটতে রইল। অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই ভাতের জায়গা হয়ে গেছে। পাতে বসে শিবশঙ্কর একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। একটু চমকে উঠল। ভদ্রমহিলা একলা, কিন্তু রান্না করেছে ত অনেক রকম। অবশ্য বাড়ীতে একটি বিধবা মহিলা ঘুরছে। তিনি কে এখনও জানা হয়নি। রান্নার প্রথমেই দেখল শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, নারকেল কুরি টুরি দিয়ে ছোলার ডাল, পাকালো পোনা মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাই কারি; মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির তরকারী, মোচার চপ, ডিমের ডেভিল, আলু-বখরার চাটনি সাজানো শেষে। অবশ্য এর পর এক এক করে এল দৈ মিষ্টি।

শিবশঙ্কর খাওয়া সুরু করেই বলল—করেছেন কি! এ যে দেখছি বিয়ে বাড়ী।

শুধু কি তাই এই সঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্থ শিবশঙ্করের মনে হচ্ছে, এই রকম ব্যবস্থা যখন তখন না জানি কত হাঁকবে! হৃদয় কাছে থেকে এদের ভাল করে ভোজনাদি লক্ষ্য করে যাচ্ছে। শিবশঙ্কর বলে উঠল—দাদা আপনি বসুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে যে।

—আচ্ছা আচ্ছা হবে হবে।

কিন্তু না, তবুও শিবশঙ্কর তাকে ছাড়তে চাইল না। কোথায় যেন বাধ বাধ ঠেকতে রইল। সে আবারও ঐ কথাই বলতে তখন হৃদয় বলল—ঠিক আছে আমাকেও খাবার দাও। এই দাও এই দিতে দিতেই এদের একরকম খাওয়া সমস্ত হয়ে গেল।

শিবশঙ্কর—এ দেখছি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যা রান্না করেছেন—প্রত্যেকটিই পরম উপাদেয়। আমার মেয়ে এখানের যোগ্য হওয়া যেন আমাব কল্পনার বাইরে।

হৃদয়—এ আর কি রান্না—অতি সাধারণ। একা ত পেরে উঠে না। ঐ জন্য আমার পিসতুতো বোনের মেয়েকে এনেছি। অবশ্য ও এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকে।

শিবশঙ্কর—ও তাই, আমি ভাবছিলাম যে মেয়েটি নিশ্চয় কেউ আত্মীয়।

—হ্যাঁ ও অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছে। শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা অবশ্য ভালই। তা ভাগনে-জামাইও নেই বা এক দুটো ছেলেও যদি থাকত তাহলেও না হয় এক কথা ছিল। ও প্রায় বেশীর ভাগ সময়ই কাশীতে কাটায়।

—নেন নেন দাদা আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে আপনি খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। এদের ততক্ষণে খাওয়া সাবা।

হৃদয় গীতাকেই ডাক দিয়ে বলল—কৈ মা গীতা এদের মুখ শুদ্ধি দিলে না?

—হ্যাঁ মামাবাবু, এখানে আমি সব গুছিয়ে রেখেছি।

যাক দু'এক কথা বলতে বলতেই এরা এগিয়ে এল বসাব ঘরে।

হৃদয়—তাহলে তোমরা একটু এই সুযোগে বিশ্রামটা সেরে নাও। আমি এই অবসরে খাওয়াটা সেরে আসি।

শিবশঙ্কর—আমরা বিশ্রাম করতে যাব আর আপনি এতক্ষণে খেতে যাবেন।

—না তাতে আর কি হয়েছে। এক আধ দিন একটু দেরি হয়েই থাকে।

অমরেশ—না মেসোমশয় দেবিটা বড্ড বেশী হয়ে গেল। এখন প্রায় পৌনে দুটোর মত বাজছে।

—না না বাবা ও আমাদের এক আধ দিন সহ্য আছে। তা তোমার বাবারও কি এরকম হয় না?

অমরেশ—হ্যাঁ সে কথা ঠিকই অবশ্য।

বাপ বেটা একা। শিবশঙ্কর বললো—অমরেশ, কেমন দেখছ?

—এখনও ত ভালই দেখছি।

—হ্যাঁ সে ত আমারও মনে হচ্ছে। তবে দেনা পাওনার কাছেই সব বোঝা যাবে।

অমরেশ—না, মনে হয় মানুষটা ভাল।

যাক গে এই রকম দু একটা কথা হতে না হতেই হৃদয় পৌঁছে গেল। শিবশঙ্কর ব্যস্ত হয়ে—'এই বসুন বসুন' বলে মুখগুঞ্জিটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

হৃদয় বসে কয়েকটা এখান ওখানের কথা আরম্ভ করেছে। শিবশঙ্কর দেখল বেশী সময় নেই এবার কথা পাড়া যাক। এই ভেবে সে কথা তুলল—তাহলে দাদা বলুন, বিয়ের জোগাড় কি কি আমাকে করতে হবে?

—সে কথা আমি আর কি বলব—বিয়ের জোগাড় কি কি করতে হবে।

—না, তাহলে আপনি না একটা বলে দিলে আমি বিয়ের জোগাড় কি বকম কি করব?

—তোমার মেয়েকে তুমি কি দেবে কি না দেবে—কি রকম কি জোগাড় করবে সেটা আমার বলার চাইতে তোমারই বিবেচনা করা উচিত হবে না কি? আমি ত আর রাজলক্ষ্মীর শ্বশুর নয়, সেইজন্ত আমার এ সব গুলো বাধে খুব। তোমার মেয়েকে তুমি খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছ। লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছ। তারপর তার বিয়ের আসরে তুমি কি দিতে পারবে বা কি দেবে সেটা তুমিই ভাল বোঝ। আমার এখানে বলার কিছু নেই।

—তাই বললে কি চলে! দাবী দাবা আপনাদের কি কিছু নেই?

—দাবী দাবা! থাকলে অনেক না থাকলে কিছু নয়।

অমরেশ—না ছেলের তরফেও ত কিছু দাবী থাকতে পারে।

—হ্যাঁ সে কথাটা যদি বলছ তাহলে বলি ঠিকই বলেছ। সেটি আমি বলতে পারব। তাহলেও আমি কি গুছিয়ে বলতে পারব? ওর মাকে ডাকি, ও ওর মায়ের কাছে যদি কিছু বলেছে।

হৃদয় মনোরঞ্জনের মাকে ডাক দিল। ছেলের মা এসে দাঁড়াল।

শিবশঙ্কর—বলুন ত আপনাদের বৌমাকে কি কি দেব?

—কি আর বলব! আমি কি বলব। আপনি আপনার মেয়েকে সাজিয়ে দেবেন। একটি মেয়েকে সাজিয়ে দিতে যেমন লাগে তেমনিই আপনি দেবেন। এ আর বলা বলি কি আছে!

শিব—হ্যাঁ সাজানো ত অনেক রকমই হয়।

—না সেটা আপনি বিবেচনা করবেন।

—তা আচ্ছা বলুন, ছেলের কি দাবী?

—মনোরঞ্জনের? মনোরঞ্জনের একটা রেফ্রিজারেটারের সখ।

হৃদয়—তাহলে ঐ তারিখই আমাদের ঠিক রইল ?

শিব—হ্যাঁ জেনে রাখুন ঐ তারিখই, তবে আমি বাড়ীতে যেগে ঐ তারিখেই পারব কি না আপনাকে জানাব।

হৃ—তা আর না পারার কি আছে। এ যে একবারে ২৯ তারিখ ধরা হয়েছে। আর ত দিন নেই।

—না বিয়ের ত এখন লম্বা দিন আছে—মাঘ ফাল্গুন দুটো মাস।

এরা উঠি উঠি করছে এমন সময় কে একজন এসে বাইরে ডাক দিল—হৃদয় বাবু বাড়ী আছেন নাকি ?

—হ্যাঁ আছি। আরে আপনি ! আসুন আসুন। শিবশঙ্করের দিকে চেয়ে হৃদয় বলল—এটি কে জানেন ত ? আমরা একসঙ্গে রিটায়ার করেছি। তবে উনি আমাদের কারিতকর্মা। সব কাজ কর্ম সেরেই ফেলেছেন। মাত্র ছোট ছেলের বিয়েটিই বাকী।

শিবশঙ্কর—'তা বেশ বেশ, উনি থাকেন কোথায় ? আসুন, বসুন।' পাশেই আহ্বান করল।

—থাক থাক আমার আর বসতে হবে না। কি মনোরঞ্জনের পাকা দেখা শেষ হয়ে গেল।

হৃ—হ্যাঁ একরকম প্রায় হয়েই গেল।

শি—থাকেন কোথায় ?

—এই তো পাশেই।

হৃ—ভদ্রলোক অমায়িক মানুষ

শিব—তা আপনিই কি কমটা !

—যাক আপনাদের বিয়েটা লাগছে কবে ?

হৃ—অগ্রহায়ণের উনত্রিশ বলেই ঠিক করলাম। এবার উনার সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। উনি যেয়ে জানাবেন।

এদিকে আর দেরি করা কেন। শিবশঙ্কর বলল—আচ্ছা দাদা তাহলে আমরা উঠি ?

হৃ—তাহলে কৈ মা গীতা চা নিয়ে এলে ?

—না, আর চা খাব না দাদা আমাদের বেলা হয়ে যাবে।

—না-না-না একটু চা না খেয়ে গেলে চলে !

অমরেশ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—যদি আজকে যান তাহলে সময় কিন্তু আর বেশী নেই।

হ—তা আজ না হয় রাত্তিটা এইখানে থেকেই যাও না। কাল সকালে রওনা হবে।

শিবশঙ্কর—না না, আজকে বাড়ীতে আমার রওনা হতেই হবে।

অম—বাবা ইচ্ছা করলে আমার হোষ্টেলেই থাকতে পারেন, কিন্তু উনি যে থাকবেন না।

কথা বলতে বলতেই চা জলখাবার এসে পৌঁছে গেল। যথা সময়ে এরা বেরিয়ে গেল। ছেলের হোষ্টেলের কাছে এসে শিবশঙ্কর বলল—আমি তাহলে আর তোমার ওখানে যাই কেন, একবারেই ষ্টেশনে চলে যাই।

—তা অবশ্য ঠিকই। আর সময় বেশী নেই। তবে আপনার স্যুটকেসটা ত ওখানে রয়ে গেল ?

—সে থাক না কেন ? দুএক দিন পরে তুমিও ত আসছ, বোঝাপড়া করতে হবে।

—হ্যাঁ আমার দিন কয়েক পর একটা ছুটি পড়বে সেই সময় যেতে পারি।

এই বলে অমরেশ বাবাকে ট্রেনে তুলে দিতে চলে গেল।

অমরেশ সন্ধ্যার পর হোষ্টেলে ফিরেছে। অজয় সামনে এগিয়ে এল—কি দাদা তোমাদের এত দেরি হল, বাবা কোথায় ?

—বাবাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলাম রে।

—ও বাবা তাহলে এদিকে আর এলেন না! দাদা তোমায় কে একজন খুঁজতে এসেছিল।

—কে ? কিছু বলে গেছে ?

—না কিছু বলতে চাইল না। শুধু তোমাকেই খুঁজল।

—তা তুই নাম জিজ্ঞেস করলিনা কেন ? কে, কি জন্য, কোথা থেকে এসেছে—ইত্যাদি জানতে হয় ত।

—নাম আমি জিজ্ঞেস করেছি, তবে কোথা থেকে কেন এসছে কিছু বলল না। বলল—তুমি বলে দেবে আমার নাম ধনঞ্জয়। নাম বললেই সব বুঝতে পারবে।

—ও হো সেই ধনঞ্জয় গোস্বামী! বুঝেছি—বুঝেছি কেন এসেছিল।

পরদিন সকালে ও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে—এইটিই শুধু বলল।

সকালবেলা যাবে কি আর গীতিকা এসে পৌছেছে। অমরেশ ভিতরেই বেরবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। অজয়ই প্রথম দেখতে পেল।—দাদা এই দ্যখ কে এসছে।

—'কে রে?' অমরেশ ভাবল তাহলে বোধহয় ধনঞ্জয়ই আবার এসছে। কিন্তু না তার ভাবা ভুল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে নীচে গীতিকা। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সাহসী অমরেশ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নিজেকে সামলাব ইচ্ছা করলেও সে যেন আর সামলাতে পারল না।' দারওয়ান এসে খবর দিতে ডেকে পাঠাল। গীতিকা উপরে গিয়ে দাঁড়াল। উভয়ে উভয়ের দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলতে সাহস করল না।

অমরেশ—একি, আমার এ ভয় ভাব এল কেন! ভাবাই বৃথা, ভেবেও কিছু করতে পারল না। সেই ভেবেই দাঁড়িয়ে রইল।

গীতিকা—কি ব্যাপার অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?, আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ?

—না ভয় আর কি পাব।

—তাহলে কৈ আমার সঙ্গে ত সহজ ভাবে কথা বলছ না? আর বসতে বলতে ত ভুলেই গেছ।

—বলা বলির কি আছে। বস না তুমি।

—আমি কি একাই বসব, তুমিও বস।

'হ্যাঁ বসছি' বলতেই অজয় 'দাদা' বলে ডাক দিয়ে উপরে উঠে এল।

গীতিকা—এই রে এই জঞ্জালটা সব জায়গায় যেন বাধার সৃষ্টি করে।—এই কথাই সে অজয়কে দেখে ভাবল।

অমরেশ—তাহলে চায়ের কথা বলে এলি?

—হ্যাঁ দাদা এক্ষুণি দিয়ে যাবে।

—তাহলে তুই এবারে চলে যা কি খবরটা নিয়ে আয়।

—হ্যাঁ দাদা এই বেরব।

—হ্যাঁরে চা কতক্ষণ পরে নিয়ে আসবে বলল?

গীতিকা—আবার চায়ের ব্যবস্থা করলে কেন? আমি ত এই খেয়েই বেরিয়েছি।

অজয় বেরিয়ে গেল। অমরেশ গীতিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে—তা একবার খেলে কি আর একবার খেতে নেই? আমিও ত খেয়ে তোমাদের বাড়ীতে যাই। তাহলে আবার খাওয়াও কেন?

—তোমাকে আমাদের খাওয়ানো আর আমাকে তোমার খাওয়ানো অনেক তফাৎ।

—তার মানে?

—ঐ ত বললাম তার অর্থ। কি ব্যাপার বলত—তুমি বসছ না, যেন খুব চঞ্চল ভাব দেখাচ্ছে

—না আমি একটু বেরব কথা ছিল—সেইজন্যই—

—তাই নাকি, কোথায়?

—ধনঞ্জয়ের কাছে একবার যাব।

ধনঞ্জয়!—গীতিকা নামটা শুনে কেমন যেন একটু চমকে উঠল। অমরেশের চোখ তা এড়াল না। কারণ অমরেশ আগে জানত যে ধনঞ্জয় গীতিকাকে ভালবাসতে চায়। অবশ্য গীতিকার তার দিকে লক্ষ্য ছিল না।

গীতিকা—ও তাহলে তুমি এখন সেই দিকেই ব্যস্ত। এখন তোমার এখানে বসার ইচ্ছা নেই?

—না তা বলছ কেন?

—বলছ মানে, তোমার ব্যবহারই ত আমাকে বলা করাচ্ছে!

গীতিকার কথা শেষ না হতে হতেই অমরেশ পাশে যেয়ে বসল। আবার কেমন যেন অমরেশ হতবাক হয়ে পড়ল। অমরেশের সেই চোখ দুটো বার বার সরিয়ে রাখতে চাইলেও সে কোনমতেই যেন অবাধ্য দৃষ্টিকে সংযত করতে পারল না। আর সেই সুযোগেই পাজি মন দুর্ব্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গীতিকাও—'না' ত তার ছিলই না উপরন্তু ক্ষুধার্ত্ত—লালায়িত ভাব। এমত অবস্থায় অমরেশ কি করতে পারে! তাই তার মনে হতে রইল—একবার একটি বারের মতন আমি শুধু গীতিকাকে জড়াতে চাই। এতে আর ক্ষতি কি? এতে জীবনই বা নষ্ট হবে কেন! আর একটু গীতিকার দিকে অমরেশ এগিয়ে বসল। গীতিকা যেন কিছু জানেনি ভাবটা নিয়ে বসে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে রইল। অমরেশের মনে দারুণ ঝড় বইতে রইল।—আমি যদি একে জড়াই তাহলে অমার কি-ই বা হতে পারে? তাতে আমার আগুন মন কেন ছাই হয়ে

যাবে! এত নিকটে একা ঘরে—কেই বা জানতে পারছে—কেই বা দেখতে পারছে!

অমরেশ নিজেকে আর রক্ষা করতে পারল না। সে নিজেকে হারিয়ে দিল। পরিস্কার মনবল নিয়ে মনের জোর নিয়ে সে আর কিছু চিন্তা না করে গীতিকার বুকে হাত বাড়িয়েছে।

শোন অমরেশ শোন তুমি
এই কি তে'মার সত্য পালন!
কেমন করে বলবে কারে—
"আমি বীর্যবান আমি আগুন,
করেছি পালন,
শেখাব সবারে জানি।"

শোন অমরেশ শোন তুমি
এই কি তোমার ঠিক ছিল!
পারবে না পারবে না
আমি জানি।
হবে যুদ্ধে জয়ী—জয়ী তুমি।
তোমার দেহের ক্ষুধা বড় করে
তুমি অমরেশ কেন ধরার বুকে
কলঙ্কিত করে গেলে!

অমরেশ—
জানি আমি জানি—
চির অমর সবার মাঝে
হয়ে রবে তুমি।
আগে জ্বালাও অনলে
তুমি তোমারে,
তবেই জ্বালাবে সবারে জানি।

ও অমরেশ—
কি কর এখন তুমি !
ভাব আগে—আগে ভাব।
দাঁড়ায়ে রয়েছি সমুখে তোমার
আমি সাক্ষী দেব জানি।
দাঁড়িয়ে আছে জ্ঞান ও বিবেক-মণি
কেন দাও তাড়ায়ে তুমি তাদের ?

অমরেশ—
ভুলের পথে পা বাড়ালে
বিশ্ব পিতা কেমন করে হবে—
হবে তুমি শুনি ?
ও অমরেশ—অমরেশ
জান নাকি তোমায় তুমি ?
কত সাক্ষী রইবে তোমার
দাঁড়াবে জনে জনে
দেবে সাক্ষী তোমার মানি।

ও অমরেশ—
কেন হও আগুয়ান !
একবার ভেবে দেখ,
দেখলে নাকি তোমায় ভেবে ?
ঝাঁপ দিতে চাও কোন্ আগুনে !
হবে পুড়ে ছাই যে তুমি।
অমরেশ,
তোমার মতন কজন হবে !
তোমার একটু—
একটু ভুলে অনেক জানি।

অমরেশ—ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করতে যাচ্ছি। ঝপ করেই অমরেশ তার নিজের সম্বিৎ ফিরে পেয়েই তার সেই হাতের কপ ঘুরিয়ে দিল। গীতিকার মাথায় হাতটি রেখে সে শুধু এই কথাই বলে উঠল—গীতিকা, এ আমি কি করতে যাচ্ছি। তুমি না আমার ছোট বোন। একদিন আমিই না বলেছিলাম এই কথা। আজকে আমিই একি করতে চলেছি।

গীতিকা রাগ অভিমান দুই নিয়েই সে বলে উঠল—আর আমি যদি তা না গ্রহণ করে থাকি? তুমি অনেক কিছুই বলতে পার। তাহলে তুমি আমার মনের কথা শোন—আমি পরিষ্কার বলছি আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই এবং শুধু চাই না, আমি তোমাকে চিরসাথী হিসাবে পেতে চাই।

অম—গীতিকা, এ তোমার ভুল ভুল, এ হতে পারে না। এ তোমাকে ভাবতে হবে তুমি আজগুবি স্বপ্ন দেখছ।

—কেন আমি জানতে চাই—আমি তোমার কাছে কিসে অযোগ্য?

—সেটা পরের কথা। আগের কথা আমি কোন বন্ধন সৃষ্টি করব না।

—তাহলে কি করবে? কি চাও?

—কি আবার চাইব। আমি বিশ্বকে এক চোখে ভালবাসতে চাই। এ ছাড়া আমার অন্য ভূমিকা নয়। তাহলে তুমি আমার জীবনের একটা কথা শোন—যদি আমার মন হত ভালবাসার তাহলে তোমার অনেক আগেই আমি একজনকে ভালবাসতে পারতাম। সে কি অপরাধ করেছিল।

কথাটা অমরেশ, অবশ্য সত্যি হলেও, একটু খোঁচা দেওয়ার মন নিয়েই বলেছিল।

গী—আমার উপর দিয়ে তোমাকে এমন কে ভালবেসেছিল?

—ও তুমি তা হলে জান না। তোমার উপর দিয়ে।—তাহলে বলি—তোমার ভালবাসার মধ্যে বার বার একই চ্যালেঞ্জ—আমি কিসে অযোগ্য। গীতিকা এভাবে চিন্তা কর দেখিনি এটা কোন জাতের চ্যালেঞ্জ। আর এমন যদি সে হয়—সে সব সময় অসহায় অনাথটির মতন আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—আমি তাকে দয়া করব কি না। সেও ত দেখতে মন্দ নয়। লেখাপড়ায় খারাপ নয়। তার উপর কি—বাবার অবস্থা মোটামুটি। সে জায়গায় যদি আমি একটা কিছু করতে যেতাম সেখানে বীরত্বের প্রমাণ হত। যাক এই কথা আমি মনে না করলেও তারা মনে করত। কিন্তু

ভাবত তোমার ক্ষেত্র—তোমাদের অর্থ সম্মান—তার চাইতে আমরা হয়ত ছোটই হ'ব। তার ফলেই কি তুমি এই কথাগুলো আমাকে বার বার করে শোনাও না? তা না হলে এইখানেই তফাৎ করে দেখ না—সে আমার প্রথম জীবনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দু একটা কথা বলাতে সে ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। শুধু সরে দাঁড়ায় নি, অটুট শ্রদ্ধা তার মধ্যে। তার পাশে ফেলে এখন আমি তোমাকে বিচার করে দেখি।

গী—কি বিচার করে দেখলে?

—কি আর দেখব! অনেক তফাৎ।

—তফাৎ! কি তফাৎ?

অম—যাক আর জল ঘোলা করে দরকার নেই। ক্রোধে কোন কাজ হয় না। থাক থাক তুমি রাগ করছ গীতিকা—

—রাগ আবার কি করব!

—না লক্ষ্মী বোনটি, আমি বলি শোন—এই বছর পাস করার পর বিয়ে করে সংসার যাত্রা সুরু করব।

বিয়ে!—গীতিকা চমকে উঠে অমরেশের মুখের দিকে একবার চাইল।—তুমি কি ভাবছ আমি কোনদিন বিয়ে করব। পুরুষ জাতের প্রতি আমার ঘেন্না হয়ে গেল। সত্যিকারের ভালবাসতে পুরুষ জানে না, তাই তোমাকে চেয়ে যখন পেলাম না তখন অপর একজনকে বিয়ে করে আমি সুখী হব—এ তোমার ধারণায় এল কি করে!

—ধারণায় আমার ঠিকই আসে। এ তুমি ভুল করছ।

—আমি ভুল করিনি। তুমিই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

—আমি বিশ্বাসই করিনি তাহলে আবার বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন উঠল কি করে!

—কি তুমি বিশ্বাস করনি?

—কি আমি বিশ্বাস করেছি?

গীতিকা—কেন, আমি তোমায় ভালবাসি।

অমরেশ—ভালত আমাকে অনেকেই বাসে। বিশ্বাসঘাতকতা কথাটা উঠল কোথা থেকে? শিবানী তোমার চাইতে আমাকে কি কম ভালবেসেছে? তবে সেখানেও আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি?

—রাখ তোমার ও কথা শুনতে চাইনি।

—আঃ ভুল বুঝছ কেন! বিশ্বাসঘাতকতা জিনিসটার অর্থ কি সেইটিই ভাল করে বুঝিয়ে বল।

—তা আমি জানি না।

—তাহলে বলি আমি জানি বুঝিয়ে বলছি শোন। তুমি আমায় ভালবেসেছ সেই ভালবাসা আমি তিলে তিলে গ্রহণ করেছি এবং সেই গ্রহণের দ্বারাতে তোমায় আশা দিয়েছি, তারপর তোমা থেকে ছিটকে গিয়ে অন্যত্র আমি কিছু করতে চাইছি বা করেছি—সেইটিই হল বিশ্বাসঘাতকতা। এখানে তুমি আমাকে ভালবেসেছ—আমি এখানে কি করতে পারি! বল তোমাকে কোনদিন আশা বা আশ্বাস দিয়েছিলাম কি না? শুধু কি তাই আমার জীবনের স্বপ্ন তোমাকে প্রায় মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করে গেছি। তাহলে তুমি আমাকে কি দোষ দিতে পার—কোথায় আমি অপরাধী? দেখ গীতিকা আমি বললে তুমি হয়ত একটা কথাতে রাগ করতে কিন্তু ভেবে দেখ দেখিনি—আমার জীবনের স্বপ্ন ইঙ্গিত শোনা সত্বেও তুমি এভাবে কি করে এগিয়ে এসেছিলে? ভাবত আমি আমাকে নিজেকে ঠিক রাখা কি চাট্টিখানি কথা! সেইজন্য হয়ত সংযমে আমি এক আধ জায়গায় অসাবধানী হয়ে পড়লাম—সেইটি কি ঠিক হল? তুমি জানবে এইটি আমার জীবনে দারুণ ভুল বলে আমাকে কাঁটার মত বিঁধতে থাকবে। তবে যাক আমার মনে এই একটা সান্ত্বনা রইল—যে আমার ভুল আমি নিজেই ধরতে পারলাম, অন্যকে দেখিয়ে দিতে হল না। তাহলে আরও দুঃখ বা লজ্জার হয়ে দাঁড়াত। তুমি জানবে সত্য আদর্শ এরা চিরসুন্দর। এদের গায়ে কখনও ময়লা থাকে না। যেমন একটা কথা শুনে থাকবে—চাঁদ সে স্নিগ্ধ আলো দেয়। তবুও কেউ কেউ বলে, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। আমার জীবনে তাই ঘটতে চলেছিল। তাই বলি তুমি এসব আশা ত্যাগ করে নিজের জীবন লক্ষ্য করে সংসারের দিকে পা বাড়াবার চেষ্টা কর। তবে হ্যাঁ তোমাতে আমাতে যে ভালবাসা—ভাই ভগ্নী সম্বন্ধ এইটিই কর স্থায়ী।

গী—অমরেশ, কি বলছ! তা আমি পারব না।

—সে কি কথা! মনকে এত নীচুর দিকে নামাচ্ছ কেন। তোমার অমরেশকে নিয়ে কথা। তোমার জীবন থেকে ত অমরেশ হারিয়ে বা পালিয়ে যাচ্ছে না। ভেবে দেখ, বরং আরও আন্তরিকতা বা গভীরতা বেড়ে উঠবে।

—না না তা হতে পারে না।

—কেন নয়? তোমার একটিও ভাই নেই। সে ক্ষেত্রে আমি তোমার পাশে তোমার ভাই হয়ে দাঁড়াই সে কি আরও মধুর নয়? লক্ষ্মী বোনটি, মন খারাপ করো না, আমার কাজের সাহায্যকারী হও।

গীতিকা হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—অমরেশ তুমি কি মানুষ!

—হ্যাঁ। নিশ্চয় মানুষ ছাড়া আর কি!

—না না আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি দুর্বল লজ্জাশীল নারী হয়ে আজকে যে ভাবে তোমার দিকে আগিয়েছি, তুমি একটা পুরুষ হয়ে সংযমী হতে পারছ।

—না-না-না আমি হতে পারছি—এ কথা বলোনা গীতিকা। আমি যে হতে পারিনি তারই প্রমাণ একটু আগে তোমাকে দিয়েছি। আমি চেষ্টা করছি বল—যুদ্ধ করছি বল।

গীতিকা—একা এভাবে যুদ্ধ করা যায়! ধন্য তোমার মনবল।

—হুঁ এ আর কি। জীবনে কত শত বিক্ষত হয়ে যেতে হবে।

অজয় 'দাদা দাদা' বলে উপরে উঠে এল। অমরেশও ওকে সাড়া দিল—কিরে সব ব্যবস্থা করে এলি?

—হ্যাঁ তোমাকে একবার যেতে বলছে।

- ঠিক আছে আমি যাব।

এদের কারুরই মনে ছিল না। অজয়ই লক্ষ্য নিল—চা খেয়েছ তোমরা?

—চা? ঠিক বটে। তুই চায়ের কথা বলে গেলি, ওরাও দেয়নি আর আমাদেরও খাওয়া হয়নি।

অজয় সামান্য যেন একটু দাবীর সুরে ঝাঁকি দিয়ে উঠল—ওরাই বা দিল না কেন আর তুমিই বা চাইলে না কেন—কি তোমার মন!

অমরেশ নির্মল আবদার সুর বুঝতে পেরে একটু হাসল। ততক্ষণ গীতিকা দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে কাপড়টা গুছিয়ে নিচ্ছে। এবার চলে যাবে সে।

অজয়—কি দিদি উঠলেন যে? দাঁড়ান চা আনি, চা খেয়ে যাবেন।

অম—হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে আয়।

গীতিকা -- ভারি গলায় বলে উঠল—নাঃ আর চা খাব না, সময় হয়ে গেছে, চলে যাই।

অজয়—আরে বাবা, চা-টা খেতে আর কতটুকু সময় লাগবে!

গীতিকা কথার উত্তর না দিয়ে দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করল। অমরেশ এই ভারি গলাটা হাল্কা করার জন্য অজয়কে বলল—থাম না তোর দিদির বাড়ীতেও আমি গেলে আর চা খাব না।

গীতিকা পিছন ফিরে অমরেশের মুখের দিকে শুধু একবার চেয়ে দেখল। তার চাউনির মধ্যেই অনেক কিছু যেন অমরেশকে বুঝিয়ে গেল। অমরেশের মনটা যে খারাপ হল না তা নয়। কিন্তু মুহূর্তে তাকে রূপান্তরিত করে সে অন্যদিকে ব্যক্ত করে দিল।—আচ্ছা তোর জন্য যে আমি যাব, টাকাটুকি কি লাগবে বলদেখিনা?

—কি জানি দাদা সে খবর তুমিই জান, আমি বলতে পারবনা।

আচ্ছা চল দেখা যাক কতদূর কি হয়।—বলে অমরেশ দেরি না করে ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শিবশঙ্কর পৌঁছানোর পরই শ্রীমতী উদ্‌বিগ্ন হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। শিবশঙ্কর শ্রীমতীর মুখের দিকে চেয়ে বলল—যাক একরকম সব ঠিকই হয়ে গেল।

—ও তাই।

—হ্যাঁ ঠিক ত হল, তা শোন—ঘটনাগুলো শুনলেই সব বুঝতে পারবে।

কথাটা শুনে হঠাৎ শ্রীমতী মনে উদ্‌বিগ্ন আতঙ্কের ছায়া দেখা দিল। শিবশঙ্কর হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া সেরে বসল। আজকে আর অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। তাই শ্রীমতীকে বলল—তোমার হাতের কাজ সেরে এস। বসে শুনতে হবে।

শ্রীমতীও কয়েকটা টুকিটাকি কাজ সেরে দীপাকে রান্না ঘরে বুঝিয়ে এসে স্বামীর কাছে বসল। সব কথা শুনে সে আশ্বস্ত হল। হিসাব করে দেখল ওরা আট দশ হাজার টাকা মতন খরচ পড়বে।

শিবশঙ্কর—এত টাকা ত আমার পক্ষে বার করা অসম্ভব।

শ্রীমতী—তুমি ত ওর বিয়ের জন্যই কিছু জমিয়েছ।

—আরে সে আর কত! মেরে কেটে না হয় হাজার ছয়েক হবে।

শ্রী—মানিককে কিছু বলবে না কি ?

—আর সেই ত এখন নূতন সংসার পেতেছে। তার উপর স্কুলের দায়িত্ব।—কথাটা শিবশঙ্করের নেহাতই মুখে, কিন্তু ছেলের কাছে হাত পেতে টাকা চাইতে সে নারাজ। তবে শিবশঙ্করকে আবার কেউ যেন না ভুল বোঝে। প্রত্যেকেই যে যার নিজের সংসার পাতবে, আর প্রত্যেকেরই থোক খরচের সময় আসবে। কাজেই সঞ্চয়ী না হলে—না জমালে থোক খরচের সময় পেয়ে উঠবে কি করে। সেইজন্য মোটামুটি শিবশঙ্করের ইচ্ছা—ছেলেদের টাকা নিয়ে কিছু করব না। একে কি এক জাতের মহৎ বা উদার পিতা বলা চলে না ? আর এই সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরও এরকম পিতার মুখ চেয়ে তাকে দিয়েই তার সমস্ত কাজ করিয়ে নেন। সেই সঙ্গে শ্রীমতীও বলে উঠল—তোমার যদি এরকম ধরণের ভাবনা চিন্তা যে আমাদের জিনিস দিয়ে আমাদের কাজ করব, তাহলে আমার গায়ের কিছু গয়না এই সময় ভেঙ্গে ওর গায়ের গড়িয়ে দিলেই হয়।

—হ্যাঁ সে মন্দ কি। তবে একটা কথা কি খুব ঠিক নয় শ্রীমতী—আমি চেষ্টায় যখন বিফল হব তখনই আমি না বললেও তুমি বের করে দেবে এবং আমিও সেটা হাত পেতে নেব। আমাকে আগে চেষ্টা করতে দাও।

—চেষ্টা আর তুমি কোথায় করবে কি করে করবে !

—কেন 'লোন্' নেব। এবং আমিই সেই ঋণ যেমন করে ওর বিয়ের জন্য ছহাজার জমিয়েছি তেমনি করেই শোধ করে যাব। আর যদি শোধের আগেই আমার কাজ হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে যে টাকা পাবে তোমরা তার থেকেই শোধ করে দেবে।

মণ্টু—বাবা, দাদার একখানা চিঠি এসছে।

হাতে করে এনে বাবার হাতে সে দিল। চিঠিটা শিবশঙ্কর খুলে দেখে দুখানা কাগজে লেখা। স্বামী স্ত্রী উভয়েই লিখেছে। শ্রীমতীকে লিখেছে তার বৌমা আর শিবশঙ্করকে মানিক।

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা—

অনেক দিন হল আপনাদের কোন কুশল না পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন আছি। আশা করি ওখানে সকলেই কুশলে আছেন বা আছে। অমরেশ অনেক দিন হল এখানে আসেনি। নিশ্চয় ওর পড়াশুনার চাপ বেড়েছে। সামনেই পরীক্ষা

এসে গেল। দীপার বিয়ের কতদূর কি হল তাও জানতে পারছি না। স্কুলটি মোটামুটি এক রকম চলছে। তবে আশা করা যায় স্কুলের উন্নতি একদিন হবে। বর্ত্তমান আপনার বৌমায়ের শরীর খারাপের জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। যাই হোক ওখানকাবের সমস্ত খবরা খবর নিয়ে আপনি আমাকে পত্রপাঠ উত্তব দেন। দীপার বিয়ের জন্য আমি খুব উদ্‌বিগ্ন রয়েছি। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন। মাকেও জানাই। ছোট ভাইবোনদের ভালবাসা জানালাম। ইতি—

আপনার হতভাগ্য মানিক

এবার শ্রীমতীব চিঠিখানা—কি এটা তোমাব বৌমা তোমাকে লিখেছে। পডবে তো নাও।

—আমি আবার পড়ব কি! তুমি আমাকে পড়ে শুনিয়ে দাও।

—আমি পড়ে দেব। আচ্ছা তাহলে শোন—

পরম পূজনীয়া মা—

আমি আপনার হতভাগিনী পুত্রবধূ। আজকে অনেক কথাই লিখব মনে করেও কেন জানি হাতে কলম সরছে না। কোথায় যেন বাধায় আমাব কলম আটকে যাচ্ছে। শত বাধা ঠেলেও এই কটা কথা লিখতে বাধ্য হলাম।

আমার শরীর খুব খারাপ। সব সময় মাথা ঘোরায়। গা বমি বমি করে। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। তাই সবার আগে মনে হল, এই সব কথা আপনাকে জানাই। আজ প্রায় তিনচার মাস আমার এই রকম চলছে। এমত অবস্থায় আমি কি করব আপনি আমাকে চিঠি পড়ে বুঝে জানাবেন। ঠাকুরপো আমার এখানে অনেকদিন হল আসেনি। ঠাকুরঝির বিয়ের কি ঠিক হয়ে গেল? আপনি একবার বাবাকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। ঐসঙ্গে যেন ঠাকুরপো ঠাকুরঝিও বেড়িয়ে যায়।

আপনি ও বাবা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ছোট ভাইবোনদের জন্য রইল আমার স্নেহ আদর। ইতি—

আপনার দুঃখিনী বৌমা।

চিঠিখানা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী শিবশঙ্করের মুখের দিকে চাইল। ঠিক শিবশঙ্করও একই সঙ্গে চোখ তুলে চেয়েছে। উভয়ের চাওয়া চায়ির মধ্যে যেন কত রকমের প্রশ্ন লুকিয়ে ছিল। যাক শিবশঙ্কর রই অপেক্ষা করল—শ্রীমতী

কি বলতে চায়। শ্রীমতীর যতই হোক নরম মন—মেয়েছেলেই মেয়েছেলের দুঃখ বেশী বোঝে। তার উপর যতই হোক পুত্রবধূ। তাই সে বলল—বৌমাদের ব্যাপারটা কিছু কি তুমি বুঝতে পারছ?

—না আমি আর কি রকম কি করে বুঝব। মেয়েরাই মেয়েদের ব্যাপার ভাল বোঝে।

—আমার কিন্তু যতদূর মনে হয়—বৌমা অন্তঃসত্ত্বা। সেইজন্যই এই রকম মাথা ঘোরানো, বমি বমি বা খেতে পারে না। তা যা মনে হয় চার পাঁচ মাস। কারণ ওর ভাষাতেই বোঝা যাচ্ছে।

—তাহলে আমাদের করনীয় কর্তব্যটা কি?

—কি আর করনীয়। এখন ত ওর কাছে একজন মা দরকার। সময়ে খাওয়া, সময়ে সব করা, লক্ষ্য রাখা—

—তাহলে যা হয়, যা ভাল বোঝ তুমি বৌমাকে একটা চিঠি লিখে দিও। আর সেই সঙ্গে দীপার বিয়েটাও জানিয়ে দিও।

—হ্যাঁ লিখে দেব—এই সময়টা বাপের বাড়ী চলে যাক না, মানিক একলাই থাক। এখন কটা দিন মায়ের ওখানে কাটিয়ে আসুক।

উত্তরটা শিবশঙ্করের মনের মত না হলেও এ ক্ষেত্রে ঠিকই হয়েছে। আর মানিক বা ঋতা ঠিক এইরকম ধরণেরই উত্তর আশা করে বসে আছে। কারণ ঋতা ভালভাবেই জানত যে কুলের বৌ হতে কুল গাবাতে চলেছে। তাই এত শীঘ্র ঘনিষ্টতা না হয়ে তাদের কুলমণি এসেই যা হয় করবে।

—ভাল কথা, হৃদয় বাবুকে বলে এসেছিলাম আমি যেয়ে একটা কাহিনী লিখে জানাব। তাহলে কালকেই লিখে দিই?

—হ্যাঁ, আর মানিককেও একখান লিখো যে দীপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

—ও ত তুমিই ত বৌমাকে লিখছ—ঐ সঙ্গেই জেনে যাচ্ছে।

—না সে আবার কি করে হয়। তোমাকে না আলাদা করে লিখেছে। তুমি তোমার চিঠির আলাদা উত্তর দেবে না?

—আচ্ছা বলছ যখন, আলাদা না হয় একখানা দেওয়া যাবে।

শ্রীমতী কাজে উঠি উঠি করছে, ফিরে চেয়ে দেখে সামনেই শিবানী।—কিরে?

শিবানী—দীপার বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেল, মা জিজ্ঞেস করতে পাঠাল।

শিবশঙ্কর—হ্যাঁ একরকম হয়েই গেল।

শ্রীমতী—দাঁড়া মা, এখনই কি ঠিক। যতক্ষণ না ভায়ের কন্যা বাঁয়ে ঘুরছে—সিঁথায় সিঁদুর পড়ছে ততক্ষণ আর বিয়ে কি? তবে তোর মাকে যেয়ে বলিস তোর জেঠু ফিরে এসেছে একরকম প্রায় ঠিক হয়ে গেল।

• শিবানীও ছপ্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে দীপার কাছে যেয়ে পৌছাল।—কিরে কি শুনছি!

--কি আর শুনছিস!

—একটু বল না বাবা।

—আরে আমি কি বলব।

—রাখ রাখ তুই সব জানিস, বলবি নি বল।

—বারে! আমি কিছু জানি নি, আর আমি কি বলব তোকে!

—এই দেখ ভাই তোর বরটা কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর হবে।

—তা তুই জানিস কিরকম হবে।

—আহাঃ আর ন্যাকামোটি করো নি। তুমি বুঝি সেদিনে দেখ নি!

—আমি কখন দেখলাম বল? আমি দেখেছি?

—আরে অতক্ষণ ছিল তুই একবারও দেখিস নি?

—না বিশ্বাস কর, একবারও নয়।

এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে শিবানী আর দাঁড়াতে পারল না। বাড়ীতে যেয়ে ঢুকতে হাসি হাসি মুখখানা দেখে মা জিজ্ঞেস করল—কিরে কি খবর? নিশ্চয় সুখবর?

মেয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বলল—হ্যাঁ।

মা-ও মেয়ের মুখের দিকে এক নজর চেয়ে নিয়ে ছোট্ট করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। মেয়ের তা আর বুঝতে বাকী রইল না। মেয়েও ঠিক এই ধরণের ব্যথা নিয়ে সৌজন্যতার হাসি হেসে মাকে বলতে এসেছিল। যাক এ ধরণের চিন্তা তাদের হিংসার পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ শিবানীও বড় হয়েছে দীপার সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে মিলিয়ে দেখল—সত্যিই কি এ ধরণের সৌভাগ্য তার কোনদিনই হবে! কারণ শিবানীর বাপের চাইতে তার বাপের অবস্থা অনেক খারাপ। তার উপর দীপার মাথার উপরে বড় বড় দাদারা

রয়েছে, এর তা কৈ! তাছাড়া বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে—তার ভাল ঘর বর এ নিয়ে হিংসা নয়। ঠিক মায়ের চিন্তাগুলোও এই ধরণেরই—দীপার তুলনায় শিবানী আমার দেখতে কি এমন খারাপ। আর লেখাপড়া তাও ত এমন কিছু কম নয় আমাদের অবস্থার জন্যই তাকে অনেক দূর পিছিয়ে থাকতে হয়েছে। সেইজন্যই মা এক মুহূর্ত ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলল—হে ঈশ্বর আমরা সুখে দুঃখে যাই হোক করে দিন কাটাচ্ছি, আমাদের শক্তি দাও দরিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতন। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ কচি কোমল মেয়েটার মুখের দিকে চেও। ও যেন সুপাত্রে পড়ে সুগৃহিণী হতে পারে।

যাক মেয়েকে আর কয়েকটা প্রশ্ন করল—হ্যাঁরে তাহলে ওদের বিয়েটা এই অগ্রহায়ণ মাসেই লাগবে? আর কি বলল তোর জ্যাঠাইমা?

—কি জানি বাবা আমি সব জিজ্ঞেস করি নি। জেঠু ছিল, তুমি জ্যাঠাই-মাকে সব জেনো।

—হ্যাঁ তা ত জিজ্ঞেস করবই আমি।

বিকেল গড়াবার আগে শিবানীর মা এদের বাড়ীতে এসেছে। দোড় গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকছে—ও দিদি দিদি। সামনেই মন্টুর সঙ্গে দেখা। মন্টু বলে উঠল—যান না কাকীমা ভিতর দিকে। মা উকিল মাসীমার সঙ্গে কথা বলছে।

—ও তাই নাকি! জয়ন্তীর মাও বুঝি এসেছে!

—হ্যাঁ

—তা তোমার দিদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল?

মন্টু বেশ আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁ।

—তাহলে মন্টুবাবুর ভোজ এগিয়ে এল।

—শুধু কি আমার একলার সনতের বুঝি নয়?

—হ্যাঁ তা ত বটেই বাবা, তুমি কি আর সনতকে বাদ দিয়ে ভোজ খাবে!

মন্টুও বেরিয়ে গেল কাকীমাও তার ভিতরে গিয়ে দেখল—শুধু জয়ন্তীর মা নয় বুড়ীর মাও আছে, নেওর মা, হাবলী পিসি বেশ কয়েকজন নিয়ে দিদি গল্পের আসর বসিয়েছেন।

শিবানীর মাকে দেখে শ্রীমতী—আরে এস এস আমি এই ভাবছিলাম যে তুমিই নেই এই আসরে!

—তা আমাকে কি আর দিদির মনে আছে যে আমি এ আসরে থাকব!

—কেন মনে নেই, তোমার মেয়ের হাতে ত আমি বলে পাঠিয়ে ছিলাম যে তোর মাকে পাঠিয়ে দিবি সব বলব। সে তোমায় বলে নি?

—কৈ না। আমায় ত কিছু বলে নি।

—তা আর বলবে কেন!

—না দিদি ওর কিন্তু খুব দোষ নেই, শিবু আনন্দে আটখানা। না হলে এ কথাটা সে আমায় বলে—মা তুমি শিগ্রি কাজ সেরে জেঠিমায়ের কাছ থেকে সব শুনে আসবে যাও।

এরাও যে সব এসেছে সকলেরই ঐ এক উদ্দেশ্য দীপার বিয়ের খবর জানতে। অবশ্য আজের আসাটা এদের নূতন নয়—তারা এসেই থাকে। শিবশঙ্কর লোকটি জ্ঞানী পরোপকারী নিরহংকারী। কাজেই পাড়ায় অনেকের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা। ভদ্রলোককে প্রায় সকলেই একরকম শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

অনেকেই দল বেঁধে নূতন উদ্যমে পাচটা কথা বার্ত্তা সুরু করল। শ্রীমতী মাঝখানে একবার দীপাকে ডাক দিয়ে বলল—দীপা কাপ কয়েক চায়ের জল বসাও। তোমার কাকীমা, পিসিমা, জ্যেঠিমা সকলকে এক কাপ করে চা দাও।

এর মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠল—কি রে ও দীপা, আমাদেরকে মনে রাখবি ত, না নূতন শাশুড়ী পেয়ে শ্বশুর পেয়ে সব ভুলে যাবি!

এদের মধ্যে বুড়ীর মায়েরই একটু কাঁচা বয়স ছিল সে সম্পর্ক বজায় রেখে মেয়েকে একটু হাল্কা ঠাট্টা করে উঠল—আমাদের আর কি করে মনে রাখবে বল দিদি, নূতন জামাইয়ের কথাই চিন্তা করতে আমাদের দীপা মণির সময় কেটে যাবে।

এবার হাবলি পিসি মুখ খুলল—না বলেও আর থাকতে পারি না বাবা, ভাইঝি আমার নেহাৎ ছেলে মানুষ বলে তাকে যে যা মন যায় তোমরা বলে দেবে! আর তুইও বাপু কি, মুখ খুল না। তুই বা অমন ক্যবলা মেয়ে কেন! বল আমার মতন বয়সে নতুন কনে তোমরাও যা চিন্তা করেছিলে আমিও তাই করব। মেয়েটা দেখছি নেহাতই শান্ত পিতিমা।

দীপা—কেন পিসি আমার হয়ে ত তুমিই রয়েছ। আমার আর মুখ খোলার প্রয়োজন কি!

নেওর মা জ্যাঠাইমা—যা বলেছিস দীপা, হাবলি ঠাকুরঝি যা আরম্ভ করেছে তা চ্যাঙ্গাড়ী নেড়ে খৈ বেছে ফেলবার মতন।

দীপা কথার উত্তর দিয়েই সে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হল। যথা সময়ে চা করে নিয়ে পৌঁছে গেল।

এবার উকিল মাসীমা বলে উঠল—কি রে দীপা তোর মায়ের নতুন জামাই আসছে, তা শুধু চা কেন?

অবশেষে শ্রীমতী মুখ খুলতে বাধ্য হল—তা জামাই-ই আগে আসুক গো। জামাই এলে কি আর মিষ্টি মুখ করতে বাদ পড়বে! তোমাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, নির্ব্বিঘ্নে চার হাত এক হোক—সবই হবে।

তখন সকলেই এক সুরে এক গলায় বলে উঠল—না-না-না হবে বৈকি, ঠিকই হবে।

কোথাও কিছু নেই মাঝখানে মণ্টু এসে পৌঁছে গেছে—বাঃ বাঃ, দিদির বিয়ের মহিলা মহল আসরটা ভালই বসেছে।

মণ্টুর কথাতে সকলেই ফিক্ করে হেসে ফেলল। শুধু শ্রীমতীই বলল—আসবই হোক আর যাই হোক—কত ভিড় আসবে কত ভিড় যাবে—ঠেলার নামে বাবা—তুমি কিন্তু বাবা তোমার পড়াশুনা লক্ষ্য রেখো।

শ্রীমতীর স্বরে সকলেই স্বর মিলিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ এই সব ব্যাপারেই ছেলেমেয়েদের পড়া নষ্ট হয়।

যাক আজকের মত এইখানেই থাক—এই রকম ভাবখানা নিয়ে সকলে একসঙ্গে গা তুলল।

ঋতা এখন কয়েক দিন হল স্কুলে গিয়ে বড় একটা সময় দিতে পারে না। যোগ দিয়ে কাজ বুঝে বুঝিয়ে চলে আসে। আর পাঁচজন শিক্ষয়িত্রী তারা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর সহানুভূতিশীল। অবশ্য ঋতার ব্যবহারও তাদের প্রতি ভাল ছিল বলেই আজকে তাদের এই ভাব। তবে ঋতাও সামলে আসছে। আর মনে হয় কয়েক দিনের মধ্যে ও সামলে উঠবে।

স্ত্রী বাড়ীতেই আছে। স্বামী গেছে কর্মস্থলে। একা থাকার সময় কাটতে চায় না বলেই নানা রকম চিন্তা আসে। সে ভাবছিল—চিঠি দিলাম কৈ উত্তর

ত দিল না। তবে কি আমায় কোনদিনই এরা মেনে নেবে না! কিন্তু না মেনে নেওয়ার কারণ কি হতে পারে। আমি এমন কি অন্যায় বা অপরাধ করে বসে আছি! রীতিমত আমার দাম্পত্য জীবন। তার উপর কি—প্রেম করে নয়। তিনি আমাদের দরিদ্রতা লক্ষ্য করে আমাকে ঘরে এনেছেন। কিছুটা আমার বাবাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তা নইলে আমার বাবার কোনদিনই এমন যোগ্যতা হত না যে টাকা পয়সা খরচ করে এমন জামাই আনেন। তারপরে জাত—আমরা এক জাত, ওরা ভিন্ন। জাত! জাত আবার কি—এ আমি কি ভাবছি! শুধু জাতের কথা একটাই আমি ভাবতে পারি—আমি কলঙ্কিত বজ্জাৎ কি না। কৈ তা ত নয়। আমার মধ্যে ত সেরকম নমুনা খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে? তবে এ সব ফালতু চিন্তার কারণ কি? এই সব সাত পাঁচ মনে করছে। এমন সময় পিয়ন এসে দরজায় দাঁড়াল। পর পর দুখানি খাম হাতে দিল। সঙ্গে সঙ্গে খামটা দেখেই ভেবে নিল—শশুর বাড়ীর চিঠি। আনন্দ আতঙ্ক অনেক রকমই তার মুহূর্তে ছুঁয়ে গেল।—কি জানি এতে কতখানি কি আছে! স্বামীর চিঠিখানা রেখে নিজে সেটাই খুলল।

কল্যানীয়া বৌমা—

তোমার চিঠি পেয়ে সমস্তই অবগত হলাম। আমার যতদূর মনে হয় তোমার সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে বলেই এইরূপ শরীর খারাপ। তাই আমার মনে হয়—এই সময়টা কয়েকদিন তোমার মাকে এনে রাখা, না হয় তুমিই যেগে দিন কতেক সামলে এস। এতে ভয়ের কিছু কারণ নেই। শুধু একটু সাবধানে থাকা।

তোমাদের দুজনের কুশল আশা করি। এখানে সকলে একরকম। তবে সামনেই দীপার বিয়ে আগিয়ে এল। নিশ্চয় বিস্তারিত তোমার শ্বশুরের চিঠিতে জানতে পারবে। ইতি —মা।

চিঠিখানা পড়ে ঋতা অনেকখানি আশ্বস্ত হল। তবে এমন কিছু আনন্দ পেল না। যাই হোক ঋতার মত মেয়ে—বুঝনদার তাই সে ভেবে নিল এই রকম ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেও একদিন ঠিকই সত্যের সত্য ঘণ্টা বেজে উঠবে বলে আশা করা যায়। এই বলেই ঋতা মনে সান্ত্বনা নিয়ে স্বামীর চিঠিখানা হাত দিয়ে ভাবল—খুলে পড়ি না। তারপরেই যেন মনে হল—কেন, এ ত আমার

অনধিকাব। যদিও এবকম ধরণের কাজ আমি করলে তিনি আপত্তি কববেন না বা পাঁচদিন আমাকে করতে বলেছেন, কিন্তু বলেছেন বলেই আমি কবব— তা কেন। অল্প সময উচ্ছ্বাসকে সরিযে ধৈয্য রাখতে পারলে জিনিসটা জবব বা আদর্শ হবে। এই সব ভেবেই চিঠিটা যে বেখে দিল।

বিকেলে মানিক আসাব পব ঋতা তাকে যথারীতি চা জলখাবার দিযে চিঠি দুখানি সামনে ধবে দিল।

—কি ব্যাপার, কাব চিঠি এল ?

—দ্যখ, দেখলেই বুঝবে কার চিঠি।

—তা একটা খোলা, একটা খোলনি ?

—বা বে যেটা আমাব সেটা আমি খুলে পড়েছি। তোমাব চিঠি খোলবাব আমার অধিকার কি।

মানিক মুখের দিকে চেযে ছোট্ট কবে শুধু বলে উঠল—আর কেন। সবেব অধিকারই ত নিযেছ চিঠিটা খোলার অধিকারই শুধু নেই।

—না না ও তুমি বোঝ না। দবকাব কি বাবা আমি পবেব বাডীব মেযে। তোমার বাবা মা ঐ চিঠি দিযেছেন—ওব মধ্যে কত প্রাইভেট গোপন থাকতে পারে।—বৌ খেতে দেয না শরীব স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবি, টাকা পযসা সাবধানে খবচ কববি, যেন না বৌ বাপেব বাডীতে দিযে দেয—আরও অনেক কিছু আছে। আর সেটা আমি জানতে পাবলে কি অবস্থা হবে বলত ? যতই হোক বাপ মাযেব ছেলে বাপ মা ত একটু স্পেশাল চোখে দেখবেই।

—বা বাঃ বেশ কথা শিখেছ দেখছি। ঠিক তোমাব বেলায় এইরকম জিনিস গুলোই হবে ত। তোমাব খোকাকে তুমি এই বকম ভাবেই চিঠি লিখবে ?

—তা এখন ত চিন্তা করতে পাবছি না। আগে খোকা হোক, তাবপর খোকা বৌ আসুক, তাবপর চিন্তা। নাও নাও বাজে কথা বাখ ত, চিঠিখানা পড়ে তোমার প্রাইভেট বাদ দিযে বাকী কথা আমায বল। আমার শোনার ইচ্ছা হচ্ছে।

মানিক—ঠিক আছে গোপন গুলো তুমিই না হয জেনে বাকীগুলো আমার কাছে পড। আমি এখন চা খেতে খেতে শুনি।

—না না আব আমি কেন ? বলছি না, তোমার বাবা মাযের চিঠি তুমিই পড, আমি শুনি।

আরে নাও না, নাও না খুল না।—বলতেই ঋতা চিঠিখানা হাতে নিয়ে খুলে পড়তে শুরু করল।

—কল্যাণীয়—এবার বাকীটা তুমি পড়ে দাও।

—কেন বাকীটা আমি পড়ে দেব কেন, তুমিই পড় না।

—আহা কি যে বলে!

—কি আবার বলব—ভাল কথাই ত বলছি।

—ভাল কথাই বলছ—বলে ঋতা আর একটু আগিয়ে এসে ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁটটা নিয়ে যেয়ে ফিস্ ফিস্ করে ঠোঁট নেড়ে কি যেন একটা বলল—মানিকও না বুঝতে পারার ফলে ঠোঁট সরিয়ে কান পাততে বাধ্য হল—আঃ ভাল করে বল বুঝতে পারছি না।

—শুনতে আর পারছে না! সব বুঝে, আবার শুনতে পারছে না!

—না না বিশ্বাস কর সত্যিই শুনতে পাচ্ছি না। এমনিই ত স্ত্রী জাতের চোখের ইসারা আর ঠোঁট নড়া বোঝা ভার, আর তার উপর তুমি যেভাবে ঠোঁট নাড়ছ তাতে আমার ক্ষমতা কি আমি বুঝি।

—ও তাহলে বুঝি তুমি আমাকে সেই পর্যায়ে ফেলবে।

—এই দেখছ ত কত ঠুনকো মন তোমার—ঝপ্ করে মনে লেগে গেল।

—নিশ্চয়, লাগবার কথাই ত—স্ত্রী জাতকে বলেছ তুমি, সে জায়গায় ত বুকে বাজবেই।

—নাও নাও ছেলে মানুষী করো না। মাথা খারাপ—

বলেই মানিক চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ঋতার বগলের তলা দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে ওকে কোলের কাছে আধা জড়ানো ভাবে টেনে নিল।—এই দেখবে তুমি বলবে না ত—শোন।

—কি আবার শুনব! ছাড়—আমার উনান ধরে গেছে।

—আর রাখ উনান ধরা, এস হাতগুলো একটু গরম করি।

—আঃ কি আহ্লাদ।

মানিক ঋতার গালে গাল দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে—এবার যদি বলি যে এ নাম তোমার বুকে এ নাম তোমার মুখে নয়।

ঋতাও গালে গালটি পেতে রেখে ঠিক তেমনি ভাবে উত্তর দিয়ে গেল—তাই যদি জান দয়াময়, ত বলছ না কেন? সেইটিই ত বলতে বলেছিলাম।

—আরে এক কথায় যদি বলে দেব তাহলে যে ক্ষীরের গজাটা আমার জন্য করে রেখেছ সেটার স্বাদ কি এত বাড়ত! এই দুখ এবার স্বাদটা কত বাড়ছে।

বলা মাত্র একটা ছোট শব্দ উঠল।

—নাও এবার পড়া সুরু কর ত।

তোমার চিঠি পেয়ে সব কিছুই জানলাম। তুমি লিখেছ স্কুলের কাজ ভালই চলবে বলে আশা কর। যাই হোক ওদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো যাতে স্কুলটি ভালভাবে গড়ে উঠে। এবং শিক্ষাও ঠিক ঠিক মত দেওয়া হয়। কারণ একটা কথা—তুমি জানবে কোন জিনিস প্রতিষ্ঠার সময় খুবই তার আড়ম্বর উচ্ছ্বাস—অনেক কিছুই হাম বড়িমা দেখা যায়। কিন্তু জিনিসটির শেষ যা দাঁড়ায় তা কারও পাতে দেবার মত নয়। তাই অন্তত তোমাদের দিক থেকে এ রকম জিনিস যেন না হয়। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠুক, দুঃখ নাই কিন্তু শেষ যেন তার চারদিকে বাহাবা রব উঠে। এই ধরণের লক্ষ্যই তোমার হবে আমি আশা করি।

যাক বৌমায়ের শরীর সম্বন্ধে বৌমা তোমার মাকে যা লিখেছে তোমার মা-ই তার ঠিক উত্তর দিয়েছে। ওর শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখো। আর দীপার বিয়ের কথা তুমি জানতে চেয়েছ। দীপার বিয়ে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। ২৯শে অগ্রহায়ণ দিন ধরা হয়েছে। ছেলের সম্বন্ধে তোমাকে আগেই যা একটু আধটু জানিয়েছিলাম সেই ছেলের সঙ্গেই স্থির হয়েছে। দেনা পাওনা ও খরচ বাবদ প্রায় আট দশ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। যাক সাক্ষাতে বিস্তারিত শুনবে। আমাদের এখানে কুশল। আশা করি তোমাদেরও সব ভাল। আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমার বাবা

শ্বেতা—না এখানটা আমার কিন্তু বলবার আছে।—আমার বাবা।

—তা বেশ ত।

—কি অন্তর থাকতে না মুখে?

—না না, একটা কথা কি খুব ঠিক নয়—ছেলে যখন বিয়ে না করে তখন জানবে সে বাবা মাকে কাউকে ভাগ দিতে চায় না। কিন্তু তার বিয়ের পর যদি তার বাবা মা তার বৌকে খুব ভালবাসে তাহলে জানবে যে লুকিয়ে গোপনে

আনন্দ উপভোগ করে। কথাটা মিলিয়ে দেখবে যখন তোমার ছেলে বিয়ে করে নিয়ে আসবে।

—আমার ছেলেই নেই আবার বিয়ে করে আনছে।

—আঃ থাম না ব্যস্ত হচ্ছ কেন! এখন কল্পনায় খোকার মা হও, বৌয়ের শাশুড়ী হও তাহলে বাস্তবে ঠিকই একদিন হবে।

—আর আমি হলে তুমি বুঝি বাদ থাকবে?

—আরে আমি কল্পনায় এগিয়ে না গেলে কি তোমায় অমনি বলছি না কি।

—ও তাই বটে! বা বাঃ শুনেও সুখী। দেখি দেখি খোকার বাবার মুখখানা একটু দেখি।

—খোকার বাবার আর দেখতে হবে না। যখন খোকাকে কোলে করে নিয়ে দাঁড়াব তখন না হয় দেখবে! এখন খোকার মা-ই না হয় খোকাকে গর্ভে নিয়ে নিজেকে আয়নায় চেয়ে দেখুক।

—আর খোকা না হয়ে যদি খুকী হয় তাহলে?

—আর যাই হোক না কেন সে বাবা ত বটে!

—না না তোমার সঙ্গে ফালতু গল্প করলে আমার চলবে না। আমার উনান ধরে গেছে।

ঋতা উনান রান্নাঘর সামলাতে গেল মানিকও সঙ্গে সঙ্গে গেল।—তাহলে বাবার চিঠিটা ত পড়লে, আমাদের কি করণীয় কি বুঝলে বলদেখিনি?

—তোমার চেয়ে কি আর আমি বেশী ভাল বুঝি?

—আরে তা কেন বলছ! তুমি একটা শিক্ষিত মেয়ে, চাকুরে।—

—আমার জ্ঞানে আমার এখানে বলাটা কি ঠিক হবে?

—না তুমি ত তাদের সামনে বলছ না। তুমি আমার সামনে বলছ।

—তুমিও যে তাদের একজন – যদি ভাবি?

—সে ভাব না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তাহলেও ত একটা আলোচনা বলে কথা আছে।

—তাহলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝি—এই চিঠিখানির উত্তরে স্বয়ং তোমরাই পৌঁছে যাওয়া উচিত। সেখানে যেয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে সব জেনে তারপরে তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী যা বুঝবে সেই টাকা দেব বলে স্বীকার করে আসবে।

—আমি আর কত কি দিতে পারব!

—আরে তুমি কত কি দিতে পারবে সে কথা বাবাও বোঝেন। আমাদের একটা নূতন প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে সে কথা কি তিনি জানেন না! আর তুমি জানবে, তুমি যদি কিছু না দাও বাবা কিছুই বলবেন না। কিন্তু তাতে তুমি কর্তব্যে খেল হয়ে যাবে। সেইজন্য আমাদের ধার কর্জ করেও অন্তত হাজারের কমে কথা বলা উচিত নয়। কারণ দীপার বিয়ে ত আর দিন হবে না বা আর একটি তোমার বোন নেই যে তার বেলায় দিয়ে তুমি—। এখন তুমি ঋণ করলে শোধের সময় থাকবে।

মানিক—আরে হাজার। কোথায় পাব!

—কেন আমার কাছে সেই আমার চাকরির টাকা ত পাঁচশ' রয়েছে। আর বাকীটা এদিক ওদিক করে জোগাড় কর দাও।

—তাহলে যে আমাদের হাতে এক পয়সাও থাকবে না।

—সে না থাকলে আর কি করা যাবে! তারপর সবচেয়ে একটা কথা কি জান—বাবা হচ্ছেন জ্ঞানী বিবেচক মানুষ। নিশ্চয় তিনি এই হাজার টাকা দেওয়াতে চিন্তা করবেন—এরা কোথায় পেল। কারণ তিনি বিলক্ষণ জানেন—আমি অনেক দিন আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। শুধু তোমার রোজগারের টাকাতে আমাদের সংসার চলছে।

—হ্যাঁ তাই ভাবছি। তোমার কথাগুলো একটাও ফেলে দেবার নয়! কিন্তু মনে কর আজকে হামবড়িমা করে বোনের বিয়েতে দিয়ে কালকে সেই ত আবার বাবার কাছে হাত পাততে হবে। আর এখানে ত আমার হাত পাতার কোন প্রশ্ন আসে না।

—হ্যাঁ সে ত ঠিক কথাই। তুমি হাত পাতবে, এ কথা মনে করছ কেন? তুমি আমার কথা ভেবে এ সব কথা বলছ ত? চিন্তা করার কিছু নেই—আমি ত তোমাকে সেদিনেই বললাম।

—কি বললে?

—ও হো ঠিক বটে, তোমাকে বলিনি আমিই অনেক কিছু মনে করছিলাম। চিঠিটা পড়ে প্রথম মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা মুচড়ে গেল—অকস্মাৎ যেন আমার বুকের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল।

অবশ্য এর পূর্ব্বেই মানিক ওর স্ত্রীকে লেখা ওর মায়ের চিঠিখানা পড়েছিল। তাই ঋতার মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছিল। শুধু কি তাই ঋতা এই সব ব্যথা চেপেও সে তার ঐ পাঁচশ' টাকা সঞ্চিত ধন সহাস্য বদনে ননদের বিয়েতে তুলে দিতে চাইছে এটাও একটা ভাববার বৈকি।

ঋতা—হঠাৎ কে যেন আমার গভীর মনে কোথায় বলে গেল—ভয় নাই ঋতা, সত্যের সত্য ঘন্টা ঠিকই বেজে উঠবে। তারপরই আমি আমার নিজের সাম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাবলাম—ছিঃ ছিঃ আমি এ সব কি ভাবছি! সত্যিই তাই হল—মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি আমার দেহ মধ্যে অমিত বল পেলাম।

মানিক—না ঋতা তবু ত আমার দিক থেকে তোমার একটা বলার আছে। যতই হোক তোমাকে আমি বিয়ে করেছি। তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেয়ে দ্যাখ দেখিনি। আজ অবধি তোমাকে আমি একখানাও সোনার কিছু দিতে পারলাম না।

ঋতা মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি হেসে উঠল—সোনা! তোমার কাছে আমি কি পেয়েছি। কি দিয়েছ আমাকে সেটা তুমি ভাব?

—আরে না না, সে ত অনেকই দেয়। তাহলেও দেখতি দেওয়া ত একটা থাকে।

—আরে সেইটিই ত আমি বলছি—তুমি বুঝতে পারছ না বুঝি! যে জিনিসটার সেদিনে আমি নাম করলাম নি—পুড়ে ক্ষয়ে যায় বা কমে যায়। এবার ভাব দেখিনি সোনার চাইতে তার দাম কত বেশী।

মানিক কথাটা শুনে হাসবে না ভাববে কিছুই স্থির করতে পারল না। ঐ ভেবেই যেন উত্তর দেওয়ার ভান করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঋতা—যাও ত তুমি যাও ত, আবার এখানে আসলে কেন? আমার রান্নার দেরি হয়ে যাচ্ছে না।

মানিক তখন গম্ভীর। কে আর তখন তার কথায় কান দেয়। ঋতা পরিষ্কার সেটা বুঝতে পারল। তাই কথাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় সে বলল—আচ্ছা বলত, এখনও ময়দা মাখি নি, একটুখানি খিঁচুড়ী করে ফেলব? সে বেলা ত মাছ রান্না করেছিলাম সেই মাছই আছে, আর একখানা ভাজা ভেজে দেব

মানিক—তুমি যেটা পারবে—যেটা তোমার মন চায় সেটাই করে ফেল।

ধীরে ধীরে মানিক বৈঠকখানা ঘরে পেপার হাতে বসল। কিন্তু কৈ তার সে মন। পেপারে মন বসে না। সে তার কত রকমই চিন্তা সুরু করে দিয়েছে। ঋতা রান্না ঘরের কাজের ফাঁকে একবার একটু এগিয়ে এসে দেখল মানিক খুব বেশী যেন চিন্তিত। ও তার সঙ্গে হাল্কা দু-একটা কথা বলতে চাইল। কিন্তু কৈ সে রকম ধরণের উত্তর মানিকের কাছ থেকে আগিয়ে এল না। যাই হোক খেতে বসে আবার পাঁচটা হাল্কা কথা পাড়ল—আচ্ছা ঠাকুর পোয়ের পরীক্ষা এগিয়ে এল না? এই সময়টা ঠাকুঝিয়ের বিয়ে, ওর পড়ায় বোধ হয় কিছু ক্ষতি হবে।

মানিক তার ভাইকে বিশ্বাস করত বা ভাল রকম জানত বলেই বলল—না তা তুমি ভেবো না, ও ঠিক ওর পড়া সামলেই লক্ষ্য করবে। প্রসঙ্গ পাল্টে মানিক বলল—আচ্ছা ঋতা।

—বল।

—তুমি যে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হবে আশা করছ, তাহলে ত তোমাকে রীতিমত নূতন উদ্যমে আবার পড়াশুনা সুরু করতে হবে। অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছ পড়াশুনা, তার পরে মা হয়ে পড়াটা কি তোমার সম্ভব হবে?

—চেষ্টা করে দেখতে হবে কতদূর কি হয়। একটা কথা কি খুব ঠিক নয়, যদি কেউ সাধনা করব মন নেয় তাহলে তুমি জানবে সে তার নিজের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে, তবে যদি করতে পারে, যদি তার একাগ্রতা থাকে তখনই ঈশ্বর তার প্রতি মুখ তুলে চান।

—এখানে ঈশ্বর মুখ তুলে চাওয়ার কি আছে! রীতিমত পড়ে পাস করতে হবে।

—ঐ ত বললাম, যদি আমার ঠিক সৎ উদ্দেশ্য থাকে—আমার উচ্চ শিক্ষা না হলে স্কুল রক্ষা করা যাবে না—এইটিই যদি যথার্থ হয় তাহলে জানবে আমার চেষ্টা ও তার আশীর্ব্বাদ অল্প পড়ে অনেক বেশী কাজ করব। আমার পড়াতে বেশী সময় দিতে হবে না।

—যাক ঋতা তোমাকে 'আমার আর বলার মতন কিছু নেই। শুধু আমি স্বামী হয়ে তোমাকে এইটুকুই বলি—যেন যে প্রতিভা নিয়ে এসেছ সেই প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে পার।

ঋতা—'বলি' নয় বল আশীর্ব্বাদ করি।

—না ঋতা আমি ক্ষুদ্র মানুষ। আমার আশীর্ব্বাদ আর কতটুকু! ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

ঋতা খানিক থেমে বলল—যাক তাহলে ঠিক হল কি? তুমি কবে যাচ্ছ?

—সামনের শনিবার ছাড়া আর উপায় কি। তাহলে আমি ঠিক যাব—আমাকে যেতে বলছ তুমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ত আমার বক্তব্য বলে দিলাম সব। কেন তোমার বিচারে স্থির করতে পারছ না?

না ঠিক তা নয়, তবে কি জান—

জানা জানি আর কি! তুমি বড় ছেলে হিসাবে তোমার উপরে সব দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য এসে পৌঁছান উচিত। তবে এখানে তোমাকে দেয় নি তার কারণ হয়ত এই হতে পারে যে বাবা এখন নিজেই কর্মী। তাই তিনি কারও কাছে হাত পাততে চান না। তারপর আর একটা কথা আছে—সেটা থাক বলব না।

মানিক বুঝেও না বোঝার ভান করে চেপে ধরল—কি কি বল না, বল না?

—না না সে বলব না।

—আরে বলই না শুনি জিনিসটা।!

—সেটা আর কিছু নয়—বাপ মাকে না জানিয়ে আমাকে বিয়ে করা।

—ঋতা, তুমি এখনও এ কথা বলবে! তুমি জানবে—আমি তোমার জাত বা রূপকে বিয়ে করি নি। আমি বিয়ে করেছিলাম তোমার গুণকে। অবশ্য তখন আমি এতখানি জানতে না পেরে। অল্পতেই আমার মনে হয়েছিল—নিশ্চয় খুলে দেখলে আরও এর মধ্যে অনেক কিছুই পাওয়া যাবে। তাই কিছু চিন্তা না করে তোমায় আমি বিয়ে করেছি! আর এ কথাও আমি জানি বা জানতাম যে যাদের কাছ থেকে আমি গড়ে উঠেছি—যাদের শিক্ষা আমি বাল্যেই পেয়েছি নিশ্চয় সেটা হাল্কা শিক্ষা নয়—তারা যখন সব জানবে বা বুঝবে তখন বধূ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে—যে তাদের মানিক কিছু অন্যায় করে নি!

পরদিন সকালে ঋতা মানিককে বলল—আজ আমার শরীরটা অনেকটা ভাল মনে হচ্ছে আমি বোধহয় আজকে স্কুলে একটু দেরি করব।

—কেন, আর কটা দিন গেলেই ভাল হত—একবারে সোমবারে—

—না সোমবার আর কি আছে, একটু একটু করে বাড়াতে থাকি এবার।

ঋতা রান্নার দিকে ব্যস্ত। মানিক বাইরের ঘরে অফিসেরই কাগজ পত্র উল্টাচ্ছে। এমন সময় দেখল প্রণবেশ হাজির। মুখ তুলেই মানিক—কি প্রণবেশ যে, কেমন ভাল?

প্রণবেশ জামাইবাবুকে ঠিক বড় দাদার মতনই সম্মান দেয়। তাই সে যেমন মাথাটি নামিয়েছিল সেইরকমেই উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—তাহলে খবর কি?

—দিদির শরীর খারাপ হয়েছিল তাই বাবা মা আমাকে দেখতে পাঠিয়েছে। আর মা দিদিকে দিন কতক ওখানে রাখার কথা বলেছে। শরীরটা একটু সামলে আসবে।

—তা তোমার দিদিকেই বল গে যাও। এই যে ঋতা, কোথায় তুমি।

ঋতা রান্না ঘর থেকে সাড়া দিল—কেন? যাই।

—না এখানে তোমাকে আসতে হবে না। আমি তোমাকে ডাকছি না। আমার চেয়েও তোমার বড় কুটুম এসেছে—দ্যখ. ডেকে নিয়ে যাও।

ঋতা বুঝে নিল প্রণবেশ এসেছে। তাই আর সে আগিয়ে এল না।

মানিক—যাই আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে। তোমার দিদি ত আর এল না। তুমি ত আমার বড় কুটুম।

না জামাই বাবু, আপনি বসুন আমিই যাচ্ছি—বলেই প্রণবেশ দু'পা আগিয়েছে আর দিদিও তখন বাইরের ঘরে আসছে। সামনা সামনি হতে দিদিই বলে উঠল—কিরে?

প্র—তোমাকে দেখতে মা বাবা পাঠাল।

ঋতা সেদিকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে বলল—কেন, আমাকে দেখার কি আছে! কি হয়েছে আমার!

মানিক—আঃ ধমকে দিচ্ছ কেন, ওকে পাঠিয়েছে ও তাই এসেছে। তোমার কি হয়েছে না হয়েছে ও কি করে জানবে। যাও ভিতরে নিয়ে যাও।

ঋতার সঙ্গে সঙ্গে প্রণবেশও ভিতরে গেল। আজ স্বামীকে খাইয়ে খেয়ে

নিজেকেও বেরতে হবে। তাই তাড়া আছে। ভাইকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে দুখানা বিস্কুটও হাতে দিল।

প্র—না দিদি, আমি খেয়ে এসেছি। এখন আর কিছু খাব না। আর চা-ই তুমি এখন আমাকে কেন দিচ্ছ!

না, তবুও খেয়ে নে। কি আর—এতটুকুন ত ভারি চা।—ঋতা উনানের দিকে মুখ করেই ভাইয়ের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলছিল!—কিরে, তারপর তোর পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

—হ্যাঁ সেই কথাটাই তোমার কাছে বলব। বাবা তোমার কাছে কটা টাকা চেয়েছে।

—টাকা চেয়েছে আমার কাছে! বাবা ত জানে আমি এখন চাকরি টাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

—হ্যাঁ বাবা সেকথা বলেছেন। বাবা এই কথাই বললেন আমাকে—তোমার দিদির ত এখন আর চাকরি নেই তাকে টাকা চাওয়া বৃথা। কিন্তু তবুও তুমি বলবে—এই বছরটার মত কোন রকম অল্প সল্প যেন কিছু ব্যবস্থা করে দেয়। বছর বলতে আর মাত্র কয়েক মাস। তোমার ত ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে এল। আর এটাও জানিয়ে দিয়ে আসবে তোমার যে মামা সেদিনে এসেছিল—তোমার পরীক্ষার পর চলে যেতে বলেছে। ওখানে সে কিছু একটা তোমার ব্যবস্থা করে দেবে। ঐ সময়টা তুমি ওখানে ট্রেনিং নেবে। তাই সবই তোমাকে জানাতে এলাম। আর তোমারও শরীরটা দিন কতক আমাদের ওখানে যেয়ে সামলে আসবে।

, ঋতা—যাক সে এখন পরে হবে, ট্রেনিংটা তুই কিসে নিবি—কিসের ট্রেনিং?

ঐ মামা যে কারখানায় কাজ করে সেই কারখানায় মামার কাছে। যদি আমি পাস করতে পারি মামা বলেছেন ওখানে একটা ভাল 'চান্স' পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু তুই যে আমাকে টাকার কথা বললি—টাকা ত আমি এখন একেবারেই দিতে পারব না। কারণ সামনেই আমার ননদের বিয়ে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ কথার মাঝে মানিকের গলা—কি গো তোমাদের ভাই বোনের কি

আলাপ হচ্ছে? এ যে দেখছি রান্না ঘরের কোনেই সব কথা সেরে নিচ্ছ! আমি কি ওখানে যেতে পারি?

প্রণবেশ বেশ লজ্জায় পড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ঋতাও তড়িৎ-বেগে উত্তর দিল—কেন আসবে না, আসবে বৈ কি। যে আলাপ হচ্ছে তা থেকে কি আর তুমি বাদ থাকবে।

—নাঃ, বাদ থাকাই ভাল। যতই হোক তোমরা ভাই বোন আপন-জন। আমি পরজন ত।

প্রণবেশ বরাবরই জামাইবাবুকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। তাই সে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না। ঋতাই অল্প কথায় সারবার জন্য তাড়াতড়ি আবার বলে উঠল—নটা বেজে গেছে। আর এখন কারোরই কথা বলবার সময় নেই। তুই এখন বাড়ী চলে যা, আমি এখন এক সময় তোর জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ করে যা হয় একটা ব্যবস্থা করব। আর মা বাবাকে বলবি—সামনের শনিবার তোর জামাইবাবু থাকবে না, ঐ দিন যেয়ে থেকে আসব।

গলায় স্বর চড়িয়ে বলল ওদিকে—কি গো, আমি কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই বলে দিলাম।

—তা আমাকে আর জিজ্ঞেস করবার দরকার কি। তোমার ভাই, তুমি বোন—আমি না আগেই বলে দিয়েছি—আমি পর।

—আহা সবেতেই ন্যাকামো করো না। বল, ও কিন্তু চলে যাচ্ছে।

মানিক তখন স্নান করে এসে দাঁড়িয়েছে—প্রণবেশ, মা বাবাকে বলো তাদের জামাই যাচ্ছে না, যা কিছু ভাল মন্দ রান্না করে তোমার দিদিকে খাইও।

প্রণবেশ এতক্ষণ মুখ বুজে ছিল এবার একটুখানি মুখ খুলল—আপনি কি গরীবদের বাড়ীতে যাবেন!

মানিক একটুখানি হেসে বলল—হাসালে, আমিই বুঝি খুব বড়লোক।

প্রণবেশ বিদায় নিল। এরাও একে একে স্বামী স্ত্রীতে খাওয়া দাওয়া করে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ল।

শিবশঙ্করের লিখিত একখানি চিঠি আজ সকালে হৃদয় পেয়েছে। আগাগোড়া পড়ে জয়াবতীকে বলল—শুনছ, মেয়ের বাবা একখানি চিঠি দিয়েছে। আমি

যেদিন ধরেছিলাম সেইদিনেই ওরা রাজী। তাহলে আমাদেরও এবারে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাক, না তুমি কি বল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা ত বটেই। তবে কিন্তু সবের আগে আমাদের খুকীকে আনা দরকার।

—আঃ তা তুমি ভাবছ কেন! খুকী এখন পরের বাড়ীর বৌ হয়েছে, এখন কি আর তোমার খুকী! কেন, তুমি গীতাকে নিয়েই বিয়ের টুকটাক সব গুছাতে থাক?

—একটা চিঠি দিয়েই দেখ না। এত সাধের এই প্রথম ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে। ওখানে ওর মনটা চঞ্চল হবে না!

—হ্যাঁ তা আমি তোমার কথামত লিখে দিচ্ছি।

স্বামী স্ত্রীর এই রকম সব কথার মধ্যে ছোটছেলে সৌরেন ঘরে এসে ঢুকল। মা বলে উঠল—জানিস রে মনি, ওদের আজকে চিঠি এসেছে ওরা ঐ ২৯শে অগ্রহায়ণই দিন ধরবে।

সৌ—তা ভাল, বেশত। দুঃখের মধ্যে আমি বিয়ের আনন্দ করতে পাব না।

মা—তাতে আর কি হয়েছে, তোদের ঘরেরই ত বৌ হয়ে আসছে। স্থায়ী আনন্দ থেকে তোকে সরায় কে!

এর মধ্যে বাপ ওদিক থেকে সরে সে তার নিজের কাজে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

সৌ—তুমিই তো এই সময়টা বিয়ের দিন ধরলে। কেন বাবা আমার পরীক্ষাটা পার করে দিন স্থির করলেই পারত।

মা—নারে আমার বা তোর বাবার মনে হল কি—শুভকাজ শীগ্রি হয়ে যাওয়াই ভাল। তবে তোর কথা যে ভাবি নি তা নয়। তখন মনে হল তুমি ত আর নেহাৎ বোকা ছেলে নও, নিশ্চয় নিজের দিক সামলাবে।

সৌরেন মায়ের দিকে একটুখানি চেয়ে—ঐ সুখেই থাক আর কি!

মা—যাক এখন বাজে কথা রাখ দেখিনি। তোমার দিদিকে আনার কি ব্যবস্থা করছ বল।

—দিদিকে আনতে আমি যাব!

—তাহলে কে যাবে?

—ও বাবা, আমার সময় হবে না। ও তুমি যাকে হোক পাঠাও।

—তা বললে কি চলে! তাহলে কে যাবে বল, তুই ছাড়া।

—কেন, দাদাকে পাঠিয়ে দাও না। আমার এখন পড়াশুনার চাপ আমি যেতে পারব না।

—তাই বললে কি হয় বাবা! সে এখন বর সাজতে যাচ্ছে, সে কি করে আনতে যাবে বল্!

—তাহলে তুমি দেবজ্যোতি দাদাকে বলতে পারতে, সেদিন ত এসছিল জিজ্ঞেস করতে—দাদার বিয়ের ঠিক হল কি না।

—সেদিন কি করে বলব! তখন কি নতুন কুটুমের চিঠি এসেছিল! আজই ত ওদের চিঠি এসছে। তাব উপর একটা কথা—ওর সঙ্গে বা পাঠাবে কেন!

—কেন পাঠাবে না! আমাদের দিদি ত! দাদার যখন দিদি, দাদার বন্ধুরও দিদি। দিদিকে আনতে দোষ কি! কেন, সেদিন ত সকলে একসঙ্গে মেযে দেখতে গেছিল। অ জ আর আনতে দোষের কি!

হৃদয় মা ও ছেলের অনেকক্ষণ ধরে বচসা শুনছিল। সৌরেন চিরকালের আদুরে, আর একটু গোঁযাড গোছের ছেলে। তাই বাপ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিযে এসে বলল—এ কি কথা বলছ তুমি! এ তাই আবার হয় নাকি! তখন একসঙ্গে যাওযা আর তাকে দিযে আনতে পাঠানো—কথাটা কি কিছু বোঝ, না, না-বুঝেই বলছ?

সৌরেন বাবার কথাতে মথা নামিযেছিল বটে তবে খুব একটা কিছু নয়। তাই সে বলে উঠল—না বোঝার আর কি আছে!

হৃ—নিশ্চয় বুঝলে এ কথাটা বলতে না। এটা যে সামাজিকতা। সামাজিকতায়—ভায়েরা থাকলে ভায়েরা বা বাপ জ্যাঠা কাকা ইত্যাদি যে হোক আত্মীয় গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। তখন বাইরের লোকের প্রশ্ন আসে না।

সৌ—এ সব আপনারা মনে করলেই মনে করা।

—হ্যাঁ তা ত বটেই। সে কথা ত তুমি বলবেই। যাক আমিও লেখাপড়া শিখেছিলাম সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলাম আর তুমি এই সবে বি. এস. সি. পাস করেছ। যাক যেখানে যাই কর, সমাজ মেনে ক্ষেত্র বুঝে কাজ করতে হবে।

সৌরেন আর কিছু বলল না বটে কিন্তু পরে তালটা মায়ের উপর তুলবে এই

ইচ্ছাই রাখল। মা ও তার ছেলেকে নিয়ে ভুক্তভোগী তাই সেকথা সে বুঝতে পেরে বলল—এখন বড় হচ্ছিস বাবা আর কি ছেলেমানুষী চলে রে!

থাক খুব হয়েছে—মাকে সে ঝাঁকার দিয়ে উঠল। এমন সময় মনোরঞ্জনও ঘরে এসে ঢুকল। দু'ভায়ের অনেক বয়সের তফাৎ ছিল তাই দাদাকে সে ভয় করে চলত। দাদা ঘর ঢুকার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন তীরের বেগে বাইরে চলে গেল। দাদার কানে ঝাঁকার নিশ্চয় গেছিল। তাই সে ঘরে পা দিয়ে মাকে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার, সৌরেন ওরকম ভাবে বেরিয়ে গেল কেন?

—আর বলিস কেন বাবা! ওটা একটা পাজির পাঝাড়া। তোর দিদিকে আনার কথা বলছিলাম। আজ তোর হব-শ্বশুরের একখানা চিঠি এসেছে। তারা ঐ দিনই ধরবে। তাই বলছিলাম তোর দিদিকে নিয়ে আয়। তাই ও অত আমার সঙ্গে হম্বি তুম্বি করছিল। তোর বাবাও এসে বকল।

—তা ও কি বলতে চায়, কি বলে কি?

—ও বলে ওর পড়ার চাপ। ও পারবে না।

তবে একটা কথা ঠিক ছেলেটা গোঁয়াড় হলেও পড়াশুনায় ভাল ছিল। সেই জন্যই অবশ্য সকলের থেকে একটু বেশী লাই পেয়ে গেছে।

মনো—তা দিন পাঁচেকের মত পড়া ছেড়ে থাকলে এমন কি ক্ষতি হবে। তবে হ্যাঁ একটা কথা বটে এই ট্রেন 'জার্নির' পর হয়ত একটু ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তার উপর আবার এসে কদিন পরেই হাঙ্গামার মুখে পড়ে যাবে।

মা—তা না হলে আর উপায় কি বল?

মনো—তা তুমিই বা এত শীগ্রি দিদিকে আনার ব্যবস্থা করছ কেন? বিয়ের সময় সময়-করে জামাইবাবু সঙ্গে করে নিয়ে আসত, সেইটিই ভাল হত না কি? হাঙ্গামা করে আনানোর এখন কি দরকার?

—আর আনা না-আনা ঐ একই হল নে। যদি ঐ সময়ই ওরা বলে—না আনতে এলে পাঠাব না। তখন ত সেই আনা লাগবে।

মনো—কেন, বাবা লিখবে যে আমাদের লোকের অভাব।

—তুই তাহলে শুনিস নি—তখনই ত বলা হয়েছিল আমাদের আনার লোকের অভাব, খুকীকে রেখে যাও। জানিস না কি, ওরা কি ধরণের লোক? সব সময় প্যাঁচ ছাড়া চলে না।

মনে—প্যাঁচ আছে তাদের আছে, তা আমাদের তা দিয়ে দরকার কি।

—তুই আবার ভাল বললি। তোদের বোন যে তাদের ঘরে আছে, তা বুঝিস ?

—তা আছে ত কি হয়েছে। সেইজন্য পায়ে ধরে পড়ে থাকতে হবে নাকি ?

—এ সব এখন তোরা বুঝবি না, জ্ঞান হলে বুঝবি। এখন খুকীকে আনা নিয়ে কথা। কি করে আনা যাবে সেই চিন্তা কর।

—যাক ও যদি পড়ার ক্ষতির কথা বলে তাহলে আমাকেই যেতে হবে।

—তুই তাহলে যাবি।

—কি আর করা যায়—বাধ্য।

জয়াবতী কোথায় যেন আশ্বস্ত হল। হৃদয়কে কথাটা বলল। স্বামী সব শুনে প্রথমে একটু না না করছিল তারপর অগত্যা তাই হবে বলে স্বীকার করে নিল।
—তাহলে ওদিকে কি চিঠি ছেড়ে দেওয়া হবে ?

—হ্যাঁ লিখে দাও। ও মনোরঞ্জন যাবে বলছে সেইটিই ভাল। একবারে ওকে নিয়ে আসবে, আর ওর শাশুড়ী শ্বশুর সকলকে ভাল করে বলে আসে যেন ওরা বিয়ের সময় আসবে।

জয়া—হ্যাঁ গো বৌকে আমাদের দিক থেকে কি দেওয়া হবে ?

হৃ—সে আর আমি কি বলব—সেটা তোমরা মেয়ে মহলই ভাল করে বোঝ—কি দেওয়া হবে কি না হবে! আমার কি দিতে হবে সেটা আমায় ভাল করে বলে দাও।

গীতা এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল—কেন মামীমা, আপনার যে পুষ্প হারটা আছে সেইটা দিয়েই আপনি বৌয়ের মুখ দেখবেন। প্রথম—বড় বৌ ত।

জয়া—তারপর বুঝি আমার আর নেই ?

—তা থাকবে না কেন! মনিব বৌয়ের কথা বলছেন ত ? মনির বৌকে গিনিগাঁথাটা দেবেন।

—আর আমার আছে কি রে! ঐ দু'টাই যা আমার বাবার দেওয়া আছে। তাছাড়া ত তোমার মামা রাজলক্ষীর বিয়েতে কিছু নিয়ে নিয়েছে।

হৃ—কি আর তোমার কটা নিয়েছি। দু এক থান মাত্র।

—হ্যাঁ তাই, আমিও সেই বলছি।

গীতা—তাহলে এক কাজ কর—ঐ গিনির হারটাই গিনি খুলে নিয়ে একটা করে পেন্‌ডেন্ট তৈরি কর তাতে একখানা করে গিনির লকেট করে দাও।

—যাক তুমি যখন বলছ, তখন বড় বৌকে গিনির হারটা দিয়েই মুখ দেখব, ওর আর কাটাকাটি করা কেন! আর ওরাই আমার গয়না—আমি আর গয়না রেখে করব কি!

মনোরঞ্জন পাশের ঘরেই ছিল। কথাগুলো একরকম সব তার কানে গেল। প্রথমটায় মনে মনে করছিল—মাও তাহলে আমার তোমার জানে। তার পরেই মনে করল—সত্যিই ত ওর বাপের দেওয়া জিনিস সে এখনই বৌকে দেবে কেন। বৌ আগে বৌ এর মত হোক—ও একটা কেন, কত পাবে। এই রকম নানারকম পাঁচটা কথা ভাবছিল। অবশ্য মায়েরও মনে কোন গোপন ছিল না, তাই সে সহজ সরল ভাবে ফাটিয়ে বলছিল।

যাক সব কথার পর জয়াবতী বলল—খুকীও ত আসছে আসুক না; সেই কি বলে। মামা ভাগ্নী একসঙ্গে সায় দিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভাল।

অফিস থেকে মানিকের ফিরতে দেরি দেখে ঋতা বেশ একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। যাই হোক ফিরতে আশ্বস্ত হল—যাক বাবাঃ, তোমার জন্ত আমি কি চিন্তাই না করছিলাম।

ও তাই নাকি, আমার জন্ত তুমি আবার চিন্তা কর।—হাতের কাগজ পত্রগুলো স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে মানিক বলল।

—আহা কি যে তুমি বল না, তোমার জন্ত যেন আমি একটুও ভাবি না! পুরুষ জাত এই রকম ধরণেরই নিন্দা করে। তাদের স্ত্রীরা তাদের জন্ত যতই করুক না কেন সেই নিন্দার মালা গলায় পড়তেই হবে।

—বা, তুমি আমাকে দেখেই সমগ্র পুরুষ জাতকে বিচার করে ফেললে!

—তা কেন বলছ, আমি অনেককেই দেখেছি বলেই এই কথাটা বললাম।

—আর আমি যদি বলি, আমি এটা নিতান্তই ঋতাকে রাগানোর জন্য বলেছিলাম।

—তা আমি বুঝি।

মানিক কথাটা শেষ না হতে হতেই ছু'পা আগিয়ে যেয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তার গালে গাল দিয়ে বলল—ওগো আমার প্রাণেশ্বরী, তাই যদি বোঝ তবে অমন করে কেন রাগ কর শুনি !

—আহা ছাড়।

—আর আমি যদি বলি না ছাড়ব না ! একি অফিসের মধ্যে অবিবাহিত কোন স্ত্রীলোককে জড়িয়ে ধরেছি নাকি ?

—তা ধরতে এলে কি আর ছাড বলে বলতাম ! ছাড়িয়েই দিতাম। ছাড় ত ছাড় ত কখন সেই ছুটো ভাত খেয়ে গেছিলে ! খাওয়ার ত নামও করতে চাও না।

—আরে এ যা খাচ্ছি না—এ খাওয়ার চাইতে কি তুমি ছুখানা গরম পরোটা খাওয়াবে !

ঋ—এতে কি আর পেট ভরবে !

—পেট ভরাটাই কি বড় নাকি ! পেটের চাইতে ত মন ভরবে।

যাক ঋতা একটু জোর করে ছাড়িয়ে নিযে রান্না ঘবের দিকে চলে গেল। মানিক বলে উঠল—হায়রে, আমার চাতক পাখীর মত অবস্থা হল।

মানিক হাত পা ধুয়ে এসে চেয়ার নিযে বসেছে। ঋতা এক প্লেট খাবার নিয়ে এসে পৌছল।—নাও হাত দাও, আমি চা নিয়ে আসছি।

মানিক—মেযেটা আজকে আসে নি ?

—হ্যাঁ এসেছিল, তোমার দেরি দেখে ও এই একটু আগেই চলে গেল। খানিক বাদে উভয়ের চা নিয়ে ঋতা এসে স্বামীর কাছে বসল।

ছু'একটা মামুলী কথার পর ঋতা কথা পাড়ল—সকালবেলা ভাই এসছিল কেন এবার তাহলে শোন। বলেই সকালের ভাই বোনের সব কথা বলল। মানিক উত্তরে বলল—তাহলে কিছু ত দেওয়া উচিত।

—কোথা থাকতে এখন দেব ! ঠাকুর ঝির বিয়ের জন্যে যে টাকার কথা তোমাকে বলেছি তার থেকে আর কি করে ভাগ দেব ! আর ও বৈ ত আমার অন্য কোন পুঁজি নেই।

—আরে তাই বললে কি আর চলে ! একজন না খেয়ে মরবে আর একজনের উপর দিয়ে টাকা পাওয়া—এ কোন্ যুক্তি !

ঋ—এখানে আমার কর্তব্য। ওখানে ত আমার কর্তব্য নয়।

—তা হোক না কেন তোমার কর্তব্য। ওর থেকে কিছু কেটে তোমায় ব্যবস্থা করতে হবে। তার উপর সে যখন এরকম কথা বলেছে যে তার মামা তার একটা ব্যবস্থা করবে। আমার যতদূর মনে হয়, তুমি কাল বাদ দিয়ে, আমি চলে যাওয়ার পর, একবার যাবে বলছ যে যাও। যেয়ে সমস্ত বুঝিয়ে বলে কিছু দিয়ে এস গে যাও।

ঋ—কিছু বলতে কি রকম কি দেব! আমার ত ঐ পুঁজি।

—ওর থাকতেই শত খানেক নিয়ে দিয়ে এস।

ঋ—তাহলে ত হাজার থেকে কমে যায়।

মানিক—তা যাক, ওটা আমি এদিক ওদিক করে 'ম্যানেজ' করে নেব।

বেশ কদিন কেটে যাওয়ার পর আজকেই অমরেশ ভেবেছে—তার একবার গীতিকার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। ইদানীং সে পড়াশুনা খুব চেপে করে। সামনেই বোনের বিয়ে। বিয়েতে বেশ সময় দিতে হবে। তারপর ফাইনাল পরীক্ষা। গাফিলতি তার নেই কিন্তু নানান ঝামেলায় সময় দিতে হয়। তাই পড়ার ফাঁকে এক সময় ভাইকে বলল—ছাখ্, আজকে আমি একবার তোর দিদির ওখানে যাব। অজয় সে কথায় কোন উচ্চ বাচ্য করল না। আগেই বলেছি অজয়ের অহেতুক কৌতুহল কম। যাই হোক বেরবার উদ্যোগ করছে এমন সময় একখানি চিঠি এসে পৌঁছল। বাবার চিঠি। এমন কিছু লেখা নেই। কয়েকটা জিনিস কেনা কাটা করে শিগ্রী পারলে এই শনিবারই বাড়ী যেতে। অমরেশও ঠিক করল—হ্যাঁ তাই তাহলে চলে যাই। কিন্তু গীতিকার সঙ্গে একবার দেখা না করেই কি চলে যাব! এই রকম সাত পাঁচ চিন্তা করছে। সামনেই শ্রীমান অজয়।

—দাদা, কি ভাবছ গো, দিদির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল?

—হ্যাঁ রে একরকম তাই, বাবা যেতে লিখেছে।

—আর আমি কবে যাব? আমি কিন্তু থাকব না দিদির বিয়ের সময় এখানে।

—না না তোকে থাকতেও হবে না। এখন আমি জিনিস পত্রের দাম সব

জেনে, কয়েকটা কেনা কাটা করে একবার বাড়ী ঘুরে কিছু কাজ এগিে আসব। তাই বাবা যেতে বলেছে।

—হ্যাঁ তা তুমি যাও।

—হ্যাঁ তা যাব ত, কিন্তু ইচ্ছা ছিল এখানে তোর দিদির সঙ্গে একবা দেখা করে যাব।

—তাহলে আর ভাবছ কেন এখুনি চলে যাও।

—তাই তবে বেরিয়ে পড়ি। আজ কি রান্না করবি বলদেখিনি?

এরা অবশ্য আগে দুজনেই হোটেলে খেত। অমরেশ ত খেতই, অজ আসার পরও কিছুদিন খেতে হয়েছিল। তারপরই এরা দুইভায়ে যুক্তি পরাম করে 'মেস' পাল্টে নিজেরাই রান্না করে খাচ্ছে। অবশ্য এটা অজয়ের সাহসে হয়েছে। অমরেশ যে একবারেই সাহায্য করে না তা নয়। তার আরও হযত সাহায্য করবার মন আছে। কিন্তু সময় কোথায়! সেই থেকে এর শ্যামবাজারের একটা ঘরে উঠে এসেছে।

অজয়—কেন দাদা, ঐ যে কালকে তোপ্‌সে মাছ আনা হয়েছিল, সে কিছু আছে, তার ঝোল করব আর আলু সেদ্ধ দিয়ে দেব।

—এ বেলা ত না হয় এই করলি, আর সে বেলার জন্য কি করবি?

অমরেশের জিজ্ঞেস করার কারণ এই—খুব অল্প পয়সায় ছিম্‌ছাম্ করে হ রান্না হত তাই তারা দুবেলায়ই খেত। তাই বলে শরীর থাকবে না এম করে নয়।

অজয়—সেবেলার দিকে ঐ ডিম আছে সেই ডিম সেদ্ধ আলু সেদ্ধ কে একটু রাত করে দুটো ফেনাভাত করে নেব।

অম—তাহলে তুই যা পারিস কর, আমি ঘুরে আসি।

সেই সেদিন গীতিকা অমরেশের কাছ থেকে ফেরার পর তার যেন আর মে কোন উদ্যমই নেই। পড়তে হয় পড়ে খেতে হয় খায়, এইরকম ভাবেই তা দিনগুলি কাটছে। বাপ কিন্তু এখন অনেক সুস্থ। ইউনিভার্সিটি যাওয়া আস করেন। তবে পুরা সময়টা থাকেন না। একটু আগেই বাড়ী ফেরেন গীতিকার এই মনের অবস্থা নিয়ে ওর মা একদিন ওর বাবাকে পাঁচট

কথা বলে। তাতে জ্ঞানী বাবা জ্ঞানের উত্তরই দেয়—এ তো ভারি মজার কথা। তার যদি একটা কিছু উচ্চস্তর লক্ষ্য থাকে তাকে গণ্ডী-বন্ধনে আনাটা বা ডাকাটা কি ঠিক? এখানে বরং তাকে সাহায্য করা উচিত। কারণ গণ্ডী নিয়ে ত সবাই পড়ে আছে। কে আর গণ্ডী ছাড়া কিছু করতে পারে! এরকম হীরা যদি চোখে দেখা যায় তাকে মাটি চাপা দেবার চিন্তা না করে মাটি থেকে বাইরের আলোয় নিয়ে আসার চিন্তা তোমার মেয়ের হবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

হায় রে, মা কি ভাব নিয়ে বলতে এসেছিল। মনটা খুবই ভেঙ্গে গেল। ভেবেছিল আমার স্বামীর ত খুব প্রতিপত্তি, যেমন করেই হোক ওকে ছলে বলে কৌশলে উনি নিশ্চয়ই বাঁধতে পারবেন।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাইস চ্যান্সেলর' শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ মুখার্জ্জী ছোট্ট করে শুধু এই কথা বলল—কি ঠিক বললাম না?

স্ত্রী হ্যাঁ না-বলে পারে কি! তার মনঃপুত উত্তর না হলেও সে বাধ্য হয়ে 'হ্যাঁ' দিল। মানুষের মন বুঝে চলতে হয় দ্বিজেন্দ্রকে। গুরুত্বপূর্ণ পদে সে দীর্ঘদিন আছে। তাই স্ত্রীর প্রকৃত ভাব বুঝতে সময় লাগল না। কিন্তু কি আর করা যেতে পারে! এখানে বেশী কথা উত্থাপন না করাই ভাল। মেয়ে-ছেলের দুর্ব্বল মন, তারা ত নিজের গণ্ডীটুকুই বুঝবে। মিতাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। সে তার সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্যই সুপাত্র অমরেশের হাতে তার মেয়েকে দিতে চাইছে। এখানে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! যাক মিতার 'হ্যাঁ' দেবার পরও দ্বিজেন্দ্র বলে উঠল—যাক নিশ্চিত যদি জানতে পার যে অমরেশকে কোনদিনই জামাই করা যেতে পারে না তাহলে মেয়ের জন্য আবার নতুন করে ভাবতে সুরু কর। কারণ যা হবে না, হবার নয় তাকে নিয়ে ধরে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

মিতা—না আমার একটা কথা বলার ছিল—

—কি?

—তুমি যদি একটু চেষ্টা করতে।

—আমি! আমি এর চেষ্টায় কতটুকু কি করতে পারি। আমি ত 'থার্ড পার্সেন'। তাদের যেখানে মতের মনের মিল হল না সেখানে আমার নাক গলাতে যাওয়াটা অন্যায় বা অপমানের হবে না? তোমার মেয়ে এমন কিছু

খারাপ নয়—শিক্ষিতা সুন্দরী—অর্থও কিছু কম নেই। সব দিক জেনে বুঝে যখন সে ছিটিয়ে দিয়েছে তখন বুঝতে হবে সে সাধারণ নয়। সেখানে আমাদের আগে মন চুপ করে সরে আসাটাই ভাল হবে না কি ?

মিতা—আর কিছু নয়, মেয়েটা বড্ড ভেঙ্গে পড়েছে।

—ও বললে আর চলে কি করে। ও দিন কতক পরে আবার নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে। —বলে বেশী কথায় আর না গিয়ে সে তার কর্মস্থলে বেরিয়ে পড়ল।

ধনঞ্জয় কদিন আগেই টের পেয়েছে গীতিকা ও অমরেশের মধ্যে কি যেন একটা হয়েছে। দুজনের মধ্যে দূরত্ব। তাই এই সুযোগে তার আর একবার টোপ ফেলার ইচ্ছা ছিল। সেই টোপ ফেলতেই সে একদিন এসেছিল। কিন্তু গীতিকা ওকে পাত্তা দেয় না।

ধনঞ্জয় ছেলেটাও মন্দ নয়। বড়লোকের একমাত্র ছেলে। বাপ কোলিয়ারীর ম্যানেজার। দীর্ঘদিন সে কলকাতাতে আছে। পড়াশুনার উদ্দেশ্যেই এসেছিল কিন্তু পাঁচরকম ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার দরুণ সব বছর তার ঠিক ঠিক 'প্রমোশন' পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে তুখোর বুদ্ধি এবং এক কথায় বলতে গেলে এমন চৌকস ছেলে ঝপ্ করে একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু হলে কি—গীতিকার ত তাতে মন ভরবে না। সে চায় আদর্শ।

আজকেও সকালে এই মাত্র সে এসেছিল। সে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অমরেশ কপাটে এসে ধাক্কা দিয়েছে। ভিতর থেকে গীতিকার মা-ই বলে উঠল—কে ?

—আমি মাসীমা, কপাটটা খুলুন না।

গলার স্বর শুনেই গীতিকা চমকে উঠল। মাসীমা যেয়ে কপাট খুলে ডাকল —এস। অমরেশ ভিতরে বলতে বলতে ঢুকল—গীতিকা কৈ ? গীতিকা নিশ্চয় পড়াশুনায় খুব মেতে উঠেছে ?

—না কৈ আর সে রকম পড়াশুনা করছে বাবা ! ও ত দেখি প্রায়ই একলা বসে কি যেন ভাবে।

কথাটা কি অমরেশের না জানার বাইরে। তবুও সে সেটা চেপে বলে উঠল

—কেন, ও ত একলা। পড়াশুনার সব সময় সুবিধা। আমি না হয় নানান চাপে ঠিক মতন পড়াশুনা করে উঠতে পাচ্ছি না।

মাসীমা—তোমার আবার কিসের চাপ?

—না আমাদের জীবনে ত খেলাধুলা, ইউনিয়ন ফিউনিয়ন অনেক কিছুই আছে। তার উপর দেখুন না ক'দিন আগে এক অজয়কে নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছিলাম। সে না নয় যাক মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলাম। হতে হতে বোনের বিয়ে এগিয়ে এল।

কথা বলতে বলতে গীতিকার ঘরে ঢুকেছে তারা। গীতিকার কোন সাড়া নেই। মা-ই শেষকালে কথার মাঝে বলে উঠল—দাও গীতিকা বসতে দাও অমরেশকে। তা তোমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল?

—হ্যাঁ একরকম ঠিকই হয়ে গেছে। আজকে আমি বাড়ী যাচ্ছি। তাই ভাবলাম যে গীতিকার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। পড়াশুনা কতদূর কি আগাচ্ছে—

মায়ের মনে কোথায় যেন একটু আশা বা আনন্দ ছুঁল।—আচ্ছা তোমরা তাহলে একটু গল্প কর আমি ভিতরে যাই—বলেই তিনি চলে গেলেন।

গীতিকার মুখ সিমেন্ট করা। এখনও সে একটিও কথা বলে নি। তাই বাধ্য হয়ে অমরেশই কথা বলল—বুদ্ধিমান অমরেশ বুঝে নিল—ওর মুখ বন্ধর কারণ ত আমি। অবশ্য সত্যিকারের কারণ না হলেও, ওর ত ধারণা তাই। তাই অমরেশ বলে উঠল—কি ব্যাপার গীতিকা, কথা বলছ না যে?

একটা জোর দীর্ঘ নিঃশ্বাস সামলে সে বলল—কথা থাকলে ত বলব!

—কথা নেই। আরে সামনে আমাদের পরীক্ষা কতদূর কি রকম কি আগালে—

—আমি যা আগিয়েছি তা কি তুমি জান না, তাহলে জিজ্ঞেস করছ কেন?

—জানলে কি আর তোমায় জিজ্ঞেস করি!

—থাক থাক খুব হয়েছে। তুমি আজ জান না বলছ। আমার জীবনের যা কিছু স্বপ্ন আনন্দ মুহূর্তে তুমি চুরমার করে দিয়েছ।

—গীতিকা! একি, এ যে বিনা মেঘে আমার মাথায় বাজ পড়ল! শেষে তুমি আমাকে দোষী করে দিলে।

—তোমাকে দোষী করাটা আমার অন্যায় না অপরাধ? একবার ভেবে দেখ দেখি, কোন্ অনলে তুমি আজ আমাকে দগ্ধ করছ?

অমরেশ—গীতিকা, এ কথা তোমার বলার মত না আমার বলা সাজে—একবার চিন্তা কর দেখিনি। কে কার দিকে ঝাঁপিয়েছিল?

গী—তাহলে কি তুমি বলতে চাও সুফলে হাত বাড়ানোটা আমার অপরাধ?

—দেখতে হবে ত তোমার হাতের নাগালের মধ্যে কি না। সে যদি তোমার নাগালের বাইরে হয়? তাহলে মিছেই গতর-ব্যথা সার হবে। তখন দোষ হবে—ফলটা কেন এগিয়ে এল না। আরে তার যে আগাবার উপায় নেই, সে কথা কি একবারও চিন্তা করে দেখা তোমার উচিত ছিল না? এবার ভাবত—ফলটাও বার বার স্পর্শ পেল নাড়া পেল অথচ ছেঁড়া হচ্চে না, তার কি অবস্থাটা হয় এবার ভাব দেখিনি?

গী—আমি যদি বলি—যে ফল পাড়তে গেছে, নাড়া দিয়েছে তার হাতে এসে ফলটার কি দেখা উচিত ছিল না যে সে মেড়ে চটকে খায় না সে শুধু তার স্বাদ গ্রহণ করে?

—আর এমন যদি হয়, ফলের স্বাদ যিনি গ্রহণ করবেন তার হাতে ফলটা পড়লে আর সে দেব-সেবায় লাগবে না। সে ফল তখন হয়ে গেল খুঁট ফল। তাই বলি গীতিকা, যা আছে মনে ধুয়ে মুছে নূতন উদ্যমে নূতন পথে অগ্রসর হও। তুমি জানবে—তুমি আমার মনের গভীরের কোন এক কোণ অধিকার করে রইলে। তবে থাকবে না সেখানে চাওয়া পাওয়া। শুধু বসে যাবে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আর একথা তোমার কাছেও আমি আশা করি তুমিও তোমার অমরেশকে মনের এক কোণে অমর করে রেখে দেবে। এটিই কি ভাল হবে না?

গীতিকা একবার মুখের দিকে চেয়ে শুধু বলে উঠল—অমরেশ, তাহলে আমি বীর বাঘা অমরেশের মনের এক কোণ্ অধিকার করতে পারব, এ তুমি বলছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে কেন বলছ, পেরে বসে আছ।

গীতিকার কোথায় যেন একটা আশা বা ভরসা পেল—অমরেশ তাহলে আমাকে ছিটিয়ে দেবে না? অমরেশ তার মুখের দিকে চেয়ে তার চিবুকে হাত দিয়ে বলে উঠল—গীতিকা, তোমার মন আমি অধিকার করেছি, এ কথা ত কৈ আমায় ফিরে বললে না?

—অমরেশ তা কি তোমায় খুলে বলতে হবে! আমি বরং বলি—আমার বুকের এক কোণ নয় গোটা বুক জুড়ে রইলে তুমি।

—না না গীতিকা, তা হয় না, তা হয় না। এ বুকের অনেকখানি অধিকার করবে তোমার পতিদেবতা। তারপর তোমাদের দুজনের মধ্যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে যারা? তারা সবের উপর অধিকার নিয়ে বসবে।

—না না অমরেশ, এ তুমি কি বলছ! আমি এ মন কাউকে ভাগ দিতে পারব না।

—না না বোন, তা হয় না হয় না। আরও বড় হও আরও বুঝবে, মুখ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়—বাক্যই সত্য হয়। তুমি আমার স্নেহের ভগ্নী ছাড়া আর কিছুই আমি মনে করতে পারি না। সে যে আমার অন্যায় অপরাধ হবে।

গীতিকার দুচোখ দিয়ে বন্যার ধারা বয়ে যাচ্ছে। স্তম্ভিত হয়ে অমরেশের হাত দুখানা চেপে ধরেছে। মন তার আনচান করে উঠছে। প্রেমের শোক সামলাবে না আদর্শ লক্ষ্য করবে। অমরেশের চোখ দিয়ে জল গড়ায় নি বটে কিন্তু তাই বলে তার ভিতরের কান্না গেছে কোথায়! সে যে পুরুষ। তাই ভিতরের কান্না ভিতরে সামলে তাকে অনেক কথাই বলে যেতে হচ্ছে।—তাহলে তুমি বিয়েতে যাচ্ছ ত?

—বিয়ে! কার বিয়ে?

—এতক্ষণ ধরে তাহলে কি বলে গেলাম—কি শুনলে? মাসীমাকে যে বলছিলাম।

—না খুব ভাল করে শুনি নি।

—দীপার বিয়ে। আমি ত আজকেই চলে যাচ্ছি।

—আসবে কবে?

—আবার আসব। ঠিক বিয়ের সময় তোমাকে নিয়ে যাব।

—না না আবার আমি কেন। আমার এ ভাঙ্গা মনে আমি ওখানে যেয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমার বিয়ে না হয়ে আমি অন্যের বিয়ে দেখতে যাব কোন্ দুঃখে।

—তোমার বিয়ে! তোমার বিয়ে হবে না কেন—তোমার বিয়ে ত হবে।

—গীতিকা চমকে উঠে বলল তাহলে কথা দাও কবে?

—সুপাত্র পাওয়া গেলেই দিন ধার্য হলেই তবে।

—ও সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।

—কেন, আমাকে ভাবতে হবে না কেন? আমার ত ইচ্ছাই আছে তোমাব বাবা মা ডাকলেই তোমার বিয়েব অনেক জায়গায় নাক গলাব।

—থাক, আর ফাঁকা দাযিত্ব না নিলেও চলবে। এ দাযিত্ব নেওযার অনেক লোকই আছে।

—যাক গীতিকা তুমি আমার উপব বাগ কবছ?

—যদি তাই বল না—রাগ দুঃখ অভিমান সব কিছুই।

—তাহলে তোমাকে এতক্ষণ ধরে যে এত কথা বলছিলাম সব তাহলে এক কান দিয়ে নিযে এক কান দিয়ে ফেলে দিচ্ছ?

—কানে মনে না নেওযাব কথা যদি বল তাহলে তাই করতে হয।

—ছিঃ ছিঃ গীতিকা, এ কি করছ তুমি। একি আমাদের আমড়া গাছিব জীবন—যে না হ্যাঁ চলবে। একটা কিছু হেস্তনেস্ত না হযে গেলে জানবে তুমিও পথ পাবে না আব আমারও পথে চলতে বেগ পেতে হবে। তাই সব ঝেড়ে ফেলে দিযে এস নূতন উদ্যমে পথ চলি।

গী—ও তুমিই পাবতে পাব, তুমিই পারবে। তুমিই পাবাব মন দিযে জন্মেছ। আমি তোমাব মত নই, সে মন নিয়ে জন্মাই নি।

—গীতিকা, তাই যদি বল না—হ্যাঁ আমি স্বীকাব করলাম। কিন্তু একটা কথা ত ঠিক—কেউ মন নিযে জন্মায় আর কেউ কারও মনকে তৈবি কববাব জন্য যদি আপ্রাণ চেষ্টা করে তাহলে দুটো একই মন হতে পাবে? তুমি হযত বলবে—না। কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে না কি? তা যদি না বল তাহলে আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ, এমন কি আছে যা, পাবে না। পাবলে মানুষই পারে আর তা না হলে কেউই পারে না। তুমি জানবে সব জীবেব মধ্যে জ্ঞান, বিবেক, শক্তি, সাহস মানুষেরই বেশী।

অমরেশের কথার উত্তর দেওয়ার মত গীতিকার কিছুই ছিল না। তবুও সে টেনে একটা উত্তর দাঁড় করাল—আর আমি যদি বলি—কথাগুলো হয়ত তোমার ঠিকই, কিন্তু সেই কথার ফাঁকেই ফেলে দাও—তুমি যে মন দিযে যা চাইছ, আমি আমার মনে যা চাইব তা পাব না কেন? তোমারটা যদি ঠিক হয় আমারটা ভুল হবে—এ মানব কেন?

অমরেশ—আর আমি যদি বলি—বিচার করে দেখে যেটা ঠিক হবে সেইটাই,

সে তোমারই হোক বা আমারই হোক। তুমি বিচার না করেই চাইছ বলে তোমার পাবার কোন আশা নেই। আমি বুঝে বিচার করে বাজিয়ে দেখছি বলেই আমারটা ঠিক হবে। যাক গীতিকা এ সব তর্কের শেষ কোনদিনই নেই। এখন সমস্যার সমাধান করাটাই আমাদের মধ্যে বাঞ্ছনীয়। তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালবাস তাহলে আমার মুখের দিকে চেয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করে যাও।

—আঃ কেন যে বাজে বাজে কথা বলছ। আমি যদি বলি আমার মন নেই, মন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর কি মন দিয়ে পড়া আয়ত্ব করব! শুধু আমার মনের উপরেই লক্ষ্য বা নির্ভর করছ। কিন্তু ছোট্ট একটা কথার জন্যই যে আমার মনটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝছ না। শুধু একটা ছোট হ্যাঁ।

অম—ঠিক এর পাশ দিয়ে আমিও বলি—এমনই কি বেয়াড়া মেয়ে তুমি যে আমাকে এরকম চঞ্চল বা পাগল করে তুলেছ। কোন কাজে স্থির ভাবে মন বসাতে দিচ্ছ না। একবার শুধু 'না'—এইটুকু ভিক্ষাও তুমি আমাকে দিতে পাচ্ছ না! আমি রীতিমত তোমার কাছে ভিক্ষা প্রার্থী। বার বার অতিথিকে না ফিরিয়ে এবার আমার ভিক্ষা ভাণ্ড ভরে দাও।

শোন অমরেশ শোন অমরেশ
বুঝেছি সকল আমি।
মন যে আমার পাগল করে
কেমনে বোঝাব তারে!
ভাসালে এ শোক সাগরে
কেন আমায় তুমি!
শোন অমরেশ শোন তুমি।
তোমার মোহিনী মুখ
সদা জাগে মনে
আহারে বিহারে তোমায়
দেখি শয়নে স্বপনে।
ও অমরেশ, ভাসালে আমায় তুমি।

গেঁথেছিনু বসে আমি নীরব রাতে
জান না কি তুমি ?
আমার ব্যথার মালা
অমরেশ অমরেশ—
শুকিয়ে পড়ছে ঝরে দেখেছ কি তা ?
ভেবেছিনু বারে বারে
গেঁথেছি মালা যাহার লাগি
আমি গোপনে একলা রাতে
দেব পরায়ে সবার মাঝারে।

অমরেশ, কেন সরে যাও
কাঁদায়ে এ মন আমার !
কেমনকরে বাঁধব শুনি ?
গড়েছিনু মন যাহার লাগি
সে যে আমায় দিল ফাঁকি।
তাই জ্বলেছে মনেতে অনল।
কেমনে বোঝাই তোমায়—
কেমনে করিব শীতল এখন !

শুনি তোমার সকল বাণী।
হও তুমি আদর্শের শ্রেষ্ঠ
ঈশ্বরের কাছে ;
মাগি বর তোমার আমি।
ও অমরেশ,
জান না চিন না তুমি
তুমি কোন্ জন।
চিনেছিনু তোমায় আমি।
তাই বেঁধেছি হিয়ার মাঝে।

কেমন করে ভুলব তোমায়।
বলো না বলো না
কভু যেন তুমি ভুলিতে আমাকে।
হও তুমি শ্রেষ্ঠ
আলো আলো সবার মাঝে
মনে রেখো একটুখানি
কেবল এই অভাগিনী গীতিকাকে।

গীতিকার মনের গান বুঝে অমরেশ স্তব্ধ বা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার এ বিদায় বিরহের কি উত্তর দেবে! তাই মনে মনে স্মরণ করল—হে ঈশ্বর, এ কি হল! একেই কি বলে তোমার কৌশল ফাঁদ! আমি সামান্য ক্ষুদ্র মানব আমাকে এখন তুমি পথ বলে দাও—আমি কোন্ পথ দিয়ে কি ভাবে যাব। জাল বিছিয়ে খাদ্য দিয়ে রাখলে! পাখী স্বভাবতই সেই খাবারের লোভে উড়ে যাবো তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে কি করে জানবে যে খাবার ঘিরে জাল পাতা? হঠাৎ কে যেন আমরেশের পিছনে বলে উঠল—তারই জন্য ত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চোখ কান, বুদ্ধি বিবেক সবই দেওয়া হয়েছে—দেখে বিচার করলেই পাবে। খাবারের লোভে ছুটে গেলে জালে জড়িয়ে যেতেই হবে। অমরেশ চমকে উঠে মনে মনে ভেবে নিল—হ্যাঁ ঠিক তাই ত। এখন বর্ত্তমান যা অবস্থা এসেছে তাতে গীতিকা থেকে আমার দূরে সরে থাকাই উচিত। শুধু আমাদের দুজনের দূর ভবিষ্যতের সম্পর্ককে বজায় রাখুক কাগজ, কলম, কালি। তাহলেই আমার মনে হয় ঠিক পথই পাওয়া যাবে।

মুহূর্তে অমরেশ জ্ঞান বিবেকের জোরে সমস্তকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল—না, এবার উঠি। গীতিকা অতি কষ্টে শোক সাগরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—এত শীঘ্রি?

—হ্যাঁ আমি না গেলে অজয় হয়ত অপেক্ষা করে বসে থাকবে। তখন অমরেশ দাঁড়িয়ে পড়েছে—তাহলে তোমাকে বলা রইল—বিয়েতে কিন্তু যাওয়া, চাই। সবের উপর বলে রাখি—ফাইনালের জন্য এবার তৈরি হও। সেই সঙ্গে আমি আমাকেও বলছি।

গীতিকা আর কথার উত্তর দিল না। মা সামনে এসে দাঁড়াল—কি বাবা উঠলে যে!

—হ্যাঁ মাসীমা, চলি এবার।

—তা গীতিকার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হল তোমার, কারণ ও পড়াশুনায় ত একেবারেই মন দিতে পারছে না।

—হ্যাঁ তাই ওকে বললাম। অমরেশ যে ভিতরে একটু চমকে উঠে নি তা নয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলে তা কি আর প্রকাশ করবে! সেইজন্য মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে বলে চলল—সামনেই ত আমাদের পরীক্ষা এগিয়ে এল। আমার না হয় অনেক কাজের ঝামেলা, ওর আর কি, ও তো মন দিয়ে পড়াশুনা করতে পারে।

মাসীমা—কি জানি বাবা, ওর যে কি হয়েছে! ওর মনের খবর তুমিই জান।

অমরেশ একটু চুপ করে গেল।

—প্রথম প্রথম তুমি যখন আসতে তখন ওর মনে কি হাসি কত খেলা। এ পাশটায় ও একেবারেই মন মরা হয়ে বসে থাকে। কি জানি কি যে দিনরাত ভাবে।

অমরেশ মাথাটা আধা নামানো ভাবে ঘাড়ে একটা হাত রেখে শুনছিল। একটু থেমে বলল—এটা কি যুক্তিসঙ্গত। সামনে যে সময় এগিয়ে আসছে সেদিকে না লক্ষ্য রেখে বৃথা চিন্তায় সময় খুয়ার করে কি হবে। তারপর ওর পড়ার গুরুত্ব ওর দায়িত্ব—ও বড় হয়েছে, ও নিশ্চয় বোঝে।

—ও তুমিই পারবে বাবা, তুমিই আসবে, তুমিই বোঝাবে ওকে। আমাকে ত পাত্তা দেয় না।

অমরেশ এখানেও চমকে উঠল। সে ত ঠিক করেছে, চিঠিপত্র ছাড়া কোন আলাদা ভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা আর তার দ্বারা সম্ভব হবে না। যাক সে এখন পরের কথা, বর্ত্তমানে এই ধাপ সামলে বেরিয়ে যাওয়াই হচ্ছে বড় কথা। তাই সে মাসীমাকে বলে উঠল—হ্যাঁ চেষ্টা করব।

মাসীমা—চেষ্টা করব মানে!

—না মানে আমার ত চারদিকে কাজ। এই দেখুন না সামনেই বোনের বিয়ে—মাতব না বললেই কি আর উপায় আছে, আস্তিন গুটিয়ে কাজে লাগতে হবে।

—তা না হয় হবে কিন্তু গীতিকাকেও ত লক্ষ্য করতে হবে।

—হ্যাঁ তা ত বটেই, তা ত বটেই, করবেই ত।

এত উৎসাহ কেন? এভাবে কথা বলবার উদ্দেশ্য? নিজেও যেমন ফাইনালে আগাচ্ছে, সেইভাবে সে গীতিকাকেও লক্ষ্য করবে। কিন্তু গীতিকার মায়ের মনে হয়ত অনেক কিছুই ছিল! বুদ্ধিমান অমরেশ সবদিক বুঝে লক্ষ্য করে এই কথা বলেছে। যাক তখনকারের মত অমরেশ বিদায় নিল। কে জানে এই বিদায় তার স্থায়ী বিচ্ছেদ আনবে না অস্থায়ী—সেই ভাবতে ভাবতে গীতিকা তার পিছনে পিছনে নীচে নেমে গিয়ে দাঁড়াল।

—তাহলে কখন যাচ্ছ?

—ইচ্ছা আছে ভোরের দিকে বেরব। বেশ ঐ কথা রইল—তুমি কিন্তু ঠিক যেও তাহলে।

গীতিকা আর তার কোন উত্তর না দিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। অমরেশ পা বাড়ল। গীতিকা তার যাওয়ার পথে চেয়ে কত চিন্তাই না করতে রইল।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ দুই ভাই এক সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে হাজির। মানিক যে এই ট্রেনেই যাবে তা আগে থেকে স্থির ছিল। অমরেশ গতকাল গোটা বিকাল ঘুরেও কাজ সারতে পারে নি। সন্ধ্যার পর যখন মেসে ফিরেছে তখন আর কোন ট্রেন ছিল না।

দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ বলল—দাদা তুমি! বাড়ী যাবে?

হ্যাঁ—মানিক খুব উদ্‌গ্রীব এগিয়ে এল—কি ব্যাপার বলত, তুই অনেক দিন আমার ওখানে যাস নি?

—হ্যাঁ কি করে আর যাব বল? এপাশে পড়ার চাপ আর সেই সঙ্গে দীপার বিয়েও ত এগিয়ে এল। সেইজন্য এই দেখছ না কতকগুলো জিনিস বাবা কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে তাই নিয়ে চলেছি। তোমাকেও ত বাবা চিঠি দিয়েছে। তুমি নিশ্চয় সেইজন্যই বাড়ী যাচ্ছ?

মানিক প্রথমটায় একটু দুঃখ ও আক্ষেপে চুপ করে গেল। তারপর

নিজেকে সামলে নিয়ে সহজভাবে জিনিসটাকে গ্রহণ করল। না বুঝে ভুল বোঝাটা অন্যায়। এমনও ত হতে পারে যে ওর এই সবগুলো কেনাকাটার সুবিধা আছে বলেই বাবা বলেছে। মানিক এবারে উত্তর দিল—হ্যাঁ বাবার চিঠি পেয়েই যাচ্ছি।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ল। বসার জায়গা একখানেই দুজনের হয়েছে। তাই পাঁচটা প্রশ্ন করবার সুবিধা সুযোগ হল মানিকের। দীপার বিয়ের এটা ওটা খবর ভাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছে।—ও ভাল কথা মনে পড়ে গেল—দেওয়া থোয়ার ব্যাপারে কত কি নিচ্ছে জানিস তুই ?

—সবটা ঠিক মত আমি জানি না, তবে যেটুকু শুনেছি তাদের নাকি দাবী দাবা নেই। শুধু ছেলের সখ একটা রেফ্রিজারেটার। তাই বাবা সেটা দর দাম করে জেনে যেতে বলেছে।

—তুই জানলি—কি রকম কি দাম বুঝলি ?

—তা হাজার দুই আড়াই ত বটেই।

—তা বাবা এ ঝুঁকি নিলেন কেন? কেন না, ওরা যতই বলুক কিছু চাই না, তাহলেও কি আর বাবা শুধু মেয়েকে বার করতে পারবে! নাই নাই করে হলেও এদিকেও আড়াই হাজার ধরে রাখ। তবে হ্যাঁ একটা কথা—বাবার মোট উদ্দেশ্য জানলে অবশ্য বলবার কিছু নেই।

অম—সে আমিও জানি না।

এদিকে রান্না ঘরে দীপা দুধ জাল দিতে যাবে হঠাৎ দুধটা হাত থেকে পড়ে গেল। মেয়ে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল। মণ্টু চেঁচিয়ে উঠল—হায় মা দিদি কতখানি দুধ ফেলে দিল। বলতে বলতে মাও এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। দুধটা ফেলায় মেয়েকে আর বকবে কি; মনে হল এ ত শুভ—হাত থেকে পড়েছে দুধ। নিশ্চয় ছেলেরা চিঠি পেয়ে আসছে। মানিক না হোক অন্তত খোকা ত বটেই। মানিককে সে কিছু কম ভালবাসে না। সেই তার প্রথম ফল। এমন একটা মাঝখানে খিচিমিচি হয়ে যাওয়াতে মানিকের উপর ভালবাসাটা যেন গোপন হয়ে গেছে। যাক জননীর অন্তরের আশা আর বাইরের ব্যাখ্যা এক হয়ে যেন ফলল। কার্ত্তিক গণেশ উভয়েই ঘরে এসে ঢুকল।

মণ্টু—ও মা মা, এই ছাখ তুমি যা বলেছিলে তাই হল।

মা রান্না ঘরের ভিতর থেকে মণ্টুকে বকে উঠল—কি আবার বলেছিলাম?

—এই ছাখ, তুমিই বলেছ তুমিই ভুলে যাচ্ছ! তুমি তখন দিদিকে বললে না—দুধ ফেলেছিস বকব! বকব আর কি, শুভও ত হতে পারে—তোর দাদারাও ত আসতে পারে। ঐ, ছাখ বড়দা মেজদা এক সঙ্গেই এসে গেছে।

শেষ কথাগুলোয় আর কান করবে কি, দীপা বেরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল—ও মা, সত্যিই দ্যখ দ্যখ। মা বেরিয়ে এসে ততক্ষণে দুয়ারে দাঁড়িয়েছে। ছেলে মেয়েরা সব একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। দেখে গর্বে তার বুক ভরে উঠল। ফলবতী জননী একবার তাদের প্রতি দৃষ্টি ফেলে ঈশ্বরকে স্মরণ করল—ঈশ্বর তোমাদিগে মঙ্গল করুন।

দুই ভাই আগিয়ে এসে মাকে জানাল সশ্রদ্ধ প্রণাম। আশীর্বাদ জানাল মা—থাক থাক বাবা, ভাল আছিস ত? ভাই বোনও দাদাদের প্রণাম করে পাশে দাঁড়াল।

সত্য সে ত আব আর গোপন থাকতে পারে না। ঝপ্ করেই শ্রীমতীর মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল—বৌমা কেমন আছে? মানিকের ভিতরে কোথায় যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। যেমন একদিকে সে ঠিক করেছে—তেমন আর একদিকে মাতৃভক্ত সন্তান সে। তার মনে কি কষ্ট বা ব্যথা লাগে না? মা তার পুত্রবধুকে এখনও চোখে দেখে নি। মানিক সন্তানের পিতা হতে চলল। তাই সে সামলে নিয়ে চাপা গলায় বলল—ঐ আছে আর কি। মানিক দীপার মাথায় হাতটা রেখে বলল—তারপরে তোর খবর কি বল?

মণ্টু—দাদা, ছোড়দির বিয়ে, জান?

—কি করে আর জানব বল। তুই কি আর আমাকে জানিয়েছিস?

—সেদিন ত বাবা তোমাকে চিঠি দিল, আমিই ত সে চিঠি পোষ্ট করলাম। আর জাননি মানে!

—তাহলে জানি।

এদিকে ফাঁকা ফাঁকা কথা বলছে। পোশাক পরিচ্ছদ সব খুলে হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সকলে।—দিদির বিয়ে ত জানলাম, আনন্দ করছ খুব, তারপর পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

অমরেশ মাঝখান থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল—সে আর বলতে হবে না—সে যা পড়ছে না!

মানিক—তাই বললে আর চলে কি করে!

মণ্টু—হ্যাঁ মেজদা তুমি জান, আমি কিরকম পড়াশুনায় আগিয়েছি।

অম—হলেই ভাল—ফলনেই পরিচয়।

মা এসে বলল—কিরে তোরা স্নান করবি ত? এরা কেউ কেমন আসবে জেনেই মা দুটো চাল বেশী নিয়েছিল।

দুভাই একসঙ্গে বলে উঠল—না, অনেক ভোরে এসেছি, মাথা ধুয়ে নেব।

—তাই ভাল, সে যা করবার করে খাওয়া দাওয়া সেরে নে—বেলা হয়ে গেছে।

মা যে ছেলেদের জন্য এক দু পদ বেশী রান্না করেনি তা নয়। ছেলেদের খেতে দিয়ে কাছে বসল। মানিক খেতে বসে জিজ্ঞেস করল—বিয়ের কি কেনা কাটা সব হয়ে গেছে?

শ্রীমতী—না না এখনই কোথায় সব হয়ে গেছে। এই ত সবে সুরু। তোর বাবা খোকাকে লিখেছিল তা খোকা নিশ্চয় কিছু কাজ গুছিয়ে এসেছে।

মানিক—তা তোমরা মোট কত হাজার টাকা খরচ করবে? কিছু বাবার কাছে শুনেছ?

শ্রীমতী—না সেরকম একটা কিছু শুনিনি তবে মোটামুটি তোর বাবার কাছ থেকে যা আঁচ পেয়েছি তাতে আট দশ হাজার টাকা ত বটেই। না হলে একটা কি আর প্রফেসর জামাই করা যায়।

মানিক কথাটা শুনে একবার শুধু ভেবে নিল সে তাহলে আজ কত টাকার পাত্র। কিন্তু কৈ বাবা মায়ের ত আর সে গৌরব আমি রাখতে পারি নি। বলতে গেলে বরং তাদিকে আমি ব্যথাই দিয়েছি। ব্যথা! ব্যথা আবার কি? মানিক যে মহত্তের পরিচয় দিয়েছে সে দিকটা কে দেখবে! সেদিক বিচার করলে? হয়ত বর্ত্তমান শিবশঙ্করের কিছু বলবার আছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা কি কেউ একবার করবে না বা একবার কেউ সব কিছুকে তলিয়ে ভাববে না যে পিতা শিবশঙ্করের মহত্তের পরিচয় সন্তান মানিক দিয়েছে। একটা অত বড় শিক্ষিত অফিসার হয়ে আমিত্ব ও অর্থ লালসা ত্যাগ করে একটি গরীবের দরিদ্রতা মিটাতে পারে! শুধু কি তাই, ঐ অসহায় রমনীটির মান ইজ্জৎ সব

কিছু বাঁচিয়ে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। এ সত্যের উত্তর কেউ যে দেবে না তা বলতে পারি না, তবে ঈশ্বর ত দেবেনই। তিনি সত্য মিথ্যার বিচারক হয়ে সব সময় নিখুঁৎ বিচার লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। তবেই মানিকের আর মন খারাপ বা চিন্তার কোন কারণ নেই। নিশ্চয় এখন তার সহ্যের পালা, তারপর এক সময় যিনি বিচারক তিনি বিচারে সত্য মিথ্যা সব বুঝিয়ে দেবেন। তবে এটকা কথা এখানে খুব ঠিক—মানুষের মন অতি ক্ষুদ্র, ঠুনকো। সেইজন্য সহ্য ও ধৈর্যের কাছে সে সব হারিয়ে ফেলে।

খেতে খেতে মা ছেলেদের এটা ওটা পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করছে, মাঝখানে দীপা এসে জিজ্ঞেস করল—দাদা, চাটনিটা কেমন হয়েছে বলদেখিনি? ওটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমি করেছি। একটা নূতন ধরণের রান্না করেছি।

মানিক—নারে চাটনিটা ভালই হয়েছে। বেশ হয়েছে খেতে।

দীপা—মেজদা, তুমি চুপ করে রইলে যে, তুমি কিছু বলছ না?

অমরেশ—আমি বললে কি আর দাদার মত বলব! নিখুঁৎ বিচার করে বলব। দাদা তোকে না হয় একটু বেশী ভালবাসে বলে বিচার না করে পক্ষপাতিত্ব করল।

শ্রীমতী—বেশ তাই না হয় বল—নিখুঁৎ বিচারই না হয় কর—কেমন করে ও শ্বশুর বাড়ীতে সকলকে খাওয়াবে।

দীপা সাময়িক দাদাদের কাছে একটু লজ্জা পেয়ে যেয়ে বলে উঠল—আঃ মা কি যে বলে!

—থাম বাবা, মা যা বলে তা ঠিকই বলে। তুই জানবি নারীর সার্থকতা পতিগৃহ গড়ে তোলা। বহু জায়গায় বহু রকমের ব্যাপারে লাগবে খটমট। প্রত্যেকের মত হয়ে প্রত্যেককে মানিয়ে নিয়ে নিজে স্বার্থত্যাগী হলে পরে তবেই যে প্রকৃত তার নারীরূপ ফুটে উঠে। কারণ তুমি জানবে দীপা, একবার সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়া হয়ে কাপড়ের আঁচলটা পড়লে তারপর থেকে তার আর কখনই বধুরূপ যায় না। শেষের দিকে হয়ত জোর করে গিন্নী আখ্যাটা টেনে আনা যায়।

দীপা—কেন, এখন ত তুমি গিন্নী তোমার ত বৌ হয়ে গেছে।

মানিক কথাটা শুনেই মনে করল—সত্যিই কি বৌ হয়েছে—সত্যিই কি

বৌ বলে মেনে নিয়েছে! যাক মেনে না নিলেও তার ছেলে যে বিয়ে করেছে এটা ত ঠিক কথা।

শ্রীমতী—ঐ ত বললাম—জোর করে টেনে। এখনও তুই চিন্তা করে দ্যাখ জোর করে কোন কথা বলা আমার চলে না।

অমরেশ এতক্ষণ নীরবেই ছিল। এবার সে মুখ খুলল।—হ্যাঁ তাহলে মা, ওর চাটনি তৈরির নিখুঁৎ বিচার করি—

—হ্যাঁ, তা করবি বই কি বাবা। ভাই যখন বোনের বিচার করে তখন তার অন্তরের স্নেহ আদর গোপন রেখে বিচার বা শাসন করে যায়। কারণ বোনের নিন্দে হলেই ত ভায়ের নিন্দে। কার বোন কার মেয়ে পাঁচটা প্রশ্ন অমনি উঠে পড়বে।

—তাহলে শোন দীপা বলছি—তোর চাটনিতে না একটু চাখো টক হয়েছে। লবণের পরিমাণটা মনে হয় আর একটু হলে ভাল হত আর, তোরা না রাঁধুনী না ঐ কি বলিস, সেটা না এত বেশী পড়ে গেছে যে টক মুখে দিলেই সেগুলো জিভে দাঁতে জড়িয়ে যাচ্ছে।

দীপা—মিষ্টিত সবাই সমান খায় না। কথাটা নেহাতই দীপা ওর বড়দাকে লক্ষ্য করে বলল। বড়দা ত কিছু বলে নি। বডদা জিনিসটা বুঝতে পেরে বলে উঠল—নারে দীপা, খোকা যা বলছে তাই ঠিক।

অমরেশ—বডদা কিছু বলল না—সেটা ত কোন কথা নয়। কথাটা হচ্ছে—বিচার করে সকলে যা বলবে সেইটিই ঠিক। এক দুজনের উপর নিভর করে না কিছু।

মানিক—তা ঠিক।

দীপা—তা হলে তুমিও বললে না কেন?

অমরেশ মানিকের উত্তরের আগেই কথা বলে বসল—দাদা তোকে ভালবাসে, তোর রান্নাটাই তার কাছে আনন্দের বলে সে অত ছোট দোষ আর ধরল না। তাই কি না জিজ্ঞেস কর।

শ্রীমতী—জিজ্ঞেসই আর করবি কেন! দেখলি না সেদিন তুই মাছের ঝোল রান্না করেছিলি একেবারেই নুন দিস নি, তোর বাবা ঝোল খেয়ে বলল ঝোলে নুন নেই। আমি তখন তোকে বকতে তোর বাবা কি বলে বসল মনে আছে—আঃ বকছ কেন, সবে নূতন রান্না শিখছে ছোট মেয়ে ত, শেখাও শেখাও।

আর তারই কদিন পরে আমার কফির ডালনায় একটু হলুদ কম হয়েছিল। কি বলেছিল তাতে মনে আছে কি? এটা যে কি রান্না করেছ মুখে দেওয়ার মতন নয়। সেইজন্ত অনেক কিছুর খুঁতই শ্বশুর বাড়ীতে ধবে!

খাওয়া দাওয়া সেরে কত কথার মধ্যে এদের মা ভাই বোনদের সময় কেটে যায়। শনিবার। তাই একটু সকাল করেই শিবশঙ্কর বাড়ী ফিরলো।—কি খবর তোমরা কখন এলে?

দু'ভায়ে প্রণাম করে দু'পাশে দাঁড়াল—আমরা এই দুপুরে এসে পৌছেছি।

—বস বস। বলে সে পোশাক পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে এসে ছেলেদের কাছে বসল। শ্রীমতী রান্না ঘরে গেছিল। এগিয়ে এল। দীপা খানিক বাদে বাপের চা নিয়ে হাজির হল।

শিব—তাহলে খোকা, তোমায় যে কাজগুলো করে আনতে বলেছিলাম, কি কি করে এলে বল?

—ঐ ত কাপড় জাতীয় কতকগুলো জিনিস কিনে এনেছি। মশলাপাতি যা যা লিখেছিলেন সবই পেয়েছি আর ফ্রিজটা হাজার দুই তিনের মধ্যে হবে।

শিবশঙ্কর মানিকের দিকে লক্ষ্য করে বলল—তুমি খোকার কাছ থেকে কিছু শুনলে নাকি?, ওদের দাবী দাবা কিছু নেই তবে ছেলের শখ হচ্ছে এই মেসিনে।

মানিক—ও আর বলছ কেন! এটা আজকালকারেরই ষ্টাইল এসেছে। বা এক ধরণের ভদ্রতাও বলতে পার।—আপনি আপনার ছেলেকে যা দেবেন দেবেন, আমার ছেলের শখ এইটা।

'শিব—হ্যাঁ তা ত বটেই।

মানিক—মেসিনেই যদি তোমার এত টাকা পড়ে যায় তাহলে এদিক দিয়ে—

শিব—তা এদিক দিয়ে তোমার হাজার পাঁচেক ধরে রাখ। খোকার দিকে লক্ষ্য করে বলল—এইটিই দিতে হবে তার কি মানে আছে। মাঝারি সাইজের একটা নিয়ে এলে তার একটু দর কম হত।

খোকা—হ্যাঁ তা হয়—হাজার দেড়েক টাকার মধ্যেও আছে।

মানিক—তা না করে তিন আর দেড়ের মাঝখানে ঐ দু'আড়াইয়ের মধ্যে দেওয়াই ভাল। কারণ এটা যখন ছেলেরই শখ—আর জিনিসটা স্থায়ী থাকবে।

শিব—হ্যাঁ অত টাকা এখুনি এখুনি জোগাড় করাও ত অসম্ভব।

মানিক—এ ত আর পাঁচ সাতটার বেলায় দেনা করতে হচ্ছে না, যা করতে হবে একটার বেলায়। আর তোমাকেই যে শোধ করতে হবে—তাই বা কেন!

মা কিন্তু পাশেই দাঁড়িয়ে, কথাগুলো সবই শুনছে।

মানিক—এখন আমি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করে এনেছি ওর বিয়ের জন্য, সেটা তুমি নাও। তারপর স্কুলটা একবার দাঁড়িয়ে গেলে খোকাও বেরলে আমাদের টাকার অভাব কি। একটা মাত্র বোনের বিয়ে কোন খেল জিনিস তাকে যেন নাই দেওয়া হয়।

বাপ মা উভয়েরই ভিতরে কোথায় যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ভাইবোনদেরও যেন কর্তব্যবান বড় দাদা বলে শ্রদ্ধা জাগল। আজকে এই জিনিসটা হওয়ার কারণ কি এই নয়—যে মানিক যা করেছিল বিবেকবান পিতা তা বিচার করে চুপ করে ছিল। যদি বাজে পিতৃত্ব দাবী নিয়ে অন্যায় বলে তাকে লাঞ্ছনা করত তাহলে কি আজ এই জিনিসগুলোর আশা থাকত? মা মেয়েছেলে তাই প্রথমটা একটু গাঁই গুঁই করেছিল তারপর জ্ঞানী স্বামী জ্ঞানের দ্বারাতে তাকে পাঁচটা কথা বুঝাতে চাইল তখন সে বুঝল।—আমাদের কর্তব্য ছেলে মেয়েদের মানুষ করা তাই করে চলেছি। আগে দেখ, জান; বুঝ তারপর ছেলেকে পাঁচটা কথা বলবে। যদি সব সময় ছেলেপিলের কাছে শুধু আমিত্ব অহংকার নিয়ে থাকা যায়, আর শ্রদ্ধা গুরুত্ব আশা করা যায় সেইখানেই বঞ্চিত হতে হয়—তাই নয় কি শ্রীমতী? এইরকম ধরণের কথাগুলো মায়ের মনে হল ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে।

মানিক—আচ্ছা বাবা, ঐ যে ফ্রিজটার কথা তুমি বলছ—ওটা কলকাতা—অতদূর থেকে টেনে নিয়ে এসে আবার এখান থেকে বইবে?

শি—তাহলে আর উপায় কি বল?

অম—কেন বাবা, ঐখানেই যদি ওটার ব্যবস্থা করা যেত?

মানিক—হ্যাঁ বাবা, সেই যুক্তিই ঠিক হবে। ঐ অতদূর থেকে বয়ে না এনে উচিত হবে ওখান থেকে তুলে ওদের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া।

শিব—তাহলে আমাকে ভদ্রলোককে একখানা চিঠি দিতে হয় আগে। কারণ ওর মতামত না নিয়ে এই জিনিসটা করা হয়ত শোভা পাবে না।

মানিক—তাহলে তাই কর, এখনই চিঠি লিখে দাও। উত্তরটা আসার আবার সময় লাগবে ত।

এদের এদিকের কথা পাঁচটা হয়ে যাওয়ার পর শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ তোমার চিঠি পেয়েছিলাম, বৌমায়ের শরীর এখন কেমন আছে?

—আছে মোটামুটি একরকম।

মা—হ্যাঁরে বৌমা অন্তঃসত্বা ত—তা ক'মাস হল এটা?

মানিক—কে জানে তা আমি বলতে পারব না।

শিব—হ্যাঁ তাহলে এই সঙ্গে গয়নার 'লিষ্টটা' করে ফেলা যাক। বল তোমরাই ত এসব বলতে পারবে—স্ত্রীকে লক্ষ্য করে সে বলল।

স্ত্রী—গয়না কিছু না দিলেও, একটা মেয়েকে সাজিয়ে বের করতে হবে ত তোমার। সেই সাজানো হিসাবে চুড়ি আটগাছি, গলায় দুখানা—

শি—দু'খানা আবার কি হবে!

স্ত্রী—কেন, বারমাসের একগাছি আর তোলা একগাছি। কানে একজোড়া, হাতে আংটি আর উপর হাতের ত আজকাল রেওয়াজ ভাল নেই।

মানিক—নেই আর বলো না, সোনার দাম অনেক বল। সোনার আবার নেই আছে কি!

অম—সোনার ব্যণ্ড দিয়ে রিষ্টওয়াচ্ একটা।

শিবশঙ্কর মোটামুটি হিসাব করে নিল ভরি চোদ্দ পড়ছে। তাহলে এপাশে চোদ্দ দু'গুণে আঠাশ—

স্ত্রী—আঠাশশ আবার কিসের?

—আরে তুমি ত শুধু সোনা দিতে পারছ না—বানী টানী ত আছে সব নিয়ে।

—তাও, গয়না গড়িয়ে দিলেও অত লাগবে না।

—আর ধরে নিলাম—অত লাগবে না।

অম—তা লাগবে না বলে তোমার যে অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে।

শি—আরে ধরই না। —ও নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন! দু'শ পাঁচশর তফাৎ বই ত নয়। তাহলে এদিকে দু'হাজার, আর বাসন পত্র, দান সামগ্রী, খাওয়ান দাওয়ান ইত্যাদি সব নিয়ে আরও দু'হাজার ধরে দাও। তাহলে এদিকে গেল—

অম—সব নিয়ে ছ'হাজার আটশ।

শিব—ঐ সাত হাজার ধরে নাও।

মানিক ভোরেই বেরিয়ে যাবে সেই কথাই ছিল। ঋতাও স্থির করেছিল আজ সে বাপের বাড়ী যাবে। তাই কয়েকটা কাজ গুছাচ্ছে এমন সময় মহেন্দ্র এসে পৌছল।

—এই যে মহেন্দ্র যে।

—হ্যাঁ আমি, অনেক দিন আসি নি বাবুর সঙ্গে দু'পাঁচটা কথা বলব তাই এলাম।

—তোমার বাবু ত নেই। আজকের ভোরেই তিনি বেরিয়ে গেছেন।

—কোথায় ?

—বাবুর বোনের যে বিয়ে, মহেন্দ্র।

—ও বেশ বেশ, তা কবে ?

—আর বেশী দিন নেই। এই অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে। তা তারিখটা আমি ঠিক জানি না !

—তাহলে আমি আজকে চলি, দেখা ত আর হল না।

—না, কি কথা তুমি বলনা আমাকে একটু আধটু, আমি কি শুনতে পারবনা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা পারবেন না কেন, আমাদেরই ত স্কুলের কথা।

—না থাক তোমার বাবুই আসুক, একসঙ্গে বসে তিনজনে কথা হবে। আর আমারও এদিকে দেরি হয়ে যাবে।

—আপনি—

—হ্যাঁ এই যে ভাই এসছিল ; তা এই সময় তোমার বাবু নেই যাই বাপের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি।

মহেন্দ্র—না তাহলে উঠি, আপনার আর শুভ যাত্রায় দেরি করব না।

ঋতা—তার মানে ?

—না যতই হোক আজ পিত্রালয়ে বেরোচ্ছেন ত।

ঋতা যেয়ে পৌছেছে। তখনও ভাই বোনরা স্কুল যায় নি। তবে তৈরি

হচ্ছিল। এর যাওয়ার অপেক্ষায় সকলেই ছিল। মেজ বোন নন্দিতার মন ছুক ছুক করছিল। তাই সে বার বার এসে বাইরে দাঁড়াচ্ছিল। দু'চার বার ঘুবার পর এবাব ভগবান যেন তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন—দিদিকে দূর থেকে লক্ষ্য করে সে চেঁচিয়ে উঠল—ওমা, দিদি এসেছে। পর পর ঋতার বাটখাড়ার থাক ভাইবোনগুলি ছুটে এল। যেন ঋতার ঘর ঢুকার অপেক্ষা তাদের আর সইছে না। দিদি দিদি করে সকলেই ব্যস্ত। মা ঘর থেকে দু'এক পা এগিয়ে এসে বলে উঠল—আরে থাম মেয়েটাকে ঘর ঢুকতে দে, কি করিস তোরা ? মেজ বোনের সবুর সইছে না তাই সে যেন ব্যস্ত হয়ে দিদিকে জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ দিদি তোর নাকি ননদের বিয়ে ?

ঋ—হ্যাঁরে।

মা—নন্দিতা, কি করছিস কি, এমনিতেই ওব শরীর ভাল নয়, আসুক মেয়েটা, হাত মুখ ধুতে দে, তারপরে সব খবর শুনবি এখন।

ঋ—না মা আমার শরীর কিছু খারাপ নয়। আমি এখন বেশ ভালই আছি।

নিখিলবাবু কোথায় যেন একটু বাইরের দিকে গেছিল, আসতেই স্ত্রী বলছে—ওগো শুনছ, ঋতা এসেছে।

—তাই না কি! ও বেটী ত আমাদের ভুলেই গেছে। আর বুড়ো বাপ মাকে মনে রেখে কি হবে!

মেয়ে গদ গদ গলায় বলে উঠল কেন বাবা তুমি আমাকে ভুলে যেতে কি দেখলে ?বলেই এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করল।

—তা বেশ, আশীর্ব্বাদ করে বাবা বলল—ও বাড়ীর সব খবর ভালত ?

—হ্যাঁ।

—শুনলাম জামাই নাকি বোনের বিয়ের জন্য বাড়ী গেছে ? হ্যাঁগো ঋতাকে কিছু দিয়েছ ?

মা—হ্যাঁ এই যে দেব। আয় রে ঋতা এদিকে। দ্যাখ ত অনিলেশকে কখন পাঠিয়েছি এখনও আসছে নি—কথাটা ফাঁকা ছুড়ে দিল। খানিক বাদেই অনিলেশ এসে হাজির।

দিদি ভাইবোনদের নিয়ে জলখাবারে বসেছে। মা-ও কাছে আছে।

দিদি—কি রে তোরা স্কুল গেলি না ?

সকলেই চোখ মুখের ভাবে যা জানাতে চাইল তা মা ভাষায় প্রকাশ করল —হ্যাঁ আজ আর যায়! এক ত তুই এসেছিস তায় আবার শনিবার।

দিদি—কেন, আজকে ত হাফ, কালকে রবিবার—আমি ত থাকছিই।

মা—যাক গে বাবা, আজ না যায় না যাক, তোকে নিয়ে একটু আনন্দ করুক।

ভাই বোন এদিক ওদিক হয়েছে, এরই ফাঁকে মা মেয়েকে জিজ্ঞেস করে নিল —কিরে এখন আরুচ টারুচগুলো একেবারেই কেটে গেছে?

মেয়ে অলজ্জা লজ্জার মাঝখানে বলল—হ্যাঁ।

—তা পেটে নড়া টড়া কিছু বুঝতে পারিস?

—কে জানে বাপু, আমি বুঝতে পারি না।

—সে কি মেয়ে রে, ছ'য়ে পড়তে গেল এখনও বুঝিস না,—একটু বুঝবি ত।

বাপ এগিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে আর পাঁচটা কথা—প্রণবেশের চাকরি, টাকা পয়সা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাপ করল। এবং সেই সঙ্গে আরও বলল—এখন দেখছি তোর মামারও একটু ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। তোর বিয়ের পর থেকে আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি—ও যেন এদিকে একটু টানতে চায়।

ঝ—তা ত হওয়া উচিতই—মামা দেখল যে আমি তোমাদের সংসারে যা রোজগার করে দিচ্ছিলাম তা বন্ধ হয়ে গেল।

—হ্যাঁ তাই দেখছি, প্রনবেশের কাজের কথা, তারপর নন্দিতার জন্যও একটা সম্বন্ধ দিয়েছিল।

যাক তোমাদের দিকটা যদি এরকম হয় তবে আমিও নিশ্চিন্ত হই! কারণ, আমার এখন কি অবস্থা চলছে দেখছ ত স্কুলের ব্যাপারে।

বাবা—হ্যাঁ মা তুমি তোমার সংসার নিয়ে সুখী হও আমি তাই চাই। আর আমার এই ছেলে দু'একটা বেরিয়ে পড়লে যাই হোক করে সংসারটা চলে যাবে।

শিবশঙ্কর এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল—বিয়ের দিন ত আর বেশী দেরি নেই। তাহলে মানিককে কি কিছু বলে টলে দিলে নাকি?

—হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছিলাম—তোমাকে জিজ্ঞেস করব। কারণ

একটাই ত মাত্র মেয়ের বিয়ে, বৌ ছেলেকে বাদ দিয়ে কি আর কাজ করা চলে ? ছেলেকে ডাকবে বৌকে বাদ দেবে—তা কি করে হয় ? আর তার উপর আর কদিন পরেই ত আমাদের বংশ পরিচয় দেবার লোক আসছে।

—হঁ্যা তাহলে তুমি গুছিয়ে বলে দেবে যা বলতে হয়।

—গুছানো গুছিনির কি আর! এমনিই বলে দেব—বিয়ের কদিন আগে তুই তাহলে বৌমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছিস।

—সে যা হয় বোলো।

মানিক তার হাজার খানেক টাকা যা সে সঙ্গে করে এনেছিল তা সে বাবার হাতে তুলে দিল। এবং সেই সঙ্গে বলে উঠল—এ দেওয়াটা আমার পক্ষে কিঞ্চিৎই হল বাবা। কারণ আমি বড় ছেলে হয়ে বোনের বিয়েতে এত কম দেওয়া চলে না। তুমিত সবই জান—স্কুলের জন্য, আর তোমার বৌমা-ও ত এখন চাকরি বাকরি করে না।

শি—হুঁ। তার হুঁ এর ধারাতে বোঝা গেল যে, সে তার এ দেওয়াটাও পছন্দ করে না।

রাতের ট্রেনেই রওনা দেবে। দু'ভাইই এক সঙ্গে বেরবে। মা বুঝিয়ে যাকে যা বলবার বলে দিল। হঠাৎ অজয়ের কথা মনে হতে বলল—ভাল কথা তোর বাবার মুখে শুনছিলাম, অজয় বলে যে ছেলেটি তোর কাছে আছে তাকে যেন আনতে ভুলিস না।

—ও বাবার মুখ থেকে তুমি সব শুনেছ ?

মানিক—অজয়টি কে ?

অজয়টি আমাদের এক ভাই। বলেই অমরেশ বলল—মা তুমি ত মোটামুটি বাবার কাছে সব শুনেছ, দাদা চল তোমাকে ট্রেনে যেতে যেতে বলা যাবে।

ওদের বেরোবার মুখে শিবশঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছে—তাহলে তোমার মায়ের কাছে বৌমাকে আনার কথা সব শুনলে ?

মানিক—হঁ্যা।

—তাহলে তোমরা ঠিক ঠিক সময়ে সকলে চলে এস। আর কেউ দেরি করো না। আর ওদের ওখান থেকে চিঠিটার উত্তর এলে যদি আমাকে মেসিনটা দেখতে যাওয়ার দরকার হয়, তাহলে আমি ত একবার যাচ্ছি।

মানিক—তাহলে বাবা তুমি এবার আমার ওখানেই উঠবে ত।

—না একে সঙ্গে করেই যেতে হবে ত! তুমি তো অফিসে অফিসে থাকবে!

—না আমি তাহলে বলছিলাম তুমিই সঙ্গে তোমার বৌমাকে নিয়ে আসতে। আমি অফিসে দু'একদিন কামাইটাও করতাম না। আগে খোকা এসে পৌঁছে যাক। তারপর বিয়ের পর দরকার হলে আমি না হয় দু'একদিন কাটাব।

শিবশঙ্কর একটুখানি মাথাটা চুলকে নিয়ে—তুমি আবার আমার উপর এই দায়িত্ব চাপাচ্ছ!

—না তোমার যদি খুব অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্য আমা'কই আসতে হবে।

অফিসার বাপ অফিসের সব কিছু জানে বলেই আর কথা না বাড়িযে বলল —বেশ তাহলে তাই না হয হবে।

গাড়ী ছাড়তে মানিক ভাইকে জিজ্ঞেস করল তাবপর খোকা, অজযেব সম্বন্ধে কি বলবি বলছিলি?

—না, ওর কথা এমন কিছু নয আবাব নযই বা বলব কেন। বলেই আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে অমরেশ বলে চলে। মানিক স্তম্ভিত হযে শুনতে রইল। শেষে সে শুধু একটা কথাই বলল—তাহলে কি টাকা দিযেছে না ঐ দেব বলেই লাঙ্গ করেছে?

—হ্যাঁ এই ত সেদিনে কথা হযেছে, টাকা পাঠানোব সময হযনি এখনও।

—দ্যাখ ফলনেই পরিচয।

—না এইবার যদি গিয়ে দেখি টাকা দু'এক দিনের মধ্যে এল না তাহলে না হয একটা কথা আছে। তারপর দু'চার দিন আগে পিছে নিযে মানুষেব উপর একটা বিচার জারি করে দেওয়া ত ঠিক নয কারণ এমনিতেই ভদ্রলোক বলেছেন —তার ঐ রোজগারের উপরে তাকে বেশ বুঝে চলতে হব।

মানিক—হ্যাঁ কথাগুলো সবই ঠিক। তবে ওরকম বাপকে বিশ্বাস করাই কঠিন। কারণ ওসব বাপ সবই করতে পারে। যতই হোক ছেলে ত তাব— এমন কি অন্যায় দেখেছিল যে তার পরিণত বয়সের আগেই লাঞ্ছনা? অবশ্য হ্যাঁ পরিণত বযস হলে একটা বলবার ছিল। এখানে কি ঠিক পিতৃ কর্তব্য

বা পিতৃ পরিচয় দিয়েছে? তাই বলে অবশ্য অজয়ের কাছে এসব কথা আলোচনার কোন মানে হয় না। অজয়ের দিক থেকে উচিত হবে সুশিক্ষা লাভ করে পিতার প্রতি প্রকৃত কর্তব্য করে যাওয়া।

অমরেশ –হ্যাঁ তা ত বটেই। কর্তব্যের আগে মানুষ হওয়াটাই দরকার। প্রকৃত মানুষ যদি কেউ হয় তবে তার বিচার বুদ্ধির উপরে আর কাউকে হাত দিতে হয় না।

মানিক—তবে হ্যাঁ আমাদের কাছে যখন ও এসে আমাদের ভাই বলে পড়েছে তখন আমাদেরও ঠিকই ওকে ভ্রাতৃ পরিচয় দিতে হবে। যাক মন্দ কি আমরা তিন ভাই ছিলাম হলাম চার ভাই।

—হ্যাঁ ছেলেটা এদিক দিয়ে খুবই ভাল—দাদা বলতে অজ্ঞান। শুধু তাই নয় হোষ্টেলে আমাদের যে দুটো পয়সা খরচ হবে সেটাও ও চাইল না। মেসে ব্যবস্থা করল। নিজের হাতে রান্না চলছে এখন আমাদের। এতে বুঝা গেল যে ছেলেটার অন্তর বা গতব দুই আছে।

—অথ তুমিই সেটা ভাল বুঝবে।

সারা রাস্তা আর কত কথা হয়। ঘুম এসেছে এর মাঝে। একটু করে ঝিমিয়ে নেয় এরা। একটার পর একটা ষ্টেশন পেরিয়ে গেছে। খড়্গপুর এসে ট্রেন পাল্টে রওনা হল হাওড়ার পথে। ভোরে এসে পৌঁছে গেল তারা। যে যার গন্তব্যস্থলে বিছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যাবে। মানিক জিজ্ঞেস করল – তুই তাহলে আমার ওখানে কবে যাচ্ছিস?

—না তোমার ওখানে আর যাব কেন? বাবা এলে ঐটা যদি দেখার দরকার হয় তাহলে তোমাকে জানাব।

মানিক 'আচ্ছা' বলে ছোট উত্তর দিয়ে ঘুরেছে, অমরেশও পা বাড়িয়েছে, এমন সময় সামনে অজয়।

—কি রে তুই?

—এই যে দাদা—মানিককে থামিয়ে দেয় অমরেশ— এরই কথা বলছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অজয় বুঝে নিল বড়দা বলে। প্রণাম করল। মানিক মনে মনে আশীর্ব্বাদ করল—থাক থাক। তোমারই নাম অজয়?

—হ্যাঁ বড়দা।

সোমবার সকালে মানিক পৌঁছবে ঋতা জানত। সেইজন্ম ঋতাও বাড়ীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেন সে স্বামীর আগেই পৌঁছতে পারে। কিন্তু যতই হোক মেয়েছেলে বাড়ী থেকে 'বেরোনো, তারপরে মা বাপের কাছ থেকে আসা। কিন্তু যতই তাড়াতাড়ি করুক দেরি হয়ে গেল। মানিক আগেই এসে এখানে পৌঁছে গেছে। প্রথমটা একটু চমকে গেল—তাইত ঋতার আগেই এসে পৌঁছানোর কথা ছিল, কেন এখনও আসে নি। শরীরটা ত বিশেষ ভাল ছিল না তাই সেই চিন্তাটাই মানিকের মনে হল—কি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল না ত! ঘর খুলে যখন ঘর ঢুকে অল্প সময়েই ঋতার না থাকাটা মানিককে বেশ বুঝিয়ে তুলল। যতদিন আজ সে ঋতাকে বিয়ে করেছে ততদিন তার একা থাকার হাহাকার বা শূন্যতা ঋতা যেন ভুলিয়েই দিয়েছিল। শুধু তাই নয় এই দুদিন পরে মানিক এসেছে ঋতা থাকলে তার আহ্বানটাই অন্যরকম হত। আজ কৈ তা ত আর হল না। বাপরে, ঋতার না থাকা সে চিন্তা করতে পারে না। সত্যিই সে একটি আদর্শ মেয়ে। যাক পাঁচ সাত কথা এইরকম চিন্তা করতে করতে ঋতা এসে দরজায় টোকা দিল।

প্রথমে দরজায় চাবি না দেখেই ত ঋতার বুক অর্দ্ধেক হয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মা বোনের উপরে আদিখ্যেতার জন্য একটা রাগ হল। এরকম দেরিটা আমাকে কি না করলেই চলত না! পুরুষ বেটাছেলে বাইরে গেছিল, আজকে সে আমি না থাকায় ঘরে ঢুকাতে কতই না অসুবিধা হল! ভাই বোন না হলে ছোট, মায়ের ত বুঝা উচিত ছিল! এরা সব কখনও কোনকালেও বুঝবে না।

যাই হোক এদিকে মানিকেরও ধড়ে প্রাণ এল। তাহলে ঋতা সুস্থই, দেরি করেছে। তবুও সে না জিজ্ঞেস করে পারল না—কি ব্যাপার দেরি কেন?

পিছনেই প্রণবেশ দাঁড়িয়েছিল। জানি না, ঐ ওকেই জিজ্ঞেস কর। —ঝাঁকার দিয়ে উঠল ঋতা।

ভাই তখন বেচারা হয়ে গেছে—

মানিক—না ওকে জিজ্ঞেস করব কেন, তুমিই বল না।

—দুখ না—যত সব। বেরচ্ছি বেরচ্ছি করে আমার দেরি করে দিল—এই এরাই ত সব।

তা ত হবেই, অনেক দিন পরে দিদি গেছে, তারপর ছিল না আবার জামাইবাবু—প্রণবেশের দিকে মুখটা তুলে বলল মানিক।

ঋ—তুমি বোধ হয় এখনও চা টা কিছু খাও নি—কথা বলতে বলতেই সে পোশাক পাল্‌টে চায়ের জল বসাতে গেল।

মানিক—থাক থাক ব্যস্ত হয়ো না, আমি ষ্টেশনে চা খেয়ে এসেছি।

—না না ব্যস্ত আমাকে হতেই হবে, এখনই অফিসের ভাত দিতে হবে না! ষ্টোভে চা টা বসিয়ে দিই, চা বিস্কুট খেয়ে তুমি তোমার ওদিকে তৈরি হও; আমি এদিকে সেদ্ধ ভাত ক'রে দিচ্ছি। ঋতা ভাইয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে—যা প্রণব, তুই এবার ঘর চলে যা, মাকে বলবি আমি ভালভাবেই পৌছেছি, আর সেই সঙ্গে বলে দিবি আমার দেরি করে দিয়ে আমার কি সর্বনাশটাই না করেছে—দেখেই তো যাচ্ছিস।

মানিক—আঃ চা যখন চড়াবেই তখন আর চা-টা না খাইয়েই ওকে পাঠাচ্ছ কেন!

—ওর আরো দেরি হয়ে যাবে না? আর এই ত চা খেয়ে বেরিয়েছে, কত আর চা খাবে! ছেলেমানুষ।

—তা ভাই এল একবারেই শুধু মুখে পাঠিয়ে দেবে। আমি ষ্টেশনে নেমে একটা কেক কিনেছিলাম, খানিকটা কেটে ওকে দাও না।

অগত্যা ঋতা স্বামী আদেশ পালনে রান্না ঘরের দিকে গেল।

মানিক ব্যস্ত। অফিস যাবে। তাই কোন কথা বলার সময় নেই। ঋতারও একই অবস্থা খাইয়ে খেয়ে তাকেও স্কুল ছুটতে হবে।

এদিকে দু'ভাই চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। অজয় জিজ্ঞেস করল—কি দাদা, দিদির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—দাদা জান, কালকে দিদি এসেছিল, তুমি এসছ কি না খোঁজ নিতে।

অমরেশ একটু চমকে উঠল। কিন্তু সে চমকালেও ভচ্‌কচিয়ে যাবার ছেলে নয়। তাই সে নির্ভিক কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করল—তারপরে—তুই কি বললি?

—না আমি বললাম, দাদার ত আজকে আসার কথা নয়, কালকে আসবে। তখন টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে একখান চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে বলল—এটা তোমার দাদাকে দিয়ে দিও।

অমরেশ সহজ সরল ছেলে। তাই বলল—চিঠিটা পড়লি—কি লিখেছে?

—কেন, আমি পড়ব কেন ও চিঠি—তোমাকে দিতে বলেছে।

তা তুই কি বোকা ছেলে রে—চিঠিটায় একবারও চোখ বুলালি না? —এবার অমরেশ নিতান্তই অজয়কে পরীক্ষা করছে।

অজয় সেই প্রকৃতির ছেলে না হলে কি অমরেশের সঙ্গে মিলত! সে পরিষ্কার গলায় জবাব দিল—দাদা, এটা ন্যায় না অন্যায়? দি'দি চিঠিটা লিখে সাদা খামের মধ্যে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে আমার হাতে দিয়ে গেছে। যা বলছ তা করলে কি বিশ্বাসের উপর ঘা দেওয়া হয় না আমার? মিছে কৌতূহল নয়? ও ত অনেক দূরের কথা, যদি খোলা পোষ্টকার্ডও হত তাহলেও চোখ বুলানো আমি অন্যায় মনে করি। এবার দাদা বলত—আমার এগুলো ভাবা ভুল কি ঠিক?

অমরেশ পিঠে হাত চাপড়িয়ে বলল—নারে, এ আবার ভুল কি—এইটিই ত হওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ খোলা পোষ্টকার্ড যদি হয় তাহলে জানতে হবে কোন গোপন নেই, তাতে চোখ বুলানোয় এমন কি অপরাধ! ওটাকে অন্যায় বলা চলে না।

অজয়—ও দাদা একটা কথা মনে পড়ে গেল। তুমি যেদিন চলে গেলে না সেদিন মনি অর্ডার এসছিল তোমার নামে।

অমরেশ কথাটা ভুলেই গেছিল—কার মনি অর্ডার বলদেখিনি? কে মনি অর্ডার করল?

অজয়—আমার মনে হয়—পিতৃদেব ছাড়া আর কে? তোমায় বলে গেছিল না, তাই মনে হয় টাকা পাঠিয়েছেন।

—তা কত টাকা তুই পোষ্টম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিলি—জানলি না কেন?

—না আমি আর জিজ্ঞেস করিনি।

—তুই দেখছি রাম বোকা, দাদা ছাড়া আর চিন্তা করতে পারিস না।

—বাঃ, আমার কি জানবার দরকার, তুমি ত আসছই তুমি জানবে।

দেখতে দেখতে অফিসের ভীড় সুরু হয়ে গেছে। বাসে তিল ধারণের জায়গা নেই। ওরা কিন্তু বসার জায়গা পেয়েছিল। মাঝপথে একটি মেয়ে তার কোলে একটি ছেলে নিয়ে খুব চেষ্টা করছে উঠার জন্য। কিন্তু উঠবে কি—ভিড় বলে ভিড়! কেউ ত সাহায্য করছে না। উপরন্তু যে যার নিজেকে

সামলাতে ব্যস্ত। আর এ অবস্থায় কিই বা করা যায়! কিন্তু মেয়েটি অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করছে—তার এই বাসে যেতেই হবে—নিশ্চয় জরুরী প্রয়োজন। তা বললে কি চলে! কে তার কথা শোনে! কেউ কান করল না। মেয়েটারও প্রাণপাত চেষ্টা প্রথম থেকে অমরেশ লক্ষ্য করে আসছে। এক পা এগিয়ে উপরে উঠতে যাবে হঠাৎ একজন এমন ধাক্কা দিল যে ছেলেটা তার কোল থেকে পড়ে গেল। কোন রকম হাত ধরা। বাসশুদ্ধ সকলে হৈ হৈ করে উঠেছে। অমরেশ কিন্তু ততক্ষণে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসছে। কিন্তু রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। ছেলেটাকে তার মা তুলে নিতে সকলেই তার মাকে এক-ভাবে কোনঠাসা করছে। মা যতই হোক মেয়েছেলে তার উপরে দেখে মনে হচ্ছে অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ নয় সে। নিজের আঁচল দিয়ে ছেলের মাথার রক্ত চেপে আঁউ মঁাউ করছে। অমরেশ ত প্রত্যক্ষদর্শী। যে মহাপুরুষের ধাক্কায় ছেলেটা ছিটকে পড়েছিলো তারই গলার জোর বেশী শোনা যাচ্ছে। অমরেশ একেবারে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বলল—কি ব্যাপার বলুন ত, আপনি থাকেন কোথায়?

অমরেশের স্বর বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠল—যেখানেই থাকি না কেন তা আপনার জমা খরচের অত দরকার কি?

আমার জমা খরচের হিসাব নেওয়ার সময় হয়েছে বলেই ত নেমে এসেছি। এতক্ষণ ত আপনাকে ঘাঁটাই নি।

রুখে উঠল ভদ্রলোক—আর আপনাকেও হিসাব বুঝাবার জন্যও আমি দাঁড়িয়ে নেই।

বাসের অন্যান্য যাত্রীরা শ্রোতা। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। এদিকে বাস দাঁড়িয়ে রাখা চলে না। কণ্ডাক্টার তাড়া দিচ্ছে—উঠুন উঠুন। ড্রাইভারও বাস ছাড়বার উপক্রম করছে। এমন সময় অমরেশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল—থামুন। বাস ছাড়বে কি! এটার কিছু একটা ব্যবস্থা না হয়েই বাস ছেড়ে দেবে! দেখতে পাচ্ছেন না কি রকম রক্ত বেরোচ্ছে।

কণ্ডাক্টার—তার জন্য আমরা কি করতে পারি বলুন? আমাদের ত অফিস টাইম!

বহু প্যাসেঞ্জারই সুরে সুর মিলিয়ে বলল—আমাদের যে অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—তা যদি মনে করেন অন্য বাস ধরে বেরিয়ে যান। তাহলে এটার

একটা ত ব্যবস্থা করা উচিত—কি বলতে চান আপনারাই বলুন। এই দুধের শিশু মাথা দিয়ে এত রক্ত যাচ্ছে—ছেলেটি এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখুন নেতিয়ে পড়েছে।

কয়েকটি সন্তানের পিতা ছিল। তাদের অবশ্য মনে জিনিসটা ছুঁল। ছেলের মা ত ভয়ে কান্নার স্বর বাড়িয়ে তুলেছে—ওগো আমার কি হবে গো। ও বাবা তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা কর। আমার ছেলে বোধ হয় বাঁচবে না।

অমরেশ ঘুরে ছোট করে বলল—'হ্যা চেষ্টা করছি ত।' অজয় ভীড়ের মধ্যে বসে হাঁ। সে যেন তাল গোল পাকিয়ে গেছে।

অমরেশ—নেন নেন আপনার ঠিকানা জানতে চাইনি, চলুন হাসপাতাল আপনার ছেলেকে নিয়ে।

—বাঃ, আপনি ত বেশ মজার লোক আমি হাসপাতাল যাব কেন?

—তবে কি লালবাজার যাবেন নাকি?

অমরেশের গলা শুনে সমীর বুঝতে পেরে ঘুরে দেখে। কি ব্যাপার এখানে একটা কিছু ঘটেছে? উত্তেজিত বন্ধুকে চিনতে পেরে সে এগিয়ে এল। ব্যাপারটা দু'এক কথায় জেনে অমরেশের সঙ্গে যোগ দিল। গাড়ীর কয়েকজন যাত্রীও অমরেশের দিক নিল। কিছুজন দর্শক হল। এবার ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠল—আচ্ছা মজার লোক ত আপনি। আপনাকে হাসপাতালের কথা বলা হচ্ছে, আপনি পেছু পা হচ্ছেন কেন? নেমে যান গাড়ী থেকে।

ঘটনাটি ছোট করে অল্প কথায় বলা হল। সত্যের জয় এইভাবেই হয়। যখন কেউ সত্য পালনের মন নিয়ে অগ্রসর হয় তখন দেখা যায় প্রত্যেকেই তাকে কোণঠেসা—এক ঘরে করে ফেলেছে। একদিক থেকে বলতে পার ঈশ্বরের এ ছলনা বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু আরও গভীরে জ্ঞানত চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারা যায়—সত্য সবাই ভালবাসে কিন্তু তাদের নিজের সম্পদ খুয়ার করেছে বলেই আড়াল করে সরে দাঁড়াতে চায়। কে এত ঝামেলা নেয়। কিন্তু যিনি পালনের মন নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তিনি কারও সাহায্য আশা না করে জলন্ত ও চলন্ত মুখে অগ্রসর হয়েছে। তার ভাবার মত সময় নেই। এখানে সেইরকম জিনিসটা হল কি না—চিন্তা কর দেখিনি? প্রথম অপরাধী তার গলাবাজীতে কি রকম সরে দাঁড়িয়েছিল। অন্যায় কার সে সকলেই জানত। তারপর একা এই অমরেশই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দাঁড়াল।

তখনও সকলের স্বীর ভাব—কেউ তার পক্ষে নেই। কিন্তু এ ত আর পিছনে চাইবার ছেলে নয়! তারপর ধীরে ধীরে দেখা গেল এক এক করে তার দিকই সবাই নিল।

ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে চুপ করে গেছে। সকলে একমত বুঝে সুট্ সুট্ বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। বাস ছেড়ে গেছে। এবার তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে মা ছেলেকে নিয়ে উঠলো। সঙ্গে অমরেশ। সমীরও ছিল। অজয়ও ছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসা করবার যা খরচ খরচা দেওয়া করাল অমরেশ। মেয়েটির পরিচয় জানা গেল—খুব কষ্টের মধ্যে দিন চলে। ডাক্তার ছেলেটিকে দেখে বেরিয়ে এসে বলল—এর বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে মাথায়। যেভাবে রক্ত পাত হয়েছে তাতে পরে ছেলেটি ঠিক মত স্মরণ শক্তি পায় কি না সন্দেহ আছে।

তাহলে কি করতে হবে—অমরেশ

ডাক্তার—না বয়স ত অল্প সেইজন্য এর খাদ্য দ্রব্যের দিকে একটু নজর নিলে মনে হয় মেক্ আপ হয়ে যাবে। কারণ ছেলেটি বেশ সুস্থ সবল নয়।

অমরেশ পূর্ব্বেই বুঝেছিল অভাবের সংসার তারই কারণ এটা। সে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল—যাক তাহলে আপনি লিখে দেন কি কি খাওয়াতে হবে ওকে।

—ছেলেটি আপনার কে হয়?—অমরেশের আগ্রহ তাকে অবাক করেছে।

—এই মনে করুন না মা ভাই।

সমীর—হ্যাঁ ডাক্তার বাবু জগৎ জোড়াই ওর মা ভাই।

ডাক্তার—কি ব্যাপার বলুন ত আপনাদের!

সমীর বন্ধুর সম্বন্ধে ডাক্তারকে অনেক কিছুই জানাল। ডাক্তারের অমরেশের প্রতি আগ্রহ দ্বিগুণ হল।—যাক আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ভাল করে ওকে লক্ষ্য নেব। আপনি এইগুলো আপাততঃ আনবেন, আর বাড়ী ফিরে গেলে এই গুলো এই গুলো খাওয়াবেন।—বলে সুপথ্যের একটা ফিরিস্তি দিলেন।

অমরেশ এবার ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে বলল—তাহলে মশাই আপনি এগুলোর ব্যবস্থা করুন।

—আমি পথে বেরিয়েছি এত টাকা কোথায় পাব।

—তাহলে আপনার ঠিকানা দেন আমরা আপনার দেরি দেখলে গিয়ে নিয়ে আসব।

ডাক্তারও এখানে আর একজন সাক্ষী হয়ে গেল।

অমরেশ—এখন বর্ত্তমান আপনার কাছে যা আছে দিয়ে যান।

—গোটা দশেক আছে।

—তাহলে বাকীটা সময় করে দিয়ে যাবেন।

অমরেশ কিন্তু আর ঠিকানা নেওয়ার দিকে গেল না।

শেষে অমরেশ সমীর আর অজয়কে নিয়ে বেরিয়ে আসছে মেয়েটা এগিয়ে এল—বাবা আমি তাহলে এবার কি করব?

—তুমি! ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞেস করবে, উনি যেমন বলেন তেমন চলবে।

—বাবা তুমি থাক কোথায়? ঠিকানাটা—

—আমার ঠিকানা! তা জেনে তোমার লাভ হবে না। কোথায় কখন যে থাকি তার ঠিক নেই। তবে মোটামুটি জেনে রাখ—পড়ি ইউনিভার্সিটিতে, খাই মেসে?

সমীর ছুঁয়ে দিল—আরে ঐ চত্ত্বরে শ্রী অমরেশ সাহার নাম সকলেই জানে—ইনিই আমাদের সেক্রেটারী।

অমরেশ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—এই দ্যখ অজয় তুই শুদ্ধ দেরি করলি। কত বেলা হয়ে গেল! একটু আগে গেলে তুই রান্নার ব্যবস্থা করতে পারতিস।

অজয়—হ্যাঁ দাদা আমি চলেই যেতাম, কিন্তু যেতে পারলাম না এই মহাপুরুষের শেষটা দেখব বলে। এ কে জানত?

অমরেশ একটু চমকে ওর দিকে ঘুরে দেখল—এ হচ্ছে আমার মায়ের মামাত ভাই।

—তা তোকে চিনতে পারে নি?

—আমি ওকে চিনতে পেরেছি। উনি পেরেছেন কি না কে জানে। বেশী ত দেখিনি এক দুবার এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। তা মায়ের মুখে গল্প শুনেছি ছোটবেলায় ওদের বাড়ীতেই মা অনেকদিন কাটিয়েছিল।

মেসে যখন উঠেছে বেলা তখন প্রায় দেড়টা দুটো। অমরেশ বলল—হ্যাঁ, অজয়, এমন সময় আর কি খাওয়া যায় বলদেখিনি? কিছু কিনে আনলে কেমন হয়?

—না দাদা, কিচ্ছু দরকার নেই। এক একদিন খেতে আমাদের বেলা প্রায় আড়াইটেও ত হয়েছে। ভাতে ভাত চাপিয়ে স্নান করতে করতে হয়ে যাবে। নামাব আর খাব।—অমরেশ আর আপত্তি তুলল না।

খেতে বসে দাদা ভাইয়ে দু'একটা কথা হল। এই সময় অজয় আবার মনে করিয়ে দিল—দাদা, তোমার চিঠিটা নিলে না ?

—হ্যাঁ খেয়ে দেখব।

অমরেশের খাওয়া আগেই হয়ে গেছে।

অজয়—যাও দাদা তুমি উঠে যাও, আমি এগুলো মুক্ত করে দিচ্ছি।

—নারে না, তুই-ই সব করবি কেন! বলে অপেক্ষার ভার নিতে অজয় বলে উঠল—কি যে বল না দাদা তুমি! তুমি বুঝি সব করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব!

—হ্যাঁরে তুই বুঝিস নি, অনেক সময় ছোট ভাই উঠে যায় দাদাকেই টানতে হয়।

—আমি বুঝি তোমার সেই নেহাৎ হামাগুড়ি দেওয়া ছোট ভাই!

আর কথা বাড়ানো চলে না। অমরেশ উঠে চিঠিটা চেয়ে নিল।

প্রিয় অমরেশ,

আমি তোমার এখানে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কয়েকটা কথা ছিল। কিন্তু তোমাকে না পাওয়ায় এই চিঠি লিখে রেখে গেলাম। আশা করি এই চিঠি পড়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

অভাগী গীতিকা।

এই চিঠিটায় যা লিখছে তাতে আমাকে যেতে বলছে রে। ওর নাকি কিছু কথা আছে আমার সঙ্গে।

—তা তুমি যাও।

—আমি এখন বেরতে পারব না ত। কারণ আমি এই রকম করেই যদি সময় নষ্ট করব, আমার ত ফাইনাল এগিয়ে এল। যেটুকু ফাঁক পাব আমায় চেপে পড়াশুনা করতে হবে। তা তুই না হয়, আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, নিয়ে একবার চলে যা, যেয়ে দিবি। আর মুখেও বলবি যে এমনিতেই

ত পড়াশুনা হচ্ছে না, যেটুকু দাদা ফাঁক পাবে পড়াশুনায় বসবে। সামনেই পরীক্ষা আসছে, তাই এল না।

হ্যাঁ তাহলে দাও যাচ্ছি—বাসন ধুতে ধুতে অজয় বলল।

অমরেশ কাগজ টেনে নিযে বসল।

স্নেহের বোন গীতিকা,

আমি আজ দুদিন এখানে ছিলাম না। আসা মাত্র অজযের মুখে শুনলাম তুমি এসেছিলে। দুভাগ্য আমার সঙ্গে দেখা হল না। যাই হোক তোমার হাতের লেখাটা পেযে অনেকখানি আনন্দ পেলাম। তুমি আমাকে যাওয়ার কথা লিখেছ। আমারও যাওযার খুব ইচ্ছা আছে বা ছিল। কিন্তু আমরা অনেক উপরের ছাত্র ছাত্রী। সে কথা আর কেউ বুঝুক না-বুঝুক তুমি বুঝবেই। নানা দিকের ঝামেলাতে পড়া একেবারেই হচ্ছে না। কিন্তু এসব কথা ত কেউ বুঝবে না। পরীক্ষার পাস ফেলটাই সবাই লক্ষ্য করবে। তাই যেমন করেই হোক আমাদের পাস করে বেরোতেই হবে। আর আমাদেরও ত বছর নষ্ট হওয়াটা চিন্তা কবতে পারি না। ক্ষতিব উপব টিপ্পনী। তাই যেমন করেই হোক আমাদের সব চেপে তৈরি হতে হবে। তাই বলি লক্ষ্মী বোনটি, নিশ্চয় আমার না যাওযাতে তুমি কোন চিন্তা বা অভিমান করবে না। আমি ঠিক সুবিধা সুযোগ বুঝলেই তোমাব সঙ্গে দেখা করব। এই চিঠি আমি ভায়েব হাতে পাঠালাম। আমি এখন লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করি। নিশ্চয় তুমিও পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকবে। লিখব না লিখব না করেও অনেকখানি লেখা হয়ে হয়ে গেল। এটুকুন পড়েও হযত এসময় সময় নষ্ট করতে মন চাইবে না। তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—

অমরেশ।

ঋতা আগেই স্কুলে গিয়ে পৌছেছে। তখনও মঞ্জু সেন ও আলপনা দাসগুপ্ত আসে নি। মধ্য বয়সী একজন শিক্ষক এদের সতীর্থ। নাম তার সরোজ মিত্র। সে এসে বসেছিল।

মঞ্জু সেন এদেরই প্রতিবেশী। স্কুল সুরু হওয়ার থেকে আছে। দুটি ছেলের মা। স্বামী থাকতেও নিজে কর্ম সংস্থানের জন্য বেরিয়েছে। অভাবের

সংসার সামলাতে দেশ ভাগের পর বহু লোক পূর্ব্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসে এ বঙ্গে হায় করে বাঁচতে চেয়েছে। এখানে তারা নিরাপত্তা পেয়েছে, কিন্তু কি খেয়ে বাঁচবে সেই প্রশ্নই সকলকে পাগল করে তুলেছে। সমস্যার কথা সে অনেক কথা। সে প্রসঙ্গ এখানে আর কেন! যাই হোক স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে মঞ্জু এসে ঋতাকে ধরে পড়ে। সর্ব্বদিক বিচার করে মানিকও আপত্তি তোলে নি। এখানে সেই অবধি মঞ্জু।

আলপনার কথা আগেই বলেছি। স্বভাব নিয়ে তার সমালোচনা চলে বটে কিন্তু তাদের সংসারেও যে অভাব সে কথা কে অস্বীকার করবে! দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষের প্রতি মহৎ ব্যক্তি মাত্রেরই একটা অনুকম্পা থাকে। তারা পারে না এদের ছিটিয়ে দিতে। শুধু তাই নয় ঋতা বা মানিকের দুজনেরই একটা মনোবৃত্তি—কাউকে দুশ্চরিত্র হয়ে জীবন কাটাতে বা ঘৃণিত পথে যেতে দেবে না। বন্ধুর দিকটা ঋতা সেইভাবেই বেশী লক্ষ্য করেছিল। যদি অভাবে কোন কুপথ অবলম্বন করে সেই জন্য অভাবটুকু সে সাধ্য মত মিটিয়ে চলবে। আর স্বভাব হলে ত বলার কিছু নেই। সেই রকম বিচারেই আলপনা চাকরি পেয়েছে।

আর সরোজ মিত্রর ঘটনাটা এখানে একটু বলে যাই। সে নেহাৎ গ্রামের স্কুলের শিক্ষক নয়। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম—একরকম শহর বললেই চলে। নানান কারণে সেখানে তার টেকা দায় হল। মানুষটি সৎ, টাকার চাহিদা পরিশ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে। খাটব টাকা নেব না—এমন উদামাদাও নয়, আবার ঠকিয়ে নিজের কিছু গুছিয়ে নেব—এ ভাবও নয়। আজকালকারের যুগে সব জায়গাতেই রাজনীতি। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আজ আর সার্থক শিক্ষা নিকেতন নয়। মানুষের হীন ভাব, নীচতা প্রশ্রয় পেয়েছে সর্ব্বত্র। সৎ মানুষের বাঁচাই দায়। যে না পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে তারই দুর্গতির সীমা থাকবে না। এই সরোজেরও তাই দুর্ভোগ কপালে লেখা ছিল। দীর্ঘদিন একই স্কুলে শিক্ষকতা করেও সে নাম পেল না। শেষে বড় দুঃখে স্কুল ছেড়ে ঘরে বসেছিল। ঘর অবশ্য মহেন্দ্রর ঘরের কাছেই। মহেন্দ্র চিনত ভাল করে। সেই মহেন্দ্রই একদিন ঋতা মানিকের কাছে এর গল্প করে। তখন মানিক বলেছিল—ঠিক আছে একদিন দেখা করতে বল না। ভদ্রলোক আসতে অনেক কথা গল্প হয়। প্রথমেই ত স্কুলের কোন সংস্থান নেই। সরোজ কিন্তু মানিকের মনোভাব বুঝে

নিজে থেকে বলে বসে—তাতে কি আছে! আপনি টাকার দিকটা অত বড় করে দেখছেন। একটা জিনিস যদি গড়ে উঠে তাহলে উদ্যমী হয়ে খাটতে দোষ কি! আজ কম হলে পরে বেশী হবে।

সেই সঙ্গে শ্বেতা বলেছিল—হ্যাঁ সে কথা ত ঠিকই। আজ যারা কম মাযনায় ঢুকবে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে—আমাদের সৎকাজে তিনি যদি আশীর্ব্বাদ করেন, তাহলে তাদের ত মাইনা বাড়বেই উপরন্তু প্রতিপত্তি হবে।

মানিক বলেছিল—হ্যাঁ এ কথা আর বলাব কি আছে! একজন বহুদিন থাকলে পরেই—পুরানো হলেই তার একটা আপনার মত জিনিস হয়ে যায়। সেইজন্য এ সব কথা এখন বাহুল্য।

সরোজ—হ্যাঁ সে কথা ত ঠিকই—আমি এখন আমার মত করি ত আগে, তারপরে সব কথা আসছে। তার উপর আবার যে পুরানো হবে—আপনার বলে মনে করবে তাকে আবার নিজের স্বার্থ ভুলে যেয়ে নূতন অতিথির কথা চিন্তা করতে হবে।

মানিক—তা এখন আপনি আছেন কোথায়, আর কাজ স্বরু করলে কোথায় থাকা খাওয়া করবেন?

সরোজ—আমি খবর পেযে এসেছি। মহেন্দ্রর বাড়ীর কাছেই আমার বাড়ী। কাজ পেলে এখানেই থাকব।

মানিক—তাহলে আপনার দেশের বাড়ীতে ত যাওয়া আসার অসুবিধা হবে।

সরোজ—না সে ঝামেলা আমি একরকম একেবারেই চুকিয়ে দিয়েছি।

মানিক—কি রকম!

—আর আমি দুভাগার কথা আর বলবেন না—বলেই সরোজ নিজের ইতিহাস স্বরু করল।—

আমরা তিন ভাই। আমি মেজ, বড় ছোট আছে। মা এখনও বেঁচে বর্ত্তমান। বিযে ভাল ঘরেই করেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে তার দুটি পরিচয় আমার কাছে রেখে সবে যায়। কোলেরটি হওয়ার পরই মারা গেছে। মা-বৌদিরা মিলে ছেলেটিকে মানুষ করে। সেটি এখন বছর পাঁচেকের।

শ্বেতা—তা আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন?

—বিয়ের জন্য আমাকে অবশ্য অনেকেই অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল।

অনেক পাত্রীর বাপ এসে দুয়ারে ধন্না দিয়েছিল। সবচেয়ে বেশী মা-ই গালাগাল সুরু করল—বুড়ো বয়সে আমি কি তোর ছেলে মানুষ করব? আমার উপর দায়িত্ব দিয়ে সে অভাগী মরে গেল। সরোজ, লক্ষ্মী বাবা, তুই দ্বিতীয় সংসার পাত। কিন্তু আমি যত দিক দিয়েই চিন্তা করে দেখলাম কোন দিক দিয়েই সায় পেলাম না। মানুষ এক ঝামেলাই সামলে উঠতে পারে না, আমি আবার নূতন করে ঝামেলা টেনে আনব! নিশ্চয় না বিয়ে করলেই আমি সুখী হব। আমাকে বাবা বলে ডাকার লোকও সে দেখে গেল। এবার নূতন করে যাকে আনতে যাব সে যদি ওদিকে মেনে না নেয়!

ঋ—তা বলছেন কেন? এমন কি নারী হয় যে শিশুকে না ভালবেসে পারবে!

—আপনি ভাবছেন কি! মানুষের চাওয়া পাওয়ার কাছে মানুষ সব কিছুই করতে পারে। আর তখন আমার হবে বিষম জ্বালা। বাঁ হাতও আমার নিজের আর ডান হাতও আমার নিজের—কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটাকে ভালবাসব বলুন? আর আজ যারা আমাকে উৎসাহিত করছে তারাই কিছু না বুঝে বলে বসবে—সরোজ, একি তোর একচোখো বিচার রে!

মানিক—আর আমি যদি বলি আপনি ব্যালেন্স রেখে চললে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

—দেখুন তা সব সময় হয়ে উঠে না। সমতা হয়ত আমি ঠিকই রেখে চলেছি কিন্তু অনেকের চোখে অনেক রকম ভাবে সেটা ফুটে উঠবে। সেই জন্য সব দিক ভেবে দেখলাম—আমাদের এক গৃহস্থ, এখনও ভাগের প্রশ্ন উঠে নি। মাতৃদেবী জীবিত। দুটো বাচ্চা মানুষ হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। আবার নূতন করে ঘ্যাটঘ্যাটর সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন। ভগবান যদি মুখ তুলে কোন দিন চান তাহলে ওরা বড় হয়ে মানুষ হলে আমি ওদের নূতন সংসার পেতে দেব—সেই আছে ইচ্ছা। আর এই ফাঁকে নিজে যেখানে পারি টুকটাক রোজগার করব। পিতৃ সম্পত্তির উপর ভাগ বসাতে না গেলে তারাও নিশ্চয় আমার আয়ের উপর তেমন একটা আশা করবে না। তাই মহেন্দ্রর মুখে যখন এই স্কুলের কথা শুনলাম ভাবলাম জিনিসটা মন্দ কি, যাই না একটু এগিয়ে।

মানিক—তা মহেন্দ্র জেনে বুঝেই নিশ্চয় আপনাকে খবরটা দিয়েছে?

—তা হয়ত হবে।

যাক মানিক আর ঋতার যেন মনের ইচ্ছা ভগবান পূরণ করলেন। এই রকম ধরণের এক শিক্ষক থাকলে নিশ্চয় একদিন স্কুল উন্নতি করবে।

এক এক করে ছেলেমেয়ের দল আসছে। মাত্র জনা পঞ্চাশের ছোট প্রতিষ্ঠান। বেশীর ভাগই নীচের ক্লাসের ছাত্র ছাত্রী। ক্লাস থ্রী ফোরে মাত্র জনা বিশেক। আজকে ঋতা আগেই পৌছেছে বলে সরোজ বাবুর সঙ্গে কয়েকটা কথা সুরু করল।

—তারপর সরোজ বাবু কি রকম কি বুঝলেন? ভবিষ্যৎ কিছু উন্নতি হবে?

—হ্যাঁ তা না হওযার কি আছে!

—কিন্তু আমার দেখে যা মনে হচ্ছে তাতে শেষ দাঁড়াবে ত—না এই পর্যন্তই এর দৌড়?

—না না ঋতা দেবী, তা আপনি ভাবছেন কেন? ছোট থেকে বড হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় নয় কি? আমাদের প্রত্যেকের যদি এর প্রতি একটা দরদ বা লক্ষ্য থাকে তাহলে নিশ্চয় একদিন গড়ে উঠবে বৈকি। তবে হ্যাঁ সবই সময সাপেক্ষ্য। ধীর ধৈর্য্য না হলে কোন জিনিসই হয না। একটা কথা আছে কি জানেন, অবশ্য এটা আমার মা ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প—দেখ বাবা, যদি সুস্বাদু পাকা আম খেতে চাস তাহলে মুকুলে বা কুসিতেই ঝড়িয়ে দিস না। থাম না। এই যে এখন পেড়ে খাবার জন্য এত ব্যস্ত হযেছিস তখন দেখবি আপসেই বোঁট থেকে খসে পড়বে। শুধু লক্ষ্য করে যা যাতে কেউ না নষ্ট করে দেয। তা এই যে আশায় পরিশ্রম করা এতে নিশ্চয একদিন সফল হবো।

কিছুক্ষণ পরেই মঞ্জু ও আলপনা এসে পৌছেছে। হাতে খাতা পত্তর নিযে যে যার ক্লাসে যাওয়ার উদ্‌যোগ করছিল। কথাগুলোর গুরুত্ব ওদের খুব একটা তৎপর হতে দের নি। কথাগুলো উভয়েই কানে মনে নিচ্ছিল। সরোজ বয়সে প্রবীণ হওয়ার জন্য নয় শুধু, সত্যি সত্যিই যোগ্য বলেই সকলে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ঋতা প্রশ্ন করল—কি মিসেস সেন, আপনি কেমন বুঝলেন?

—না আমি ত প্রথমটা কিছু শুনি নি। তবে যা শুনলাম তাতে আমার মনে হয় যদি আমরা ঠিক মত সকলে মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে পারি তাহলে নিশ্চয় ভগবান একদিন মুখ তুলে চাইবেন।

সরোজ—তবে হ্যাঁ আরও দু একটি অভিজ্ঞ শিক্ষক বা শিক্ষিকা বাড়ানো প্রয়োজন।

ঋ—সে আপনার চিন্তা করবার দরকার নাই। ঘোড়া হলেই চাবুকের অভাব হবে না। আগে ছাত্র সংখ্যাই, বাড়ুক ত।

মঞ্জু—আমার যা দেখে শুনে মনে হচ্ছে—এই স্কুলের দিকে সকলের একটা লক্ষ্য পড়েছে। এ চত্বরে সকলে ত তাদের বাচ্চাদের নিয়ে আসছেই; এমন সেদিন কয়েক ভদ্রলোক শ্যামবাজার থেকে এসে সব খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন।

আলপনা কথাটা লুফে নিয়ে বলল—হ্যাঁ আমার এক মামা আছেন বালীগঞ্জে। তিনি তার ছেলে মেয়েদের এখানেই ভর্ত্তি করার কথা বলছিলেন—অবশ্য আমি এখানে আছি বলেই হয়ত।

সরোজ—তা ভাবছেন কেন—এই করেই ত আস্তে আস্তে নাম ছড়াবে।

আর কথা না বাড়িয়ে সরোজ চেয়ারটাকে ঠেলে উঠে পড়ল। এক সঙ্গে সকলে অফিস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ছেলে মেয়েদের ভীড় জমেছে প্রার্থনার লাইনে। আলপনা দাঁড়িয়েছে পুরোভাগে। হয় মঞ্জু নয় আলপনা এদের পরিচালনা করে।

সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রীতে একত্র হয়ে ঋতাই আগে কথা তুলল—তারপরে বাড়ীর খবর কি? ঠাকুরঝির বিয়ের কতদূর কি এগোলো?

মা—এগোলো মানে! আর ত মাত্র এক সপ্তাহ বাকী। আর দুচার দিনের মধ্যে তুমি তৈরি হও তোমাকে যেতে হবে।

ঋতা একটু চমকে উঠে বলল—আমি!

—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই।

—হাস্যকর, হতেই পারে না এ কথা।

—কেন, না-হওয়ার কি আছে। আরে মানুষ জানবে প্রথমটাতে অনেক কিছুই ভাবে বা চিন্তা করে। কারণ যে আশা যে স্বপ্ন তারা দেখে রাখে তা জ্বলে উঠে। সেই জন্য মনের নানারকম ভ্রান্তির মূলে নানা কথা বলে থাকে। তারপর তোমার ঐ একটা কথা তুমি যে বলে থাক—অবশ্য ওটা তোমার কথা নয় সর্ব্বকালেই চলে—সত্যের ব্যাখ্যা হয় খুব ধীরে।

ঋ—তাই বলে এখানে এটাও ত সত্য যে তুমি অসবর্ণ বিবাহ করেছ। তার উপর কিচ্ছু পাও নি, কেউ জানল না। সে ব্যথা, সে দুঃখ যাবে কোথায়! আমাকে দেখলেই ত তাদের রাগ হবে। এই হতচ্ছাড়ী মেয়ে কোথায় ছিল আমাদের সর্ব্বনাশ করল।

মা—কথাটা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু গুণ বিচারের পরও কি একথা খাটে?

ঋতা সম্পূর্ণ এ আলোচনা এড়িয়ে যেয়ে বলল—হ্যাঁ তাহলে কত টাকায় সব ঠিক হল?

—ঐ বাবা যা লিখেছিল—আট হাজার টাকাই পড়ে যাবে প্রায়।

—আমাদেব এখান থেকে কি কি গয়না দেওয়া হচ্ছে?

—ঐ হার বালা টালা কি সব দেওয়া হচ্ছে—যাবে ত তুমি—দেখবে ত। আর ছেলের দাবী একটা রেফ্রিজেটাব। সেইটার জন্য বাবা কয়েক দিনের মধ্যে আসবে। ও ভাল কথা, বেবিয়ে আসবার মুখে আমাকে দীপা বলে দিয়েছে—দাদা তুমি একা এসো না কিন্তু। যাক এবার তোমার বাপের বাড়ীর কথা বল।

আমার বাপের বাড়ীর কথা নতুন করে কি বলব বল—ঐ টাকার কথা বলছিল, ভাইটার চাকরি হবে—এই সব আর কি। আব মামা নন্দিতাব একটা সম্বন্ধ দিয়েছে।

—ও তাই নাকি, ছেলে কি করে?

—কে জানে অত এখনও কিছু বলে নি বাবা।

সকালের ডাকে হৃদয় শিবশঙ্করের একটা চিঠি পেয়েছে। চিঠিখানা পড়ে—কৈ গো কোথায়, শুনছ—বলেই রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

—হ্যাঁ এই ত—গলার স্বরে জয়াবতীও দু পা এগিয়ে এল।

—এই দেখ শিবশঙ্কর কি লিখেছে।

স্ত্রী প্রশ্ন দৃষ্টি দিতে হৃদয় চিঠিখানা পড়ে গেল। শুনে জয়াবতী বলল—তা মন্দ কি ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসবে কেন। মিছিমিছি টানা পোড়ান হবে। তুমি লিখে দাও যে আমাদের এতে আপত্তি নেই।

সৌরেনের দিকে লক্ষ্য করে জয়াবতী বলল—কিরে মণি, নূতন বিয়াই এই লিখেছে। তা কি করবি?

মণি—যেটা ভাল হয় কর।

জয়া—হ্যাঁ ভাল যা বুঝব তাই ত করব—তবু তোকে যখন জিজ্ঞেস করছি তখন তুইও ত একটা মতামত দিবি।

গীতা পাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে বলল—না মাসীমা ভদ্রলোক ত সহজ সরল কথাই লিখেছে, ভালই ত।

কাউকে না জিজ্ঞেস করলেও মনের সরল সহজ উত্তর পাওয়া যায় আর কাউকে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। এইখানেই সরল গরল বুঝা যায়। সৌরেনের প্রকৃতি যে মোটেই সুবিধার নয় তাবই প্রমাণ এটা। ও যেন এ সব বিষযে কিছুই মাথা ঘামাতে চায় না। রাজলক্ষ্মীকে আনার ব্যাপারেও তাই করল। একজনকে ভাল করবার চেষ্টা অনেকেই করে। সবচেয়ে তার বাপ মা। কিন্তু যদি ভাল হবার না হয তাহলে কি তার জন্ত কারও আটকে যায়! যে যার মতন সরে দাঁডায। সে তার একাই হযে যায বা মন্দের দলে গিয়ে দলভারি করে। এই যে রাজলক্ষ্মীকে আনব না বলে পডাশুনার একটা অজুহাত দেখাল। চেষ্টা করলে কি আর পারত না। কয়েকটা ক্ষেত্রেই ঐ রকম অজুহাত দেখাতে পারে। তারপরেই তার চরিত্র চিনতে কারেও বাকী থাকে না।

গীতার দিকে মুখ ফিরিয়ে মাসীমা বলল—হ্যাঁ মা, আমারও তাই মনে হয—বেচারাকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কি। মণি সাতে পাঁচে থাকতে চায না। সে তার বন্ধু আর পড়াশুনাই বোঝে। সেইজন্ত সে স্থান ত্যাগ করে সরে পড়ল।

হৃদয জয়াবতীর মুখের দিকে চেয়ে বলল—ছেলেটা, লেখাপড়াই শিখছে, সমাজে পাঁচজনের সঙ্গে মিশবার মত ভদ্রতা ও নম্রতা কিছুই নেই ওর।

জয়াবতী কিছু উত্তর করল না। পাশে গীতাই তার জবাব দিল—না মামাবাবু, তা বলছেন কেন, বড় হলেই ঠিক হয়ে যাবে।

—শুধ গীতা, উঠতি গাছ দেখলেই তার ভবিষ্যৎ বোঝা যায়।

জয়া—হ্যাঁ গো আজ রাত্রেই তাহলে ত মনোজ রাজলক্ষ্মীকে আনতে বেরিয়ে যাবে?

একটু থেমে—হ্যাঁ অগত্যা, তাছাড়া আর উপায় কি! ও বেবাগা ছেলে যখন না গেল, হলে আমি না হলে মনোজ এ দুয়ের একজনকে যেতে হয় ত। আর পড়ার অজুহাত দেখিয়ে ও এটা নিতান্তই ফাঁক কাটল।

জয়া—তা ঐ সঙ্গে তার শাশুড়ী বা অন্যান্য যে কেউ আসতে চায় সকলকেই ত আসতে বলবে ?

হাঁ তা নয় আর কি ! ওর দিক থেকে ও সকলকেই নিয়ে আসার কথা বলবে, তারপর সকলেই কি আর এখনই আসবে ! ওরা এলে সেই বিয়ের আগের দিন বা বিয়ের দিন এসে পৌঁছবে।

গীতা— না মামাবাবু তা বলছেন কেন, রাজলক্ষ্মীর শ্বশুর বাড়ী যা না তাতে এখনও আসতে পারে।

হৃদয়—তা আর এলে এখন কি করা যায় !

আজকে মেয়ের গয়না গড়ানোর জন্য স্বর্ণকারকে ডাকা হয়েছে। সে বাড়ীতে এসে সবের মাপ নিয়ে যাবে—তাই স্থির ছিল। শিবশঙ্কর স্বর্ণকারকে বসতে দিযে ভিতরে শ্রীমতীর কাছে গেল—হাঁ গো তাহলে গয়নার মাপটাপ সব বলবে এস। আর মানিকের ঐ হাজার খানেক টাকাতে কি এমন গয়না হবে !

শ্রীমতী—হবে না কেন, গা সাজানোই হবে। তবে হলে বেশী না হলে কম—একটা কিছু তোমাকে হিসাব করে রাখতে হবে। না হলেই হয়ত ওরা ভাববে যে তুমি ওদের টাকাটা গ্রহণ করনি।

হাঁ এইখানে একটু বলে নিই। শিবশঙ্করের পুত্র ও পুত্রবধূ তাদের অন্তর থেকেই, পরিশ্রমে যেটুকু জমিয়েছিল, আগে পিছে না ভেবে পিতার বা শ্বশুরের সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়াতে চাইল। এটা কি মানিকের গুণ ? এখানে সত্যিকারের আদি কে ? শিবশঙ্কর। ঐ যে একবার ওখানে গেছিল সেই সময় দেখে এসেছিল পুত্রবধূর গা খালি, তাই লক্ষ্যই ছিল—যা হবার হয়েছে এখন ত আমার পুত্রবধূ বটে ! খালি গা, আমাদের দিক থেকে কয়েক খান গয়না না দিলেই নয়। এ কথা অবশ্য শ্রীমতীর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছিল। তবে হাঁ খুব গভীর আলোচনার মধ্যে ছিল না। যাক আজ বুঝি ভাগ্যবতী শ্বতার ভাগ্যের ব্যাখ্যা হল। তাই শ্বশুর শাশুড়ী উভয়ে মিলে স্বর্ণকারের কাছে বসে গয়নার মাপ দিল। দীপার কি কি গয়না হবে শিবশঙ্কর বলল। শ্রীমতী উত্তরে বলল—আগে বৌমায়েরটা হয়ে যাক। বংশের বড় পুত্রবধূ, তাকে দিয়েই শুরু করা যাক।

আজ ঋতা দূরে থাকলেও নিশ্চয় এমন কোন গুণে শাশুড়ী মুগ্ধ হয়েছে যে মেয়েকে বাদ দিয়ে বৌকেই তার আগে টানল।

শিব—হ্যাঁ তাহলে বল। বৌমায়ের তাহলে কি কি হবে?

শ্রী—তিন গাছা করে ছ গাছা চুড়ি। দু'গাছি বালা, কানের রিং, হাতে আংটি।

স্বর্ণকার—এ ত মা আপনার অনেক পড়ে যাচ্ছে।

শ্রী—হ্যাঁ তুমি হিসাব কর না কত পড়ছে।

—চুড়ি আপনার বার আনি করে থাকবে ত?

—বার আনি করে কি সুবিধা হবে, আমার মনে হয় এক ভরি করেই দিয়ে দাও। ছ ভরির চুড়ি, তিন ভরির বালা, আড়াই ভরির হার, আর আধ ভরিতে কানের আর আংটি।

শিব—সে কি তুমি যে এখানে অনেক আরম্ভ করে দিলে—এ যে হাজার দু'য়েক পড়ে যাবে।

শ্রী—তা হোক না কেন তোমার কাছে ত হাজার আছেই আর মানিক পেটে মা যে আমায় হারটা দিয়েছিলো না সেই হারটা আমি ভেঙ্গে দেব।

শিব—সেটা তুমি ভাঙ্গবে!

—হ্যাঁ ভাঙ্গি না, ওর ঠাকুর মায়ের ত খুব সখ ছিল। সে সব সখের ত আর কিছুই হল, নইলে ঐ হারটা মুখ দেখেই দেওয়া হত। তা ত আর হল না।

শিব—যাক যা ভাল বুঝ তাই কর।

স্বর্ণকারের দিকে ঘুরে বলল—আর তুমি ত মেয়ের সব জান কি কি হবে। তাহলে সেই মত করবে, মাপটা নিয়ে যাও। যাক এবার বল কবে নাগাদ সব পাব?

—তা এক সপ্তাহ মতন লাগবে।

পরদিন সকালের ডাকে হৃদয়ের একটা খাম পেয়েছে শিবশঙ্কর। ওরা সম্মতি জানিয়ে লিখেছে। শিবশঙ্করের মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। সেই কথাই সে স্ত্রীকে জানাতে রান্না ঘরের দিকে গেল—শুনেছ গো। চিঠিটার উত্তর এসেছে।

বলতে বলতে শিবশঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দ্যাখে শ্রীমতী শিবানীর মায়ের সঙ্গে

পাঁচটা কথা বলছে। শিবশঙ্করের কথা শুনে শ্রীমতী বলল—ও তাই নাকি, কি লিখেছে কি?

—না আমরা যা লিখেছিলাম সেইটিই ওদের মত; তাই লিখেছে।

শ্রীমতী শিবানীর মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল—কুটুম ভালই বলতে হবে, না কি শিবানীর মা? চিঠিটা শুনলে ত, কি মনে হয়?

—হ্যাঁ তা বৈ কি! আপনার মুখে প্রথম থেকে যা শুনছি তাতে কুটুম খুবই ভাল। ও সব কি ভাই জানেন, মেয়ের ভাগ্য। আপনারাও যেমন আর মেয়ের কপালও তেমন। তাই ত আমাদের উনি কাল বলছিলেন—দাদার যেমন মন, আর ফলনও তেমন সবগুলিই দ্যাখ। কোথায় গেলেন পুরী বেড়াতে অমনি মেয়ে দেখে পছন্দ হয়ে গেল—কোথাও খোঁজা নেই দেখাশুনা নেই, এক কথায় বিয়ের কথা।

শ্রী—না সবই ভগবানের হাত ভাই। তোমাদেরই আর কি খারাপটা—শিবানীর মত অমন একটা মেয়ে হয় না।

—না দিদি, সে কথা আর বলবেন না। শিবানীর পরিবেশটা কেমন—সব সময় সে এখানে পড়ে আছে। তারপরে অমরেশ এলেই ত যেমন করেই হোক ওকে দুপাঁচটা শিক্ষা না দিয়ে সে যায় না। এরই নাম বলে রত্নগর্ভ। তাই ত আমি শিবানীকে বলি—আরে ভাগ্য ভাল না হলেও ভাগ্যার ঘর্ষণ পেলেও অনেক সময় দুর্ভাগ্য সরে যায়।

এদের কথা সুরু হয়েছে। শিবশঙ্কর কিন্তু ওদের ওখান থেকে সরে পড়েছে অনেকক্ষণ আগে। দীপা কোথায় ছিল ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল—কাকীমা, বেশত ঝাঁপিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প জমিযে আমাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করছেন।

কাকীমা—বালাই সাট, কেন মা ঘরের লক্ষ্মী আসবে যাবে, তোমরা যে মা প্রতিমা।

—তাহলে শিবানীদির ব্যবস্থা কতদিনে করছেন? আমাকে ত তাড়াচ্ছেন।

—সে কি আর বলতে পারা যায় সবই ভাগ্য। তোমার কাকাবাবু তাই ত বলেছেন—দাদা বলে যখন মেনেইছি তখন নিজের দাদা বলেই জানব। উনিই যা করে দেবেন তাই। তোমার হয়ে গেলে নিশ্চয় ভাসুর ঠাকুর ওর জন্ত একটা কোথাও দেখবেন—সে চিন্তা আমি করি না।

—দিদি তাহলে বড় ছেলে বৌমা ওরা সব কবে আসবে?

শ্রী—তাই ত বলছি—দিদির ভাগ্য ভাল বলে ত খুব উপরে তুলে দিচ্ছ। কিন্তু বংশের বড় প্রথম—সেইখানেই যে দিদি ঘা খেয়েছে, কৈ সেটা ত বললে না। আজকে দীপার বিয়েতে আমাকেই সব করতে হচ্ছে। যেখানে মঙ্গলাচার বড় বৌমাই সব করবে। কি আর করব ফেলতে ত পারিনি—ছেলেমেয়েরা বড় হলে তারা কোথায় কি করে বসে মা বাপের কথা একটুও চিন্তা করে না। আর বাপ মা তারা ত আর ফেলতে পারেনি।

সুচরিতা—ও কথা কেন বলছেন দিদি আপনি ? আপনাদের মত বুঝনদার লোক হয়ে এ কথা ত বলা চলে না। 'মানিক আপনার যা করেছে তা আমি আগাগোড়াই ত শুনেছি—কত মহত্তের পরিচয় দিয়েছে তা জানেন! আজকে কি জাতটাই আপনার কাছে বড় হয়ে দাঁড়াবে! ভাবুন ত আজকে ঐ মেয়েটির কি অবস্থা হত। তার পরে আমি ত মাঝে মাঝে শিবির কাছে সব শুনি, শিবি গিয়ে গিয়ে গল্প করে—ভাসুরও ত গেছলেন, অমায়িক তার ব্যবহার। রূপ দিয়ে জাত দিয়ে চিরদিনই কি দিদি ধুয়ে খায়! প্রথম প্রথম অনেকেই অনেক কথাই বলে, তারপর তার গুণই সকলকে মুগ্ধ করে দেয়। আহা বৌমায়ের কথা শুনলে আমার মনে হয়—যদি জাতের কথা না দিদি মনে করেন, তাহলে দিদির প্রকৃত ঘর আলো করা ঘরের লক্ষ্মী এসেছে।

শ্রী—তা আর মনে করতে পারলাম কোথায়! প্রথম ত খুবই রাগ হল দুঃখ হ'ল—মনে হ'ল এত করে তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলাম, তুই আমার কূলে কালি দিলি। কিন্তু দিনকার দিন যখন বুঝলাম, তোমার ভাসুর এসেও বলল, আর খোকা ত সে শতমুখে গুণগান।—তুমি মা জান, তুমি জাতটাকেই এত বড় করে দেখবে! তোমার কাছে কি নারীর চরিত্র বড় কথা নয় ? তুমি নারী হয়ে সে নারীর কথা খুব ভাল করেই বুঝবে। দাদা যা করেছে তা কিছু অন্যায় করেনি। দরিদ্রতার মূলে, অভাবে আজ যদি নারীকে চরিত্র বিলাতে হয় তার মত আর দুঃখের কি আছে! তোমার ছেলে সেই বীরত্বের কাজ করে এসেছে। তারপর বৌমায়েরও কয়েকখানা চিঠি পেলাম—যাই হোক বহু রকম করতেই মনকে বুঝ দিলাম।

সুচরিতা—হ্যাঁ ভাল কথা, শুনলাম বৌমা নাকি অন্তঃসত্ত্বা।

—হ্যাঁ তাই ত শুনছি, সেই আবার এক চিন্তা।

দীপা—হঁ্যা কাকীমা আর একটা কথা শুনেছেন, বৌদি একটা নূতন স্কুল খুলেছে।

—হঁ্যা রে মা, তাই ত শুনলাম। ভাশুরই ত যেয়ে তার উদ্বোধন করেছেন নাকি যে। তাহলে এখন কি হবে দিদি—নিশ্চয় দীপার বিয়েতে এসে আর যাবে না? এটা ক'মাস?

—মনে হয় ছ'মাস।

—তাহলে ত বিয়ে সেরে যেতে যেতে সাতে পড়ে যাবে।

—কে জানে ভাই ও সব কথা এখন চিন্তা করি না। আগে মাথার উপর মেয়ে পার হোক, মেয়ের চিন্তাই আমাকে পাগল করেছে।

—ও দিদি, ও আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি যখন পরের মেয়েকে স্থান দিয়েছেন, ও ঈশ্বরই আপনার চিন্তা সব করে রেখেছেন। আচ্ছা, এই ক'মাস তাহলে স্কুলই বা কি করে চলবে!

—বলছি ত ও সব এখন কিছুই আলোচনা হয় নি। আগে বিয়ে চুকুক, ছেলেরা সব থাকবে, নিশ্চয় তোমার ভাসুর একটা কিছু ব্যবস্থা করবে।

সনৎ এসে দাঁড়িয়েছে—ও মা, তুমি শীগ্রি চল, দিদি কি রাগ করছে। বলছে মা কখন গেছে আমাকে বাড়ীতে রেখে, আমি পারব না আর একলা থাকতে।

—তুই ডেকে নিয়ে আয় গে যা।

শ্রী—আচ্ছা বাবা যাচ্ছে। মায়ের ত এমন সময় দেওয়া নেই।

দীপা—বা রে, কাকীমা না গেলে শিবানীদি আসতে পারছে না যে!

সুচরিতা—আচ্ছা মা আচ্ছা যাচ্ছি। শিবানীদি দিনরাতই এখানে পড়ে রয়েছে। আর তুমি চলে গেলে আরোই থাকবে।

দী—থাকবেই ত।

সু—থাক। দিদি, তাহলে এখন আসি। এদিকে ছেলের তাড়া, এদিকে ভাশুর ঝিও তাড়িয়ে দিচ্ছে।

দী—আর ও নিন্দেটি করে যাবেন না। বলুন যে শিকড় গজিয়ে গেছিল এবারে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হচ্ছে।

সু—আমার যদি শিকড় গজিয়ে যায়, শিবির কি গজিয়ে যায়?

দী—মা-গুলো দেখছি সব এক রকম। আমিও ঐ রকম যেয়ে একটু দেরি হলেই মা বলবে—কখন গেছলি।

শ্রী—মায়ের ঐ বলাতে গায়ে লাগত, এবাব কে কি বলে দেখব সেটা।

দীপা—হ্যাঁ ঐ ভাব না, তাড়াতে প্যারলে ত বাঁচ। আমাকে যদি কিছু শুনায় তোমাকে তখন আমি শুনাব।

স্থ—না দিদি, উঠি এবার। আমরাও আমাদের মাকে কত শুনাচ্ছি ওবাও আবার শুনাবে। অনেকেই অনেক কথা বলে মা। কতক্ষণ বলবে জান মা ঐ যতক্ষণ না কোলে একটা 'অঁহা' হয়! আর 'অঁহা' হতে যদি দেবি হয় তাহলে চিনতে আব কত সময় লাগে—বছর খানেক।

দীপা—কাকীমাটা কি যে না! যা তা সব বলে। যান ত যান ত আপনি, আপনি না গেলে শিবানীদি আসতে পারছে না।

আর হাতে মাত্র দিন পাঁচেক বাকী। শিবশঙ্কর সব হিসাব করে শ্রীমতীকে বলল—তাহলে আমাকে আজই বেরিয়ে যেতে হয়।

শ্রী—তাহলে কি রাতের ট্রেনেই যাবে? ভাল কথা, তোমার কি নেমন্তন্ন কার্ড সব ছাড়া হয়ে গেছে?

শিব—তুমি ঐ সুখেই থাক আর কি! যেদিন স্বর্ণকার এসেছিল সেদিন সকালে তোমাকে বললাম না যে আজকেই সকলকে সব জানানো হয়ে গেল। দ্যাখ না, আর ত হাতে মাত্র পাঁচ দিন আছে, তোমার বাপেব বাড়ী থেকে কোন খবরই এখনও নেই।

শ্রী—আমার বাপের ঘরে আর আছে কে যে খবর পাবে!

—তা বলছ কেন, তোমার ভাই, ভাইপো।

—আর দাদার কথা আর বলো না, বুড়ো হয়ে গেছে সে। কত বড় যে সে আমার চাইতে তার নাই ঠিক। আর ভাইপোটি ত একের নম্বর।

শ্রীমতীর বাপের বাড়ীর সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে যাই। মেয়েটি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ছিল। তার বাবার নাম ছিল কেশব মণ্ডল। ভদ্রলোক রোগ শোকে জর্জ্জরিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। অনেকগুলি সন্তানেরই পিতা হয়েছিল। দুর্ভাগ্য—সব গিয়ে দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে টেকে।

ছেলেটিই সর্ব্বপ্রথম। আর শ্রীমতীই সকলের শেষ। মাঝে শ্রীমতীর উপরে যে মেয়ে তার ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল। জামাই ছিল উকিল—পেশায়। এমনই ভগবানের চক্রান্ত—দিদি শান্তি—বিয়ের পরই পেটে ছেলে আসে এবং ফল শুদ্ধ গাছটি উপড়ে যায়। অবশ্য তখন শ্রীমতীর বিয়ে হয় নি। অনেকে অনেকই রকম প্রশ্ন তুলেছিল শ্রীমতীকে ঐ ঘরেই দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঘা-খাওয়া কেশব বাবু ও মা সরযূ একেবারে পাগলের মত হয়ে যেয়ে আর কোন কথাই উত্থাপন করতে পারলেন না। ছেলে বলতে একটিই তাদের। বিয়ে থা হয়ে গেছে। কেশব এমন কোথাও মনে এনেছিল—থাক আমি আর এই কোলের মেয়েটার বিয়ে দেব না। আমি যখন এদের কেউ নয়—ঈশ্বর একটি একটি করে আমার কাছ থেকে ইচ্ছা মতন তুলে নিয়ে যাচ্ছেন—এই ভাবে পাঁচ পাঁচটিকে আমি হারিয়ে ফেসলাম। কিন্তু হায় সবই যে সেই বিধির ইচ্ছা। হঠাৎ এই দুর্ভাগা কেশব মণ্ডলের কপালে—ভাঙ্গা বুক জোড়া দিতে এল শিবশঙ্কর। নামেও শঙ্কর কাজেও শঙ্কর। কে জানত, সপ্তম কন্যা শ্রীমতী পিতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল করবে! অবশ্য কেশব কিছু কিছু দেখে যায় নি যে তা নয়। পাশাপাশি দুটি ঘটনাই তার চোখের উপরে ফুটে উঠতে রইল।

বড় ছেলে ফণিভূষণ তার এমনই ঘরে বিয়ে দিয়েছিল যে বৌটি তার, বলার কথা নয়। আর ফণিকে ত ফণির বাবা অনেক চেষ্টাই করেছিল লেখাপড়া শেখাবার জন্য, কিন্তু সে কোনদিনই 'এণ্ট্রান্সে'র দুয়ার গোড়ায় পা দিতে পারে নি। বাপ হমিওপ্যাথি পাস করা ডাক্তার হয়েও একমাত্র ছেলেকেও মানুষ করতে পারল না। এই দুঃখ তার খুবই বড় ছিল। জ্ঞানী লোক ভগবানকে দোষারোপ করবে কি করে নিজের কর্মকেই দোষ দিত। সেই ফণির বৌ আর কেমন আসবে। চলতি কথায় যা বলা হয়—যেমন দেবা তেমনি দেবী। পেটে কিলালে 'ক' বেরাবে নি, তার উপর নোংরা, হিংসুক, অভিমানী সব গুণের গুণবতী ছিলেন তিনি। একমাত্র ছেলেবৌ শাশুড়ীর পাতে ভাতের বদলে কিছু তিরস্কার শুনাতো। বুড়া বুড়ীর অন্ধের যষ্ঠী একমাত্র ছেলে—কোন উপায় নেই, আর গবলেট ফণিও, কোনদিন স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নি।

সব দিক দিয়াই কেশবের কপাল ভেঙ্গে ছিল। সে জানত, এত খারাপের মধ্যেও ঈশ্বর তার কোথাও কোনখানে এমন একটি ভাল জিনিস লুকিয়ে

রেখেছেন। এইজন্যই বলে—মানুষ দিলে কুলায় না ভগবান দিলে ফুরায় না। তিনি নখের কোণ ঝেড়ে দিলে পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কেশবের সেই কথাই ঠিক—সবই কর্ম।

হঠাৎ শিবশঙ্করের মা এই মেয়েটিকে দেখে পুত্রবধূ করতে চায়। কেশব সব জেনে শুনে ভেবেছিল—এ স্বপ্ন। দুর্ভাগা কেশবের স্বপ্ন সত্য হয়ে দাঁড়াল। সত্যিই শ্রীমতীর বিয়ের বাজনা বেজে উঠল! তারপর বুড়ো দাঁপা হওয়া পর্যন্তও ছিল। জামাইয়ের ব্যবহার, ছেলেগুলির ধারাল বুদ্ধি, মেয়ের এই ছিমছাম সুন্দর সাজানো সংসার দেখে প্রায় বাপের মনে হত এ কি আমার কপালে টিকবে! অমন ভাল ছেলে দেখে শান্তির বিয়ে দিয়েছিলাম, শান্তি মরার পরে তলে তলে শুনছি ছেলেটি পাঁড় মাতাল হয়ে গেছে। সকলেই প্রথমে কত উচ্ছ্বাসই না করেছিল—যাক একটা উকিল জামাই করলেন। সেই সব সাত পাঁচ কারণে শ্রীমতীর ঘরে যাওয়া আসা বা কুটুম কুটুম্বিতা করত না ভয়ে। কোথায় যেন মন থেকে মুছেই ফেলেছিল যে ওরা তার কেউ বলে। আর শ্রীমতীর বিয়ের পর তার বাড়ীতে একটা কাজ কর্ম্মও কিছু ছিল না। শ্রীমতীর বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই ফণির ছেলের বিয়ে হয়ে যায়। ভাইপোটিও এদের সঙ্গে মেশার মত নয়। বাপ তবু টেনে ঘসে এণ্ট্রেন্সের দুয়ারে গেছিল, ছেলে মাইনর পাস করেই শেষ। ছোটখাট একটা মুদিখানার দোকান দিয়ে যাই হোক কোন রকমে ঐ দিকের সংসারটা চলে। ফণি এখন অথর্ব বুড়া। ফণির ছেলে মণিই বুড়ার কি কমটা!

শিব—আরে সে তারাই ত আসা যাওয়া করতে পারে। দ্যাখ এই বিয়ের ব্যাপারে কি করে।

শ্রী—আমার মনে হয় কেউই আসবে না। ঐ টাকাই দেখবে মনিঅর্ডার হয়ে আসবে। দাদা বুড়ো, ভাইপো সে রকম ধরণের নয়। আর দেখ না ভাইপোটারও এমনই দুর্ভাগ্য, তিনটি মেয়ে পর পর একটিও ছেলে হয়নি।

শিব—সবই একরকম আমার গুছানো হয়ে গেছে, আজ রাতের গাড়ীতে আমি বেরিয়ে গেলে কাল তুমি, আমার মনে হয়, মণ্টুকে স্কুলে যেতে দিও না। পাতা গ্লাস কাল সব আসবে। অবশ্য আমার অফিসের একটা চাপরাশিকে বলা

আছে সেই ম্যানেজ করে নিয়ে আসবে। তাহলেও ঘরে একটা ছেলে থাকা ভাল।

শ্রী—তুমি কি একেবারে ঐ পথে বিয়ের বাজার করেই ফিরবে?

শিব—তা নয় আর কি? আর বিয়ের বাজার করবার সময় কখন?

শ্রী—আচ্ছা দ্যাখ ঠাকুরপোকে তুমি এমন ভাবে লিখে দিয়েছ ত—ও যেন তাড়াতাড়ি সুষমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসে।

শিব—হ্যাঁ, তা ত আমি সেই রকম ভাবেই ভবানীকে লিখে দিয়েছি। ওদের ত আজকেই এসে পৌছানোর কথা ছিল। যাক আজকে না হয় কালকে এসে পৌছাবেই।

ভবানীর সঙ্গে শিবশঙ্করের খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। ওদের মা যখন বেঁচে ছিল ওদের যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল সেই সম্পত্তি শিবশঙ্কর বিদেশে চাকরি করার জন্য ছোট ভাইই দেখাশুনা করত এবং মা ওখানেই থাকত। ভবানীশঙ্করের চাকরি, মা মারা যাওয়া এই সব কারণে সম্পত্তি দেখাশুনার লোকের অভাব হল। সেইজন্য দুই ভায়ে আলোচনা করে ওদের এক জ্ঞাতি কাকাকে সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়। আর ভবানীর বদলির চাকরি বলে এখান ওখান করে ঘুরে বেড়ায়।

ভবানীর তিনটি মেয়ে, দুটি ছেলে। প্রথম ছেলে ও মেয়ে মারা যায়। বর্ত্তমান দুই মেয়ের কোলে এক ছেলে। ছেলে পড়াশুনায় মোটামুটি। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। তখন অবশ্য শিবশঙ্করের বাড়ী থেকে কেউই যেতে পারেনি। একা জ্যোঠামশায়ই গেছিল। শুধু যাওয়া নয় বন্যা কর্ত্তা সেজে অভাব অভিযোগ সব জায়গায় মাথা গলিয়েছিল। ভবানীর ছেলের জন্যও শিবশঙ্কর অনেক বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছিল। অবশেষে তাকে একটা ছোট খাট মোটর মেকানিকের কাজে ঢুকিয়ে দেয়। আর মাঝের যে মেয়েটি, পড়াশুনায় মন্দ নয়—একরকম ভালই বলতে হবে। স্কুল ফাইনাল পাস করে ঘরে বসে আছে—বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে। ভবানী ও শিবশঙ্করের বেশী বয়সের তফাৎ ছিল না। দুই ভায়ের বিয়েও বেশী তফাতে হয় নি। শিবশঙ্করের সন্তান হওয়া একটা হিসাবে নিয়মে হয়েছে। ভবানীর কোন হিসাব নিয়ম ছিল না। দেড় বছর, এক বছর, দু'বছর এই রকম তফাতে পাঁচটি সন্তানের পিতা হয়। ভবানীর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী দেখে, সন্তান মানুষ করার অসুবিধা জেনে,

শেষের দিকে বাধ্য হয় ছেলে পিলে আর না হতে দেওয়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ হঠাৎ সেবার মহামারীতে ওর বড় ছেলে বড় মেয়ে মারা যায়। এই সব দুর্বলতার দরুণই ভবানী কোলের ছেলেকে মানুষ করে তুলতে পারে না।

শ্রীমতী—হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়। হয়ত ঠাকুরপো, সুষমা, আভা এরা আগেই চলে আসবে। আর পল্টু ত কলকাতার কাছেই থাকে—হয়ত বিয়ের দিন আসছে।

সকালে উঠে অজয় অমরেশ দুভায়েই ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যথাসময়ে ট্রেন এসে থামতে শিবশঙ্কর নেমে বেরিয়ে দেখে ওদের।—কি ব্যাপার, তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে?

অমরেশ হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলল—পেয়েছি বটে, না পেলেও বা কি, আপনার ত বলাই ছিল।

অজয় দাদার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে সুরু করল। সোজা ওরা শ্যামবাজারের মেসে গিয়ে উঠল। অজয় রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে। এরা বাপ বেটা আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ল। বিয়ের কেনাকাটা সেরে সন্ধ্যার সময় মানিকের ওখানে যাবে এইরকমই স্থির হল।

এক দোকানেই টয়লেটের জিনিস সব কেনা সেরে শিবশঙ্কর বলল—এবার চল কাপড় চোপড় কি কি কেনা যায় দেখি।—বলেই সে ছেলের হাতে ফর্দটা ধরে দিল।

—ও থাক না তোমার কাছেই।

—এই সামনে মাড়োয়ারীর দোকানটায় উঠা যাক চল।

—না বাবা, আরও খানিকটা গেলে বাঙ্গালী এক ভদ্রলোকের বড় দোকান আছে। একটু আগিয়ে চলুন সেখানেই কিনব।

—কেন, যেখানেই উঠবে টাকা ফেলবে জিনিস নেবে, তা আর বাঙ্গালী মাড়োয়ারী নিয়ে কি আছে!

—না না এ দোকানদারটা ছোটলোক। জিনিস জৌলুষই কিন্তু খুব ভাল হবে না। আর কথায় লোকটা খুব পটু। আমার এক বন্ধুর বোনের বিয়ের সময় লোকটাকে আমার খুব ভাল করে চেনা হয়ে গেছে।

—তাহলে তাই চল।—এক কথায় শিবশঙ্কর রাজী হয়ে গেল।

দোকানে উঠে শিবশঙ্কর বলল—দেখি বিয়ের বেনারসী আছে ত ?

দোকানদার অমায়িক মানুষ, প্রৌঢ় বয়স তাই সে ঠাণ্ডা মেজাজে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে না কেন, আপনাদের জন্যই দোকান, তা সব রকম গুছিয়ে সাজিয়ে না রাখলে !

শিব—দ্যাখ অমরেশ কোন্ রংটা পছন্দ হয় ?

দোকানী—এই আকাশী রংটা নেন না। নিশ্চয় আপনার মেয়ে শিক্ষিত সুন্দরী—কার জন্য নিচ্ছেন মেয়ে না বৌ ?

শিবশঙ্করের কোথায় যেন মনে একটা খটকা লাগল।—না মেয়ে।

অম—আকাশী রংটা কি ওকে মানাবে ?

দো—কেন দাদা ?

—না ওর গায়ের রংয়ের সঙ্গে ত মিল খেতে হবে।

—তাহলে এই আভা গোলাপী—দেখুন দেখুন কোনটা পছন্দ হয় বেছে নেন।

অম—আভা গোলাপীটা মন্দ নয়, তবে সবচেয়ে সাদার উপরে ঐ যে সোনালী ফুলগুলো ঐটিই মানাবে।

দর দাম করে আরও তার সঙ্গে সায়া ব্লাউজ ইত্যাদি প্রায় শ' চার পাঁচ টাকার জিনিস—বেনারসীই হল শ'দেড়েক মতন, বরের জোড় এই সব নিয়েই। দোকানদারের কাছে এত টাকার জিনিস কেনা এবং খদ্দের ভাল মানুষ দেখে দোকানী আর এক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিল। শিবশঙ্কর আপত্তি তুলল—'না আর খাব না। এবার উঠার পালা।' মানি ব্যাগ থেকে টাকা বার করে শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করল—কি তাহলে আপনাকে কি পুরো চারশ' আশীই দেব ?

দোকানী—দেখুন আমাদেরও ত কেনা দেওয়া থুয়া সকলের পর লাভ যা থাকে না, সে আর কতটুকু! আপনার হয়েছে চারশ চুরাশী টাকা তের আনা। তা স্যার ঐ আনার অংশটা কেটে দিন।

—তা বললে কি আর চলে—এত টাকার মাল কিনলাম একটু সুবিধা না করলে ?

—তা যাই হোক একটা করুন, আপনি বিচক্ষণ মানুষ আপনাদের সঙ্গে কি আর—

শিবশঙ্কর আর কথা না বাড়িয়ে দু'টাকা ধরে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘড়ির

দিকে চেয়ে দেখল প্রায় দুটো।—তাহলে আমরা এখন কি করব? ঐ মেসিনটা দেখতে যাওয়ার কথা আছে—

অম—সব কেনাকাটা কি হয়ে গেল আর কিছু বাকী নেই?

শিব—ফর্দ্দটা খুলে দ্যাখ, দেখলেই বুঝতে পারবে।

অমরেশ চোখ বুলিয়ে নিল। হ্যাঁ প্রায় সবই কেনা সারা। জামাইকে যে স্যুটকেশটা দেওয়া হবে শুধু সেইটিই কেনা বাকী।—মেসিনটি দেখবে, তা দাদাকে নিয়ে গেলেই হত না?

—তাহলে চল আগে তোমার ওখানে গিয়ে খাওয়া সেরে নিই

মেসে পৌঁছতে প্রায় বেলা তিনটে বাজল। এসেই শিবশঙ্কর অজয়কে জিজ্ঞেস করল—কি তোমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে?

অজয়—হ্যাঁ এই এক সঙ্গেই ত খাব।

—সে কি, তুমি এখনও খাওনি!

অম—ওর ঐ রকমই স্বভাব—আমিও কোথাও কখনও দেরি করলে ও ঠিক আমার জন্য বসে থাকবে।

শিব—না না এটা মোটেই ভাল নয়। যে যার কাজ সারবে, তা একজন অন্য জনের জন্য বসে থাকবে কেন?

যাই হোক তিনজনে তৎপর হয়ে খাওয়া সেরে নিল। বিশ্রামে বিশেষ সময় দেওয়া যায় না। খানিক বাদে শিবশঙ্কর বলল—খোকা, মানিকের ওখানে তুমি শুদ্ধ যাবে ত?

—না বাবা, আমি আর বেরব না। তুমি বরং অজয়কে নিয়ে যাও। আমার সামনে পরীক্ষা এগিয়ে এল। সময় নষ্ট করব না আর, এই সময়টা একটু পড়তে বসি।

যদিও শিবশঙ্করের অমরেশই বল ছিল তবুও পড়ার কথা শুনে গুটিয়ে যেয়ে বলল—তাহলে তাই।

অজয়—হ্যাঁ বাবা, আমিই যাব, বৌদিকে দেখিনি এখনও।

—চল তাহলে বেরনো যাক।

অমরেশ—অজয়, তাহলে তুই কি ফিরবি?

শিব—না, ওর নাই ধরে রাখ। ফিরলে দুজনে একসঙ্গেই ফিরে পড়ব।

ধীর স্থির সংযত অমরেশ মহা উদ্যমে নিজের পড়ায় মনোনিবেশ করেছে। নানান ঝামেলায় তার দিনের যত সময়ই কাটুক, এই একটা গুণ তার—যখন সে পড়তে বসে তখন বইয়ের অক্ষর ছাড়া কিছু ভাবতে জানে না। যার ফলে এত করেও ছেলেটি পরীক্ষায় বরাবর ভাল ফলই করে চলেছে। খুব ভাল না হলেও পাস তার আটকায় কে! এ সময় সে বড় একটা কাউকেই বরদাস্ত করে না। ফালতু আড্ডা ত দূরের কথা।

কিন্তু সে যাকে ভয় করে সেই স্বয়ং তার দুয়ারে আজ হাজির। সত্যিই কি অমরেশ ভয় করে না সময় নষ্টর চিন্তা করে?

—কে?—দুয়ারে কড়া নড়তেই অমরেশ বইয়ের পাতায় মুখ রেখেই উত্তর দিল। উত্তর নেই। তখনই একটু হচকচিয়ে গেল। আবার কড়া নড়তে একটু বিরক্ত হয়েই ভাবল কেউ ইয়ারকি করছে। কিন্তু তার দরজায় কেউই ত এরকম আসবে না। চ্যাংনা ফচ্‌কের দল ত দূরর কথা মেসের ম্যানেজার ভদ্রলোকও বেশ একটু সম্ভ্রম করে—সম্মান দেয়। সারাদিন যে সব লোকের যাতায়াত চলে!

অমরেশ উঠে আসতে বাধ্য হল। দরজাটা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমরেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একি, আমি ত চেয়েই ছিলাম আর দেখা করব না। যা হবে চিঠির মাধ্যমেই হবে। ছুঁয়ে গেল অমরেশের মনে—নারী জাতির নির্লজ্জতা। তার মনে একটা গাঢ় ধারণা ছিল—পুরুষই আগায়। কিন্তু না তা নয় সব সময়। কোথাও পুরুষ পা বাড়ায় কোথাও নারী আসে ঘর থেকে বেরিয়ে। এমনও কোথাও কোথাও দেখা যায় পুরুষ এড়িয়ে যেতে চাইলেও সে যেন পথ পায় না। নাছোড়বান্দা অসহায় ভাবে সে তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অমরেশের কি চেষ্টাই না সুরু হয়েছে। ধন্য নারীর নির্লজ্জতা। হোক না অমরেশ একটি ভাল সুপাত্র তাই বলে তার কর্মের দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজের স্বার্থ পূরণ করাটাই কি গীতিকার জ্ঞানে উচিত বলে মনে হল!

গীতিকাও একটু থমকে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চাইল। অমরেশ ভয় বা চমকানোর ছেলে নয়। তাই সে বলে উঠল—তুমি দেখছি নির্ঘাত এবারে ডুববে। এস ভিতর দিকে। কি ব্যাপার বলত?

গীতিকা ঘরে ঢুকল বটে কিন্তু কোন কথা নেই।

অম—কি আমার চিঠিটা নিশ্চয় পেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আজকে কি মনে করে?

—মনে আবার কি!

—না আমি ভাবছিলাম তুমি এখন খুব পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকবে। কারণ হাতে ত আর বেশী দিন নেই। আমি ত ভেবেছি এবার আমিই ডিগবাজী খাব, তুমি বেরিয়ে যাবে। কারণ যে ঝামেলা আমার চলছে।

গী—থাক খুব হয়েছে।

অম—কেন খুব হয়েছে কেন? তুমি দিনরাতই পড়াশুনা করবে, তোমার আবার কি কাজ!

গী—অজয় কোথায়, অজয়কে দেখছি না?

অম—তাই ত বলছি—এই তিনটের সময় খেয়ে উঠেছি—বাবা এসেছেন বোনের বিয়ের সব কেনাকাটা সেরে বেরিয়ে গেছেন দাদার ওখানে, সঙ্গে অজয় গেছে।

গী—থাক তোমাকে আমায় কয়েকটা কথা বলবার আছে। বলতে পারি কি?

অম—আর বলার জন্যই যখন এসেছ, না বলে যাবে কোথায়। বল, তবে সংক্ষেপে। কারণ পরীক্ষার সময় বাজে কথায় সময় নষ্ট না করাই বাঞ্ছনীয়—কি বল?

গী—তাহলে থাক।

অম—এই তো এইগুলোই মেয়ে জাতের স্বভাব বড্ড খারাপ। ছোঁয়ার অপেক্ষা, যেন হাওয়াই পুতুল বাতাস লাগলেই গুটিয়ে যাবে। এত টুনকো মন কেন?

গী—তাই যদি মনে কর তাহলে এই টুনকো মনে ঘা না দিলেই হয়।

অম—ও কি আর কেউ দেয় না কি, ও যার হয় তার আপসেই হয়।

গী—এমনই ঘা দেওয়া এতক্ষণ যে এসেছি একবার ত বসতেও বললনি।

ও তাইত! যাক নানা চিন্তায় বলা হয়নি, সেটা ক্ষমা করে এবার বস। কি বলবে তাহলে এখন বলা সুরু কর।—একটু থেমে বলল অমরেশ।

গী—আমার সম্বন্ধে কি ভেবে রেখেছ বলদেখিনি?

—কৈ বসলে না যে!

—হ্যাঁ বসছি নাও না।

গীতিকার বসা মানে সে এমনই বসা অমরেশের গায়ের পাশে সে না বসে পারল না।

হ্যাঁ, পাশে বোন বসেছে এই মনে করি না।—এই ভেবে অমরেশ সহজ হয়েই গীতিকার মুখের দিকে চেয়ে বলল—নাও নাও স্বরু কর।

—স্বরু আব করব কি—তুমি ত সবই জান।

—তার মানে?

—এখন দেখছি বোনের বিয়ের জন্য সব কিছুই ভুলে যেতে বসেছ।

—তা ত হবেই বোনের বিয়ে, পরীক্ষা—দুটো মাথায় ঘুরছে—কর্তব্য আর কর্ম।

—তাই বলে কি নিজের দিকে একটুও তাকাতে নেই?

অম—গীতিকা, কি বলছ! আমার দিকে চাওয়া!

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলছি, ভেবে দ্যখ একটুখানি। এমন করেই নিজেকে ভুলে কেউ কাজ করতে পারে!

—গীতিকা, তুমি জেনে রেখো, যদি কেউ অনেককে ভালবাসতে চায় তবে তার নিজেকে আগে ভুলে যেতে হবে। যে নিজেকে ভালবাসবে জানবে সে আর কাউকে ভালবাসতে পারে না। দেখেছ তুমি কি কথাটা বললে—নিশ্চয় তুমি তোমার নিজেকে ভালবাস বলেই আর একজনের ভালটা তোমার ভাল লাগল না।

—হ্যাঁ তা যদি বল তাই।

—বলব কি, এ তো তোমার ভাবে ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে। তোমার যা ভাব ভাষা আমার ত আর তা হলে চলবে না।

—তাই বলে তুমি আমাকে এরকম ব্যথা বেদনা দিচ্ছ কেন? তুমি যদি জেনেইছ আমি আমাকে ভালবাসি তাহলে সে ভালবাসায় খোরাক দিলেই পার।

—এ ত মহা মুশকিল! আমি যে আমাকে ভালবাসি না। তাহলে আর তোমার খোরাক জোগাব কি করে বল?

গী—যাক অত বুঝি না এখন ধনঞ্জয়ের ব্যাপারে কি করা যায় বল?

—ধনঞ্জয়!

— এই দেখেছ ত সব জেনেও ন্যাকা সাজছ।

—না না ও কথা বলো না। হয়ত কবে কোথাও একখানি কিছু হয়েছে তা ভুলেই গেছি।

—হ্যাঁ সে যে এখন দিনই আমার বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করেছে আজকেও তার আসার কথা, আমি ফাঁক কেটে চলে এসেছি এখানে।

অম—কি ব্যাপারটা বলত? কি বলতে চায় ও?

—কি আর বলবে! ধূর্ত্ত পুরুষকে ত আর চিনতে বাকী নেই। কোথা থেকে কিছু বুঝতে পেরেছে যে তোমার পদাঘাত আমার দিকে এগিয়ে এসেছে সেই সুযোগেই উনি এসে আমার রাস্তা দেখাচ্ছেন।

অম—গীতিরা, একটা কথা কি খুব ঠিক নয়, তুমি নিজে যদি ঠিক হও তাহলে সে পাত্তা পাবে না।

গী—অমরেশ, তুমি জানবে, পুরুষ আর নারী অনেক তফাং। নারীর মন সব সময় দুর্ব্বল।

অম—আবার এই কথাটাও কি ঠিক নয় যে, মনে দুর্ব্বলতা নিয়ে আসলে আরও দুর্ব্বলতা যেন বেড়ে যায়। মনকে সব সময় সহজ সবল সাহসী করে তুলতে হবে। তারপরে তোমার মত মেয়ে। তুমি ত গ্রামের কোন মূর্খ রমণী নয়। রীতিমত পাঁচরকম দেখেছ—বেশ কিছু জান বোঝ।

গী—অমরেশ, তোমার সঙ্গে কথা বলাটাই ভুল। তুমি কি বোঝ—কোন একটি যুবক একটি যুবতীর ভালমন্দ বিচার না করে, অনবরত তাকে যদি ভালবাসি বলে তার রূপ গুণের তারিফ করে চলে—মুগ্ধ বিস্ময়ে যদি পাঁচটা কথা বলে তাহলে মনের কি অবস্থাটা হয় বল দেখিনি?

অম—বেশ বলেছ, কিন্তু যার তারিফ করছে সে ত একটু তলিয়ে চিন্তা করে দেখলেই পারে তার নিজের কোথায় দোষ আছে।

গী—আরে এটা বুঝছ না কেন, সে দেখছে বলেই ত তার খটকা লাগছে। সেইজন্যই ত সে বলছে। আর সে নিজে তার দোষের যত ব্যাখ্যা করছে ও তার ততই পাঁচটা গুণের প্রসঙ্গ তুলে ঢাকবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আর অমরেশ একটা কথা কি তুমি বোঝ না—মানুষের স্বভাবই হচ্ছে—তোষামোদপ্রিয়—যদি তাকে কেউ ভাল বলে তার কোথায় যেন একটা দুর্ব্বলতায় হাত পড়ে।

অম—কথা যা বলছ সবই ঠিক, তবে সেই ঠিকের মাঝেও সত্য এই নয় কি

—আমার দুর্বলতায় হাত পড়বে বটে কিন্তু আমাকে শুধু এড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে বুঝাতে হবে বলতে হবে। দরকার হলে হয়ত পাঁচটা কড়া কথা বলতে হবে।

গীতিকা অমরেশের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। অমরেশ গীতিকার চোখের উপর চোখ রেখে শুধু বুঝাতে চাইল। কিন্তু গীতিকা বুঝেও বুঝতে চাইল না। অমরেশ আবার মুখ খুলতে বাধ্য হল।—গীতিকা আমার মধ্যে যা দেখেছিলে তুমি—যা চেয়েছিলে তা কি আমি দিতে পেরেছি? তুমি কি তা পেয়েছ? আমি অনেক রকম চেষ্টা করে যখন দেখলাম কিছু হবার নয়, তখন চিঠির মাধ্যমে তোমার সঙ্গে ভাব রাখব এইটেই স্থির করেছিলাম। কারণ আমি দেখি আমাকে আনতে হবে প্রীতি। গীতিকা এ বয়সে ছেলেমানুষ। যদিও দু'জনের আমাদের দেহ-মনের একই অবস্থা—নিছক খাদ্য খাদক সম্পর্কটাই এখন স্বাভাবিক; তার উপর আমি পুরুষ। কিন্তু আমার যে এ সব চলে না। চলবে না। তুমিও দেখছি বুঝবার মেয়ে নয়, বুঝতে চাইছ না। অতএব সমাধান কি? তাই আমাকে কঠিন হতে হ'ল। এখানে কি বলবে—বয়সের গুরুত্ব না জ্ঞানের গভীরতা? আমি যে বয়সে যেখানে থেকে তোমাকে সরিয়ে দিয়েছি সে বয়সে কি তাই সম্ভব? আমি কিছুই বুঝি না। সবচেয়ে ভাল লাগে আমার দেশকে। দেশ বলতে বখাটে, যেখানে এক খেলা শোনায়। চাই গণ্ডীকে গুছাতে। তাহ বলো কি সারা জীবন ধরে কোন একজনের উদ্দেশে মালা গাথা কি আমার সাজে! কাজেই পাঁচজনের তৃপ্তি দেখতে গেলে একজনকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

গা—অমরেশ! হাতটা চেপে ধরে ধরা গলায় বলে উঠল—সেই পাঁচজনের একজন কি আমি নয়!—টপ্ করে অমরেশের হাতে এক ফোঁটা জল পড়ে গেল।

সহজ গলায় অমরেশ বলল—ছিঃ গীতিকা, তুমি কাঁদছ!

—হ্যাঁ আজকে কাঁদার মতনই আমার অবস্থা এসেছে।

অমরেশের শক্ত ইস্পাতের মত মন সহজেই দুর্বল হয়ে যায়। এক ত নারী তায় আবার চোখে জল। অমরেশের হাতের উপর গীতিকার হাত। অমরেশ তায় সজোরে চাপ দিয়ে বলে উঠল—গীতিকা, তুমিও সেই পাঁচজনের মতন হও আমার কাছে। আমার ভালবাসা তোমাকে ঘিরে অমর অটুট থাক। দ্যাখ

এবার শেষ ভিক্ষা তোমার কাছে আমি চাই—তুমি আমায় সাহায্য কর। —আমার পথ পরিষ্কার করে দাও—দাও আমায় অসীম মনোবল। জীবনের সব কিছু দুর্বলতার পরিসমাপ্তি যেন এইখানেই ঘটে।

—অমরেশ! আমি যে তা পারছি না, কিছুতেই মনকে বাঁধতে পারছি না। সব সময় মনে হচ্ছে—যে আমার গোটা বুক অধিকার করে বসে আছে তাকে কেন বাইরে পাই না! এত বাধা এত বিঘ্ন—যদি পাবই না তবে এমন করে সারা বুক জুড়ে বসল কি করে! এ প্রশ্নের জবাব যে আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

অমরেশ হাতের হাত ছেড়ে দিয়ে দুটি গালের উপর দুটি হাত রেখে গীতিকার মাথায় মুখ নামিয়ে বার দুই চুম্বন করে বলে উঠল—নিশ্চয় এর উত্তর তুমি খুঁজে পাবে। ভেবে দ্যাখ দেখিনি—এক্ষুণি এর উত্তর তুমি পেলে কি না?

গীতিকা চোখ তুলে সোজা চাইল। অমরেশ সহজ ভাবেই বলে চলেছে—আমি তোমার মাঝে চিরস্থায়ী বলেই—আমার অধিকার চিরকালের, তাই ক্ষণস্থায়ী প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছ না। তুমি আমার স্নেহের ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার আমার মধ্যে যে চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন উঠছিল বা আজও যা তুমি কাটিয়ে উঠতে অক্ষম তার মধ্যে আমাদের দুজনকে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টার মূলে স্থায়ী করতে হবে প্রীতি। যার কোন ক্ষয় নেই। যে দিনে দিনে অমৃত পান করতে পারবে, যার কোন দাবী দাওয়া নেই, চাওয়া পাওয়ার পরোয়া করে না যে, সেই প্রীতিই আমাদের দু'জনের মনকে নিবিড় করে বাঁধবে। চরম সুখ পরম শান্তি জানবে এই প্রীতিই দান করতে সক্ষম।

গালের উপর হাত দুটো রেখে শেষ অমরেশ বলে উঠল—বোন, ভগ্নী স্নেহই তোমাকে যেন চিরদিন করে যেতে পারি। আর তুমি যেন তোমার মনের সকল চাওয়া পাওয়াকে স্তব্ধ করে বুকজোড়া দাদাকে বুকেই রাখতে পার। যে রাখার মধ্যে বুকের নাই ক্ষয়, হবে অক্ষয়—তাই নয় কি বোন?

গীতিকা অমরেশের হাত দুটি নিজের গাল থেকে নামিয়ে শূণ্যে ধরে রেখে বলল—অমরেশ, তুমি যা বলছ আমি কি তা হতে পারব?

—কেন বোন, না পারার কি আছে? মানুষ চেষ্টা করলে কি নাই পারে।

—তাহলে তুমি আমায় কথা দাও—তুমি যা করবে আমিও তাই করব, তোমার পাশে পাশে আমাকে থাকতে দেবে? তোমার কর্মই হবে আমার

কর্ম, তোমার স্বপ্নই আমার স্বপ্ন। যে বুক অধিকার করে তুমি রয়েছ সে বুক আর কেউ ভাগ নিতে আসবে না বা ভাগ দেওয়া নেওয়া কোন প্রশ্ন উঠবে না। আমি হব তোমার সাহায্যকারী। সহধর্মিণী না হতে পারলেও সহকর্মিণী হব।

অমরেশ—গীতিকা, তোমায় আমি কথা দিচ্ছি তুমি যা চাইছ তাই হবে। নিশ্চয় তোমার এই আক্ষেপ আশা ঈশ্বর পুরণ করবেন একদিন। তবে বর্ত্তমান নয়।

বলেই হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে গীতিকার মাথাটা সে নিজের বুকে টেনে নিল। সস্নেহে চুম্বন করে বলল—লক্ষ্মী বোন, শান্ত হও। সহজ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাও। সত্যিই যদি তুমি আমাকে ভালবাস—আমার মত পথকে গুরুত্ব দাও তাহলে মা হয়ে এসে দাঁড়াও। তখন কারও কিছু বলবারও থাকবে না, আর তোমার আমার মধ্যে যে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেছিল সে আগুনেরও তেজ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। সেই হবে উত্তম। এখন কিন্তু এ সবের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। তুমি যুবতী আমি যুবক। তোমার ক্ষুধা আছে নিশ্চয়ই তুমি চেপে দিতে বাধ্য; আর আমার ক্ষুধা আছে কিন্তু আমি ক্ষুধা মিটানো প্রয়োজন মনে করি না। এমত অবস্থায় দুজনে এক জায়গায় থাকাটা কি বাঞ্ছনীয় মনে কর? আর আমার পক্ষেও এটা হবে অসম্ভব, অসহ্য। আমারই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিলে তিলে একজন আমারই জন্য শুকিয়ে মরবে—এ কি করে হয়?

গী—তাহলে তুমি আমাকে কি করতে বলছ?—বুক থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশ্ন করল।

—কি করবে!

হঠাৎ দারুণ সহজ হয়ে গিয়ে অমরেশ সাধারণ কথা শুরু করল—এখন! সামনেই পরীক্ষা, মন দিয়ে পড়াশুনা কর, পাস আমাদের করতেই হবে। তারপরেই উঠবে তোমার বিয়ের প্রশ্ন, তুমি জেনে রেখো তোমার পিছনে আমি সব সময় রইলাম। আমাদের মধ্যে যে চাওয়া পাওয়া সেটি একেবারে চুকে যাক। তার পরিবর্ত্তে আসুক প্রীতি স্নেহ ভালবাসা।

খানিকক্ষণ বিচ্ছিন্ন দুজন নীরব থাকার পর অমরেশ বলল—বস চা খাও, চা আনি।

গী—কোথায় চায়ের সরঞ্জাম বল, আমি চা করে দিই।

—তুমি করবে, আচ্ছা কর—চল।

গীতিকা চা করার মন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অমরেশ হাতের কাছে সব গুছিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। আজকে অমরেশের চোখে গীতিকাকে সেই প্রেমিকা দেখাচ্ছে কি? মেসে তার পাশে আজ স্নেহ মমতা জড়িত এ কোন্ গীতিকা! আর এই কিছুক্ষণ আগে গীতিকা যে মন, যে জ্বালা নিয়ে পুড়ে মরছিল তা কি এখনও তার মধ্যে বর্তমান? এত অল্প সময়ে কোন্ মহামন্ত্র গুণে অমরেশ সব কিছুকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। সেখানে আবার কোন্ এক নূতন গীতিকার জন্ম হল! এর মাঝে এখন কি আর খুঁজে পাবে সেই স্থূল চাওয়া পাওয়ার আকর্ষণ? কিন্তু দাবী কার বেশী—কে স্থায়ী? স্থূল প্রেমের আকর্ষণে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবনটাকে সকলে ফুরিয়ে দেয়। চাইলেই হারাবার প্রশ্ন উঠে। এখানে নেই তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন। স্থূলের সমস্ত দাবী দাওয়া ঘুচিয়ে স্থায়ী ভাবে কে কাকে চায়! সে কি সহজ! কে পারে উদার হয়ে একান্ত আপনার জনকে দূরে সরিয়ে আপনার করে রাখতে? নিঃস্ব হয়ে নিজেকে না বিলিয়ে দিতে পারলে ত এ স্তরের চিন্তা চলে না। আজ কি গীতিকা অমরেশের মধ্যে বন্ধন আরও নিবিড় হল না? পরস্পর পরস্পরের জন্য শুধু শুভ আকাঙ্খাই করে যাবে। নিঃস্বার্থ ভালবাসাই হবে উভয়ের মধ্যে সঞ্জীবনী সুধা।

গীতিকা চায়ের কাপটা অমরেশের দিকে এগিয়ে বলল—নাও ধর।

—কৈ তোমার?

—আমারটা আনছি।

—দাঁড়াও বিস্কুট দু'খানা করে আনি।

—আর নিয়ে আসতে হবে না চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আমায় বল আমি আনছি।

—তুমি আর কোথা থেকে আনবে! নীচের দোকান থেকে কিনতে হবে।

—কেন বিস্কুট না হলে তোমার চা খাওয়া হবে না?

—আঃ গীতিকা বুঝতে পারছ না—যদি তেমনই হবে তাগিদ, তবে নিশ্চয় ঘরে থাকত।

—না তাহলে আর আনতে হবে না।

—তুমি শুধু চা খাবে?

—অমরেশ, এখনও তুমি তোমার গীতিকাকে এই কথা বলবে? তাহলে বুঝতে হবে এ তোমার গীতিকা নয়।

—না না গীতিকা এ কথা বলছ কেন! তোমার জীবনে অনেক ভাঙ্গা গড়া চলবে।

—তা চলুক না কেন, মনত আর ভাঙ্গে ভাগ হবে না। ভাবের ভাঙ্গা গড়া চলবে।

অমরেশ গীতিকার মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল—ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

গীতিকা অমরেশকে থামিয়ে দিয়ে বলল—অমরেশ, ঈশ্বর বলে আমি কিছু জানি না। আমার অন্ধকারও তুমি আমার আলোও তুমি। সেইজন্য তুমি জেনে রেখো, আমি আজ থেকে যা কিছু করব জানবে শুধু তোমাকে লক্ষ্য করে। আর এই কথাই ভাবব—কবে এসে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ধর্মে কর্মে সাহায্য করব।

অমরেশ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—গীতিকা, রাত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। চল তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

গীতিকা—না তোমার পড়াশুনার সময় ক্ষতি করে উঠতে হবে না।

—তাই বললে কি আর চলে! আজ না উঠে পারি। সহজ সম্পর্ক সহজ পা ফেলে চলে। আজ আর লজ্জা সঙ্কোচ পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরবে না। চল।

সঙ্গে বেরিয়ে অমরেশ বাস ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল। গীতিকা খুব হাল্কা কয়েকটা কথা সুরু করল।—আচ্ছা অমরেশ, বাবার কি এখন কয়েকদিনের মত বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয়?

—কেন, উনি কি এখনও বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি?

—উনি ত বলবেন সুস্থ হয়ে গেছি, কিন্তু ভাবদেখিনি অসুখটা কি রকম করেছিল এবং সেরে উঠার পর থেকে বিশ্রাম নেই।

—অথ যারা দায়িত্বপূর্ণ লোক হয় তাদের এই রকমই অবস্থা ঘটে। বসে বিশ্রাম তারা কোন কালেই নিতে চায় না। বিশ্রামের ব্যাখ্যা তারা অন্যরকম দেয়।

—তা বললে আর চলে না, আমাদেরও ত দেখতে হবে।

—হ্যাঁ সে কথা ত ঠিকই। তাহলে এক কাজ কর সামনে পরীক্ষা যখন এসে গেছে, দিয়ে নাও, তারপর বরঞ্চ বেশ কিছুদিনের মতন বাইরে কোথাও যাও।

—তখন ত আবার বলে বসবেন—এ সময় কি বেরনো চলে কলেজ ইউনিভারসিটির যত কাজ ত এই সময়!

—তাইত বলছি না গীতিকা এসব মানুষের কখনই ছুটি নেই। এদের কাছে বিশ্রাম মানেই বিশেষ ধরণের শ্রম।

অদূরে বাস দেখে ওরা ওদের কথা থামিয়ে দিল। বাসে তুলে দিয়ে অমরেশ পা বাড়াতে পিছন দিকে হঠাৎ গীতিকার মনটা কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল। উভয় উভয়কে ভাল করে দেখবার সময়ও পেল না। তার আগেই বাস ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। ঘরে ঢুকতেই যেন এই অমরেশের কোথায় যেন একটা খটকা লাগল। আজ যেন সে গীতিকাকে একেবারেই বিদায় দিয়ে এল। গীতিকা অনেক কষ্ট বরণের পর সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। গীতিকা অমরেশকে বিদায় জানায় নি অমরেশই গীতিকাকে বিসর্জন দিল। তিলে তিলে গীতিকার মনে যে ভালবাসা বাসা বেঁধেছিল অমরেশ তা আজ পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সেই অমরেশ আমি—কি কঠিন কি পাষাণ তার মন! হঠাৎ যেন তার মনটা ডুকরে কেঁদে উঠল। কেন, সে না হলে আমার সাথিই হতে চেয়েছিল। পাশে গীতিকা থাকলে আমার কাজের এমন কি অসুবিধা হত? বরং আমাকে সাহায্যই করত। সত্যিই কি তাহলে আমি পাষাণ? আমার মমতা, হৃদয় বলে কি কিছুই নেই? ওর চোখের জল কি আমার কাছে একেবারেই অর্থহীন? হঠাৎ অমরেশ নিজের সম্বিৎ ফিরে পায়—না না না এ সব কি আমি আবোল তাবোল ভাবছি। আমি হৃদয়হীন পাষাণ কে বলে? যদি বলি সত্যই আমার হৃদয় দয়া মায়ায় ভরা? সামান্য চাওয়া পাওয়া নিয়ে চিন্তার মূলে আমি আমার এরকম বিচার করছি কেন? সত্যিকারের ভাবতে গেলে জীবনের যা কিছু সার্থক অর্থ, সব এর মূলে পূর্ণতা লাভ করে। আমি ওর শুভ চিন্তা শুভ কামনা করব, ওর প্রতি আমার ভালবাসা হবে নিগূঢ় নির্মল। আমি ওর কাছে কিছু চেয়েছি বা নিয়েছি এ প্রশ্ন যেন কোন দিন না উঠে। আমাকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে যে ক্ষুধা ওর এসেছিল সে ক্ষুধা মিটানোর, আমার তরফ থেকে, কোথাও বারণ রইল না ত। ও ওর দেহের চাওয়া পাওয়া ঠিকই মেটাবে। শুধু আমার দেহের

প্রয়োজন মেটানোকে আমাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। ওর বিয়ে ওর সংসার নিখুঁত করে আমায় লক্ষ্য করে যেতে হবে। ওর জীবনের সকল ঝড় ঝাপ্টার মাঝে গিয়ে আমায় দাঁড়াতেই হবে। তখনই প্রমাণ হবে আমার নির্মল নিঃস্বার্থ ভালবাসার। তখনও কি গাতিকা তার অমরেশকে ভুল বুঝবে! আজ যে অমরেশের উপর যে দুঃখ অভিমান নিয়ে সবে দাঁড়াল সেদিনও কি সেই সবের প্রশ্ন উঠবে

ঘরে পা দিয়ে তার ভিতরটা কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল। আরশিতে নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়তে সে স্থির দাঁড়িয়ে গেল। মনের এ কোন্ অবস্থা? এমন করে নিজেকে সে ত কোন দিন অনুভব করে নি।

হৃদয় আমার কাঁদে রে কাঁদে রে।
কাহারে সে যেন মাগে রে—
মাগে রে।
হৃদয় আমার কেন শুধু কাঁদে রে
কাঁদে রে?
শুধু কি কাঁদে শুনি!
কাঁদায় সে যে আমায় বুঝি--আমায়
আমায় কেন সে না জানি।
হৃদয় আমার কাঁদে রে কাঁদে রে
কাহারে সে মাগে রে!

শুধু শুধাই আমি—আমি তারে
হৃদয়, তুমি কাঁদ কেন—
কেন নাচাও শুনি অমন করে?
হৃদয় হৃদয়
আমি শুধাই তোমায় শুধাই জেনো
ও হৃদি হৃদি, আগে আমায় বল—
আমার এ বেদনা শোন।

কেন মন অমন করে
যায় ছুটে যায়
দূর—দূর দিগন্ত পারে !
হৃদয় আমার কাঁদে রে
কাহারে সে—
কাহারে সে মাগে রে !
ও হৃদি, তোমায় বলি শোন—
যেও না যেও না তুমি
কেঁদো না কেঁদো না
কারো না গোপন আমায় এখনো

হৃদয় আমার উদাস হয়ে তাই
কে যেন আসবে বলে
শুধু ভয়ে ভয়ে আমারে—
আমারে শুধায়-শুধায় ।
নাচে হৃদয় আপনি জানি ।
ও হৃদয়,
বন্দী তুমি বন্দী জেনো,
কারাগারে রেখেছি তোমায় আমি !
হৃদয়, পারবে না পারবে না
তবে কেন তুমি অমন করে
দাও আমারে ভাবনা !

হৃদয় আমার হৃদয় আমার আমার
সুন্দর —সুন্দর জানি ।

হৃদয়, কাহার লাগি কাহার আশায়
অমন করে—
অমন করে অন্ধকারে
রও দাঁড়ায়ে তুমি !
তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর।
জেনো তুমি জেনো মনে
করিব তোমায় অল্পক্ষণে
অতি মনোহর আমি।
হৃদয়, তুমি সুন্দর—সুন্দর—
সুন্দর জানি।

তবে কেন—
তবে কেন তুমি অমন করে
ভাব বসে
বসে ভাব একা—
একা ঘরে !
চল হৃদয হৃদয় তুমি।
জেনে রেখো নামটি তোমার।
তুমি—তুমি গুণমণি—
তুমি আমার সঙ্গিণী।

তোমায় নিয়ে যাব নিয়ে যাব,
আপন হাতে গড়ব সেথায়—
সেথায় গিয়ে।
নাম দেব যে—
দেব নাম তোমার তাতে।

হ্লাবে গলে তুমি,
ছবি হবে সবার কাছে,
হৃদয় রতন বটে।

হৃদয়, হৃদয় আমার—আমার
জানি সে কাঁদে।
কেন কাঁদ শুনি ?
কারে মাগ কারে চাও—চাও ?
কেন অধোবদনে রও দাঁড়ায়ে
ভাবি যে আমি।
হৃদয় আমার হৃদয় আমার
আমার জানি।

ও হৃদয়, তাই ত বলি—
কেন অমন করে—
অমন করে আড়াল করে
কর ছলনা ?
আমি তাই বলি—
হৃদয়, ভুলে যাও সকলি তুমি।
জেনে রেখো আজ হতে তাই
হবে তুমি হৃদয় রতন।
সবারে—সবাবে দেবে—
করিবে চমকিত।
আলো পাবে তোমা হতে।
ভুলে যাও কেন তুমি
হৃদয় আমার
আমার ?

বইয়ের সেই পাতাটা তখনও সেইরকম খোলা পড়ে। সেদিকে চোখ পড়তে চিন্তা সূত্র ছিন্ন হল। মুহূর্তে সব চিন্তা ভাবনা দমড়ে দিয়ে সে স্থির মনে শুধু এইটুকুই স্থির জানল যে যা করেছি ঠিক করেছি, যা সেরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে জন্মে, তারই পিছনে ছুটতে হয়। তবেই না দুর্লভ জীবনের সার্থকতা! গীতিকার হয়ত কষ্ট হবে। কিন্তু এ কষ্ট কতক্ষণ! নিশ্চয় সে সামনে উঠবে।

গীতিকার নবজন্ম হল—এই কথা ভেবে মনটা তার বেশ হাল্কা বোধ হয়। আর বিন্দুমাত্র সময় খুয়ার না করে সে বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করল।

[ উপন্যাস প্রথম খণ্ড শেষ হল। মন ভরলেও কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি ছুঁয়ে যায়। কিন্তু তা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। খুব ভাল কি বুঝি ছাই যে সমালোচনায় যাব। আমাদের অজ্ঞতাই মূলধন। আক্ষেপকে কোন্ জ্ঞানে সার্থক রূপ দেব! তবে একটা কথা খুব সত্যি, আমাদের আবোল তাবোল আবদার গুছিয়ে নিয়ে মায়েব অনন্য সাধারণ সৃষ্টি।

আজ সকালে সংসারের শত কাজের ঝামেলা ঠেলে মা এক ফাঁকে এসে বলেন—নে কলম ধর। পরক্ষণেই প্রশ্ন করলেন—কি গাইব বল? আমরা দু'ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি প্লট—মায়ের ক্ষেত্রস্থলে দাঁড়িয়ে বিচার ও সর্বকালের প্রতিভা প্রসঙ্গে কথা তুললাম।

মা সুরু করার আগে কয়েক কথা বলেন—তোদের মনের উপরি ভাগে যা হচ্ছিল সেটা তোরা মনকে এবং বাস্তবকে লক্ষ্য করে উভয় সমন্বয়ের মধ্যে এই জিনিস ব্যক্ত করলি। এ তোদের সত্যকারে কথা নয়। এবার যেটা তোদের গভীরে সেই জিনিসটাই আমি বলছি। তবে তোরা যা মনে করে বললি সেটাও আমি উত্তর দিতে রাজী আছি, বলব। ]

আমি একাকিনী ঘরে
বসি উদাসীন হয়ে হায় গো।
আমি একাকিনী ঘরে বসি উদাস হয়ে,
খুলে রাখি দুয়ার গো।
কার প্রতীক্ষায় কারই আশায়!
সে ত এখনো এলো নাই গো।

আমি একাকিনী ঘরে, বসি দুয়ার খুলে—

কার আশায় হেথায় গো।

সে যে আমায় কাঁদাবে বলে

ফেলে গেল —সে গো চলে।

আমি কেমন করে রব গো হেথায়।

আমি কেমন করে রব গো হেথায়।

যদি আমি পাখী হতাম

উড়ে যেয়ে বেঁধে নিতাম

আমার এ ডানায় গো—

আমি আমার এ ডানায় গো।

সে যে আমারে ফেলে গেল চলে

আমি জানি যে

আমার-ছাড়া নয় গো।

আমি কেমনে এ মনে বুঝাই গো।

আমি দরজার পাশে

শুধু দেখি এসে

এখনো কেন মিলে নাই গো।

আমার নয়নের পাশে

আঁধার যে আসে

আলো কেন খুঁজে পাই নাই গো।

আমি আলো কেন খুঁজে পাই নাই গো।

কাহারি প্রতীক্ষায় রহেছি হেথায়,

সেকি আসিবে না ?

দেবে না সাড়া—
দেবে না আমায় গো ?
আমি আলু-থালু— আলু-থালু বেশে
বসি একা এসে।
কি যেন হারায়ে
খুঁজি হেথায় গো।

শুধু পদধ্বনি শুনি কানে জানি।
মিছে কি আমার ভ্রম দেখা—দেখা ?
কারে বা শুধাই গো !
আমি খুলিনু বাতায়ন ;
হায় হায়
যদি একবার দূরেতে তারে দেখা যায় !
কৈ কৈ এলো নাই এলো নাই ;

হঠাৎ কি মনে চমকিনু—জাগিনু যেন
ভাবিনু, স্বপন দেখেছিনু হেথায় গো।
আমি চমকিত হয়ে দেখিনু তাহারে,
তারই ছায়া আমাতে মিলায় গো।
কি যেন বলিতে চায় ;
ভেবে কিনারা নাহি যে—
নাহি যে পাই।
শুধু মনে হয় ছায়াতে ছায়া মিলায় গো।
আমি ছায়াতে ছায়া মিলাই গো।

[ মায়ের গান গাওয়া শেষ হল। মা প্রশ্ন করলেন—কে কাকে বলছে, কে কার জন্য বলছে ?

উত্তর করলাম—আমরা বলছি। আমাদের এক একটি ব্যক্তি-মনের বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

মা ছোট্ট একটা উত্তরে চমকে দিলেন—গীতিকা অমরেশের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে রাতে একা ঘরে বসে এক সময় এই কথা ভাবছে!

মা উঠে গেলেন। ঘরের কাজ মাকে ছাড়ে না। অবশ্য মা বলেন—"আমি কি ছাড়তে পারি!" খানিক পরে এই গানের সুরের রেশ কাটিয়ে উঠব কি আবার এক ফাঁকে মা বসে পড়লেন কাছে—'কলম ধরতে পারবি আবার?" না মানে! তিন চার জনে তৈরি হয়ে গেলাম। মা সুরু করলেন। ]

দিয়েছি বিদায় যারে
সে কি আর আসবে ঘুরে?
দিয়েছি বিদায় যারে
সে কি আর আসবে ফিরে?
ভুবন হতে তাই তাড়ায়ে দিয়েছি
আমি আসিতে দেব না—
দেব না হেথায়।
দিনু তারে তাড়ায়ে
নয়ন আমার আর ত যাবে নাই।
আমি দিয়েছি তাড়ারে—
আমার হেথায় নাই
সে ত নাই।

দিয়েছি তাড়ায়ে যারে
সে কি আর আসবে ফিরে!
অন্ধকার—অন্ধকার জীবনময় দেখিব
খুঁজিব তাহায়;

আমি দিয়েছি তারে বিদায় করে।
কভু ত দেখিস না কোথাও—
কোথাও তাই।

যেদিকে ফেলিব নয়ন দু'খানি
ভুবনের মাঝে দেখিব শূন্য জানি।
কোথাও কোথাও সেজন মিলিবে নাই
আমি দিয়েছি তাড়ায়ে ভুবন হতে
সে কি আর মিলাবে—মিলাবে হেথায়?

তবে মন কাঁদে কেন হায় রে—
হায় রে।
দুর্ভাগা মন দুর্বল তুই,
হারায়ে খুঁজিস তাই রে।

ও মন মন, তোর চিন্তা কেন শুনি?
ও মন, তবে কেন তারে দিলিয়ে
দূর হতে দূরে ঠেলে;
আজ করিস কেন হায় হায় রে।
ও মন, ক্লীবপনা তোর কি যাবে না।
তেরে তাই আগে শুধাইরে।

ও মন মন—
দিলি যখন তাড়িয়ে জানি
ভেবেছিনু মন খুঁজবি না আর
করবি না—
করবি না হায় তাও রে মানি।

মন, খানিক পড়ে পড়ল মনে
ধরল চেপে তোরে—
তোরে কে সে শুনি ?

খুঁজিস কেন অমন করে
চাস কেন মন বোকা উদাস হয়ে
যেন আবার পেলেও চাই
চাই রে।
ও মন—
তোর দুর্ব্বলতা দেখে আমি
কেমন যেন ভয় পাই রে।
ও মন, পাই রে।
সে যে আসবে না আর ঘুরে
চলে গেছে সে দূরে।
কাঁদিস না মন অমন করে।
আপন সঙ্গী খুঁজ রে
ও মন, আপন সঙ্গী খুঁজ রে।

মন, কারে খুঁজিস অমন করে !
মন, দেখাস রে তুই—
দেখাস রে তুই খুব সাহসী,
তোর বীরত্বের পরিচয় খুঁজে পাই নাই রে।
মন, অমন করে আড়াল হয়ে
কারে খুঁজিস কারে খুঁজিস
তোরে শুধাই রে।

আমি তাই দুর্ব্বল মনে
একবার পদাঘাত করিতে চাই রে।
আমি করিতে চাই রে।

ও মন অনেক দূরে—
দূরে দিয়ে এলি—
কেন খুঁজিস তবে হেথায় রে!
দূর দিগন্তে
অরণ্য—অরণ্য জঙ্গল প্রান্তে;
সে কেমনে আসিবে হেথায় রে!
সে কেমনে আসিবে হেথায় রে!

মন রে, অস্ত্র ধরে চল চলে চল।
আসিবার পথে
কাঁটা দেওয়া চাই রে।
ও মন, দিতে গেলে পথে কাঁটা
কেন বাজে বুকে—বুকে সেটা
মন, হেরে যাস হেথায় রে
ও মন, হেরে যাস হেথায় রে।

ও মন—
ভুবন হতে দিয়েছি—
দিয়েছি দূরে,
আর সে আসার সম্ভব নাই রে।
ও মন নাই রে।

মন রে—মন—মন রে।
যদি আমায় করিস পাগল শুনি
আমি দূর দিগন্তে রইব চেয়ে,
আমার হাতের কর্ম যাবে দূরেতে,
মন, আমি বল হারায়ে হব রে ক্লীব,
থাকবে না আর কিছুই আমার
চেয়েছ কি মম তাই রে—
চেয়েছ কি মন তাই রে ?

ও মন অবশেষে—
অবশেষে তোকে বলি একটু এসে
তাড়িয়েছি ভুবন হতে,
ভুবনে আসা—
আসার বাধা নাই রে—
ওরে আসার বাধা নাই রে।
ভুবনেতে আসার বাধা নাই রে

সেই খানেতে বাঁধব বাসা
কে দিবে বাধা—বাধা সেথা ?
কে দিবে বাধা সেথা !
ফুটব—ফুটব নূতন করে
গড়ব ভুবন তাই রে
ও মন, আমি গড়ব ভুবন তাই রে।

যারে হারিয়েছি আমি পাব না ত জানি
ওরে দিয়েছি হারায়ে অনেক ভেবে—

কাঁদিব না আর তাহার লেগে।

মন, আয় দু'জনায়

আয় রে।

মন, আয় দুজনায় আয় রে।

[ সবশেষে মা হাসতে হাসতে এই কথাগুলি বলে যান। এরই বা গূঢ় গভীর অর্থ কি, কে জানে!—কালকে গীতিকা, অমরেশ এসেছিল।—"আমাদের কি কিছুই নেই আর?"

অম—মা, আমাকে যদি না আর একটু জানিয়ে দাও তাহলে আমার ভাইয়েরা আমাকে ভুল বুঝবে। মহাপুরুষ মনে করবে। —'যেহেতু এটা অবাস্তব সেইহেতু আমরা আর চেষ্টা করব না।' আমি যে মা, অবাস্তব নয়—আমার যে ভিতরে ব্যথা ছিল—কষ্ট করে সংযম এনেছি বা বলিষ্ঠ হয়েছি সেটা ভায়েদিগে না বললে?

—সে ত আমি অনেক জায়গায় বলেছি, এরা না বুঝতে চাইলে!

—তা বললে কি হয় মা। মন তখন আবার সরস করতে হয়—এটা ভায়েদিগে তুমি বার বার করে বলে যাও।

গী—আমাকে তুমি যে এই বিশাল পথে আগিয়ে দিলে আমি শেষ জয়ী হতে পারব কি না, না সেই বিশাল পথের পরিশ্রম বেদনা শাস্তি সেগুলো আমার বোনেদিগে না জানালে বোনেরা ত আমাকে ভুল করবে, ভুল বুঝবে। সেই জন্য ভালবাসা ছাড়তে হলে কি অবস্থা আসে, সেটা বোনেদিকে বলে যাও। আর সত্যিকারের ভালবাসাটা কি? —জীবনে একবারই ভালবাসা যায়। তা না হলে সতীত্ব বা নারীত্বের মর্যাদা খুয়ার যায়।

মা—আমি তাই ওদের দু'জনকে বললাম। তথ মা, অনেক কিছুই ত বলা হয়ে গেছে। আর বিশেষ করে তোর কথাও অনেক জায়গায় বলেছি। তবে চল ঘরে। শেষকালে যে কয়েকটা কথা বলব সেইটাই তোর বোনেদের জন্য থাকবে।]

[ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, মৌলিকত্বের অভাব ত রয়ে গেছে, আজকাল সকলেই লিখতে চায়। তবে বাগিয়ে কলম ধরাটাই বড় কথা নয়।

একটা কথা ত খুব সত্যি, জীবন ব্যতিরেকে সাহিত্য হয় না। সার্থক দৃষ্টিভঙ্গি তথা যথার্থ জীবন দর্শনের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে। কিন্তু সর্বদিকের প্রয়োজন মিটিয়ে, কারো কোন আবেদন অগ্রাহ্য না করে যখন সাহিত্যের মাধ্যমে অলৌকিকত্ব প্রকাশ পায় তখনই তা পরম বিস্ময়ের কারণ হয়

অল্প কথায় কিছু বলা দরকার। প্রেসে কাজ চলছে। আমাদের এদিকের কাজ চুকে গেছে। একদিন সন্ধ্যা-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের সত্য সুধা প্রসঙ্গ আলোচনা সুরু হলে মা মায়ের বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। এক কথা ঠিক যেন নিতে না পারলেও মায়ের অন্যটা যুক্তির কাছে দাঁড়ানো দায়। মা পরিষ্কার জানিয়ে দেন—স্পৃহার তাগিদ অগ্রাহ্য অস্বীকার করার চেষ্টাই বলে দেয় তার কতটুকু সত্যসুধা। মায়ের বিচার বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সত্যসুধা সম্পর্কে কিছু বলবার অবকাশ রয়ে যায়। মা বলেন, রবীন্দ্রনাথ মানুষটা সত্য? হ্যাঁ সত্য। তার কবিতা সত্য? হ্যাঁ সত্য। এবার সেই কবিতা কোথা থেকে এসেছে, কি থেকে এসেছে—সেইটা বিচার করে দেখতে হবে। কি সত্য সেটা? প্রেমও সত্য প্রীতিও সত্য। আশা নয় [illegible]

প্রেম ও পূজা নিয়ে প্রশ্ন তুললে মা বলেন—মন্দিরপ্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে পূজারী হওয়ার ব্যাকুলতা। অনেককে অতিক্রম করতে না পারার দরুণ প্রাঙ্গনে গড়াগড়ি খেতে খেতে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় দক্ষিণা হাওয়ার আমেজে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। এ পূজা সাধককে জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ প্রেম দিয়ে ঈশ্বরকে বাঁধতে চেয়েছিল, জ্ঞান দিয়ে নয়। প্রেম নিস্পৃহ নয়। হলে ফল হত। ভোগের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। ধাপে ধাপে উঠে গেছে ভোগ। শেষ বলে যায় বসুন্ধরা, নাম যশ প্রতিপত্তি আমিত্ব ভোগেচ্ছা। এই প্রসঙ্গে মন্দিরে মায়ের সেদিনের বলা গল্প পরিষ্কার ধারণা দেয়। শেষ মা বলে দেন—স্পৃহার আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টা তার কোথাও ছিল না। অতিক্রম করার প্রশ্ন তার মনে কোন দিন জাগে নি। আবেগের এক ধারায় যুক্তি এক ধারায় ভাব। ভাব আবেগ সংযত করতে না পারলে ত জ্ঞান বিচার দাঁড়াতে পারে না। সত্যসুধা তাহলে বলবে কি করে! বরং বহু কবিতা লেখার নেশা তাকে পাগল করেছিল—সে কবি—কবিগুরু।

মা রবীন্দ্র সাহিত্যের কোন সমালোচনা করতে চান না। বরাবরই বলে এসেছেন, সাহিত্যে আবেগ মিশিয়ে আনন্দ পাওয়া ও দেওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকে সংসারে কল্যাণ হয় কি করে! আর স্পৃহার রাজ্যে দাঁড়িয়ে প্রকৃত জ্ঞান কি করে বিতরণ সম্ভব!

মুহূর্ত মাত্র মা নীরব থেকে গান ধরেন—

হৃদয় আমার কাঁদেরে কাঁদেরে
কাহারে সে যেন মাগে রে মাগে রে।

গানের শেষে প্রশ্ন করি—মা, হৃদয় কি আলো দেয়? আলো ত দেয় মস্তিস্ক।

মা—হৃদয় বলে আলাদা কিছু আছে কি? মন?—সে আবার কি! সবই সেই মস্তিস্ক। সেইখান থেকে আসছে সেই বেগ—স্পৃহা। এবার যুক্তি আন। হৃদয় আলো দেয়! হৃদয় কি রতন? হৃদয কি মণি? সবই অলংকার—সবই রূপক।

যা কিছু—সারা শরীরের কার্যালয় সেই মস্তিস্ক। সেই মস্তিস্ক থেকে বিভিন্ন ধারায় ভাগ করা হচ্ছে ত। বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন নাম দেওয়া হচ্ছে। যখন কেউ কারো কাছ থেকে চলে গেল বা এল তখন বেদনা বা আনন্দ মাথায় হল, না মনে হল?

—মনে।

—এবার মনটা কোথা থেকে আবিষ্কার হচ্ছে? সেই মাথা। কিন্তু বলা হচ্ছে কি, মনে। বুক ফেটে গেল। বুকটা এল কোথা থেকে? সেই মাথা। যা কিছু সব মাথা, কিন্তু বিভিন্ন জায়গার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কি? একজন দরদী ব্যক্তি। তাকে আমরা বলি হৃদয়বান লোক। হৃদয়বান যে বলা হল—সেই হৃদয়টা কোথায়? হৃদয় বলে কিছু আলাদা নেই। সেই ত মাথা। জ্ঞানে এল, বিচারে বসল তার দরদ জেগে উঠল। সেই দরদটা হৃদয় আখ্যা পেল।

—তাহলে মন চিত্ত অন্তর হৃদয়—সবই সেই মাথা!

—সবই সেই মাথা।

—কে কাকে বলছে বলদেখিনি? এই যে আমি গানটা বলে গেলাম এ গানটা কে কাকে বলছে? বলতে পারছিসনি?

আচ্ছা, দ্যখ—এই গ. টা পড়ে খুঁজে দেখবি—যখন বই-এর পাতায় চোখ তাকে দিতে হবে, তার আগে তার হৃদয় যে মোচড় দিয়ে উঠল সেই হৃদয়কে সে সংযত করছে। সংযম আনছে হৃদয়ের মধ্যে। সেই সংযম না আনলে সে বই-এর পাতায় মন রাখতে পারে না, খুঁজে দেখবি ত এবারে।

—অমরেশের কথা বলছ!

ঘরে পা দিয়ে তার ভিতরটা কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল। আরশিতে নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়তে সে স্থির দাঁড়িয়ে গেল। মনের এ কোন্ অবস্থা? এমন করে নিজেকে সে ত কোন দিন অনুভব করেনি।

—যখন সে বিদায় করে দিয়ে চলে এল—সেই হৃদয় তার কোথায়? সেই উর্বরা মস্তিষ্ক। তার মনে খেলল, ব্রেন খেলাল—সারা শরীর তার মোচড় দিয়ে উঠল। আপসেই চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনা থেকেই তার কানে তালা পড়ে যাচ্ছে। সে বলবে কোথ থেকে, শুনবে কোথ থেকে। তখনই সে আবার সারা শরীরটাকে ঠিক করে নিল। সে হৃদয়কে বলছে—হৃদয়, তুমি এমন করে কাঁদছ কেন? কার জন্য?

তাহলে সত্য-ক্ষুধা, সত্য-স্পৃহা কাকে বলে? এগুলো পেয়ে খুঁজে বুঝে বিচার করে দেখবি কাকে বলে প্রকৃত সত্য ক্ষুধা। এইরকম একটা মিলিয়ে দেখবি রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে। যদি মিলে তাহলে বলবি—হ্যাঁ সত্য-ক্ষুধা ছিল।]